শরহু নুখবাতিল ফিকার

আরবি বাংলা

ইসলামিয়া কুতুবখানা ▪ ঢাকা

শরহু নুখবাতিল ফিকার

আরবি-বাংলা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মাওলানা মোহাম্মদ আলমগীর হুসাইন

মুহাদ্দিস : জামিয়াতুস সুন্নাহ

শিবচর, মাদারীপুর

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

লেখকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান। দুনিয়ার সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, যার থেকে ইচ্ছা করিয়ে নেন। তিনি কিছু করতে চাইলে কেউ তা বাধা দিতে পারে না। তিনি চাইলে অযোগ্য বান্দা থেকেও যে খেদমত নিতে পারেন এর আরেকটি প্রকৃষ্ট নজির 'বাংলা শরহু নুখবাতিল ফিকার'। যারা আমাকে চেনেন তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, আমার মতো ইলমহীন ব্যক্তির শরাহ লেখা তো দূরের কথা তা পড়ারও যোগ্যতা নেই। এমন অযোগ্য ব্যক্তি থেকে উসূলুল হাদীসের মতো সূক্ষ্ম ও গভীর শাস্ত্রে কলম ধরাটা নিঃসন্দেহে যেমনি অবিশ্বাস্য তেমনি অনভিপ্রেতও বটে। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এই অধম থেকে এমন খেদমত নেওয়ার ইচ্ছা করেছেন, তাই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। গুনাহগার, অধম থেকে আল্লাহ তা'আলা এই মহান খেদমত নেওয়ায় তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজের জীবন-মরণ উৎসর্গ করছি। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বকৃতজ্ঞ স্তুতিবাদ জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ! আমি পুনরায় স্বীকার করছি তুমি মহীয়ান-গরীয়ান, সকল শক্তির আধার! তুমি সর্বশক্তিমান!

উসূলুল হাদীস হলো হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি। হাদীসশাস্ত্রের গ্রামার বা ব্যাকরণ। হাদীসশাস্ত্রকে ত্রুটিমুক্ত রাখতেই এ শাস্ত্রের জন্ম। কেননা, উসূলুল হাদীসের মাধ্যমেই কোন হাদীস নির্ভরযোগ্য, কোন হাদীস দুর্বল, কোন হাদীস বিশুদ্ধ, কোন হাদীস বিশুদ্ধ নয় তা জানা যায়। ইলমে হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করতে হলে উসূলুল হাদীসের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এটি একটি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র।

উসূলুল হাদীসের উপর কলম ধরে যে সকল মনীষী এ শাস্ত্রকে পরিমার্জিতরূপে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্ররূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) -এর নাম শীর্ষ কাতারে। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ইবনে হাজার (র.) উসূলুল হাদীসের উপর প্রথমত নুখবাতুল ফিকার অতঃপর শরহু নুখবাতিল ফিকার শীর্ষক একটি চমৎকার কিতাব জগদ্বাসীকে উপহার দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অন্যতম। তিনি নিজেও কথাটি স্বীকার করেছেন। সংক্ষিপ্ত কলেবরের এ গ্রন্থ এতটা সুন্দর, বিন্যস্ত ও বিষয়সমৃদ্ধ যে, লেখকের কলমের গর্ভ হতে জন্ম নিতে না নিতেই সারা জগৎ মহানন্দে তা কোলে তুলে নেয়। সেই যে লেখকের জীবদ্দশা হতেই কিতাবটি মানুষ হাতে তুলে নিয়েছে আর নামানোর নাম নেই। তখন ছিল ৮০০ শতাব্দী। এখন চলছে ১৫০০ শতাব্দী। এর মধ্যে কতদিকে কত পরিবর্তন হয়েছে, হয়েছে আমূল উত্থান-পতন। পুরাতনকে ছেড়ে মানুষ গ্রহণ করেছে নতুন নতুন উপহার। কিন্তু শরহু নুখবাতিল ফিকারই কেবল ব্যতিক্রম। এখানে নেই নতুনত্বের উপস্থিতি, পরিবর্তনের ঘনঘটা। সেই প্রথম সময়ের মতোই এই ৭০০ বছর পরেও শরহু নুখবাতিল ফিকারের একই কদর রয়ে গেছে। নিসাবে অনেক কিতাব এসেছে- চলে গেছে; কিন্তু শরহু নুখবাতিল ফিকার বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। চলতি দৃশ্যপট বলে, বর্তমানে তো আছেই ভবিষ্যতেও কিতাবটি শির উঁচু করে নিসাবের অন্তর্ভুক্ত রয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শরহু নুখবাতিল ফিকার কিতাবটির যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে পঠন-পাঠন চলছে এবং প্রায় সারা বিশ্বে তা নিসাবভুক্ত, তাই যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম এই কিতাবের পঠন-পাঠনের সহজতার স্বার্থে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ কিতাবকে কেন্দ্র করে অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু হয়েছে বিদেশে আর কিছু হয়েছে এদেশেও। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা শরহু নুখবাতিল ফিকার উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের শরাহ নয়; (এবং তা করার যোগ্যতাও এ অধম **রাখে না**। এ কিতাবকে সামনে রেখে হাদীসশাস্ত্রের শরাহ করছেন মারকাযুদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়া-এর আমীনুত তা'লীম হযরতুল আল্লাম আব্দুল মালেক সাহেব (দা. বা.)। এ কিতাবটি প্রকাশিত হলে ওস্তাদ-ছাত্র তথা সকল আলিমের পড়া উচিত।) বরং শরহু নুখবাতিল ফিকার নামীয় কিতাবের শরাহ– এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবটি গ্রহণ করা চাই। জামিয়াতুস্ সুন্নাহ্, শিবচর, মাদারীপুরে ওস্তাদ হিসেবে আসার দ্বিতীয় বছর (১৪২৩-২৪ হি.) কিতাবটি পড়ানোর দায়িত্ব অধমকে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই-তিন বছর পাঠদান হতে অধম অনুমান করে যে, শরহু নুখবাতিল ফিকার কিতাবটি প্রায় ৭০০ বছর পূর্বের রচিত হওয়ায় এর রচনায় আধুনিকতার ছাপ অনুপস্থিত। যার কারণে কিতাবটি পড়াতে সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের যেমন গলদ্ঘর্ম হতে হয় তেমনি ছাত্ররাও কিতাবটিকে একপ্রকার দুর্বোধ্য মনে করে। অথচ ইবারতের অবিন্যস্ততা ও রচনার দুর্বোধ্যতার বিপরীতে বিষয়বস্তু ততটা কঠিন নয়; বরং একপ্রকার সুখপাঠ্যই বটে। তাই এ দুটি দিক বিবেচনায় অধমের মনে জাগ্রত হয় 'বাংলা শরহু নুখবাতিল ফিকার'-এর সুপ্ত ইচ্ছা। সেই সুপ্ত ইচ্ছার বাস্তবায়ন আপনার হাতের গ্রন্থটি। সময়ের স্বল্পতা এবং বিভিন্ন ব্যস্ততা সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে আমি একটি পরিমার্জিত রূপ দিতে যারপরনাই চেষ্টা করেছি। শরহু নুখবাতিল ফিকারে আলোচিত বিষয়বস্তুকে সহজ-সরলভাবে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করার জোর চেষ্টা করেছি। বাংলা এ গ্রন্থটি সম্পন্ন করতে আমি অনেকের সাহায্য নিয়েছি। ইবারতের অনুবাদের ক্ষেত্রে মাওলানা লিয়াকত আলী সাহেবের 'হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি– শরহে নুখবাতুল ফিকার' সামনে রেখেছি। শরাহ করতে প্রথমদিকে আমার ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের রচিতব্য পাণ্ডুলিপিসহ উর্দু-আরবিতে লিখিত শরাহগুলো পাশে রেখেছি। অবশ্য পরে তাশরীহের ক্ষেত্রে উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'রাওযাতুল আছর' অবলম্বন করা হয়েছে। বলতে গেলে এই উর্দু শরাহটির সাজানো-গোছানো আলোচনাই আমাকে বাংলা করার প্রথম অনুপ্রেরণা যোগায় এবং স্বপ্ন দেখায়। অবশ্য বিভিন্ন স্থানে মাওলানা অসিউর রহমান সাহেব লিখিত প্রশ্নোত্তরে শরহু নুখবাতিল ফিকার মুতালা'আ করেছি ও তা হতে সাহায্য নিয়েছি। এভাবে বিভিন্ন গ্রন্থ, আল্লাহর তৌফিক ও আমার মেহনতের ফল আপনার হাতের এই বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি।

বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থের কাজ শুরু করার পরে মাথা-যন্ত্রণার শিকার হই। এক পর্যায়ে লেখার কাজ বন্ধ থাকে। জামিয়াতুস্ সুন্নাহর মিশকাত জামাতের শরহু নুখবাতিল ফিকারের ঘণ্টায় একদিন ছাত্রদের সামনে আমার ইচ্ছা ও অসুস্থের কথা জানালে ছাত্ররা আমার সুস্থতা ও কিতাবটি দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য দোয়া করার অঙ্গীকার করে। আল্লাহই ভালো জানেন, আসলে ব্যাপারটি কি, কিন্তু এরপর থেকে শরীরে সুস্থতাবোধ করতে থাকি এবং আল্লাহর নামে আবার কলম ধরতে সক্ষম হই। এরপর আর আমাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একপ্রকার সুস্থভাবেই কিতাব শেষ করতে সক্ষম হই। আলহামদুলিল্লাহ্!

লেখা শেষ না হতেই ইসলামিয়া কুতুবখানা কর্তৃপক্ষ কিতাবটি প্রকাশের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলে আল্লাহর নামে পাণ্ডুলিপি তাদের হাতে তুলে দিই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে কিতাবটি ছেপে এখন আপনার হাতের মুঠোয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যোগ্য প্রতিদান দান করুন।

যোগ্যতা অর্জনের জন্য মূল কিতাব (আরবি) অধ্যয়ন করা চাই। যোগ্যতার জন্য এর বিকল্প নেই। মূল কিতাব থেকে পাঠ হাসিলের পরে বাংলা দেখা যেতে পারে। বাংলার উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। তবে যারা মূল কিতাব পড়তে না পারার কারণে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারে না তাদের জন্য এ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নিশ্চয় ফায়দা দেবে। এ শ্রেণির ছাত্রই বাংলার প্রথম পাঠক।

এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আমি অক্ষরের উপর অক্ষর দিয়ে অতি যত্নে সাজিয়েছি এবং গড়ে তুলেছি। লেখার সময় বারবার দোয়া করেছি, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি শেষ হওয়ার আগে যেন মৃত্যু না হয়। নিয়তকে খালেস করার চেষ্টা করেছি যে, ব্যাখ্যাগ্রন্থটি যেন মাওলার সন্তুষ্টি এবং আমার পরকালের নাজাতের অসিলা হয়। পাঠকবর্গের কাছেও শুধু এটুকু দোয়া চাই। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যখন আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন যেন এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব আমার আমলনামায় পৌঁছতে থাকে। পাঠকবর্গ বা আল্লাহর কাছে আর কোনো বিনিময় চাই না। যশ-খ্যাতি হতে মাফ চাই।

পরিশেষে জামিয়াতুস্ সুন্নাহ্-এর ১৪২৬-২৭ হিজরির মিশকাত জামাতের ছাত্রদের শুকরিয়া আদায় করছি, যাদের দোয়ার বরকত ও অসিলায় আল্লাহ তা'আলা সুস্থ থেকে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার তৌফিক দিয়েছেন। দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইহ-পরকালে কামিয়াব করুন। সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সাথে সাথে প্রিয় সহধর্মিণী মোছাম্মাত সুমাইয়া খাতুন (ইতি)-এর ত্যাগ ও কুরবানির কথা স্বীকার না করলেই নয়। কেননা, এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার একাগ্রতার জন্য তাকে দীর্ঘদিন আমার থেকে দূরে থাকতে হয়। তার দীর্ঘদিন কষ্ট ও ত্যাগ শিকারের বদৌলতেই কিতাবটি লেখা ধারণাতীত অল্প সময়ে শেষ হয়। আল্লাহ তাকে এর বদলা দান করুন। তার সুস্থতা ও নেক হায়াত বৃদ্ধি করুন। পাঠকবর্গের কাছে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণ এবং পিতামাতার নেক হায়াত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া চাই।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, তা হলো, কিতাবটি প্রণয়নে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। বারবার দোয়া করেছি, যেন সত্য-সঠিক কথাটি কলম থেকে বের হয়। ইচ্ছা করে ভুল রাখার প্রশ্নই উঠে না। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং ব্যস্ততাহেতু কোনো ভুল যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের জন্য আমিই দায়ী এবং এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অনুগ্রহপূর্বক ভুলগুলো আমাদের জানালে কৃতার্থ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের মতো কবুল করে নিন এবং একে আমার নাজাতের অসিলা করুন।

বিনীত
আলমগীর
মনিরামপুর, যশোর
তাং ০১/ ০২/ ০৬ ইং

সূচিপত্র

উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি জ্ঞাতব্য

উলূমের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের নাম উসূলুল হাদীস। হাদীসশাস্ত্রের ন্যায় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। হাদীসের হেফাজতই এ শাস্ত্রের লক্ষ্য। রাবীদের অবস্থা যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় ও নিশ্চিত করা এ শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। শাস্ত্রটি পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ করতে যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন এবং এ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে এর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

উসূলুল হাদীস মাদরাসা শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুগ-যুগ ধরে তা মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসভুক্ত। অতীব গুরুত্বের সাথে শাস্ত্রটির পঠন-পাঠন হয়। এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা ব্যতিরেকে কেউ পূর্ণ আলিম হতে পারে না। এ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক ও মাত্রা রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও অনেক পরিভাষা। এ সমস্ত পরিভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে এ শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হয় এবং দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

উসূলুল হাদীসের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে, যা জানা প্রতিটি ছাত্র ও আলিমের জন্য অপরিহার্য। এ সমস্ত বিষয় জানার উপরে শাস্ত্রটি বুঝা ও তার হাকীকত হৃদয়ঙ্গম করা নির্ভরশীল। উসূলুল হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ও বুঝতে হলে তৎপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও মৌলিক বিষয়গুলো জানার বিকল্প নেই। কেননা, এতে শাস্ত্রটি নখদর্পণ এবং হাতের মুঠোয় চলে আসে। শাস্ত্রটির মতি-গতি, ধারা-প্রকৃতি সব সময় সামনে থাকে। সহজ কথায় শাস্ত্রটি অপরিচিত ও দুর্বোধ্য থাকে না; বরং চেনা-জানা ও সহজ-সুখপাঠ্য হয়ে যায়। নিম্নে উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হলো–

১. উসূলুল হাদীসের আভিধানিক অর্থ : শব্দটি আরবিতে মূলত أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ। এটি যৌগিক শব্দ। أُصُوْل শব্দটির সম্বন্ধ (ইযাফত) হয়েছে اَلْحَدِيْثُ -এর দিকে। এদের প্রত্যেকটির দুটি করে অর্থ রয়েছে– আভিধানিক ও পারিভাষিক।

ক. أُصُوْل -এর আভিধানিক অর্থ : أُصُوْلٌ শব্দটি اَصْل -এর বহুবচন। অভিধানে اَصْل -এর অর্থ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهٗ অর্থাৎ যার উপরে অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

খ. أُصُوْل -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَصْلٌ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. اَلْقَاعِدَةُ তথা নীতিমালা। যেমন– اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ اَصْلٌ مِنْ اُصُوْلِ النَّحْوِ অর্থাৎ فَاعِلٌ (কর্তা) পেশবিশিষ্ট হওয়া নাহুর একটি নীতি।

২. اَلدَّلِيْلُ তথা প্রমাণ। যেমন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اَصْلٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজ ফরজ হওয়ার প্রমাণ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতাংশটুকু।

৩. اَلرَّاجِحُ তথা অগ্রগণ্য। যেমন– كِتَابُ اللّٰهِ اَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى السُّنَّةِ অর্থাৎ সুন্নতের তুলনায় কিতাবুল্লাহ অগ্রগণ্য।

৪. اِسْتِصْحَابُ الْحَالِ তথা প্রকৃত অবস্থা। যেমন– طَهَارَةُ الْمَاءِ اَصْلٌ অর্থাৎ পানি পবিত্র হওয়াই তার প্রকৃত অবস্থা।

গ. اَلْحَدِيْثُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْحَدِيْثُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَحَادِيْث। اَلْحَدِيْث শব্দটি فَعِيْل -এর ওযনে সিফাতের সীগাহ। حُدُوْث শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এটা قَدِيْم -এর বিপরীত। আরবি ভাষার ইমাম জাওহারী (র.) 'সিহাহে' হাদীসের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– اَلْحَدِيْثُ اَلْكَلَامُ قَلِيْلُهٗ وَكَثِيْرُهٗ অর্থাৎ হাদীস মানে কথা বা বাণী, কম হোক বা বেশি।

এটা হলো হাদীসের আভিধানিক অর্থ। এর সারকথা হলো, আভিধানিকভাবে হাদীস সব ধরনের কথাকে বলা হয়।

তবে اَلْحَدِيْثُ শব্দটি এছাড়া আরো কয়েকটি অর্থ দেয়। যথা–

১. اَلْكَلَامُ তথা বাণী। যেমন– وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

অর্থাৎ আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্য কথা (বাণী) আর কার হবে? [সূরা নিসা : ৮৭]

২. اَلنَّبَأُ তথা সংবাদ। যেমন– هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ অর্থাৎ আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পৌঁছেছে কি? ফেরাউন এবং ছামূদের? [সূরা বুরূজ : ১৭ – ১৮]

৩. اَلْجَدِيْدُ তথা নতুন। যেমন বলা হয়– هٰذَا اَمْرٌ حَدِيْثٌ অর্থাৎ এটা নতুন বিষয়।

৪. اَلْقِصَّةُ তথা কাহিনী। যেমন– هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী কি আপনার কাছে পৌঁছেনি? [সূরা ত্বা-হা : ৯]

৫. اَلرُّؤْيَا তথা স্বপ্ন। যেমন– وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ অর্থাৎ এবং আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। –[সূরা ইউসুফ : ১০১]

ঘ. اَلْحَدِيْثُ **-এর পারিভাষিক অর্থ :** হাদীসের পারিভাষিক অর্থ নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ হয়েছে। যথা–

১. **জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত :** তাঁদের মতে হাদীসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ وَفِعْلِهِمَا وَتَقْرِيْرِهِمَا ـ

অর্থাৎ হাদীস হলো এমন কথা, কাজ ও সমর্থন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীস শব্দটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের উপর প্রযোজ্য হয়।

২. **হাফিজ সাখাবী (র.)-এর অভিমত :** প্রাজ্ঞ এ মুহাদ্দিস হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَوْلًا لَهُ اَوْ فِعْلًا لَهُ اَوْ تَقْرِيْرًا اَوْ صِفَةً حَتَّى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِى الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ ـ

অর্থাৎ হাদীস হলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই তাঁর উক্তি হোক বা কর্ম বা অনুমোদন অথবা গুণ এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় এবং জাগ্রত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি।

৩. **মুফতি আমীমুল ইহসান (র.)-এর অভিমত :** তিনি হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ–

اَلْحَدِيْثُ هُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ قَوْلُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيْرُهُ ـ

অর্থাৎ হাদীস ব্যাপকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের উক্তি, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয়।

৪. **মাওলানা আব্দুল মালেক (দা.বা.) -এর অভিমত :** উলূমুল হাদীসের বিদগ্ধ গবেষক, প্রাজ্ঞ এ মুহাদ্দিস তাঁর اَلْوَجِيْزُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে হাদীসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন–

هُوَ مَا نُسِبَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ اَوْ خُلُقِيَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ اَمْ بَعْدَهَا ـ

অর্থাৎ হাদীস হলো, নবী করীম ﷺ -এর প্রতি যা সম্বন্ধযুক্ত। চাই তা তাঁর উক্তি, কর্ম, অনুমোদন, সৃষ্টিগত বা চারিত্রিক গুণ হোক এবং তা নবুয়তের পূর্ববর্তী হোক কিংবা পরবর্তী।

২. উসূলুল হাদীসের পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পারিভাষিক অর্থে আলিমদের বিভিন্ন রকমের বক্তব্য রয়েছে। যথা–

১. আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (র.) -এর অভিমত : হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত এ আলিমে দীন তাঁর لَمْحَاتٌ مِنْ تَارِيْخِ السُّنَّةِ وَعُلُوْمِ الْحَدِيْثِ গ্রন্থে উলূমুল হাদীসকে ছয়টি বিষয়ের সমষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। তা হলো–

(١) اَلْإِسْنَادُ
(٢) وَتَارِيْخُ الرُّوَاةِ وَ وَفِيَاتِهِمْ
(٣) وَنَقْدُ الرُّوَاةِ وَبَيَانُ حَالِهِمْ مِنْ تَزْكِيَةٍ اَوْ جَرْحٍ
(٤) وَشَبْرُ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ
(٥) وَعِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ
(٦) وَعِلْمُ عِلَلِ الْحَدِيْثِ

২. মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.)-এর অভিমত : বিশিষ্ট এ মুহাদ্দিস তাঁর اَلْوَجِيْزُ فِيْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে উলূমুল হাদীসকে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি বলেছেন। তা হলো–

(١) اُصُوْلُ النَّقْدِ اَعْنِيْ نَقْدَ الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيِّ
(٢) اٰدَابُ التَّحَمُّلِ وَالْاَدَاءِ وَشُرُوْطِ وَصِفَةِ الضَّبْطِ وَالصِّيَانَةِ
(٣) مُصْطَلَحَاتُ اَئِمَّةِ الْفَنِّ اَىْ مَعْرِفَةُ مُصْطَلَحَاتِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর অভিমত : প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ইবনে হাজার (র.) দুভাবে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা–

এক. তাদরীবুর রাবীর ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজারের বরাতে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে এভাবে– مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الْمَعْرِفَةِ بِحَالِ الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيِّ

অর্থাৎ ঐ নিয়মাবলি জানা, যা হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

দুই. ইবনে হাজার (র.) -এর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি শরহু নুখবাতিল ফিকারের ভাষায় নিম্নরূপ–

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ صِحَّةِ الْحَدِيْثِ وَضُعْفِهِ يُعْمَلُ بِهِ اَوْ يُتْرَكُ مِنْ حَيْثُ صِفَاتِ الرِّجَالِ وَصِيَغِ الْاَدَاءِ.

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন ইলমকে বলা হয় যার মধ্যে রাবীদের সিফাত এবং হাদীস বর্ণনার শব্দের বিচারে হাদীসের সহীহ এবং যা'ঈফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যাতে সহীহ হলে আমল করা যায় এবং যা'ঈফ হলে পরিত্যাগ করা যায়।

৪. শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে জামাআহ-এর অভিমত : তিনি উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন–

عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ

অর্থাৎ যে নিয়ম-কানুন জানলে তার দ্বারা সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়, তাকে উসূলুল হাদীস বলে।

৫. আল্লামা তাহির জাযায়েরী দিমাস্কী (র.)-এর অভিমত : প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস কতিপয় মুহাদ্দিস হতে উসূলুল হাদীসের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ–

عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ مِنْ صِحَّةٍ وَحَسَنٍ وَضُعْفٍ وَ رَفْعٍ وَ وَقْفٍ وَقَطْعٍ وَعُلُوٍّ وَنُزُوْلٍ وَكَيْفِيَةِ التَّحَمُّلِ وَالْاَدَاءِ وَصِفَاتِ الرِّجَالِ وَمَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ.

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস ঐ নিয়মাবলি জানার নাম, যার দ্বারা সহীহ, হাসান, যা'ঈফ, মারফূ', মাওকূফ, মাকতূ', উচ্চসনদ, নিম্নসনদ-এর দিক দিয়ে সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায়, হাদীস শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রদানের অবস্থা জানা যায় এবং রাবীদের গুণাবলি ও এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

৬. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র.) -এর অভিমত : اَوْجَزُ الْمَسَالِكِ -এর মুকাদ্দিমায় হযরত যাকারিয়া (র.) উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ–

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَةِ السَّنَدِ اِتِّصَالًا وَاِنْقِطَاعًا وَغَيْرِ ذٰلِكَ -

অর্থাৎ যে ইলমের মধ্যে মুত্তাসিল, মুনকাতি' ইত্যাদি সনদের দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে উসূলুল হাদীস বলে। -[আওজাযুল মাসালিক ১ : ৬]

৭. **আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর অভিমত :** তিনি দুটি পঙ্ক্তির মাধ্যমে চমৎকারভাবে সংক্ষিপ্তরূপে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর اَلْفِيَة গ্রন্থে বলেন–

عِلْمُ الْحَدِيْثِ ذُوْ قَوَانِيْنَ تُحَدُّ * يُدْرٰى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدٍ
فَذَانِكَ الْمَوْضُوْعُ وَالْمَقْصُوْدُ * أَنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُوْلُ وَالْمَرْدُوْدُ

অর্থাৎ ইলমুল হাদীস তথা উসূলুল হাদীস হলো, কিছু নিয়মাবলি, যার দ্বারা মতন এবং সনদের অবস্থা জানা যায়। আর এ সনদ ও মতনই হলো তার আলোচ্য বিষয়। আর উদ্দেশ্য হলো, কোন হাদীস মাকবূল এবং কোন হাদীস মারদূদ তা জানা।

৮. مِنْ أَطْيَبِ الْمَنْحِ فِيْ عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ গ্রন্থে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে–

هُوَ عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ وَقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম, যার দ্বারা হাদীসের সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায় যে, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

৯. হায়াতুল মুসান্নিফীন গ্রন্থে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে–

هُوَ عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ وَالضُّعْفِ وَالْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ -

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের অবস্থা জানা যায় যে, কোনটি সহীহ, কোনটি যা'ঈফ এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

১০. কেউ কেউ সংজ্ঞাটি সংক্ষেপে এভাবেও ব্যক্ত করেছেন যে– هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ

অর্থাৎ এটা এমন বিদ্যা যার দ্বারা সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায়।

৩. **উসূলুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় :** সকলের মতে উসূলুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো–

اَلسَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ -

অর্থাৎ গ্রহণ এবং বর্জনের দিক থেকে হাদীসের সনদ ও মতন নিয়ে আলোচনা করা।

৪. **উসূলুল হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** উসূলুল হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। যথা–

১. আল্লামা ইযযুদ্দীন (র.) বলেন– مَعْرِفَةُ الصَّحِيْحِ مِنْ غَيْرِهٖ

অর্থাৎ গায়রে সহীহ হাদীস থেকে সহীহ হাদীস জানা।

২. কেউ কেউ বলেন– تَحْصِيْلُ مَلَكَةِ تَمْيِيْزِ الصَّحِيْحِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ

অর্থাৎ সহীহ ও গায়রে সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৩. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, উসূলুল হাদীসের উদ্দেশ্য হলো– هُوَ الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ

অর্থাৎ ইহ-পরকালের সৌভাগ্যের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা।

৪. কোনো কোনো কিতাব থেকে জানা যায় যে, উসূলুল হাদীসের লক্ষ্য দুটি। যথা–

১. সহীহ হাদীসকে যা'ঈফ হাদীস থেকে পৃথক করা।

২. হাদীসের পারস্পরিক স্তর জানা।

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْعَالِهٖ وَاَحْوَالِهٖ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةِ السَّنَدِ اِتِّصَالًا وَانْقِطَاعًا وَغَيْرِ ذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ যে ইলমের মধ্যে মুত্তাসিল, মুনকাতি' ইত্যাদি সনদের দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে উসূলুল হাদীস বলে। -[আওজাযুল মাসালিক ১ : ৬]

৭. **আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর অভিমত :** তিনি দুটি পঙ্ক্তির মাধ্যমে চমৎকারভাবে সংক্ষিপ্তরূপে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর اَلْفِيَّة গ্রন্থে বলেন-

عِلْمُ الْحَدِيْثِ ذُوْ قَوَانِيْنَ تُحَدُّ * يُدْرٰى بِهَا اَحْوَالُ مَتْنٍ وَسَنَدٍ

فَذَانِكَ الْمَوْضُوْعُ وَالْمَقْصُوْدُ * اَنْ يُعْرَفَ الْمَقْبُوْلُ وَالْمَرْدُوْدُ

অর্থাৎ ইলমুল হাদীস তথা উসূলুল হাদীস হলো, কিছু নিয়মাবলি, যার দ্বারা মতন এবং সনদের অবস্থা জানা যায়। আর এ সনদ ও মতনই হলো তার আলোচ্য বিষয়। আর উদ্দেশ্য হলো, কোন হাদীস মাকবূল এবং কোন হাদীস মারদূদ তা জানা।

৮. مِنْ اَطْيَبِ الْمَنْحِ فِيْ عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ গ্রন্থে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে এভাবে-

هُوَ عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ وَقَوَاعِدَ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম, যার দ্বারা হাদীসের সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায় যে, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

৯. হায়াতুল মুসান্নিফীন গ্রন্থে উসূলুল হাদীসের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে-

هُوَ عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ وَالضُّعْفِ وَالْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ ـ

অর্থাৎ উসূলুল হাদীস এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের অবস্থা জানা যায় যে, কোনটি সহীহ, কোনটি যা'ঈফ এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য।

১০. কেউ কেউ সংজ্ঞাটি সংক্ষেপে এভাবেও ব্যক্ত করেছেন যে- هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتَنِ

অর্থাৎ এটা এমন বিদ্যা যার দ্বারা সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায়।

৩. **উসূলুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় :** সকলের মতে উসূলুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো- اَلسَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ ـ

অর্থাৎ গ্রহণ এবং বর্জনের দিক থেকে হাদীসের সনদ ও মতন নিয়ে আলোচনা করা।

৪. **উসূলুল হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** উসূলুল হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। যথা-

১. আল্লামা ইযযুদ্দীন (র.) বলেন- مَعْرِفَةُ الصَّحِيْحِ مِنْ غَيْرِهٖ

অর্থাৎ গায়রে সহীহ হাদীস থেকে সহীহ হাদীস জানা।

২. কেউ কেউ বলেন- تَحْصِيْلُ مَلَكَةِ تَمْيِيْزِ الصَّحِيْحِ مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ

অর্থাৎ সহীহ ও গায়রে সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৩. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, উসূলুল হাদীসের উদ্দেশ্য হলো- هُوَ الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ

অর্থাৎ ইহ-পরকালের সৌভাগ্যের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা।

৪. কোনো কোনো কিতাব থেকে জানা যায় যে, উসূলুল হাদীসের লক্ষ্য দুটি। যথা-

১. সহীহ হাদীসকে যা'ঈফ হাদীস থেকে পৃথক করা।

২. হাদীসের পারস্পরিক স্তর জানা।

৫. উসূলুল হাদীসের নামসমূহ : উসূলুল হাদীসের কয়েকটি নাম রয়েছে। যথা–

(১) عُلُوْمُ الْحَدِيْثِ (৪) عِلْمُ دِرَايَةِ الْحَدِيْثِ
(২) عِلْمُ اُصُوْلِ الْحَدِيْثِ (৫) عِلْمُ الْحَدِيْثِ دِرَايَةً
(৩) عِلْمُ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ (৬) عِلْمُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ

৬. উসূলুল হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রেক্ষাপট : যখন থেকে হাদীসের সূচনা ঠিক তখন থেকেই উসূলুল হাদীসেরও সূচনা হয়। কিন্তু প্রথমদিকে উসূলুল হাদীস স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে পরিণত ও প্রণীত ছিল না; বরং ইসলামের শুরুর দিকে মানুষ হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করত। হাদীস জাল করা দূরে থাক সহীহ হাদীস বর্ণনা করতেও তারা ভয় পেতেন। হযরত আবূ বকর (রা.) সহ অনেক সাহাবী ... مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا এ হাদীসের আওতাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় হাদীস বর্ণনা করাই বাদ দিয়েছিলেন। সেজন্য প্রথম দিকে উসূলুল হাদীসশাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে কয়েকটি কারণ প্রকট হয়ে দেখা দিলে এ শাস্ত্র প্রণয়ন অনিবার্য হয়ে উঠে। নিম্নে কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

১. বিভিন্ন ফেরকার অভ্যুদয় : সাহাবায়ে কেরামের যুগের শেষের দিকে এসে বিভিন্ন ফেরকার জন্ম হয়। প্রত্যেক দল বাস্তবে গোমরাহ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে ইসলামের সবচেয়ে অনুসরণীয় দল বলে দাবি করতে থাকে এবং প্রত্যেক দল নিজেদের সত্যতা, বাস্তবতা ও দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরার স্বার্থে হাদীস তৈরি করে দলিল হিসেবে পেশ করার অপপ্রয়াস চালায়।

২. ইসলামের শত্রুদের অপতৎপরতা : ইসলামের শত্রুরা যখন দেখতে পায় যে, ইসলামের নামে বহু দল-উপদল সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রত্যেক দল নিজেদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে হাদীস জাল করছে, তখন ইসলামের শত্রুরাও ময়দানে নেমে আসে। তারা এটিকে ইসলামের মূলোৎপাটনের অপূর্ব সুযোগ মনে করে তা কাজে লাগানোর অপপ্রয়াসে মেতে ওঠে। তারাও হাদীস তৈরি করার দুঃসাহস দেখায়। তারা এমন এমন হাদীস তৈরি করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়, যা ছিল ইসলামি ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত– ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থি।

৩. হাদীস রেওয়ায়েতের অপরিসীম গুরুত্ব : হাদীস চর্চা ও হাদীস রেওয়ায়েতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মানুষ হাদীস রেওয়ায়েতকারীদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। বেশি বেশি হাদীস রেওয়ায়েত করে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন ও অধিক সম্মানের অধিকারী হওয়ার নেশায় অনেকে খুব তৎপর হয়ে ওঠে। তারা হাদীস পেলেই তা রেওয়ায়েত করতে থাকে। সহীহ ও যা'ঈফ -এর বাছ-বিচার করে না। যার কাছ থেকে যেভাবে হোক হাদীস পেলেই হলো, তা যাচাই না করেই রেওয়ায়েত করার একটি প্রবণতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেকে আরও নিচে নেমে আসে। তারা নিজেদের হাদীস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে নিজেরাই হাদীস বানাতে শুরু করে।

উল্লেখযোগ্য এ তিনটি কারণ প্রকট হয়ে দেখা দিলে হাদীসশাস্ত্রের হেফাজতের বিষয়টি সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে ভাবিয়ে তোলে। তারা ঐকমত্যে হাদীসশাস্ত্রকে সকল চক্রান্ত থেকে দূরে রাখার সংকল্প করেন। দুটি বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হয় এবং জোরালো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথা–

১. সহীহ হাদীসকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে যে কোনো উপায়ে পৃথক করতে হবে এবং জাল হাদীস চিহ্নিত করতে হবে।

২. যে কোনো মূল্যে ইসলামের সত্য-সঠিক আকিদা-বিশ্বাস, চেতনা ও ইসলামি ভাবধারা রক্ষা করতে হবে। ইসলামবিরোধী যে কোনো আকিদাকে বাতিল বলে খণ্ডন করতে হবে।

এ দুই মহতী সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোনো চক্রান্ত রুখতে সর্বসম্মতভাবে স্থির হয় যে, এমন কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা হাদীসের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অশুদ্ধ, যা'ঈফ, মাওযূ' ইত্যাদি রেওয়ায়েত সকলের সামনে স্পষ্ট করে দেবে। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে এই নীতিমালাই اُصُوْلُ الْحَدِيْثِ নামে পরিগণিত হয়।

৭. **উসূলুল হাদীসশাস্ত্র রচনার ইতিহাস :** উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সূচনা হয় মূলত যখন থেকে রাবীকোষ রচনা এবং হাদীসগ্রন্থ লিখিত হতে থাকে। এর পূর্বে উসূলুল হাদীস লিখিতভাবে ছিল না; বরং মুহাদ্দিসগণের হৃদয়ে সংরক্ষিত ছিল এবং মৌখিকভাবে তার আলোচনা চলত। যখন থেকে হাদীসের কিতাব লেখা হতে থাকে, তখন হাদীসের কিতাবের এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে উসূলুল হাদীস জন্ম নিতে থাকে। প্রথম দিকে উসূলুল হাদীসের উপরে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ ছিল না। উসূলুল হাদীস গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এর পূর্বে হাদীসের গ্রন্থে প্রয়োজনানুপাতে কোথাও কোথাও কিছু কিছু বিষয়ের আলোচনা হতো।

আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (র.) প্রণীত لَمَحَات مِنْ تَارِيْخِ السُّنَّةِ وَعُلُوْمِ الْحَدِيْثِ গ্রন্থের আলোকে জানা যায় যে, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম উসূলুল হাদীসের উপর কলম ওঠে। উসূলুল হাদীসের কিছু বিষয়ে কয়েকটি অধ্যায়বিশিষ্ট এক ছোট্ট পুস্তিকা সর্বপ্রথম উপহার দেন ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (র.)। তিনি ১৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ২৩৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

এরপরে ইমাম শাফেয়ী (র.) (জন্ম ১৫০ হি.- মৃত্যু ২০৪ হি.) উসূলুল হাদীসের কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি اَلرِّسَالَةُ নামক গ্রন্থে উসূলুল ফিক্‌হ সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে حُكْمُ الْمُرْسَلِ , قَبُوْلُ حَدِيْثِ الْمُدَلِّسِ , اَلرِّوَايَةُ بِالْمَعْنٰى , شَرْطُ حِفْظِ الرَّاوِىْ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এরপরে উসূলুল হাদীসের উপর কলম ধরেন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সমকালীন আরেকজন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ঈসা ইবনে আবান (র.) (জন্ম ১৫০ হি. - মৃত্যু ২২১ হি.) তিনি তাঁর কিতাব اَلْحُجَّةُ الصَّغِيْرَةُ গ্রন্থের মুকাদ্দিমায় উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

এরপরে তৃতীয় শতাব্দীতে এসে উসূলুল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করেন হযরত ইমাম দারেমী (র.) (জন্ম ১৮১ হি.- মৃত্যু ২৫৫ হি.)। তিনি তাঁর সুনানে দারেমীর মুকাদ্দিমায় উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন নীতি উল্লেখ করেছেন।

এরপরে এসে কলম ধরেন ইমাম মুসলিম (র.) (জন্ম ২০৪ হি. - মৃত্যু ২৬১ হি.)। তিনি সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় উসূলুল হাদীসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন।

উসূলুল হাদীস সম্পর্কে আরো আলোচনা করেছেন ইমাম তিরমিযী (র.) (জন্ম ২০৯ - মৃত্যু ২৭৯ হি.)। তিনি তাঁর তিরমিযী শরীফের শেষের দিকে এসে একটি অংশে স্বতন্ত্রভাবে উসূলুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আরো আলোচনা করেছেন ইমাম আবূ দাউদ (র.) মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত رِسَالَتُهٗ فِىْ وَصْفِ سُنَنِهٖ নামক এক পুস্তিকায়।

অনুরূপ আলোচনা করেছেন আল্লামা আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর আল-বায্‌যার (র.) (মৃত্যু ২৯০ হি.)।

উসূলুল হাদীসের উপর আরো বলিষ্ঠ কলম ধরেছেন ইমাম ত্বাহাবী (র.)। তিনি اَلتَّسْوِيَةُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَاَخْبَرَنَا فِيْمَا سَمِعَ مِنَ الشَّيْخِ اَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ নামক পুস্তিকায় উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা করেছেন।

চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এভাবে আরো অনেকে উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন উসূলুল ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছেন। অনেকে এ আলোচনাকে অন্য গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

চতুর্থ শতাব্দীতে এসে উসূলুল হাদীসের প্রতি ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি দারুণভাবে পতিত হয়। এ যুগে এসে উসূলুল হাদীসের বেশি বেশি চর্চা হতে থাকে। নিয়ম-নীতি একস্থানে জমা করার ধারা শুরু হয়। ওলামায়ে কেরাম উসূলুল হাদীসকে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপ দেওয়ার জোর প্রয়াস চালান। বস্তুত এ যুগে এসেই

উসূলুল হাদীস স্বাতন্ত্র্য রূপ পায় এবং পৃথক শাস্ত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এ শতাব্দীতে যিনি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে উসূলুল হাদীসের রূপদান করেন এবং এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে খাল্লাদ ফারেসী রামাহুরমুযী (র.)। তিনি ২৬৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৩৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত তাঁর রচিত কিতাবটির নাম اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِىْ وَالْوَاعِىْ। এ কিতাবটি তাঁর সমকালীন গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বব্যাপী। তবে তা এ বিষয়ের সবদিক ও বিভাগকে সন্নিবেশ করেনি। পরবর্তীতে আলিমগণ এ বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতি দান করেন। সর্বপ্রথম যিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি হলেন হাকীম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.)। তিনি ৩২১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কিতাবটি উলূমুল হাদীসের পঞ্চাশ প্রকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে; কিন্তু সেটি সুবিন্যস্ত ও সুপরিপাটি ছিল না। উসূলুল হাদীস বিষয়ক তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ। তাঁর এ বিষয়ে আরো একটি কিতাব আছে, যার নাম اَلْمدخَلُ اِلٰى مَعْرِفَةِ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ مِنَ الْاَخْبَارِ।

হাকীম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আবূ নুআইম ইস্পাহানী (র.)। তিনি ৩৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি নিশাপুরীর কিতাবের উপর একটি مُسْتَخْرَجْ (পরিশিষ্ট) প্রণয়ন করেন।

এরপরে এসে উসূলুল হাদীসের উপর অনেক কিতাব লেখেন আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীবে বাগদাদী (র.)। তিনি ৩৯২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস বর্ণনার নীতিমালা সম্পর্কে اَلْكِفَايَةُ فِىْ عِلْمِ الرِّوَايَةِ এবং হাদীস বর্ণনার আদাব সম্পর্কে اَلْجَامِعُ لِاَخْلَاقِ الرَّاوِىْ وَاٰدَابِ السَّامِعِ নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের এমন কোনো বিষয় নেই, যার উপর খতীবে বাগদাদী (র.) কোনো কিতাব প্রণয়ন করেননি।

খতীবে বাগদাদীর পরে যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তিনি হলেন কাজি ইয়ায ইবনে মূসা য়াহসূবী সাবতী মাগরেবী (র.)। তিনি ৪৭৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৫৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উসূলুল হাদীসের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম اَلْاِلْمَاعُ اِلٰى مَعْرِفَةِ اُصُوْلِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيْدِ السَّمَاعِ।

এরপরে এসে উসূলুল হাদীসের উপর কিতাব লেখেছেন আবূ হাফস ওমর ইবনে আব্দুল মাজীদ আল-মাইয়ানিযী (র.)। তিনি ৪৭৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৫৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত কিতাবের নাম مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلَهٗ।

এদের সকলের পরে এসেছেন আবূ আমর ওসমান ইবনে সালাহুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান ইবনে মূসা কারদারী শাহরযুরী মুসেলী শাফেয়ী (র.)। তিনি ৫৭৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে হাদীসের দরস দানকালে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে উসূলুল হাদীসের উপর একটি কিতাব লেখেন। তাঁর রচিত কিতাবের নাম مَعْرِفَةُ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ। কিন্তু পরবর্তীতে কিতাবটি مُقَدِّمَةُ اِبْنِ الصَّلَاحِ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেন এবং অনেকে এ কিতাবটির খেদমত করেছেন। কেউ এটিকে সুবিন্যস্ত করেছেন, কেউ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ সার-সংক্ষেপ লেখেছেন, কেউবা পরিশিষ্ট লেখেছেন ইত্যাদি।

মুতাআখখিরীনদের মধ্যে যারা উসূলুল হাদীসের খেদমত করে এ শাস্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের প্রয়াস পেয়েছেন তাদের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) অন্যতম। তিনি ৭৭৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৮৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর কতিপয় দীনি ভাইয়ের অনুরোধক্রমে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন। কিতাবটির নাম রাখেন نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ اَهْلِ الْاَثَرِ। এরপর তিনি নিজেই নিজ কিতাবের শরাহ লেখেন

نُزْهَةُ النَّظَرِ فِىْ تَوْضِيْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ নামে। তাঁর দুটি কিতাবই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ওলামায়ে কেরাম এ দুকিতাবের ব্যাপক খেদমত করেছেন। অনেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে শরহু নুখবাতিল ফিকারের উপর বিভিন্ন ভাষায় অনেক খেদমত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

৮. **উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :** উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার সম্মানিত ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) তাঁর اَلْمَدْخَلُ اِلٰى عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থের ১১ পৃ. থেকে নিয়ে ১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি এখানে উক্ত গ্রন্থ হতে কয়েকটি দিক উল্লেখ করলাম মাত্র।

হাদীস শরীফের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সহীহ সনদের উপর। যে হাদীসের সনদ দুর্বল সে হাদীসও দুর্বল। আর সনদের সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয় উসূলুল হাদীসের মধ্যে। তাই উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

উসূলুল হাদীস সম্পর্কে জানা অতীব প্রয়োজন। প্রতিটি যুগেই এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের নাস্তিকতা, হাদীস অস্বীকার ইত্যাদি ফিতনার যুগে উসূলুল হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত। অতীতে উসূলুল হাদীসের যে প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন বর্তমান যুগে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। কারণ, শরিয়তে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস ইসলামী শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। আমরা প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে ৫টি বিষয়ের মুখাপেক্ষী। যথা–

১. تَصْحِيْحُ اَسْمَاءِ السَّنَدِ অর্থাৎ সনদে উল্লিখিত নামগুলোর সঠিক ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ।

২. تَحْقِيْقُ اَحْوَالِ رِجَالِ السَّنَدِ অর্থাৎ সনদে আগত রাবীদের অবস্থা ও জীবনী যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৩. تَصْحِيْحُ اَلْفَاظِ الْمَتْنِ অর্থাৎ মতন তথা হাদীসের শব্দগুলো সহীহ-শুদ্ধরূপে পাঠ করা।

৪. مَعْرِفَةُ حُكْمِ الْحَدِيْثِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ অর্থাৎ সহীহ ও যা'ঈফের দিক দিয়ে হাদীসের হুকুম জানা। অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ না যা'ঈফ তা জানা।

৫. فِقْهُ الْحَدِيْثِ وَمَعْرِفَةِ مَا فِيْهِ مِنْ اَحْكَامٍ وَفَوَائِدَ وَاٰدَابٍ অর্থাৎ হাদীসের অন্তর্নিহিত তথ্য, আহকাম, জ্ঞানকণিকা ও আদব জানা।

এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম চারটির প্রত্যেকটি উসূলুল হাদীসের উপর নির্ভরশীল। কারণ, উসূলুল হাদীস হতে জানা যায়–

১. রাবীর নামটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ।
২. রাবীর জীবনী ও তার ব্যক্তিগত হাল-অবস্থা।
৩. হাদীসটির সহীহ-শুদ্ধ উচ্চারণ।
৪. হাদীসটির গুণগত হুকুম।

আর পঞ্চম বিষয় যেটা সেটা হলো মূলত হাদীসের ফল। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, ফল পাওয়ার আগে গাছের অস্তিত্ব জরুরি।

মোটকথা, প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে যে পাঁচটি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তার মধ্যে চারটি প্রত্যক্ষভাবে এবং একটি পরোক্ষভাবে উসূলুল হাদীসের উপর নির্ভর এবং তার সাথেই জড়িত। অতএব, হাদীস সম্পর্কে অবহিত হতে হলে উসূলুল হাদীসের জ্ঞানার্জন পূর্বশর্ত।

আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা উসূলুল হাদীসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। তা হলো–

১. পার্থিব জীবনে যেমনিভাবে একজনের কথা বা উক্তি আরেকজনের কাছে বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে শরয়ী বিষয়ও একজন থেকে আরেকজনের কাছে বর্ণনা বা তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা এমন একটি বাস্তব বিষয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আরবিতে এ বর্ণনা করাকে বলে 'রেওয়ায়েত'।

২. এটা সকলেই জানে যে, রেওয়ায়েত দুপ্রকার হয়। যথা– ১. সত্য তথা বাস্তব। ২. মিথ্যা তথা অবাস্তব।
৩. সত্য-মিথ্যা এক নয়। অনুরূপ বাস্তব-অবাস্তবও এক নয়।
৪. সুতরাং সত্য-মিথ্যা আর বাস্তব-অবাস্তব নির্ণয় জরুরি।
এ কয়টি বিষয় এমনই যা প্রত্যেক জ্ঞানী স্বীকার করতে বাধ্য, কারো পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হাদীসে নববীও এক ধরনের খবর ও রেওয়ায়েত। সাধারণ রেওয়ায়েতের ন্যায় তার মধ্যেও সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনিভাবে কোনো একটি দুনিয়াবি খবরকে যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে যে কেউ 'রাসূল বলেছেন' বললে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। এটা বাস্তবতারও দাবি যে, কেউ রাসূলের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বললেই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তার শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাই-বাছাইয়ের পরেই তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, পূর্বে এমন অনেক নজির রয়েছে যে, মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে কিংবা মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে সমাজে চালিয়ে দিয়েছে। উসূলুল হাদীস হলো, হাদীসের শুদ্ধা-শুদ্ধি যাচাইয়ের পাল্লা। কোনো হাদীস বিশুদ্ধ হতে হলে প্রথমে তাকে উসূলুল হাদীসের পাল্লায় উঠাতে হবে। এখানে যথাযথ প্রমাণিত হলে তবেই সেটা সহীহ বলে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হবে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও উসূলুল হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক দিক রয়েছে। এর জন্য তাদরীবুর রাবীর মুকাদ্দিমা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৯. **ইলমে হাদীসের প্রকারভেদ :** আল্লামা ইবনুল আকফানী (র.) 'ইরশাদুল কাসিদ'-এ লেখেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রের প্রথমত দুটি প্রকার রয়েছে। যথা– ১. عِلْم رِوَايَةِ الْحَدِيْث ২. عِلْم دِرَايَةِ الْحَدِيْثِ, নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

১. **عِلْم رِوَايَةِ الْحَدِيْث -এর সংজ্ঞা :** এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ عِلْمٌ يَنْقُلُ اَقْوَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْعَالِهِ وَاَحْوَالِهِ بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِلِ وَضَبْطِهَا وَتَحْرِيْرِهَا ـ

অর্থাৎ عِلْم رِوَايَةِ الْحَدِيْث হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কাজ ও অবস্থা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শুনে এবং লেখে ও মুখস্থ করে বর্ণনা করা সংক্রান্ত বিদ্যা।

২. **عِلْم دِرَايَةِ الْحَدِيْث -এর সংজ্ঞা :** এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ عِلْمٌ يَتَعَرَّفُ بِهِ اَنْوَاعَ الرِّوَايَةِ وَاَحْكَامَهَا وَشُرُوْطَ الرُّوَاةِ وَاَصْنَافَ الْمَرْوِيَّاتِ وَاسْتِخْرَاجَ مَعَانِيْهَا ـ

এরূপ শাস্ত্র যার দ্বারা রেওয়ায়েতের প্রকার, আহকাম ও রাবীদের শর্ত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রকার ও অর্থ উৎসারণ সম্পর্কে জানা যায়।

অতএব, কোনো হাদীস সম্পর্কে এটা জানা যে, এটি অমুক গ্রন্থে অমুক সনদে অমুক শব্দে বর্ণিত হয়েছে– এটা হলো ইলমে রেওয়ায়েতুল হাদীস। আর এ হাদীস সম্পর্কে এ কথা জানা যে, এটি খবরে ওয়াহিদ না মাশহূর, সহীহ না দুর্বল, মুত্তাসিল না মুনকাতি', এরূপভাবে এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য না অনির্ভরযোগ্য, তাছাড়া এ হাদীস থেকে কি কি বিধান উৎসারিত হয় এবং কোনো বৈপরীত্য আছে কি না? থাকলে কিভাবে তার অবসান করা যায়– এসব বিষয় ইলমে দিরায়াতুল হাদীস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

১০. **তিনটি পরিভাষার ব্যাখ্যা ও হাকীকত :** اَلْحَافِظُ ، اَلْحُجَّةُ ، اَلْحَاكِمُ এ তিনটি মশহূর পরিভাষা। সলফ-খলফসহ সর্বযুগের মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ পরিভাষাত্রয় ব্যবহার করেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) شَرْحُ شَرْحِ نُخْبَةْ গ্রন্থে এ পরিভাষাগুলোর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

اَلْحَافِظُ : هُوَ مَنْ اَحَاطَ عِلْمُهُ بِمِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ ـ

وَالْحُجَّةُ : وَهُوَ مَنْ اَحَاطَ عِلْمُهُ بِثَلَاثِ مِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ ـ

وَالْحَاكِمُ : وَهُوَ الَّذِىْ اَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيْعِ الْاَحَادِيْثِ مَتْنًا وَاِسْنَادًا وَ جَرْحًا وَتَعْدِيْلًا وَتَارِيْخًا ـ

অর্থাৎ 'হাফিজ' বলা হয় যার এক লাখ হাদীস মুখস্থ থাকে।

'হুজ্জাত' বলা হয় যার তিন লাখ হাদীস মুখস্থ থাকে।

'হাকিম' বলা হয় যার সমস্ত হাদীস সনদ, মতন, জরাহ, তা'দীল, ইতিহাসসহ মুখস্থ থাকে।

পরবর্তীতে শায়খ আব্দুল্লাহ টুংকী (র.) সহ অনেক ব্যাখ্যাতা মোল্লা আলী কারী (র.) -এর অনুসরণে উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করেছেন।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো, উক্ত পরিভাষাসমূহের যে ব্যাখ্যা মোল্লা আলী কারী (র.) সহ অনেকের কলমে উল্লিখিত হয়েছে তা ভুল ও অবাস্তব। বিশেষ করে হাকিমের যে সংজ্ঞা উল্লিখিত তার বাস্তবতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, এ পরিভাষাত্রয় অনেক পূর্ব হতে প্রচলিত। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) -এর পূর্বে কোনো আলিম থেকে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়নি। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁর বিভিন্ন কিতাবে اَلْحَافِظُ -এর অর্থ ও মতলব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি نُزْهَةُ الْاَلْبَابِ فِى الْاَلْقَابِ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠায় اَلْحَافِظُ শব্দের হাকীকত সম্পর্কে বলেন–

لَقَبُ مَنْ مَهَرَ فِىْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ .

অর্থাৎ হাফিজ হলো হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির উপাধি।

ইবনে হাজার (র.) اَلنُّكَتُ عَلٰى كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আরো লেখেন–

اَلْحَافِظُ فِىْ عُرْفِ الْمُحَدِّثِيْنَ شُرُوْطٌ اِذَا اجْتَمَعَتْ فِى الرَّاوِىْ سَمَّوْهُ حَافِظًا ، وَهُوَ الشُّهْرَةُ بِالطَّلَبِ وَالْاَخْذِ مِنْ اَفْوَاهِ الرِّجَالِ لَا مِنَ الصُّحُفِ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِطَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَمَرَاتِبِهِمْ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِالتَّجْرِيْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ، وَتَمْيِيْزُ الصَّحِيْحِ مِنَ السَّقِيْمِ ، حَتّٰى يَكُوْنَ مَا اسْتَحْضَرَهُ مِنْ ذٰلِكَ اَكْثَرُ مِمَّا لَا يَسْتَحْضِرُهُ مَعَ اِسْتِحْضَارِ الْكَثِيْرِ مِنَ الْمُتُوْنِ ، فَهٰذِهِ الشُّرُوْطُ اِذَا اجْتَمَعَتْ فِى الرَّاوِىْ سَمَّوْهُ حَافِظًا .

মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় 'হাফিজ' -এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যে রাবীর মধ্যে ঐ শর্তগুলো থাকে তাকে মুহাদ্দিসগণ 'হাফিজ' বলেন। সে শর্ত হলো, রাবী হাদীস অর্জন এবং মুহাদ্দিসগণের সরাসরি মুখ থেকে তা গ্রহণে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হবেন, কিতাবাদি হতে তিনি হাদীস সংগ্রহ করবেন না। রাবীদের তবকা ও স্তর জানবেন। তাজরীহ ও তা'দীল সম্পর্কে অবহিত হবেন। সহীহ হাদীসকে দুর্বল হাদীস থেকে পৃথক করতে পারবেন। এমনকি এসব বিষয় তার অধিকহারে মুখস্থ থাকবে। হাদীসের মতনও অনেক মুখস্থ থাকবে। এ সমস্ত শর্ত যে রাবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাকে 'হাফিজ' বলে অভিহিত করেন।

এ প্রসঙ্গে কেবল ইবনে হাজার (র.) নয়, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (র.) لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ গ্রন্থে, সাইয়েদ আব্দুল হাই কাত্তানী (র.) فِهْرِسُ الْفَهَارِسِ গ্রন্থে, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা (র.) اُمَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ গ্রন্থে এবং আমার ওস্তাদ শায়খ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) اَلْرَجِيْزُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

اَلْحَافِظُ শব্দটির অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.) যা উল্লেখ করেছেন তা যে সঠিক নয় তার প্রথম কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পারিভাষিক শব্দটি পূর্বেও ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু কেউ তার অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতো করেননি; বরং ইবনে হাজার (র.) সহ অনেক ওলামায়ে কেরাম اَلْحَافِظُ শব্দটিকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি লকব বিশেষ বলে অভিহিত করেছেন, যা কারো ব্যাপারে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য হয়; সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করার সাথে এ শব্দের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই।

اَلْحَافِظُ শব্দটির অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.) যা উল্লেখ করেছেন এবং তার যে সংজ্ঞাটি ব্যাপক প্রচার-প্রসার পেয়েছে, তা সঠিক না হওয়ার দ্বিতীয় জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, যুগে-যুগে যারা 'হাফিজে হাদীস' লকবে ভূষিত হয়েছেন হাফিজ যাহাবী (র.) تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ নামক গ্রন্থে এবং হাফিজ সুয়ূতী (র.) طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ নামক গ্রন্থে তাঁদের জীবনী সংকলন করেছেন। তাঁরা এসব গ্রন্থে এমন অনেক হাফিজে হাদীসের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক লাখ তো দূরের কথা দশ হাজারও নয়। অনেক নাম তো এমন আছে যাদের রেওয়ায়েতের সংখ্যাই উল্লিখিত হয়নি, আবার যাদের উল্লেখ হয়েছে তাদের রেওয়ায়েত সংখ্যা দশ হাজারেরও অনেক কম। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'হাফিজ' হওয়ার জন্য এক লাখ হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরি নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে হুফ্ফাজদের কাতারে তারা শামিল হতে পারতেন না; বরং আসল কথা হলো, 'হাফিজ'-এর সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করার সাথে নয়; বরং 'হাফিজ' হলো লকববিশেষ, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কোনো রাবী বা মুহাদ্দিস ঐ লকবে ভূষিত হন।

আর اَلْحَاكِمُ শব্দটি মুহাদ্দিসগণের কোনো লকব নয়; বরং তা বিচারকার্য পরিচালনাকারীর উপাধি। এ সম্পর্কে ড. হাসান পাশা তাঁর اَلْاَلْقَابُ الْاِسْلَامِيَّةُ গ্রন্থে লেখেন–

اَلْحَاكِمُ ، فَاعِلٌ مِنَ الْحُكْمِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ ، وَهُوَ مِنْ اَلْقَابِ الْقُضَاةِ ـ

অর্থাৎ হাকিম হলেন তিনি, যিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন তথা বিচারক। 'হাকিম' এটা বিচারকদের লকব।

এ প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) তাঁর اَلْوَجِيْزُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে বলেন–

وَاَمَّا لَفْظُ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ هُوَ بِلَقَبٍ مِنْ اَلْقَابِ رُتَبِ الْمُحَدِّثِيْنَ ، بَلْ هُوَ وَصْفٌ لِمَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ ، وَلَا دَخْلَ لَهُ فِىْ حِفْظِ الْحَدِيْثِ وَ رِوَايَتِهِ ـ

অর্থাৎ 'হাকিম' শব্দটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্তরগত কোনো লকব নয়; বরং তা বিচারকের পদে আসীন ব্যক্তিবর্গের পদের নাম। এ নামের সাথে হাদীস মুখস্থ ও বর্ণনা করার দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই।

অতএব, হাকিম -এর যে মশহুর সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে, যার সমস্ত হাদীস মুখস্থ সেই হাকিম– এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ভুল।

আর اَلْحُجَّةُ শব্দটিও মূলত মুহাদ্দিসীনে কেরামের একক কোনো লকব নয়; বরং তা অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে اَلْوَجِيْزُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে আমার সম্মানিত ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.)-এর তাহকীকী মন্তব্য হলো–

وَاَمَّا لَفْظُ الْحُجَّةِ فَكَثِيْرًا مَا يَسْتَعْمِلُ فِىْ مَجَالِ التَّوْثِيْقِ وَالتَّعْدِيْلِ ، فَيَكُوْنُ بِمَعْنَى : اَلْحُجَّةِ فِى الرِّوَايَةِ ، اَىْ اَلَّذِىْ يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ ، وَيَسْتَعْمِلُ بِكَثْرَةٍ اَيْضًا كَلَقَبٍ مِنَ الْاَلْقَابِ. فَيُطْلَقُ عَلٰى مَنْ كَانَ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ ، حُجَّةٌ فِى التَّصْحِيْحِ وَالتَّضْعِيْفِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ـ

অর্থাৎ 'হুজ্জত' শব্দটি বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয় সমর্থন ও প্রত্যয়ন -এর স্থলে। সুতরাং 'হুজ্জত ফির রেওয়ায়েত' (اَلْحُجَّةُ فِى الرِّوَايَةِ) -এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি যার রেওয়ায়েত দ্বারা হুজ্জত তথা প্রমাণ পেশ করা হয়। اَلْحُجَّةُ শব্দটি আবার অন্যান্য লকবের মতো একটি লকব হিসেবেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আর এটা লকব হয় ঐ ব্যক্তির, যিনি তাসহীহ-তায'ঈফ ও জরাহ-তা'দীলের ব্যাপারে হুজ্জত তথা প্রমাণস্বরূপ হন।

اَلْحَافِظُ শব্দটির অর্থ মোল্লা আলী কারী (র.) যা উল্লেখ করেছেন এবং তার যে সংজ্ঞাটি ব্যাপক প্রচার-প্রসার পেয়েছে, তা সঠিক না হওয়ার দ্বিতীয় জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, যুগে-যুগে যারা 'হাফিজে হাদীস' লকবে ভূষিত হয়েছেন হাফিজ যাহাবী (র.) تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ নামক গ্রন্থে এবং হাফিজ সুয়ূতী (র.) طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ নামক গ্রন্থে তাঁদের জীবনী সংকলন করেছেন। তাঁরা এসব গ্রন্থে এমন অনেক হাফিজে হাদীসের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক লাখ তো দূরের কথা দশ হাজারও নয়। অনেক নাম তো এমন আছে যাদের রেওয়ায়েতের সংখ্যাই উল্লিখিত হয়নি, আবার যাদের উল্লেখ হয়েছে তাদের রেওয়ায়েত সংখ্যা দশ হাজারেরও অনেক কম। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'হাফিজ' হওয়ার জন্য এক লাখ হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরি নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে হুফ্‌ফাজদের কাতারে তারা শামিল হতে পারতেন না; বরং আসল কথা হলো, 'হাফিজ'-এর সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করার সাথে নয়; বরং 'হাফিজ' হলো লকববিশেষ, কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কোনো রাবী বা মুহাদ্দিস ঐ লকবে ভূষিত হন।

আর اَلْحَاكِمُ শব্দটি মুহাদ্দিসগণের কোনো লকব নয়; বরং তা বিচারকার্য পরিচালনাকারীর উপাধি। এ সম্পর্কে ড. হাসান পাশা তাঁর اَلْاَلْقَابُ الْاِسْلَامِيَّةُ গ্রন্থে লেখেন–

اَلْحَاكِمُ ، فَاعِلٌ مِنَ الْحُكْمِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ ، وَهُوَ مِنْ اَلْقَابِ الْقُضَاةِ ـ

অর্থাৎ হাকিম হলেন তিনি, যিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন তথা বিচারক। 'হাকিম' এটা বিচারকদের লকব।

এ প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.) তাঁর اَلْوَجِيْزُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে বলেন–

وَاَمَّا لَفْظُ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ هُوَ بِلَقَبٍ مِنْ اَلْقَابِ رُتَبِ الْمُحَدِّثِيْنَ ، بَلْ هُوَ وَصْفٌ لِمَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ ، وَلَا دَخْلَ لَهُ فِىْ حِفْظِ الْحَدِيْثِ وَ رِوَايَتِهِ ـ

অর্থাৎ 'হাকিম' শব্দটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্তরগত কোনো লকব নয়; বরং তা বিচারকের পদে আসীন ব্যক্তিবর্গের পদের নাম। এ নামের সাথে হাদীস মুখস্থ ও বর্ণনা করার দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই।

অতএব, হাকিম -এর যে মশহুর সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে, যার সমস্ত হাদীস মুখস্থ সেই হাকিম– এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ভুল।

আর اَلْحُجَّةُ শব্দটিও মূলত মুহাদ্দিসীনে কেরামের একক কোনো লকব নয়; বরং তা অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে اَلْوَجِيْزُ فِىْ مَعْرِفَةِ اَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ গ্রন্থে আমার সম্মানিত ওস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক (দা. বা.)-এর তাহকীকী মন্তব্য হলো–

وَاَمَّا لَفْظُ الْحُجَّةِ فَكَثِيْرًا مَا يَسْتَعْمِلُ فِىْ مَجَالِ التَّوْثِيْقِ وَالتَّعْدِيْلِ ، فَيَكُوْنُ بِمَعْنَى : اَلْحُجَّةِ فِى الرِّوَايَةِ ، اَىْ اَلَّذِىْ يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ ، وَيَسْتَعْمِلُ بِكَثْرَةٍ اَيْضًا كَلَقَبٍ مِنَ الْاَلْقَابِ فَيُطْلَقُ عَلٰى مَنْ كَانَ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ ، حُجَّةٌ فِى التَّصْحِيْحِ وَالتَّضْعِيْفِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ ـ

অর্থাৎ 'হুজ্জত' শব্দটি বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয় সমর্থন ও প্রত্যয়ন -এর স্থলে। সুতরাং 'হুজ্জত ফির রেওয়ায়েত' (اَلْحُجَّةُ فِى الرِّوَايَةِ) -এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি যার রেওয়ায়েত দ্বারা হুজ্জত তথা প্রমাণ পেশ করা হয়। اَلْحُجَّةُ শব্দটি আবার অন্যান্য লকবের মতো একটি লকব হিসেবেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আর এটা লকব হয় ঐ ব্যক্তির, যিনি তাসহীহ-তায'ঈফ ও জরাহ-তা'দীলের ব্যাপারে হুজ্জত তথা প্রমাণস্বরূপ হন।

'শরহু নুখবাতিল ফিকার' সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা

বক্ষ্যমাণ পর্বে নুখবা এবং শরহে নুখবার রচনার প্রেক্ষাপট, শরহে নুখবার বৈশিষ্ট্য, নুখবাতুল ফিকার-এর অর্থ, শরহে নুখবা তথা নুযহাতুন নযর -এর অর্থ, উভয় কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং সর্বশেষে লেখকের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা হবে। নিম্নে এ বিষয়গুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র শিরোনামে পেশ করা হলো।

কুরআনের পর হাদীস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। কুরআন শরীফ নির্দেশনা ও জ্ঞানের এক সুবিশাল প্রদীপ। আর হাদীস তা থেকেই বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। হাদীস ছাড়া ইসলামী শরিয়তের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আর হাদীসের সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস গ্রহণ, বর্জন ও বর্ণনার ক্ষেত্রে যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তার পূর্ণ জ্ঞান অতি জরুরি। ইমামুল মুহাদ্দিসীন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) রচিত শরহু নুখবাতিল ফিকার এ বিষয়ের একটি অনন্য গ্রন্থ। কিতাবটি উসূলুল হাদীসের একটি বুনিয়াদি কিতাব। বিষয়বস্তুর সারবত্তা এবং লেখকের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। ইবনে হাজার (র.)-এর অনবদ্য রচনার মধ্যে শরহু নুখবাতিল ফিকার একটি। তিনি নিজেই এ কিতাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

'নুখবাতুল ফিকার' রচনার পটভূমি : উসূলুল হাদীসের উপর নুখবাতুল ফিকার সর্বপ্রথম কিতাব নয়। এর পূর্বে অনেকে এ শাস্ত্রের উপর কিতাব লেখেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত না হওয়ায় এক পর্যায়ে তিনি নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থ রচনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেপথ্য কারণ কি ছিল এবং কোন প্রেক্ষাপটে তিনি কিতাব রচনার সিদ্ধান্ত নেন, তা তিনি নিজেই গ্রন্থটির শুরুতে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন–

হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মনীষীদের প্রচুর রচনা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম দিকের অন্যতম লেখক কাজি আবূ মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (র.) اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তিনি তাতে এ সংক্রান্ত সকল বিষয় সন্নিবেশিত করেননি। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) ও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ যেমন পরিমার্জিত ছিল না, তেমনি ছিল অবিন্যস্ত। অতঃপর এলেন আবূ নুআইম ইস্পাহানী (র.)। হাকিম (র.) -এর গ্রন্থ থেকে যে বিষয়গুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল, তিনি সেগুলোর জন্য ভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেন। তথাপি আরো কিছু বিষয় থেকে যায় যা পরবর্তীকালের গ্রন্থকারগণ সংকলন করেন।

অতঃপর এলেন খতীব আবূ বকর বাগদাদী (র.)। তিনি হাদীস বর্ণনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম اَلْكِفَايَةُ। হাদীস বর্ণনাকারী ও তা শ্রবণকারী অর্থাৎ হাদীসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দেন اَلْجَامِعُ لِآدَابِ الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ। হাদীসতত্ত্বের বিষয়সমূহের মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি।

খতীবে বাগদাদীর পরে আরো কতিপয় মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে অনেকটাই আয়ত্ত করেছেন। অতঃপর কাজি ইয়ায (র.) একটি সংক্ষিপ্ত চমৎকার পুস্তক সংকলন করেন, তিনি যার নাম দিয়েছেন اَلْإِلْمَاعُ। আবূ হাফস মাইয়্যানিযীও একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এর নাম مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثَ جَهْلُهُ।

এ ধরনের আরো অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ আবার কোনোটি সংক্ষিপ্তাকারে সহজবোধ্য ভঙ্গিতে প্রণীত। এক্ষেত্রে সর্বশেষে আবির্ভূত হলেন হাফিজ ফকীহ তকীউদ্দীন আবূ আমর ইবনে সালাহ আব্দুর রহমান (র.)। তিনি যখন দামেশকের মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হলেন, তখন রচনা করলেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ مُقَدَّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ। তিনি এতে সমস্ত বিষয় খুব পরিমার্জনার সাথে সংকলন করেন। তবে গ্রন্থটি তিনি অল্প অল্প করে অনেকদিন ধরে রচনা করায় এর বিন্যাস যথোপযুক্ত আঙ্গিকে হয়নি। তিনি প্রধানত খতীবে বাগদাদীর বিভিন্ন রচনার উপর নির্ভর করেন। সেসব রচনার বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ তিনি একত্রিত করেন এবং তার সাথে সংযোজন করেন অন্যান্য গ্রন্থ থেকে বাছাইকৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে তার গ্রন্থখানা হয়ে ওঠে অনেকগুলো গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা বিষয়াবলির সমাহার। তাই মানুষ এর প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং তা আয়ত্ত ও সহজ করার প্রয়াস পেল।

আমার কতিপয় দীনি ভাই ও বন্ধু একবার আমাকে অনুরোধ করেন উসূলুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করার জন্য। তাদের অনুরোধে সাড়া দিতে আমি কয়েক পৃষ্ঠায় উসূলুল হাদীসের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করি এবং তার নাম দেই نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ اَهْلِ الْاَثَرِ।

'শরহু নুখবাতিল ফিকার' রচনার প্রেক্ষাপট : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নিজেই পরবর্তীতে নুখবাতুল ফিকার-এর শরাহ লেখেন। কতিপয় দীনি ভাইয়ের অনুরোধে লিখিত নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় তা যেমনি পুস্তিকারূপ পায় না, তেমনি তা হতে ফায়দা গ্রহণ পাঠকের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ উভয়বিধ বাস্তবতাকে সামনে রেখে তাঁকে আবার কলম ধরতে হয়। রচনা করতে হয় একটি শরাহ-গ্রন্থ। এ শরাহ-গ্রন্থ রচনার পটভূমি ইবনে হাজার (র.)-এর ভাষায় নিম্নরূপ–

অতঃপর বন্ধুরা পুনরায় আমার নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন এর এমন একটি শরাহ রচনা করে দেওয়ার জন্য, যাতে এর প্রতিটি ইঙ্গিতপূর্ণ তত্ত্ব উন্মোচিত হবে, তথ্যভাণ্ডার মুক্ত হবে এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর পক্ষে যা অস্পষ্ট থাকতে পারে তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে। আমি সে আহ্বানে সাড়া দিলাম লেখকদের কাতারে শামিল হওয়ার ইচ্ছায়। আমি এর শরাহ রচনায় খুব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি এবং এর কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা বিষয়সমূহ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছি। কেননা, ঘরের মালিকই এর অভ্যন্তরের বস্তুসমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত থাকেন। আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, এটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং সূত্রগুলোকে বিশ্লেষণের সাথে একীভূত করে দেওয়া অধিক সমীচীন। তাই আমি এক অভিনব পন্থায় শরাহ রচনায় মনোনিবেশ করি এবং তার নাম দেই نُزْهَةُ النَّظَرِ فِىْ تَوْضِيْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ।

'নুখবাতুল ফিকার' রচনার উদ্দেশ্য : যে কোনো গ্রন্থ রচনার পিছনে গ্রন্থকারের বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। 'নুখবাতুল ফিকার' গ্রন্থ রচনার পিছনেও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) -এর কতিপয় উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তা হলো–

১. উসূলুল হাদীস সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা, যাতে তারা হাদীসশাস্ত্রের ভুলত্রুটি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ করতে পারে।

২. আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, যাতে মানুষ সহজে সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে।

৩. পূর্ববর্তী আলিমগণ উসূলুল হাদীসের যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট নয়। তাই তিনি শাস্ত্রকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করতে সংক্ষেপে যাবতীয় বিধানাবলি সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করার মনস্থ করে নুখবাতুল ফিকার রচনা করেন।

'শরহু নুখবাতিল ফিকার'-এর বৈশিষ্ট্য : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) জীবনে অনেক কিতাব লেখেছেন। তবে যে ক'টি কিতাব লেখে তিনি গর্ববোধ করেছেন, তার মধ্যে শরহু নুখবাতিল ফিকার অন্যতম। এ কিতাবটি বিষয়ের মানদণ্ডে অত্যন্ত সুন্দর ও এর সুযোগ্য গ্রন্থকারের চিরন্তন সুখ্যাতির সমান্তরালে সমাদৃত। এ কিতাবের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. উসূলুল হাদীসের গ্রহণযোগ্য মতন সংশ্লিষ্ট।
২. কলেবর ছোট হলেও উপকারী বেশি।
৩. পৃষ্ঠায় কম হলেও বিষয়বস্তুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
৪. কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক ও বিস্তারিত তথ্য সংযোজিত।
৫. ভাষাও অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ।
৬. সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি ও নয়া আঙ্গিকে রচিত।
৭. উসূলুল হাদীসের এমন কোনো বিষয় ও দিক নেই, যা এ কিতাবে উল্লিখিত হয়নি।
৮. উসূলুল হাদীসের বাইরের কোনো বিষয় এতে নেই। এমনকি যাদের রচনায় বাইরের বিষয় এসে গেছে তা তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন।
৯. উসূলুল হাদীসের ৬৬ বা ১০০ -এরও বেশি বিষয় রয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ে যে কিতাবাদি রচিত হয়েছে, তার অধিকাংশের দিকে এ কিতাবে ইশারা করা হয়েছে।
১০. এ সকল কিতাবের মধ্যে কোনটি আগের, কোনটি পরের এবং কোন কিতাবের বিন্যাস ভালো, কোন কিতাবের বিন্যাস ভালো নয়, কোন কিতাবটি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে যথেষ্ট, কোনটি যথেষ্ট নয় ইত্যাদি বিষয় সম্মানিত লেখক এ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

نُخْبَةُ الْفِكَرِ -এর অর্থ : কিতাবটির নাম نُخْبَةُ الْفِكَرِ লোকমুখে প্রসিদ্ধ হলেও এটা তার পূর্ণ নাম নয়। পূর্ণ নাম হলো- نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ اَهْلِ الْاَثَرِ এ নামটিকেই সংক্ষেপে নুখবাতুল ফিকার বলা হয়।

نُخْبَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো نُخَبٌ। نُخْبَةٌ অর্থ مُنْتَخَبٌ তথা বাছাইকৃত, চয়নকৃত, নির্বাচিত ইত্যাদি। আর اَلْفِكَرُ (ফা-বর্ণে যের, কাফ-বর্ণে যবর) শব্দটি বহুবচন-এর; একবচন হলো فِكْرَةٌ, اَلْفِكَرُ অর্থ- চিন্তাসমূহ, ভাবনাসমূহ। সুতরাং একত্রে نُخْبَةُ الْفِكَرِ -এর অর্থ হলো- 'নির্বাচিত চিন্তামালা'। যেহেতু শব্দদ্বয় اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে অর্থাৎ মূলত ছিল اَلْفِكَرُ النُّخَبُ, তাই এ অনুবাদ করা হয়েছে।

مُصْطَلَحٌ শব্দটি اِصْطِلَاحٌ তথা পরিভাষার অর্থে এসেছে। اَثَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য حَدِيْثٌ ; অতএব, اَهْلُ الْاَثَرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَهْلُ الْحَدِيْثِ, আর اَهْلُ الْحَدِيْثِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাদ্দিসীনে কেরাম। সুতরাং مُصْطَلَحُ اَهْلِ الْاَثَرِ -এর অর্থ হলো- মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা। আর فِىْ অর্থ- মধ্যে, সংক্রান্ত। অতএব মোট মিলে نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ اَهْلِ الْاَثَرِ -এর সরল অর্থ হবে, 'মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা সংক্রান্ত নির্বাচিত চিন্তামালা'।

প্রকাশ থাকে যে, মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা– সেটাই হলো উসূলুল হাদীসশাস্ত্র। সুতরাং নামের অর্থ এভাবেও হতে পারে যে, 'উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের নির্বাচিত চিন্তামালা'।

নামকরণের কারণ : সম্মানিত লেখক উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত কিতাব রচনা করে তার নাম রেখেছেন নুখবাতুল ফিকার। এ নামকরণের কারণ হলো, যেহেতু লেখক এ কিতাবে উসূলুল হাদীসের চিন্তালব্ধ বিভিন্ন বিষয় বাছাই ও নির্বাচন করে করে জমা করেছেন এবং এ কারণে তাঁর কিতাবটি নির্বাচিত চিন্তামালার সমষ্টি হয়েছে, তাই তিনি তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন নুখবাতুল ফিকার।

নুখবাতুল ফিকার -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রচিত 'নুখবাতুল ফিকার' উসূলুল হাদীসশাস্ত্রে এক অতুলনীয় গ্রন্থ। কিতাবটি প্রণীত হতেই বিস্ময়করভাবে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দরসের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম এ কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। নুখবাতুল ফিকারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ অনেক। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো–

১. نُزْهَةُ النَّظَرِ فِىْ تَوْضِيْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এর রচয়িতা হলেন হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নিজে। যা তিনি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধক্রমে করেন।

২. نَتِيْجَةُ النَّظَرِ فِىْ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এর রচয়িতা হলেন হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর পুত্র কামালুদ্দীন (র.)।

৩. إِمْعَانُ النَّظَرِ فِىْ تَوْضِيْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এটি মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম ইবনে আব্দুর রহমান মাক্কী -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৪. حَاشِيَةُ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এর রচয়িতা হলেন শায়খ ইবরাহীম আল-লুক্কানী (র.)। তিনি ১০৪০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৫. تَعْلِيْقُ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এর রচয়িতা হলেন হানাফী মাযহাবের বড় আলিম আল্লামা যয়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কতলুবুগা (র.)। তিনি ৮৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৬. عِقْدُ الدُّرَرِ شَرْحُ نُخْبَةِ الْفِكَرِ -এর রচয়িতা হলেন দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম মুহাদ্দিস, আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরতুল আল্লাম মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.)।

নুখবাতুল ফিকার -এর ব্যাখা অনেকে কাব্যাকারেও করেছেন। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

نُزْهَةُ النَّظَرِ-এর অর্থ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নুখবাতুল ফিকার রচনার পর তা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বন্ধুদের পরামর্শে নিজেই তাঁর একটি ব্যাখ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম রাখেন نُزْهَةُ النَّظَرِ فِىْ تَوْضِيْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ যা সংক্ষেপে শরহু নুখবাতিল ফিকার নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

نُزْهَةٌ অর্থ– ঘুরাফিরা, ভ্রমণ ইত্যাদি। আর اَلنَّظَرُ অর্থ– দৃষ্টি। সুতরাং পুরো নামের অর্থ হলো– 'নুখবাতুল ফিকার-এর ব্যাখ্যায় দৃষ্টির পরিভ্রমণ'।

নামকরণের কারণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নুখবাতুল ফিকার-এর শরাহ লিখে তার নাম রাখেন نُزْهَةُ النَّظَرِ। এ নাম রাখার কারণ হলো, যেহেতু মতন তথা নুখবা এবং শরাহ তথা নুযহা– দুই কিতাব মিলে এক কিতাবে পরিণত হয়েছে এবং নুখবাতুল ফিকার -এর ব্যাখ্যা পড়তে نُزْهَةُ النَّظَرِ হয়

তথা দৃষ্টির দুবার পরিভ্রমণ হয় (একবার মতনের প্রতি আর আরেকবার শরাহ -এর প্রতি), তাই লেখক نُزْهَةُ النَّظَرِ করে শরাহ -এর নাম রেখেছেন।

نُزْهَةُ النَّظَرِ -এর ব্যাখাগ্রন্থ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রচিত শরাহ نُزْهَةُ النَّظَرِ নুখবাতুল ফিকার -এর গ্রহণযোগ্যতাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। শরাহটি সকল মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। উসূলুল হাদীসের ক্ষেত্রে মানুষ এ কিতাবের প্রতি অপরিসীম ঝুঁকে পড়ে। যার ফলে কিতাবটি আরো সহজবোধ্য ও হৃদয়ঙ্গম করতে যুগে-যুগে ওলামায়ে কেরাম এই শরাহ -এর শরাহ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। নিম্নে نُزْهَةُ النَّظَرِ -এর কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম তাদের লেখকসহ উল্লেখ করা হলো–

১. مُصْطَلَحَاتُ أَهْلِ الْأَثَرِ عَلَى شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এটি মোল্লা আলী কারী (র.) -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। গ্রন্থটি বড়ই চমৎকার।

২. عِقْدُ الدُّرَرِ فِي جِيْدِ نُزْهَةِ النَّظَرِ। এর রচয়িতা হলেন শামসুল ওলামা আব্দুল্লাহ টুংকী (র.)। এটিও একটি চমৎকার গ্রন্থ।

৩. شَرْحُ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ -এর রচয়িতা হলেন আল্লামা ওযীহুদ্দীন ইবনে নাসরুল্লাহ গুজরাটী (র.)। (মৃত্যু ৯৯৮ হিজরি)

৪. شَرْحُ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এর রচয়িতা হলেন আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে সাদিক ইবনে আব্দুল হাদী সিন্ধী হানাফী (র.)। (মৃত্যু ১১৩৮ হিজরি)

৫. اَلْيَوَاقِيْتُ وَالدُّرَرُ عَلَى شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এটি রচনা করেছেন শায়খ আব্দুর রউফ আল-মুনাদী আল-হাদ্দাদী (র.)। (মৃত্যু ১০৩১ হিজরি)

৬. بِلْغَةُ الْقُرْبَةِ فِيْ تَوْضِيْحِ شَرْحِ النُّخْبَةِ। এটি মৌলভী আব্দুল হাই (র.)-এর শরাহ।

৭. كَشْفُ الْغُمَّةِ عَلَى شَرْحِ النُّخْبَةِ। এটি হযরত মাওলানা মুজিবুর রহমান সাহেবের উর্দু শরাহ।

৮. رَوْضَةُ الْاَثَرِ فِيْ تَوْضِيْحِ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ। এটি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রিয়াযুদ্দীন সাহেবের উর্দু শরাহ। শরাহটি সুন্দর সাজানো-গোছানো।

৯. 'বাংলা শরহু নুখবাতিল ফিকার'। এটি মাওলানা আলমগীর হুসাইন বিরচিত একটি বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। বাংলা শরাহ হিসেবে এটিই সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ।

কিতাবের বর্তমান অবস্থা : নুখবা এবং নুযহা পৃথক পৃথকভাবে রচিত হলেও এখন শরহু নুখবাতিল ফিকার কিতাবটি দুটি কিতাবের সমষ্টি। অর্থাৎ শরহু নুখবাতিল ফিকার-এর মধ্যে দুটি কিতাব আছে। যথা– ১. নুখবাতুল ফিকার, ২. নুযহাতুন নযর। প্রথমটি মতন আর দ্বিতীয়টি শরাহ। কিন্তু কিতাবদ্বয় একটি অপরটির মধ্যে এমনভাবে একীভূত ও মিশে গেছে যে, দু কিতাব মিলে এক কিতাবে পরিণত হয়েছে। এখন একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করা রীতিমত অসম্ভব। এমনকি কোথাও কোথাও মতন ও শরাহ এমনভাবে মিলে গেছে যে, তাদেরকে পৃথক করা হলে অর্থ পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং তারকীবও অশুদ্ধ হবে।

নুখবা এবং শরহে নুখবা পৃথক দুটি নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন দুটি কিতাব হলেও এক নাম অপর নামের স্থলে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শরহে নুখবা দ্বারা যেমনিভাবে نُزْهَةُ النَّظَرِ উদ্দেশ্য তেমনিভাবে নুখবা বললেও তার দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয় نُزْهَةُ النَّظَرِ -ই।

'শরহু নুখবাতিল ফিকার'-এর গ্রন্থকার

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচনা : পৃথিবীতে যে সকল ওলামায়ে কেরাম হাদীস ও উসূলুল হাদীসের উল্লেখযোগ্য খেদমত করতঃ বিরল যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ইতিহাসের পাতায় বরেণ্য ও ইলমী জগতের উজ্জ্বল তারকা হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাজ্ঞ আলিমে দীন, ভুবনখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা, বিদগ্ধ গবেষক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) শীর্ষস্থানীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর দীপ্তিময় পদাচরণা। তিনি ব্যক্তিজীবনে অনন্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পেশ করা হলো।

১. **নাম ও পরিচয় :** নাম আহমদ। উপনাম আবুল ফযল। উপাধি শিহাবুদ্দীন, শিহাবুল মিল্লাত, কাযীউল কুযাত, খাতামু হুফ্ফাজিল হাদীস। পিতার নাম আলী। মাতার নাম তুজ্জার। তাঁর বংশের পঞ্চম পুরুষের নাম ছিল হাজার। এদিকে নিসবত করে তাঁকে 'ইবনে হাজার' বলা হয়। তিনি মিসরের আসকালান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে 'আসকালানী' বলা হয়। মিসর তাঁর জন্মস্থান, বসবাস স্থান এবং মৃত্যুবরণ স্থান হওয়ায় তাঁকে মিসরী ও বলা হয়।

২. **বংশ পরিচিতি :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর পুরো নাম ও বংশধারা হলো, কাযীউল কুযাত হাফিজুল হাদীস আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মাহমূদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজার কিনানী আসকালানী মিসরী শাফেয়ী (র.)।

৩. **পূর্বপুরুষ ও তাদের আদিবাস :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর দাদা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার একজন বস্ত্র উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী। পিতা ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ ও আইনজ্ঞ। তিনি কিছুকাল বিচার বিভাগে চাকরি করেন। তা ছাড়া তিনি একজন কবি ও সাহিত্যিকও ছিলেন।

ইবনে হাজারের পূর্বপুরুষগণ সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা 'আসকালান'-এ বসবাস করতেন। গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (র.)-এর হাতে উক্ত এলাকা পদানত হলে তাঁরা এ স্থান ছেড়ে প্রথমে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং পরে কায়রোয় এসে বসতি স্থাপন করেন।

৪. **জন্ম ও জন্মস্থান :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) ৭৭৩ হিজরির ২৩ শে শাবান মোতাবেক ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি মিসরের 'আতিকা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. **বাল্যকাল :** তাঁর বাল্যকাল এতিম অবস্থায় অতিবাহিত হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার বয়স চার বছর পূর্তি না হতেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। ৭৭৭ হিজরির ১৫ ই রজব মোতাবেক ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর তাঁর পিতা আলী ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাতা তুজ্জার আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন ধনাঢ্য মহিলা। ইন্তেকালের সময় তিনি অনেক সম্পদ রেখে যান। তাই তিনি এতিম হলেও দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে দূরে থাকেন।

৬. **যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক :** তাঁর পিতা ইন্তেকালের সময় শিশুপুত্রকে যকীউদ্দিন নামক এক মহৎপ্রাণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে যান। যকীউদ্দিন ছিলেন তাঁর যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক। তিনি ইবনে হাজারকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান এবং দীন-দুনিয়ার নানা বিষয় পূরণে পিতার ভূমিকা রাখেন।

৭. **শিক্ষার সূচনা :** মিসরেই তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়। মুখতাসারুত তিবরীয -এর ব্যাখ্যাকার শায়খ সদরুস সাফাতীর নিকট তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি হাফেজ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। কুরআন মাজীদ হিফজ করার সাথে সাথে তিনি اَلْمُخْتَصَرْ لِابْنِ حَاجِبْ ، اَلْحَاوِي الصَّغِيْر ، اَلْفِيَةُ الْحَدِيْث ، اَلْعُمْدَةُ প্রভৃতি গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন।

৮. **বিভিন্ন দেশে গমন :** প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে যখন তাঁর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয় বিশেষত ইলমে হাদীস তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, তখন তিনি জ্ঞান-পিপাসা

নিবারণ ও ইলমে হাদীস সম্পর্কে আরো অবগত হতে জ্ঞানার্জনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি ইরাক, সিরিয়া, মক্কা, মদীনা, হিজায, ইয়েমেন, নাবলুস, রামাল্লা, গাজা, সাইপ্রাস হালাব প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং এসব দেশের প্রখ্যাত আলিমদের থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন।

৯. **ওস্তাদগণ :** তাঁর অনেক সুযোগ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ–

১. হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী (র.)। তাঁর কাছে তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন।
২. আবুল ফযল আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান।
৩. শায়খ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আরসালান বালকিনী।
৪. হাফিজ ইবনে মালাকান।
৫. শায়খ বুরহানুদ্দীন আনবারী।
৬. হাফিজ আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবনে যাহীরাহ।
৭. শায়খ জামাল ইবনে যাহীরাহ।
৮. শায়খ নুরুদ্দীন হায়ছামী।
৯. হাফিজ বদরুদ্দীন আইনী।
১০. শায়খ আফীফুদ্দীন প্রমুখ।

১০. **পবিত্র হজ পালন :** তিনি ৭৮৪ হিজরিতে পিতার নিযুক্ত অভিভাবক যকীউদ্দিন-এর তত্ত্বাবধানে পবিত্র হজ পালন করেন। হজে আগত বিভিন্ন দেশের বড় বড় আলিম ও মুহাদ্দিসের দরসে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শায়খ আফীফুদ্দীন-এর নিকট তিনি বুখারী শরীফ পড়েন। তা ছাড়া হাফিজ আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইবনে যাহীরাহ ও শায়খ জামাল ইবনে যাহীরার দরসেও অংশগ্রহণ করেন।

১১. **যোগ্যতার স্বীকৃতি ও হাদীস পড়ানোর অনুমতি লাভ :** ৭৯৬ হিজরিতে তিনি কায়রোয় হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী (র.) -এর নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন। এ পর্যায়ে তিনি ইলমে হাদীসে গভীর ব্যুৎপত্তি ও এত যোগ্যতা অর্জন করেন যে, শায়খ তাকে হাদীস পড়ানোর অনুমতি প্রদান করেন। শায়খের ইন্তেকালের সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে যে, আপনার পরে আপনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কে হাদীসের দরস দান করবে ? জবাবে তিনি বলেন, ইবনে হাজার, এরপর জুর'আ, এরপর হায়ছামী।

১২. **শিক্ষাদান :** শিক্ষাজীবন শেষে তিনি দরস-তাদরীস শুরু করেন। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করে। বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। তাঁর পাঠদানের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে প্রত্যেক অঞ্চল ও দূর-দূরান্ত হতে ছাত্ররা তাঁর দরসে ভিড় জমায়। তিনি সবাইকে অকাতরে ইলমী সুধা পান করিয়ে ধন্য করেন।

১৩. **ছাত্রগণ :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর দরসে পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রের সংখ্যা অসংখ্য-অগণিত। তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের নাম নিম্নরূপ–

১. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আস্‌সাখাবী। (মৃত্যু ৯০২ হিজরি)
২. বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে ওমর বুকায়ী। (মৃত্যু ৮৮৫ হিজরি)
৩. হাফিজ ওমর ইবনে ফাহদ মাক্কী (র.)।
৪. কাজি যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনসারী। (মৃত্যু ৯২৬ হিজরি)

১৪. **বর্ণাঢ্য কর্মজীবন :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর কর্মজীবন ছিল বর্ণাঢ্য ও দীপ্তিময়। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন কেটেছে মূলত তিন কাজে। যথা– ১. গ্রন্থ অধ্যয়ন। ২. রচনা-সংকলন। ৩. ইবাদত-বন্দেগি। তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল হাদীসশাস্ত্রের অনুশীলন, হাদীসের পঠন-পাঠন, হাদীসগ্রন্থের সংকলন, প্রচার-প্রকাশ ও ফতোয়া প্রদান। তিনি শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন বিধায় তাঁর প্রদত্ত মাসআলা ও ফতোয়া হতো শাফেয়ী মাযহাবকে সামনে রেখে।

তিনি কর্মজীবনে বিভিন্ন মাদরাসায় হাদীসের দরস দিয়েছেন। এর মধ্যে হুসাইনিয়্যাহ, মানসূরিয়্যাহ, বাইবারসিয়্যাহ, জামালিয়্যাহ, সোনিয়্যাহ, যায়নাবিয়্যাহ, শাইখুনিয়্যাহ, জামে তুলুন ও কুব্বার মানসূরিয়্যাহ অন্যতম। তিনি খারুবিয়্যাহ, নাযেমিয়্যাহ, সালাহিয়্যাহ এবং

মুয়াইয়েদিয়্যাহ-তে ফিক্হ শিক্ষা দিতেন। তিনি বাইবারসিয়্যাহ -এর মুহতামিম এবং শায়খও ছিলেন। 'দারুল আদল' -এ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি জামে আযহার এবং পরে জামে আমর ইবনে আস (রা.) -এর খতীব ছিলেন। তা ছাড়া তিনি মাহমূদিয়্যাহ-তে কুতুবখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পালন করেন।

১৫. বিচারকের পদে আসীন : তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন প্রশাসন তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করতে বারবার অনুরোধ জানায়, কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে তাঁর বন্ধু প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন আল-বুলাকীনির অনুরোধে তাঁর সহকারী হতে সম্মত হন। ৮২৭ হিজরির মহররম মাসে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং প্রায় ২১ বছর এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বহাল থাকেন। যদিও এ দীর্ঘ সময়ে তিনি একাধিকবার পদচ্যুত ও পুনর্বহাল হন।

১৬. সমাজসেবা : তিনি ব্যক্তিগত জীবনে রচনা-সংকলনে লিপ্ত থাকলেও সময়ে সময়ে যথেষ্ট জনসেবা ও সমাজসেবা করেছেন। তিনি তাবলীগ তথা জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মাদরাসা, খানকা, এতিমখানা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭. আকৃতি ও গঠন : তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সুদর্শন। তিনি বেঁটে, সাদা দাড়িওয়ালা, হালকা-পাতলা গড়নের, বিশুদ্ধভাষী এবং মর্মস্পর্শী বক্তা ছিলেন।

১৮. স্বভাব-চরিত্র : তিনি অত্যধিক নামাজ ও রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বিনয়ী, ধীরস্থির এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদা হাস্য ও ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করতেন।

১৯. সুন্নত অনুসরণ : তিনি ছিলেন সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী। এ প্রসঙ্গে ইবনুল ইমাদ হাম্বলী (র.) বলেন, ইবনে হাজারের জীবনে সুন্নতের নিদর্শন এমনই ছিল যে, মানুষ তাঁর খাওয়া-পরা ও চলাফেরা দেখে সুন্নতী আমল শিখত। একদা তিনি অজ্ঞাতে সন্দেহযুক্ত খাবার খান। পরে এ বিষয়ে অবগত হলে তিনি একটি বড় থালা বা বাসন চান এবং বলেন, 'হযরত আবূ বকর (রা.) যা করেছিলেন আমিও তা-ই করবো।' এ কথা বলে পেটস্থ সমস্ত খাদ্য বমি করে বের করে দেন।

২০. অনন্য স্মৃতিশক্তি : তাঁর অনন্য স্মৃতিশক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কাছের-দূরের, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রখর ধীশক্তির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের অভিমত, মেধা ও স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে তিনি আল্লামা যাহাবীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।*

২১. বিরল প্রতিভার অধিকারী : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বহুমুখী বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। হাদীস, তাফসীর, ফিক্হসহ আরো অনেক শাস্ত্রের তিনি সুযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। কাব্য রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতা ছিল। মিসরের বড় বড় সাত কবি যাদেরকে **'শিহাব'** উপাধিতে ভূষিত করা হতো– তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

২২. ওলীর দোয়ার ফসল : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) ছিলেন আল্লাহর এক ওলীর দোয়ার ফসল। তাঁর জীবনীতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে হাজার (র.) -এর পিতার কোনো সন্তান হয়ে জীবিত থাকত না। এতে তাঁর পিতা ভীষণ চিন্তিত হন। একদিন তিনি তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ শায়খ ছনাকবরী (র.) -এর খেদমতে গিয়ে হাজির হন এবং নিজের দুঃখের কথা খুলে বলেন। শায়খ তার বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে দোয়া করেন এবং তাঁর পিতাকে বলেন, 'তোমার ঔরস হতে এমন এক পুত্র জন্ম নেবে, যে সারা দুনিয়াকে ইলম-এর দৌলত দ্বারা ভরপুর করে দেবে'। উক্ত বুজর্গের এ দোয়ার পরে ইবনে হাজারের জন্ম হয় এবং তিনি জীবিত থাকেন। তাঁর জীবিত থাকা এবং তাঁর রচনাবলি ব্যাপকভাবে কবুল ও প্রসিদ্ধ হওয়া মূলত উক্ত বুজুর্গের দোয়ার বরকতের ফল।

---

* কথিত আছে, একবার তিনি জমজমের পানি এ উদ্দেশ্যে পান করেন যেন তাঁর মেধা হাফিজ যাহাবীর মতো প্রখর হয়। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। যার ফলে তিনি হাফিজ যাহাবীর চেয়েও প্রখর মেধার অধিকারী হয়েছিলেন।

২৩. **রচনাবলি :** শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, হাফিজ ইবনে হাজারের রচনাবলি দেড় শতাধিক। হাফিজ সাখাবীও অনুরূপ বলেছেন।

হাফিজ সুয়ূতির মতে ১৮৩। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী তাঁর ৭২টি কিতাবের নাম লেখেছেন। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো−

১. تَغْلِيْقُ التَّعْلِيْقِ। এটিই তাঁর প্রথম রচিত কিতাব। এটি একটি চমৎকার কিতাব।

২. فَتْحُ الْبَارِىْ فِىْ شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِىْ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাঙ্গুহী (র.) বলেন, 'এ অতুলনীয় কিতাবই হাফিজ ইবনে হাজারকে হাদীসশাস্ত্রে জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে'। মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফাতহুল বারী তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব'।

হাফিজ ইবনে হাজার নিজেও ফাতহুল বারী, তা'লীকুত তা'লীক ও নুখবাতুল ফিকার -এর প্রশংসা করেছেন।

৩. تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْبِ। (রাবীদের জীবনীকোষ।)

৪. لِسَانُ الْمِيْزَانِ। (দুর্বল রাবীদের জীবনীকোষ।)

৫. اَلْاِصَابَةُ فِىْ تَمْيِيْزِ الصَّحَابَةِ। (সাহাবীদের জীবনচরিত।)

৬. اَلدُّرَرُ الْكَامِنَةُ فِىْ اَعْيَانِ الْمِائَةِ الثَّامِنَةِ

৭. اِنْبَاءُ الْغُمْرِ بِاَبْنَاءِ الْاُمُوْرِ

৮. اَللُّبَابُ فِىْ شَرْحِ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ فِى الْبَابِ

৯. اَلدِّرَايَةُ فِىْ مُنْتَخَبِ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ

১০. بُلُوْغُ الْمَرَامِ مِنْ اَدِلَّةِ الْاَحْكَامِ

১১. هِدَايَةُ الرُّوَاةِ فِىْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ الْمَصَابِيْحِ وَالْمِشْكَاةِ

১২. تَشْهِيْدُ الْقَوْسِ فِىْ اَطْرَافِ مُسْنَادِ الْفِرْدَوْسِ

১৩. اَلشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فِىْ تَعْرِيْفِ الْكَبِيْرَةِ

১৪. نُزْهَةُ الْاَلْبَابِ فِى الْاَلْقَابِ

১৫. تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ

১৬. نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ اَهْلِ الْاَثَرِ

১৭. نُزْهَةُ النَّظَرِ فِىْ تَوْضِيْحِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ প্রভৃতি।

২৪. **ইন্তেকাল :** ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে হাফিজ ইবনে হাজারের কর্মমুখর জীবনের চির অবসান হয়। সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবন শেষে ২৮ শে জিলহজ ৮৫২ হিজরি মোতাবেক ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দ শনিবার মাগরিবের পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৫. **জানাজা ও দাফন :** তাঁর জানাজায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। স্বয়ং বাদশাহ প্রথমে তাঁর জানাজা কাঁধে বহন করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা একের পর এক বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যান। মিসরের "قَرَافَةُ الصُّغْرٰى" নামক প্রসিদ্ধ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْحَافِظُ وَحِيْدُ دَهْرِهٖ وَاَوَانِهٖ وَفَرِيْدُ عَصْرِهٖ وَ زَمَانِهٖ شِهَابُ الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ اَبُو الْفَضْلِ اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ الشَّهِيْرُ بِابْنِ حَجَرٍ اَثَابَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهٖ وَكَرَمِهٖ ـ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

অনুবাদ : শায়খুল ইসলাম, মহান নেতা, আলিমে দীন, আমিলে শরিয়ত, হাফিজে কুরআন এবং (হাদীস, জ্ঞান ও বিচক্ষণতায়) তৎকালীন যুগের অদ্বিতীয় অনন্য ব্যক্তিত্ব, মুসলিম উম্মাহ ও দীন ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী আল-আসকালানী, যিনি ইবনে হাজার আসকালানী নামে অধিক পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় প্রতিদান হিসেবে তাঁকে জান্নাত দান করুন। তিনি বলেন–

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشَّيْخُ الْإِمَامُ থেকে شِهَابُ الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ পর্যন্ত প্রশংসাসূচক বাক্যগুলো লেখক ইবনে হাজার (র.) -এর লিখিত নয়। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর কোনো ছাত্র হয়তো বা এ অংশটুকু সম্মানিত লেখকের অনুপম ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করতে সংযোজন করে দিয়েছেন।

اَلشَّيْخُ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : شَيْخٌ অর্থ– প্রবীণ, বৃদ্ধ। শাস্ত্রবিদকেও শায়খ বলা হয়, যদিও তিনি বয়সে যুবক হন। আলোচ্য স্থলে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। ওস্তাদ, পীর-মুর্শিদকেও শায়খ বলা হয়। হাদীস ও উসূলুল হাদীসের কিতাবাদিতে শায়খ শব্দটি সাধারণত ওস্তাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

اَلْحَافِظُ -এর অর্থ : এ শব্দটি একটি বহুমাত্রিক পারিভাষিক শব্দ। স্থানভেদে এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন হয়। হাদীসের জগতে মূলত এ শব্দটি লকববিশেষ। যিনি হাদীস চর্চায় বিশেষভাবে নিবেদিত থাকেন, তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। اَلْحُجَّةُ এবং اَلْحَاكِمُ শব্দ দুটিও এমনি সম্মানবাচক উপাধি। এ শব্দগুলোর সম্পর্ক হাদীস চর্চার সাথে; হাদীস মুখস্থের সাথে নয়। অতএব, বিভিন্ন গ্রন্থে হাফিজ, হুজ্জত ও হাকিম -এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে–

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনসহ কমপক্ষে এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেন। **হুজ্জত :** যিনি সনদ ও মতনসহ কমপক্ষে তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেন। **হাকিম :** যিনি সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেন।

–মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম একে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য মুকাদ্দিমা অংশ দ্রষ্টব্য।

وَحِيْدٌ .... فَرِيْدٌ : وَحِيْدٌ অর্থ অদ্বিতীয় আর فَرِيْدٌ অর্থ অনন্য।

اَبُو الْفَضْلِ -এর ব্যাখ্যা : এটি সম্মানিত লেখকের কুনিয়াত বা উপনাম তাঁর এ উপনামের সম্ভাব্য কারণ দুটি। যথা–

১. হয়তো তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল ফযল, তাই তার উপনাম হয়ে যায় আবুল ফযল অর্থাৎ ফযলের পিতা।

২. অথবা, এখানে اَبُو শব্দটি صَاحِبٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ اَبُو الْفَضْلِ মানে صَاحِبُ الْفَضْلِ - اَبٌ শব্দটি صَاحِبٌ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। যেমন বলা হয়– আবূ যর, আবূ তুরাব ইত্যাদি। এ অর্থে লেখকের এ উপনামের কারণ হলো, তিনি যেমনি প্রচুর ইলমের অধিকারী ছিলেন তেমনি ধন-দৌলতও তাঁর অনেক ছিল।

اِبْنُ حَجَرٍ বলার কারণ : লেখকের লকব বা উপাধি হচ্ছে اِبْنُ حَجَرٍ। তাঁর এ লকবের কারণ কয়েকটি হতে পারে। যথা– ১. হয়তো তিনি প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক ছিলেন। ২. তাঁর কাছে মণি-মুক্তা, জওহার অনেক ছিল। ৩. তাঁর রায় বা সিদ্ধান্ত হতো পাথরের মতো মজবুত। ৪. তাঁর বংশের পঞ্চম পুরুষের নাম ছিল হাজার, তাই তাঁকে তার দিকে নিসবত দিয়ে اِبْنُ حَجَرٍ বলা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَزَلْ عَالِمًا قَدِيْرًا حَيًّا قَيُّوْمًا سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاُكَبِّرُهٗ تَكْبِيْرًا وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اَرْسَلَهٗ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا .

অনুবাদ : পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সর্বদা মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী মহাশ্রোতা মহদ্রষ্টা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমি তাঁর পূর্ণ মহানত্ব ঘোষণা করছি। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি, যাকে তিনি গোটা মানব জাতির নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপরও রহমত বর্ষণ করুন আর তিনি মুহুর্মুহু ব্যাপক শান্তিও বর্ষণ করুন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা কিতাব শুরু করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে জানা যায় যে, তিনি নিজ জীবদ্দশায় দূরে-নিকটে, দেশে-বিদেশে দাওয়াত-তা'লীম ও রাষ্ট্রীয় ফরমান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যত পত্র লেখেছেন এবং প্রেরণ করেছেন প্রত্যেকটা তিনি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করেছেন। কয়েকটি পত্রে বিসমিল্লাহ-এর পরে হামদ এবং একটি কি দুটি পত্রে শাহাদতেরও উল্লেখ রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী মনীষীদের সকলের নিয়ম ছিল, তারা গ্রন্থ রচনাকালে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতেন। অনুরূপ বিসমিল্লাহ-এর পরে হামদ, শাহাদাত, সালাত ও সালাম উল্লেখ করাও তাঁদের নিয়ম ছিল। তাই শরহু নুখবাতিল ফিকার গ্রন্থকার হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত অনুসরণ এবং ওলামায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তাঁর এই কিতাবও প্রথমে বিসমিল্লাহ পরে হামদ, শাহাদাত, নবীজির প্রতি সালাত, সালাম দ্বারা শুরু করেছেন।

বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার দলিল হিসেবে كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ হাদীসটি পেশ করা ঠিক নয়। কারণ, এ হাদীসটি বর্ণিত শব্দে সহীহ নয়। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সহ অনেকে এ হাদীসের সনদকে মা'লূল ও ওয়াহী তথা অনির্ভরযোগ্য বলেছেন, যা হুকুমের দিক থেকে মাওযূ' ও জাল হাদীসের মতো। ইবনে হাজার (র.)-এর ভাষ্য নিম্নরূপ–

اَلرِّوَايَةُ الْمَشْهُوْرَةُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ : حَمِدَ اللّٰهُ ، وَمَاعَدَا ذٰلِكَ مِنَ الْاَلْفَاظِ وَرَدَتْ فِىْ بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيْثِ بِاَسَانِيْدَ وَاهِيَةٍ .

সূচনা সংক্রান্ত সহীহ ও মশহূর হাদীস হলো– হামদাল্লাহ শব্দের হাদীসটি। এ ছাড়া অন্যান্য শব্দের বর্ণনাগুলো 'ওয়াহী' সনদে বর্ণিত। –[ফাতহুল বারী ৮ : ২২০]

আর যে হাদীস মা'লূল বা ওয়াহী সনদে বর্ণিত হয় তা যে হুকুমের দিক থেকে মাওযূ' বা জাল হাদীসের মতো তা মুহাদ্দিস আহমদ গুমারী সাহেব اَلْاِسْتِعَاذَةُ وَالْحَسْبَلَةُ مِمَّنْ صَحَّحَ حَدِيْثَ الْبَسْمَلَةِ গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ الْمَوْضُوْعَ وَالْوَاهِىَ فِىْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْاِحْتِجَاجِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا حَتّٰى فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ . كَمَا قَرَّرَهٗ .

দলিলের যোগ্য না হওয়ার দিক থেকে মাওযূ' ও ওয়াহী হাদীস এক বরাবর। এমনকি ফাযায়েলে আমলের ব্যাপারেও এমন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

হামদ -এর দ্বারা সূচনা-সংক্রান্ত সবচেয়ে সহীহ ও আসল হাদীস হলো–

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ .

আল্লাহর প্রশংসা না করে কোনো কাজ করলে তা বরকতশূন্য হবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান ১ : ১৭৩)

এ হাদীসটিই আবূ দাউদ শরীফে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে– كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ

সূচনার ব্যাপারে কোনো হাদীসে 'বিসমিল্লাহ', আর কোনো হাদীসে 'হামদাল্লাহ', কোনো হাদীসে 'যিকরুল্লাহ' -এর উল্লেখ থাকলেও হাদীস মূলত একটিই। শব্দ বিভিন্ন মাত্র। শব্দের বিভিন্নতা দেখে তিনটি স্বতন্ত্র ও পৃথক হুকুম নির্দেশক হাদীস মনে করে তার উপর আমল করতে গিয়ে 'সূচনা তিন প্রকার, উদ্ভাবন করাটা উদ্ভট ও হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এক হাদীসকে তিন হাদীস মনে করা থেকেই এ ভুলের উৎপত্তি। হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী (র.) এ প্রসঙ্গে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) -এর সূত্রে বলেন–

حَدِيْثُ كُلِّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ ... اِضْطَرَبَ لَفْظُهُ ، فَفِيْ لَفْظٍ بِحَمْدِ اللّٰهِ ، وَفِيْ لَفْظٍ بِبِسْمِ اللّٰهِ ، وَفِيْ لَفْظٍ بِذِكْرِ اللّٰهِ...

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيْثُ وَاحِدٌ، وَلَفْظُهُ مُتَعَدِّدٌ، وَتَوَهَّمَ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِيْنَ تَعَدُّدَ الْحَدِيْثِ لِاخْتِلَافِ لَفْظِهِ ، فَاضْطَرَبُوْا فِيْ جَمِيْعِ الْعَمَلِ بِهِمَا ، فَاخْتَرَعُوْا لِلْاِبْتِدَاءِ أَقْسَامًا مِنَ الْحَقِيْقِيِّ وَالْعُرْفِيِّ وَالْاِضَافِيِّ ، فَحَمَلُوْا بَعْضَ الْاَلْفَاظِ عَلَى الْحَقِيْقِيِّ ، وَالْبَعْضَ عَلَى الْاِضَافِيِّ ، كَمَا هُوَ مَعْرُوْفٌ وَكُلُّ ذٰلِكَ تَكَلُّفٌ وَتَنَطُّعٌ وَغَفْلَةٌ عَنِ الْفَنِّ وَقَوَاعِدِهِ ، وَمَدَارُ تَحْقِيْقِهِمْ وَعَنَائِهِمْ عَلٰى ظَنِّهِمْ تَعَدُّدَ الْأَحَادِيْثِ ، وَلَمْ يَدْرُوْا أَنَّ الْحَدِيْثَ وَاحِدٌ ، وَاِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ فِي اللَّفْظِ، أَفَادَهُ شَيْخُنَا إِمَامُ الْعَصْرِ أَنْوَرُ شَاهُ الْكَشْمِيْرِيُّ .

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ ... হাদীসের শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন– হামদুল্লাহ, বিসমিল্লাহ, যিকরুল্লাহ। তবে সারকথা হলো, হাদীস একটিই– শব্দ বিভিন্ন। অনেক লেখক শব্দের বিভিন্নতা দেখে একাধিক হাদীস বলে মনে করেছেন। যার ফলে তারা আমলী ক্ষেত্রে এসে চরম বিপাকে পড়েছেন। এ বিপাক থেকে উদ্ধার পেতে 'তিন প্রকার শুরু' উদ্ভাবন করেছেন। হাকীকী, উরফী ও ইযাফী। অতঃপর কোনো শব্দকে প্রয়োগ করেছেন হাকীকী হিসেবে, কোনোটি ইযাফী হিসেবে।

এসব কিছুই বানোয়াট, কৃত্রিমতা এবং উসূলুল হাদীস সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচায়ক ও ফল। একাধিক হাদীস মনে করার কারণেই তাদের এ অবস্থা হয়েছে। তারা জানে না যে, হাদীস মূলত একটিই– শব্দের বিভিন্নতা মাত্র। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) এমনই বলেছেন। –[মা'আরিফুস সুনান ১ : ২-৩]

কিতাবের শুরুতে শাহাদাত উল্লেখ করে তাকে كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ হাদীসের উপর আমল বলাটা ভুল। কেননা, এখানে খুতবা দ্বারা উদ্দেশ্য মৌখিক খুতবা, যা খতীব সাহেব জুমা, ঈদ প্রভৃতি দিনে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে দান করেন। এ খুতবার দ্বারা কিতাবের খুতবা উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (র.) লিখিত خُطْبَةُ الْحَاجَةِ لَيْسَتْ سُنَّةً فِيْ مُسْتَهَلِّ الْكُتُبِ وَالْمُؤَلَّفَاتِ গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

بِسْمِ اللّٰهِ পুনর্বার উল্লেখ প্রসঙ্গ : এ কিতাবের কয়েকটি প্রতিলিপি (নোসখা) আছে। কিছু প্রতিলিপিতে بِسْمِ اللّٰهِ দুবার লিখিত আছে আর কিছু প্রতিলিপিতে একবার আছে। যেসব প্রতিলিপিতে بِسْمِ اللّٰهِ দুবার আছে তার প্রথমটি হলো شَرْحُ نُخْبَةِ الْفِكَرِ -এর বিসমিল্লাহ আর দ্বিতীয়টি مَتْنُ نُخْبَةِ তথা الْفِكَرِ -এর বিসমিল্লাহ। এর বিপরীত যেসব প্রতিলিপিতে মাত্র একবার বিসমিল্লাহ আছে তা কেবল مَتْن -এর বিসমিল্লাহ। তবে এ মতনের বিসমিল্লাহটি কোনো কোনো প্রতিলিপিতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর

পূর্বে আছে আর কোনো কোনো প্রতিলিপিতে ... قَالَ اَبُو الْفَضْلِ -এর পূর্বে আছে। যেহেতু مَتَنْ ও شَرْح মিলে দু গ্রন্থ এক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে, তাই দ্বিতীয়বার بِسْمِ اللّٰهِ উল্লেখ করা হয়নি। ঠিক এই একই কারণে কেবলমাত্র مَتَنْ -এর শুরুতে হামদ, শাহাদাত, সালাত, সালাম উল্লিখিত হয়েছে; شَرْح -এর শুরুতে এসব উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, شَرْح ও مَتَنْ -এর লেখক একজনই। তাই লেখক দু কিতাবকে এক কিতাব মনে করে شَرْح লেখার সময় পুনর্বার হামদ, শাহাদাত ইত্যাদি উল্লেখ না করে কেবল বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শরাহ লেখা শুরু করেছেন।

আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া : আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া ৭ টি। মুসান্নিফ (র.) এখানে আল্লাহর প্রশংসায় ৫ টি সিফাত উল্লেখ করেছেন। اَلْمُرِيْد এবং اَلْمُتَكَلِّمْ উল্লেখ করেননি। কেননা, আল্লাহর সিফাত তাওকীফী হয় অর্থাৎ কেবল নসের মাধ্যমে তা জানা যায়। যেহেতু اَلْمُتَكَلِّمْ ও اَلْمُرِيْدُ সিফাত দুটি আল্লাহর সিফাতে কামালিয়া হওয়ার উপর নস মিলে না, তাই লেখক এ দুটি উল্লেখ করেননি। সিফাতে কামালিয়াগুলো হলো– ১. عَلِيْم ২. قَدِيْر ৩. حَيّ ৪. سَمِيْع ৫. بَصِيْر ৬. مُرِيْد ও ৭. مُتَكَلِّمْ।

كَافَّةً -এর উদ্দেশ্য ও তারকীব : كَافَّةً শব্দটির তারকীব তিন ধরনের হতে পারে। যথা–

১. اَلنَّاسُ শব্দের হাল। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ্ যাকে গোটা মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন।

২. اَرْسَلَهٗ -এর ضَمِيْر مَفْعُوْل তথা ہ যমীর থেকে হাল। তখন অর্থ হবে– اَرْسَلَهٗ جَامِعًا لَهُمْ فِى الْاِبْلَاغِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মানব জাতির প্রতি সর্বোচ্চ প্রচারক-প্রসারক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অবশ্য এ সময় كَافَّةً -এর ة বর্ণটি مُبَالَغَة-এর জন্য হবে।

৩. كَافَّةً শব্দটি উহ্য مَفْعُوْل مُطْلَقْ -এর সিফাত হবে। তখন মূল ইবারত হবে এমন اَرْسَلَهٗ اِلَى النَّاسِ اِرْسَالًا كَافَّةً اَىْ عَامَّةً لَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মানব জাতির প্রতি ব্যাপকভাবে প্রেরণ করেছেন। এ স্থলে كَافَّةً শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং প্রকাশ্য।

اٰلْ দ্বারা উদ্দেশ্য : اٰلْ অর্থ পরিবার-পরিজন। তবে এখানে اٰلْ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে ৫ টি মাযহাব রয়েছে। যথা–

১. اٰلْ দ্বারা শুধু বনূ হাশেম উদ্দেশ্য। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

২. اٰلْ দ্বারা বনূ হাশেম এবং বনূ মুত্তালিব উদ্দেশ্য। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত।

৩. اٰلْ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল অনুসারী উদ্দেশ্য। যেমন, এক হাদীসে এসেছে– اٰلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ "প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তিই মুহাম্মদের পরিজনভুক্ত"।

৪. اٰلْ -এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্তান, স্ত্রী এবং জামাতা উদ্দেশ্য। তবে কেউ কেউ তাঁর খাদেমদেরও এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।

৫. اٰلْ দ্বারা اَهْلُ بَيْت তথা হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.) উদ্দেশ্য।

سَلَّمَ -এর অর্থ : سَلَّمَ শব্দটি যদি سَلَّمَهٗ مِنَ الْاٰفَةِ থেকে উৎসারিত হয়, যার অর্থ হলো, বিপদ থেকে মুক্ত থাকা, তখন ভাষ্যটির অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাবতীয় অকল্যাণ ও বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। আর যদি শব্দটি سَلَّمَ بِالْاَمْرِ থেকে উৎসারিত হয়, যার শাব্দিক অর্থ– সন্তুষ্ট হওয়া, তখন ভাষ্যের অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ও রাজি হন।

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّصَانِيْفَ فِيْ اِصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ قَدْ كَثُرَتْ لِلْأَئِمَّةِ فِي الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيْثِ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِيْ ذٰلِكَ الْقَاضِيْ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ كِتَابَهُ الْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ لٰكِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ وَالْحَاكِمُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ لٰكِنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْ وَلَمْ يُرَتِّبْ وَتَلَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ فَعَمِلَ عَلٰى كِتَابِهِ مُسْتَخْرَجًا وَأَبْقٰى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ ـ

অনুবাদ : হামদ ও সালাতের পর– হাদীসশাস্ত্রবিদদের পরিভাষা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসীনে কেরামের প্রচুর রচনা রয়েছে। এ বিষয়ে (হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষা সম্পর্কে) সর্বপ্রথম রচনাকারীদের একজন কাজি আবূ মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (র.)। 'আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল' নামে তিনি তার কিতাবটি রচনা করেছেন, তবে কিতাবটি (এ শাস্ত্রের সকল বিষয়) শামিল করেনি। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.)-ও (এ বিষয়ে) গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থটি পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত করেননি। এরপর আবূ নুআইম ইস্পাহানী (র.) (এ শাস্ত্র রচনায়) হাকিমের অনুসরণ করেছেন। তিনি হাকিমের কিতাবের উপর (শেষে) (হাকিমের ছুটে যাওয়া বিষয় নিয়ে) একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। তারপরেও তিনি পরবর্তীদের (লেখার) জন্য কিছু আলোচনা ও বিষয় রেখে গেছেন। (অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্র পূর্ণরূপে লেখে যেতে পারেননি।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِصْطِلَاحُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ : আহলে হাদীস দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট ফিক্হী মাসলাক ও আকিদার অনুসারীগণ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাদ্দিসীনে কেরাম, যারা হাদীস চর্চা, মুখস্থ, সংরক্ষণ, সংকলন-রচনা, রাবীদের অবস্থা যাচাই ইত্যাদি হাদীস-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিপ্ত ও নিয়োজিত থাকেন। আর তাঁদের পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিভাষা। অতএব, أَهْل حَدِيْث -এর পরিভাষা মানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষা। আর বলা বাহুল্য যে, সেটাই হলো উসূলুল হাদীস। অতএব, فَإِنَّ التَّصَانِيْفَ فِيْ اِصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ -এর অর্থ করা যায়– উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত রচনাবলি।

فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِيْ ذٰلِكَ : প্রথম দিকের রচয়িতা বলতে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কাজি আবূ মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (র.) উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সর্বপ্রথম জন্মদাতা; বরং আসল কথা হলো, উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের জন্ম বহু আগেই হয়েছিল এবং বিক্ষিপ্তভাবে হাদীসগ্রন্থের শুরু বা শেষে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর আইম্মায়ে কেরাম তার আলোচনাও করে গেছেন। যেমন– ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযী (র.) প্রমুখ। তবে এটা ঠিক যে, স্বতন্ত্র শাস্ত্র এবং এ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে আবূ মুহাম্মদ রামাহুরমুযী (রহ.) -এর কিতাব অবশ্যই প্রথম দিকের কিতাব।

اَلْقَاضِيْ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ : ইনি উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর মতে তিনি সর্বপ্রথম এ শাস্ত্র রচয়িতাদের একজন। শ্রদ্ধেয় এ মুহাদ্দিস সাহেবের পূর্ণ নাম– হাসান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে খাল্লাদ (র.)। তাঁর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। রামাহুরমুযী তাঁর স্থানবাচক নাম। ইরানের খুযিস্তান প্রদেশবর্তী একটি শহরের নাম রামাহুরমুয। তিনি ২৬৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৩৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

كِتَابَهُ الْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ : كِتَابَهُ শব্দটি صَنَّفَ উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হওয়ায় মানসূব বা যবরযুক্ত। এ বাক্যটি মূলত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো, কাজি সাহেব কোন কিতাব রচনা করেছেন? তার জবাবস্বরূপ মুসান্নিফ (র.) বলেছেন– صَنَّفَ كِتَابَهُ الْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ؛ "اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ" এটা কাজি সাহেবের লিখিত কিতাবের নাম। তবে এ নামটি পূর্ণ নয়। পূর্ণ নাম হলো– اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْوَاعِيْ

لٰكِنَّهٗ لَمْ يَسْتَوْعِبْ : এটি কাজি সাহেবের কিতাব সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ও মতামত। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, যদিও কাজি সাহেবের গ্রন্থটি প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, কিন্তু তারপরেও গ্রন্থটি অপূর্ণাঙ্গ; এতে উসূলুল হাদীসের সমস্ত দিক ও বিষয় আলোচিত হয়নি।

اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ : তিনি হাফিজে হাদীস এবং তৎকালীন যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি ৩২১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪০৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মুস্তাদরাকে হাকিম' হাদীসগ্রন্থটি। তিনি উসূলুল হাদীসের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে এখানে বলা হয়েছে তার নাম হলো مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ। এ কিতাবে তিনি উসূলুল হাদীসের ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

اَلنَّيْسَابُوْرِيُّ : শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আন-নায়সাবূরী। এটি একটি স্থানের নাম, যা বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত। এটি হাকিম সাহেবের স্থানবাচক নাম। বাংলায় এ স্থানটি 'নিশাপুর' নামে পরিচিত।

لَمْ يُهَذِّبْ وَلَمْ يُرَتِّبْ : এটি হাকিম সাহেবের রচিত কিতাব সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর মন্তব্য ও মূল্যায়ন। তিনি এখানে বলেছেন, হাকিমের কিতাবটি অবিন্যস্ত, যথাযথভাবে সাজানো নয়।

وَتَلَاهُ : এখানে ، যমীরটি ضَمِيْر مَنْصُوْب -এর مَرْجِعْ হলো হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ (র.)।

تَلَا শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف - تَلَا يَتْلُوْ تَلْوًا -এর অর্থ হলো تَبِعَ বা অনুসরণ-অনুগমন করা।

اَبُوْ نُعَيْمِ الْاَصْفَهَانِيُّ : তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ। কুনিয়াত আবূ নুআইম। তিনি ৩৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। অনেক কিতাব তিনি রচনা করেছেন। উসূলুল হাদীস সম্পর্কে লিখিত তাঁর কিতাবটির নাম اَلْمُسْتَخْرَجُ عَلٰى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ।

"اَلْاَصْفَهَانِيْ" শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আল-আসফাহানী। এটি ইরানের একটি প্রসিদ্ধ ও বড় শহর। বাংলায় শব্দটি 'ইস্পাহানী' পড়া হয়।

فَعَمِلَ عَلٰى كِتَابِهٖ مُسْتَخْرَجًا : এখানে فَاءْ টি تَفْصِيْلِيَّةْ। লেখক এখান থেকে تَلَاهُ -এর বিবরণ দিচ্ছেন। এটা উহ্য প্রশ্নের উত্তরও হতে পারে। প্রশ্ন হলো, আবূ নুআইম কিভাবে হাকিম সাহেবের অনুসরণ করলেন? লেখক فَعَمِلَ বলে তার জবাব দিচ্ছেন যে, আবূ নুআইম হাকিম সাহেবের কিতাবের উপরে রচনা করেছেন একটি পরিশিষ্ট।

"عَمِلَ" শব্দটি এখানে صَنَّفَ -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ– রচনা করা।

"مُسْتَخْرَجًا" শব্দটি اِسْمُ مَفْعُوْل -এর সীগাহ হতে পারে আবার اِسْمُ فَاعِلْ -এর সীগাহও হতে পারে। اِسْمُ مَفْعُوْل হলে তখন ইবারত হবে এমন– صَنَّفَ مُسْتَخْرَجًا عَلٰى كِتَابِهٖ اَىْ مُسْتَدْرَكًا অর্থাৎ আবূ নুআইম তাঁর কিতাবের উপর (শেষে) একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। আর اِسْمُ فَاعِلْ হলে তখন ইবারত হবে– صَنَّفَ كِتَابًا زَائِدًا عَلٰى كِتَابِ الْحَاكِمِ مَا فَاتَهٗ তিনি হাকিমের কিতাবের উপর তাঁর ছুটে যাওয়া বিষয়কে নিয়ে একটি অতিরিক্ত গ্রন্থ রচনা (সংযোজন) করেছেন।

শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالْ থেকে ব্যবহৃত। اِسْتِخْرَاجٌ عَلَى الْكِتَابِ বলা হয়– কোনো গ্রন্থে এমন বিষয় বৃদ্ধি করে সংযোজন করা যা সে গ্রন্থ হতে বাদ পড়েছে কিংবা নেই।

وَاَبْقٰى اَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ : আবূ নুআইমের পরিশিষ্ট সম্পর্কে এটা লেখকের মতামত। লেখক এখানে বলেছেন, مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ -এ যা কিছু বাদ গিয়েছিল এখানে তা সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও কিছু বিষয় পরবর্তীদের জন্য বাকি থেকে গিয়েছে।

اَلْمُتَعَقِّبُ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। অর্থ– اَلْمُتَأَخِّرُ বা পরবর্তী।

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمُ الْخَطِيْبُ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فَصَنَّفَ فِىْ قَوَانِيْنِ الرِّوَايَةِ كِتَابًا سَمَّاهُ الْكِفَايَةُ وَفِىْ اٰدَابِهَا كِتَابًا سَمَّاهُ الْجَامِعُ لِاٰدَابِ الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ وَقَلَّ فَنٌّ مِنْ فُنُوْنِ الْحَدِيْثِ اِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ كِتَابًا مُفْرَدًا وَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ نُقْطَةَ كُلُّ مَنْ اَنْصَفَ عَلِمَ اَنَّ الْمُحَدِّثِيْنَ بَعْدَ الْخَطِيْبِ عِيَالٌ عَلٰى كُتُبِهٖ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمْ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْخَطِيْبِ فَاَخَذَ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ بِنَصِيْبٍ فَجَمَعَ الْقَاضِىْ عِيَاضٌ كِتَابًا لَطِيْفًا سَمَّاهُ الْاِلْمَاعُ وَاَبُوْ حَفْصٍ الْمَيَانِجِيُّ جُزْءًا سَمَّاهُ مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلَهٗ۔

অনুবাদ : অতঃপর তাঁদের পরে এলেন খতীব আবূ বকর বাগদাদী (র.)। (অর্থাৎ তাঁর যুগ এল।) তিনি হাদীস বর্ণনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটির নাম রাখেন 'আল-কিফায়া'। আর হাদীস বর্ণনার আদব ও শিষ্টাচার সম্পর্কে রচনা করেন আরেকটি গ্রন্থ। তিনি তার নাম রাখেন 'আল-জামিউ লি-আদাবিশ শায়খ ওয়াস সামে'। হাদীসশাস্ত্রের প্রায় সকল বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিজ আবূ বকর ইবনে নুকতা (র.) (তাঁর সম্পর্কে) যথার্থই বলেছেন, নিরপেক্ষভাবে যে-ই বিচার করবে সে জানবে যে, খতীবের পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণ তাঁর কিতাবাদির পরিজন (পোষ্য)। উল্লিখিত মনীষীগণের পরে খতীবে বাগদাদীর পরবর্তী কতিপয় ওলামায়ে কেরাম এসেছেন এবং এ শাস্ত্রের (উলূমুল হাদীসের) এক একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন। (অর্থাৎ তাঁরাও এ শাস্ত্রের খিদমত করেছেন।) কাজি ইয়ায (এ প্রসঙ্গে) একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার নাম রাখেন 'আল-ইলমা'। আবূ হাফস মাইয়্যানিজী (র.) একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন– مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلَهٗ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْخَطِيْبُ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ : তাঁর নাম আহমাদ ইবনে আলী। কুনিয়াত আবূ বকর। লকব খতীব। স্থানবাচক নাম বাগদাদী। তিনি খতীবে বাগদাদী নামে অধিক পরিচিত। তাঁর দ্বারা যেমনি ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের যুগ শেষ হয়েছে তেমনি ওলামায়ে মুতাকদ্দিমীনের যুগের সূচনা হয়েছে। তিনি যুগান্তকারী অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তারীখে বাগদাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি ৩৯২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৪৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

اَلْكِفَايَةُ : হাদীস রেওয়ায়েতের বিধান-সংক্রান্ত এটি খতীবে বাগদাদীর একটি কিতাব। তবে এটি পূর্ণ নাম নয়। পূর্ণ নাম হলো– اَلْكِفَايَةُ فِىْ قَوَانِيْنِ الرِّوَايَةِ অথবা اَلْكِفَايَةُ فِىْ عِلْمِ الرِّوَايَةِ। এটি এক খণ্ডবিশিষ্ট একটি চমৎকার কিতাব।

اَلْجَامِعُ لِاٰدَابِ : এটি খতীবে বাগদাদী (র.)-এর আরেকটি কিতাবের নাম। তবে পূর্ণ নাম এরূপ– اَلْجَامِعُ لِاَخْلَاقِ الرَّاوِىْ وَاٰدَابِ السَّامِعِ। এটি দু খণ্ডবিশিষ্ট। এ গ্রন্থে ওস্তাদের হাদীস বর্ণনার আদব এবং ছাত্রের হাদীস গ্রহণের আদব বিবৃত হয়েছে।

وَقَلَّ فَنٌّ مِنْ فُنُوْنٍ .... كِتَابًا مُفْرَدًا : এখানে قُلْ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা– ১. اَلنُّدْرَةُ বা দুর্লভ। ২. اَلنَّفْىُ وَالْعَدَمُ অর্থাৎ নেই। তখন وَقَلَّ فَنٌّ مِنْ فُنُوْنِ الْحَدِيْثِ -এর অর্থ হবে– হাদীসে এমন কোনো ফন নেই...। আর ্য। ইস্তিছনাটা হবে এই পূর্বোক্ত অর্থ হতে। তখন পূর্ব বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে–

أَيْ لَا يُوْجَدُ فَنٌّ مِنْ فُنُوْنِ الْحَدِيْثِ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ إِلَّا حَالَ كَوْنِهِ مُتَّصِفًا بِهٰذَا الصِّفَةِ أَيْ بِأَنْ صَنَّفَ هُوَ فِيْهِ.

অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রের এমন কোনো দিক নেই, যে দিক নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেননি অর্থাৎ হাদীসের সমস্ত বিষয়ে তিনি পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نُقْطَةَ : তাঁর পূর্ণ নাম- হাফিজ মুহাম্মদ আব্দুল গনী ইবনে শুজা আবূ বকর ইবনে নুকতা। তিনি ৫৭৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৬২৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থের নাম- اَلتَّقْيِيْدُ لِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيْدِ

كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ..... : ইবনে নুকতা (র.)-এর এ উক্তিটি আছে তাঁর পূর্ব বর্ণিত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠায়।

عِيَالٌ عَلٰى كُتُبِهِ : এ উক্তির মাধ্যমে ইবনে নুকতা (র.) উসূলুল হাদীসের উপরে খতীবে বাগদাদীর ব্যাপক খিদমতের চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। কেউ কারো ভরণ-পোষণের জিম্মাদারি পালন করলে যার জিম্মাদারি নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় ঐ ব্যক্তির عِيَالٌ বা পোষ্য-পরিজন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাদ্য-পানীয়, খরচা পেয়ে উপকৃত হয় এবং এসব বিষয়ে আরেক জনের উপর নির্ভরশীল হয় সেই হলো عِيَالٌ। যেহেতু খতীবে বাগদাদীর পরবর্তী মুহাদ্দিসীনে কেরাম উলূমুল হাদীসের ব্যাপারে খতীবে বাগদাদীর রচিত কিতাবাদির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন এবং তারা খতীবের কিতাব হতে বিরাট অংশ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, তাই তাঁরা কেমন যেন খতীবে বাগদাদীর কিতাবসমূহের পোষ্য ও পরিজনভুক্ত হয়েছেন।

اَلْقَاضِيْ عِيَاضٌ : তাঁর পূর্ণ নাম- আল-ইমাম হাফিজ হুজ্জত ইয়ায ইবনে মূসা আল-ইয়াহছুবী আস-সাবতী আল-মাগরিবী (র.)। তিনি সাবতা শহরে ৪৭৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৫৪৪ হিজরিতে মাররাকুশে ইন্তেকাল করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ عَلٰى صِحَاحِ الْآثَارِ

اَلْإِلْمَاعُ : উসূলুল হাদীসের উপর লিখিত কাজি ইয়ায (র.)-এর কিতাবের নাম। তবে এটা অপূর্ণ নাম। পূর্ণ নাম হলো- اَلْإِلْمَاعُ إِلٰى مَعْرِفَةِ أُصُوْلِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيْدِ السَّمَاعِ।

أَبُوْ حَفْصٍ الْمَيَانِجِيُّ : তাঁর নাম- ওমর ইবনে আব্দুল মাজীদ ইবনে হাসান (র.)। কুনিয়াত আবূ হাফস। তিনি ৫৮১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ গ্রন্থের (৫ : ২৩৯) আলোকে জানা যায় যে, اَلْمَيَانِجِيُّ-এর সঠিক শব্দ হলো اَلْمَيَانِشِيُّ (আল-মাইয়্যানিশী)। مَيَانِشُ হলো আফ্রিকার একটি এলাকার নাম। তবে অনেক সময় ش অক্ষরকে ج দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, এখানেও এমনটি ঘটেছে। তবে সর্বাবস্থায় মীম অক্ষরের পরবর্তী ইয়া-বর্ণটি তাশদীদযুক্ত এবং নূন-বর্ণে যের হবে। প্রথম অক্ষর মীম যবরবিশিষ্ট হবে।

مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثَ جَهْلُهُ : এটি আবূ হাফস মাইয়্যানিজী (র.) লিখিত উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এখানে اَلْمُحَدِّثَ শব্দটি مَفْعُوْلٌ হওয়ায় যবরবিশিষ্ট হবে আর جَهْلُهُ শব্দটি يَسَعُ-এর فَاعِلٌ হওয়ায় পেশবিশিষ্ট হবে। يَسَعُ শব্দটি وَسِعَ. يَسَعُ বাবে سَمِعَ হতে ব্যবহৃত। এর অর্থ- প্রশস্ত হওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া। তবে শব্দটির শুরুতে حَرْفُ نَفْيٍ দাখিল হলে তখন অর্থ দেয়- বৈধ নয়, সামর্থ্যের মধ্যে নয় ইত্যাদি। যেমন বলা হয়- لَا يَسَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ هٰذَا অর্থাৎ এটা করা তোমার জন্য বৈধ নয় বা সামর্থ্যের মধ্যে নয়। এ অর্থ হিসেবে مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثَ جَهْلُهُ-এর অর্থ হবে, যে বিষয়ের অজ্ঞতা একজন মুহাদ্দিসের জন্য বৈধ নয় বা শোভনীয় নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মুহাদ্দিসের জন্য যা জানা আবশ্যক।

وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ مِنَ التَّصَانِيْفِ الَّتِىْ اِشْتَهَرَتْ وَبُسِطَتْ لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا وَاخْتُصِرَتْ لِيَتَيَسَّرَ فَهْمُهَا ، اِلٰى اَنْ جَاءَ الْحَافِظُ الْفَقِيْهُ تَقِىُّ الدِّيْنِ اَبُوْ عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الشَّهْرَزُوْرِىُّ نَزِيْلُ دِمَشْقَ ، فَجَمَعَ لَمَّا وَلِّىَ تَدْرِيْسَ الْحَدِيْثِ بِالْمَدْرَسَةِ الْاَشْرَفِيَّةِ كِتَابَهُ الْمَشْهُوْرَ ، فَهَذَّبَهُ فُنُوْنَهُ وَاَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْئٍ ، فَلِهٰذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيْبُهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ ، وَاعْتَنٰى بِتَصَانِيْفِ الْخَطِيْبِ الْمُتَفَرِّقَةِ ، فَجَمَعَ شَتَّاتِ مَقَاصِدِهَا ، وَضَمَّ اِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نُخَبَ فَوَائِدِهَا فَاجْتَمَعَ فِىْ كِتَابِهٖ مَا تَفَرَّقَ فِىْ غَيْرِهٖ ، فَلِهٰذَا عَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَارُوْا لِيُسْرِهٖ ، فَلَا يُحْصٰى كَمْ نَاظِمٍ لَهٗ وَمُخْتَصِرٍ وَمُسْتَدْرِكٍ عَلَيْهِ وَمُقْتَصِرٍ وَمُعَارِضٍ لَهٗ وَمُنْتَصِرٍ ـ

অনুবাদ : এ জাতীয় প্রসিদ্ধ রচনাবলির সংখ্যা অনেক। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির জন্য কিছু গ্রন্থ বিশদভাবে আর তা বুঝতে সহজের জন্য কিছু গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে রচিত। বিশদ ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনার এ ধারা অব্যাহত থাকা অবস্থায় আগমন হয় হাফিজ ফকীহ তকীউদ্দীন আবূ আমর ওসমান ইবনুস সালাহ আব্দুর রহমান শাহরযূরী দেমাস্কী (র.) -এর। মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে হাদীস শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হয়ে তিনি সংকলন করেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ)। তিনি এর বিষয়বস্তু পরিমার্জিত করলেও (দীর্ঘদিন ধরে) অল্প অল্প করে লেখানোর কারণে গ্রন্থটির বিন্যাস যথার্থরূপ লাভ করেনি। এতদ্ব্যতীত তিনি খতীবে বাগদাদীর বিক্ষিপ্ত রচনাবলি সামনে রেখে তার মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো সার-নির্যাস ও মৌলিক বিষয় জমা করেছেন এবং তার সাথে সংযোজন করেছেন অন্যান্য গ্রন্থ হতে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার ফলে অন্যান্য গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত আলোচনা তাঁর গ্রন্থে এক জায়াগায় এসে গেছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তা সহজ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর হিসাব নেই যে, কতজন তাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন, কতজন সারসংক্ষেপ লেখেছেন, কতজন সম্পূরক গ্রন্থ রচনা করেছেন, কতজন সমালোচনামূলক গ্রন্থ লেখেছেন, কতজন তার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ .... اِشْتَهَرَتْ : এ বাক্যের عَطْف কার উপর হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে পূর্ববর্তী বাক্য "فَاِنَّ التَّصَانِيْفَ فِىْ اِصْلَاحِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ قَدْ كَثُرَتْ" -এর অর্থের উপর عَطْف হয়েছে। তখন অর্থ হবে, اَلتَّصَانِيْفُ الْكَثِيْرَةُ مَا ذُكِرَ وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ অর্থাৎ উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত অধিক রচনাবলি হলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ জাতীয় আরো যেসব গ্রন্থ আছে। আবার কারো মতে- وَاَمْثَالُ ذٰلِكَ ... اِشْتَهَرَتْ বাক্যটি مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো كَثِيْرَةٌ। তখন অর্থ হবে, এ জাতীয় প্রসিদ্ধ রচনাবলির সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ বলেছেন, এ ব্যাখ্যাটি যেমনি স্বচ্ছ তেমনি অধিক স্পষ্টও বটে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উল্লিখিত বাক্যে مَعْطُوْف -কে ফেলে দিয়ে عَطْف করা হয়েছে। যেমনটি ঘটেছে عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا বাক্যের ক্ষেত্রে। তখন পূর্ণ

পূর্বোক্ত কিতাবাদির মতো। মোটকথা হলো, উসূলুল হাদীসের উপর রচিত বহু গ্রন্থের কয়েকটির বিবরণ এখানে পেশ করা হলো। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত কিতাব এগুলোই; বরং এ ছাড়াও এ জাতীয় আরো অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে।

وَبُسِطَتْ لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا : بُسِطَتْ শব্দটি মতনের শব্দ, যা আতফ হয়েছে পূর্ববর্তী মতনের শব্দ **كَثُرَتْ**-এর উপর। **بُسِطَتْ** এটা **فِعْل مَجْهُوْل** -এর সীগাহ। এর **ضَمِيْر** ফিরেছে **اَلتَّصَانِيْفُ** -এর প্রতি। অর্থ হলো, (কিছু গ্রন্থ) বিস্তৃত ও বিশদভাবে লিখিত। এর কারণ **لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا** বাক্যে বিবৃত হয়েছে যে, উসূলুল হাদীসের বিষয়বস্তু ও আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করতে বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। কেননা, সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ আলোচনায় যেমনি বিষয়বস্তু অস্পষ্ট থেকে যায় তেমনি সকল শ্রেণীর পক্ষে তা বুঝাও সম্ভব হয় না।

وَاخْتُصِرَتْ لِيَتَيَسَّرَ فَهْمُهَا : اُخْتُصِرَتْ শব্দটিও মতনের শব্দ। এটি **عَطْف** হয়েছে **وَ بُسِطَتْ** -এর উপর। এটিও **مَجْهُوْل** -এর সীগাহ। অর্থ হলো, (কিছু গ্রন্থ) সংক্ষিপ্তাকারে রচিত। এর কারণ **لِيَتَيَسَّرَ فَهْمُهَا** বাক্যে বিবৃত হয়েছে যে, অল্প বাক্যে শাস্ত্র বুঝতে যেমনি সহজ, তেমনি আয়ত্ত করতেও বেগ পেতে হয় না। কেননা, আলোচনা দীর্ঘ হলে যেমন তাতে মন বসে না তেমনি সারকথাও অনেক সময় বের করে সংরক্ষণ করা যায় না।

اِلٰى اَنْ جَاءَ : এ বাক্যটি **مُتَعَلِّقْ** হয়েছে পূর্ববর্তী উহ্য **فِعْل** -এর সাথে। আসল ইবারত এরূপ- **بَقِيَ اَمْرُ الْبَسْطِ وَالضَّبْطِ اِلٰى اَنْ جَاءَ** অর্থাৎ উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত বিশদ ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত থাকা অবস্থায় তিনি আসেন।

تَقِيُّ الدِّيْنِ اَبُوْ عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ : ইবনুস সালাহ (র.) -এর পূর্ণ নাম হলো, শাইখুল ইসলাম উসমান ইবনু সালাহুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান আন-নাসরী আল-কুর্দী। বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত মূসেল এবং হামদান শহরের মধ্যবর্তী শহর শাহরযূরী-তে তিনি জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে শাহরযূরীও বলা হয়। তবে ইবনুস সালাহ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ৫৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ এবং ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তৎকালীন যুগের অন্যতম আলিম ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ এবং রাবীচরিত-এর উপর তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও রচনা।

اَلشَّهْرَزُوْرِىُّ نَزِيْلَ دِمَشْقَ : এ শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ শাহরযূরী। এটা **عَنْكَبُوْت** (আনকাবূত) -এর ওযনে এসেছে। এটি একটি শহরের নাম, যা বর্তমান ইরাকে অবস্থিত।

نَزِيْلَ دِمَشْقَ -এর অর্থ দামেস্কে অবস্থানকারী। ইবনুস সালাহ (র.) -এর জন্মস্থান শাহরযূরী হলে পরবর্তীতে তিনি বসবাস করেন দামেস্কে এসে। এজন্য তাঁকে নাযীলে দিমাস্ক বা দামেস্কে অবস্থানকারী বলা হয়। **دِمَشْق** শব্দটির আরবি উচ্চারণ দিমাস্ক। 'দাল' বর্ণে যেরযোগে। তবে বাংলায় তার রূপান্তর ঘটেছে দামেস্ক হিসেবে।

لَمَّا وَلِىَ تَدْرِيْسَ الْحَدِيْثِ بِالْمَدْرَسَةِ الْاَشْرَفِيَّةِ : মাদরাসায়ে আশরাফিয়া দামেস্কে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাতার নামে এ মাদরাসার নামকরণ হয়। এখানে হাদীসের পঠন-পাঠন হতো। মাদরাসাটি প্রথমে আমীর সারিমুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির বাড়ি ছিল। মালিকুল আশরাফ মুজাফফর উদ্দীন মূসা ইবনু আদিল এ বাড়িটি ক্রয় করে তাকে দারুল হাদীস বানান এবং বাড়িটি মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দেন। তিনি ইমাম ইবনুস সালাহ (র.) -কে এ দারুল হাদীসের 'শাইখুল হাদীস' পদে নিয়োগ দেন। তিনিই হন এ মাদরাসার সর্বপ্রথম শাইখুল হাদীস। মাদরাসাটির গোড়াপত্তন হয় ৬৩০ হিজরির ১৪ শাবান দিবাগত রাতে।

وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ : أَمْلَا এটা بَابُ إِفْعَالٌ থেকে আগত। এর অর্থ- শ্রুত বিষয় লেখা। ওস্তাদ ক্লাসে কোনো আলোচনা ছাত্রদের যদি লিখিয়ে দেন, তাহলে এটাকে বলে إِمْلَاءٌ বা শ্রুতিলিখন। আর এ পদ্ধতিতে যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাকে বলে أَمَالِيْ তথা শ্রুতলিখনের দ্বারা লিপিবদ্ধ বিষয়াদি।

ইমাম ইবনুস সালাহ (র.) মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে হাদীসের দরস দানকালে তাঁর ছাত্রদেরকে এই إِمْلَاءٌ করান। এ শ্রুতলিখন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকে। ৬৩০ হিজরির রমজান মাসের ১৭ তারিখ শুক্রবার এই إِمْلَاءٌ শুরু হয় এবং তা সম্পন্ন হয় ৬৩৪ হিজরির মহররম মাসের শেষ শুক্রবারে। মোট ৩ বছর ৪ মাস ১৩ দিন এ কাজে ব্যয় হয়। তবে إِمْلَاءٌ-এর কাজেই কেবল এই দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়নি; বরং إِمْلَاءٌ-এর কাজটি চলে হাদীসের দরস দানের মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুপাতে। ইবনুস সালাহ (র.) মাদরাসায়ে আশরাফিয়াতে 'আস সুনানুল কুবরা' হাদীস শরীফের দরস দিতেন। এই দরস দিতে গিয়ে হাদীস ও উলূমুল হাদীসশাস্ত্রের প্রয়োজনে তিনি হাদীসের দরস দানের পাশাপাশি অল্প অল্প করে ছাত্রদেরকে উসূলুল হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি লিখিয়ে দিতেন। এভাবে ধীরে ধীরে যে গ্রন্থটি সংকলিত হয়, তা পরবর্তীতে 'মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيْبُهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ : একে তো দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে লেখানো তদুপরি একজন লেখক লেখা শুরু করার প্রাক্কালে নির্বাচিত বিষয় ও তার বিন্যাস নিয়ে যেমনিভাবে চিন্তা করেন, পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সেভাবে পূর্বপরিকল্পনা এবং স্থির চিন্তার সমন্বয় না ঘটায় বিষয়বস্তুসমূহ স্ব-স্ব স্থানে পূর্ণাঙ্গ ও পরিমার্জিত হলেও শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক বিচারে গ্রন্থবিন্যাস যেভাবে হওয়ার দাবি রাখে তেমনটি হয়নি।

نُخَبُ فَوَائِدِهَا : نُخَبُ শব্দটি نُخْبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- নির্বাচিত, চয়িত। فَوَائِدِهَا-এর 'هَا' যমীরটি কোন দিকে ফিরেছে তা নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। যথা-

১. পূর্ববর্তী غَيْرِ শব্দের দিকে। অবশ্য তখন স্ত্রীবাচক সর্বনাম উল্লেখের ব্যখ্যা এই হবে যে, এর (غَيْر) দ্বারা উদ্দেশ্য اَلتَّصَانِيْفُ الْبَاقِيَةُ অর্থাৎ অন্যান্য রচনাবলি। আর যেহেতু এটা বহুবচন যা مُؤَنَّثٌ-এর হুকুমের তাই স্ত্রীবাচক সর্বনাম আনা হয়েছে।

২. অথবা, সর্বনামটি স্ত্রীবাচক আনা হয়েছে غَيْر-এর مُضَافْ اِلَيْهِ-এর দিকে লক্ষ্য করে। আর এভাবে مُضَافْ اِلَيْهِ-এর اِعْتِبَارْ করে স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহার করার নজিরও রয়েছে। যেমন জনৈক কবির উক্তি- وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ অর্থাৎ "বস্তুত দেয়ালের মোহ আমার অন্তরকে বিগলিত ও বিচলিত করেনি।" এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, شَغَفْنَ ফে'লটি স্ত্রীবাচক। অথচ নিয়ম অনুযায়ী তার فَاعِلْ যেহেতু حُبّ শব্দ, তাই পুরুষবাচক হওয়ায় স্ত্রীবাচক فِعْلْ-এর পরিবর্তে পুরুষবাচক সীগাহ ব্যবহৃত হতে হতো; কিন্তু এখানে فِعْلْ টি مُؤَنَّثْ হয়েছে কেবল مُضَافْ اِلَيْهِ -এর দিকে লক্ষ্য করে। আর তা হলো اَلدِّيَارْ। ঠিক এমনিভাবে فَوَائِدِهَا-এর ضَمِيْر টি غَيْر -এর দিকে ফিরলেও غَيْر-এর مُضَافْ اِلَيْهِ "هَا" স্ত্রীবাচক হওয়ায় এখানে ضَمِيْر স্ত্রীবাচক আনা হয়েছে।

অথবা, ضَمِيْر টি ফিরেছে فُنُوْنُ الْحَدِيْث-এর দিকে। আর এ শব্দটি পূর্বে শাব্দিকভাবে উল্লেখ না থাকলেও আলোচনা হাদীসকেন্দ্রিক হওয়ায় তা হুকমীভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ-এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

৪. এ দূরবর্তী সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ضَمِيْر টি ফিরেছে تَصَانِيْفُ الْخَطِيْبِ -এর দিকে। অবশ্য তখন فَوَائِدُهَا -এর অর্থ দাঁড়াবে- اَلْفَوَائِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَصَانِيْفِ الْخَطِيْبِ অর্থাৎ খতীবে বাগদাদীর রচনাবলি সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত ফায়েদাসমূহ।

وَسَارُوْا الْيسره : سَارُوْا -এর অর্থ سَلَكُوْا অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনে কেরাম চলেছেন। অধিকাংশ কপিতে سَيْرَه থাকলেও কোনো কোনো কপিতে শব্দটি يُسْرَه ও আছে। سَيْر -এর অর্থ مَسْلَكْ তথা পথ। অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইবনুস সালাহ (র.) -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পথ ধরে চলেছেন। আর يُسْر -এর অর্থ سَهْل বা সহজ। তখন অর্থ হবে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম গ্রন্থটি সহজ থেকে সহজ করতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

فَلَا يُحْصٰى : মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ -এর প্রতি মুহাদ্দিসীনে কেরামের ঝুঁকা এবং এ কিতাবের খিদমতে ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আলোচ্য অংশে।

كَمْ نَاظِمٍ لَهٗ : কেউ কেউ এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে কাব্যিকরূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ কবিতার মতো ছন্দবদ্ধ বাক্যে উপস্থাপন করেছেন। এ পর্যায়ে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সনআনী (র.) (মৃত্যু ১১৮২ হি.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি قَصَبُ السُّكَّرِ فِيْ نَظْمِ نُخْبَةِ الْفِكَرِ নামে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাম-এর কাব্যিকরূপ দান করেন।

وَمُخْتَصَرٌ : اِخْتِصَارٌ বা সংক্ষেপ বলা হয় অল্প শব্দে পুরো উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ব্যক্ত করা। এ পর্যায়ে ইমাম নববী (র.) -এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি اِرْشَادُ طُلَّابِ الْحَقَائِقِ اِلٰى مَعْرِفَةِ سُنَنِ خَيْرِ الْخَلَائِقِ নামে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ -এর বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করেন।

وَمُسْتَدْرَكٌ عَلَيْهِ : اِسْتِدْرَاكٌ বলা হয় পরিশিষ্ট রচনা করা, ছুটে যাওয়া আলোচনা সংযুক্ত করা। অনেক মুহাদ্দিস মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ -এর উপর এ জাতীয় খিদমত আঞ্জাম দেন। اَلنُّكَتُ عَلٰى كِتَابِ اِبْنِ الصَّلَاحِ এ ধরনেরই একটি কিতাব।

وَمُقْتَصَرٌ : اِقْتِصَارٌ অর্থ- ছেটে ফেলা, বাদ দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হলো, মূল বিষয় বাকি রেখে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বাদ দেওয়া। অনেকে মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ -এর উপর এ সংস্কারমুখী পদক্ষেপও নিয়েছেন।

وَمُعَارِضٌ لَهٗ : এর অর্থ হলো- মোকাবিলায় নামা। আর এটা দুভাবে হয়েছে। যথা- ১. এ ধরনের কিতাব রচনা করে। ২. এ কিতাবের শব্দ, অর্থ এবং অধ্যায়ের বিন্যাসের ব্যাপারে সমালোচনা করে, অভিযোগ আরোপ করে।

وَمُنْتَصِرٌ : اِنْتِصَارٌ অর্থ- সাহায্য করা। অনেক মুহাদ্দিস মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ-এর সাহায্যে কলম ধরেছেন। তারা এ পর্যায়ে এ কিতাবের উপর আগত অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। কিতাবের দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা দূরীভূত করেছেন। কিতাবটি অধ্যায় আকারে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে হাফিজ আল্লামা আলাউদ্দিন মোগলতাঈ হানাফী (মৃত্যু ৭৬২ হি.) -এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি اِصْلَاحُ كِتَابِ اِبْنِ الصَّلَاحِ নামে এ জাতীয় একটি কিতাব রচনা করেন। তবে তিনি গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে পারেননি।

فَسَأَلَنِىْ بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ الْمُهِمَّ مِنْ ذٰلِكَ ، فَلَخَّصْتُهُ فِىْ أَوْرَاقٍ لَطِيْفَةٍ سَمَّيْتُهَا نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ عَلٰى تَرْتِيْبٍ ابْتَكَرْتُهُ وَسَبِيْلٍ انْتَهَجْتُهُ مَعَ مَا ضَمَمْتُ إِلَيْهِ مِنْ شَوَارِدِ الْفَرَائِدِ وَ زَوَائِدِ الْفَوَائِدِ .

অনুবাদ : এ কারণে এক ভাই আমাকে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে লেখার অনুরোধ করেন। আমি কয়েক পৃষ্ঠায় নয়া আঙ্গিকে এবং অভিনব পন্থায় সারসংক্ষেপ লেখে তার নাম দেই 'নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার'। তবে এর সাথে ছুটে যাওয়া মোতিতুল্য অনেক তত্ত্ব ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি সংযোজন করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَسَأَلَنِىْ : এটি মতনের অংশ। এর সম্পর্ক হলো وَبُسِطَتْ... وَاخْتُصِرَتْ -এর সাথে। এখানে فَاءٌ টি سَبَبِيَّه বা কারণ দর্শানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর জনৈক বন্ধু তাঁকে 'সারকথা' লেখার জন্য আবেদন করার কারণ হলো, যেহেতু উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি কোনোটি বিস্তারিত আর কোনোটি সংক্ষিপ্ত এবং তার মধ্যে মধ্যম ধরনের ও 'সারকথা' জাতীয় কোনো গ্রন্থ ছিল না, তাই এক সুহৃদ বন্ধু তাকে এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করেন।

بَعْضُ الْإِخْوَانِ : ইমাম সাখাবী (র.) বলেন, এখানে ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আয-যারকাশী (র.)। তিনি ৮১৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

(اَلضَّوْءُ اللَّامِعُ لِأَعْيَانِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ ٩ : ٢٠٩)

তবে কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ভাই বলতে উদ্দেশ্য হলো হযরত ইযযুদ্দীন ইবনে জামাআহ (র.)।

أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ الْمُهِمَّ مِنْ ذٰلِكَ : কয়েকটি প্রতিলিপিতে أَنْ أُلَخِّصَ لَهُمْ থাকলেও সহীহ বা সঠিক ইবারত হলো أُلَخِّصَ لَهُ। এর প্রমাণ ১. بَعْضُ الْإِخْوَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য এক ব্যক্তি অর্থাৎ শায়খ যারকাশী (র.)। ২. পরবর্তী মতনে রয়েছে فَأَجَبْتُهُ إِلٰى سُؤَالِهِ। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উভয় স্থানে ه (হা) যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুরোধকারী ভাই অর্থাৎ শায়খ যারকাশী (র.)।

اَلْمُهِمُّ এটা اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ। এর অর্থ– গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে اَلْمُهِمُّ বলতে উদ্দেশ্য ঐ সকল বিষয় যা একজন মানুষকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করে।

مِنْ ذٰلِكَ : এখানে ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ إِلَيْهِ 'মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ' গ্রন্থটি নিরূপণ করা ভুল; বরং এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো মতনের প্রথম ইবারত : اَلتَّصَانِيْفُ فِىْ اِصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ قَدْ كَثُرَتْ وَ بُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ। সংক্ষেপে বলা যায়, উসূলুল হাদীসের مُصْطَلَحٌ বা পরিভাষাগুলো।

فَلَخَّصْتُهُ فِىْ أَوْرَاقٍ لَطِيْفَةٍ : تَلْخِيْص -এর অর্থ– খোলাসা বা সারকথা বের করা। আর 'ه' ضَمِيْر টির مَرْجِعٌ হলো مُصْطَلَحُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ তথা এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী রচিত কিতাবাদি। مَنْصُوْبًا

وَرَقٌ-এর جَمْع হলো اَوْرَاقٌ। এর অর্থ– পৃষ্ঠা। لَطِيْفَةٌ-এর অর্থ– সূক্ষ্ম কথা, নরম কথা ইত্যাদি। তবে এখানে শব্দটি 'কম' অর্থে প্রযোজ্য। অতএব, اَوْرَاقٌ لَطِيْفَةٌ-এর অর্থ হবে– কম পৃষ্ঠায় বা কয়েক পৃষ্ঠায়। لَطِيْفَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো لَطَائِفُ।

نُخْبَةُ الْفِكَرِ فِىْ مُصْطَلَحِ اَهْلِ الْاَثَرِ : نُخْبَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে نُخَبٌ, এর অর্থ– ১. নির্বাচিত, ২. চয়িত, ৩. বাছাইকৃত। اَلْفِكَرُ শব্দটি فِكْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– চিন্তা, গবেষণা, ভাবা ইত্যাদি।

نُخْبَةُ الْفِكَرِ শব্দদ্বয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে تَرْكِيْب اِضَافِىْ হলেও মূলত এখানে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْف হয়েছে। অর্থাৎ সিফাতের ইযাফত হয়েছে তার مَوْصُوْف-এর দিকে। আসল ইবারত হলো এরূপ– اَلْفِكَرُ النُّخْبَةُ অর্থাৎ নির্বাচিত গবেষণা তথা গবেষণালব্ধ নির্বাচিত বিষয়, নির্বাচিত চিন্তামালা।

مُصْطَلَحُ اَهْلِ الْاَثَرِ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত পরিভাষা।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উসূলুল হাদীসের উপর কিতাব লেখে তার নামকরণ করেছেন এটা। উপরের ব্যাখ্যা মতে কিতাবটির অর্থ দাঁড়াবে– 'উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ নির্বাচিত বিষয়' বা নির্বাচিত চিন্তামালা।

اِبْتَكَرْتُهُ : بَابُ اِفْتِعَالٌ থেকে ব্যবহৃত। এ শব্দটির অর্থ কোনো কিছুর শুরুর অংশ করায়ত্ত করা। এখানে تَرْتِيْبٌ اِبْتَكَرْتُهُ অর্থ হলো, এমন বিন্যাস ও আঙ্গিক যা নতুন করে আমিই সূচনা করেছি অর্থাৎ নয়া আঙ্গিকে।

اِنْتَهَجْتُهُ : بَابُ اِفْتِعَالٌ থেকে ব্যবহৃত এ শব্দটির অর্থ হলো– পথ চলা। سَبِيْلٌ اِنْتَهَجْتُهُ-এর অর্থ হলো, এমন পথ যে পথে আমি একাই চলেছি অর্থাৎ অভিনব পন্থায়।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) যে নয়া আঙ্গিক ও অভিনব পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অতীতে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা নিয়ে যারা রচনা করে গেছেন তারা গতানুগতিক ও ঢালাওভাবে একের পর এক পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এই গতানুগতিকতা এড়িয়ে একটি নতুন পদ্ধতিতে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। আর তা হলো, তিনি হাদীসের সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো একস্থানে, সনদ সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো আরেক স্থানে এবং মতন ও সনদ উভয় সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো পৃথক পৃথক স্থানে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেছেন। সনদ সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলোকে আবার এভাবে বিন্যাস করেছেন যে, প্রথমে রাবীর পতনহেতু مَرْدُوْد প্রকারগুলো উল্লেখ করেছেন এবং এরপরে গিয়ে রাবীর অভিযুক্তি হেতু مَرْدُوْد প্রকারগুলো আলোচনা করেছেন ইত্যাদি।

مَعَ مَا ضَمَمْتُ اِلَيْهِ : এ অংশটি পূর্বোক্ত لَخَّصْتُهُ ফে'লের ه যমীরে مَفْعُوْل থেকে حَالٌ হয়েছে। মূল ইবারত এরূপ–

لَخَّصْتُ ذٰلِكَ الْمُهِمَّ مَقْرُوْنًا ذٰلِكَ الْمُهِمَّ الْمُلَخَّصَ مَعَ اُمُوْرٍ ضَمَمْتُهَا اِلَيْهِ وَ زِدْتُهَا عَلَيْهِ.

উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারসংক্ষেপ লেখে তার সাথে অতিরিক্ত কিছু বিষয় সংযোজন করেছি এবং তার উপরে কিছু কথা বৃদ্ধি করেছি।

مِنْ شَوَارِدِ الْفَرَائِدِ : এটা বর্ধিত বা সংযোজিত অংশের বর্ণনা।

شَوَارِدُ শব্দটি شَارِدَةٌ -এর বহুবচন। এ শব্দটির উৎসমূল হলো شَرَدَ الْبَعِيْرُ এটা তখন বলা হয়, যখন কোনো উট ভেগে যায়, পালিয়ে যায়।

اَلْفَرَائِدُ শব্দটি فَرِيْدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– اَلدُّرَّةُ الْكَبِيْرَةُ বা বড় মোতি।

شَوَارِدُ الْفَرَائِدِ বাক্যটি تَرْكِيْب إِضَافِيْ হলেও মূলত তা إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। অর্থাৎ সিফাতের সম্বন্ধ হয়েছে مَوْصُوْف -এর দিকে। আসল ইবারত হলো اَلْفَرَائِدُ الشَّوَارِدُ অর্থাৎ ভেগে যাওয়া বা ছুটে যাওয়া মুক্তা-মাণিক্য।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কে লেখতে গিয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের অপেক্ষা যে আলোচনা অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন তা اَلْفَرَائِدُ الشَّوَارِدُ তথা 'ছুটে যাওয়া মুক্তা' দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কারণ হলো, এ কথাগুলো খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুত এদিকে ইঙ্গিত করতে তিনি اَلْفَرَائِدُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এ বিষয়গুলো সূক্ষ্ম ও কষ্টকর হওয়ায় তা পূর্ববর্তীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে এবং তারা এর নাগাল পাননি; তাই তিনি এদিকে ইঙ্গিত করতে اَلشَّوَارِدُ (তথা পলায়নপর ও ছুটে যাওয়া) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

وَ زَوَائِدُ الْفَوَائِدِ : এটাও مَا ضَمَمْتُ তথা অতিরিক্ত সংযোজনের বর্ণনা। زَائِدَةٌ -এর বহুবচন زَوَائِدُ অর্থ– অতিরিক্ত। আর اَلْفَوَائِدُ শব্দটি فَائِدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ফায়দা, উপকারিতা।

زَوَائِدُ الْفَوَائِدِ বাক্যটিও إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। আসল ইবারত হলো, اَلْفَوَائِدُ الزَّوَائِدُ অর্থাৎ বিষয়টি উপকারী হলেও তা অতিরিক্ত পর্যায়ের।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) যে সকল পরিভাষা নিজে উদ্ভাবন করেছেন তা زَوَائِدُ الْفَوَائِدُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

উসূলুল হাদীসের পরিভাষার দিক বিবেচনায় তাঁর উদ্ভাবিত পরিভাষাগুলো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইবনে হাজার (র.) নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে তা زوائد (অতিরিক্ত)-এর মতো কম গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। নতুবা বাস্তবতার বিচারে তা কম গুরুত্বের নয়; বরং অনেক মূল্যবান।

فَرُغِّبَ اِلَىَّ ثَانِيًا اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا يَحُلُّ رُمُوْزَهَا وَيَفْتَحُ كُنُوْزَهَا وَيُوْضِحُ مَا خَفِىَ عَلَى الْمُبْتَدِىْ مِنْ ذٰلِكَ ، فَاَجَبْتُهُ اِلٰى سُؤَالِهٖ رَجَاءَ الْاِنْدِرَاجِ فِىْ تِلْكَ الْمَسَالِكِ ، فَبَالَغْتُ فِىْ شَرْحِهَا فِى الْاِيْضَاحِ وَالتَّوْجِيْهِ وَنَبَّهْتُ عَلٰى خَبَايَا زَوَايَاهَا ، لِاَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ اَدْرٰى بِمَا فِيْهِ ، فَظَهَرَ لِىْ اَنَّ اِيْرَادَهٗ عَلٰى صُوْرَةِ الْبَسْطِ اَلْيَقُ ، وَ دَمْجَهَا ضِمْنَ تَوْضِيْحِهَا اَوْفَقُ ، فَسَلَكْتُ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةَ الْقَلِيْلَةَ السَّالِكِ ، فَاَقُوْلُ طَالِبًا مِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقَ فِيْمَا هُنَالِكَ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয়বারের মতো আবার আমার কাছে আবেদন করা হলো (নুখবা) এর এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করার জন্য, যা তার ইঙ্গিতপূর্ণ তত্ত্ব উন্মোচিত করবে, খুলে দেবে তার তথ্যভাণ্ডার এবং এ শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কাছে যা অস্পষ্ট থাকতে পারে, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরবে। আমি ঐ পথে (লেখকদের কাতারে) শামিল হতে এ (ব্যাখ্যা লেখার) আহ্বানে সাড়া দেবার ইচ্ছা করলাম.। আমি চাইলাম, মতলব সাফ ও ইবারত হল করতে নুখবার খুব ব্যাখ্যা করবো এবং তার কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক করারও ইচ্ছা করলাম। কারণ, ঘরের মালিকই অধিক জানে ঘরে কি আছে। অতঃপর যখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি (উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করাই অধিক উপযোগী এবং নুখবাকে তার ব্যাখ্যার অধীনে দাখিল তথা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়াই বেশি সমীচীন, তখন আমি যে পথের পথিক কম– সে পথে চললাম অর্থাৎ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলাম। সুতরাং আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার তৌফিক ও সাহায্য কামনা করে বলছি–

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَرُغِّبَ اِلَىَّ : এটা مَجْهُوْلْ হিসেবে ব্যবহৃত। এই আবেদনকারী হলো পূর্বোক্ত بَعْضُ الْاِخْوَانِ অর্থাৎ এক দীনি ভাই।

ثَانِيًا : এটা ছিল তার দ্বিতীয় আবেদন। প্রথম আবেদন ছিল সংক্ষিপ্ত মতন রচনার জন্য, যা লেখক অতি চমৎকারভাবে পেশ করেছিলেন।

اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا : এটা হলো দ্বিতীয় আবেদনের বর্ণনা। অর্থাৎ ঐ দীনি ভাইয়ের দ্বিতীয় আবেদন ছিল পূর্বোক্ত মতনের (নুখবার) ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার জন্য। عَلَيْهَا -এর هَا যমীরটি ফিরেছে اَلنُّخْبَةُ الْفِكَرِ -এর দিকে, যা লেখক পূর্বে মতন হিসেবে লিখেছিলেন।

يَحُلُّ رُمُوْزَهَا : এ বাক্যটি তারকীবে شَرْحًا -এর صِفَتْ হয়েছে। অতএব, يَحُلُّ -এর যমীর ফিরেছে شَرْحًا -এর দিকে। আর رُمُوْزَهَا হলো يَحُلُّ ফে'লের مَفْعُوْلْ - رُمُوْزَهَا - رُمُوْزُ النُّخْبَةِ -এর অর্থ রুমূয -এর শাব্দিক অর্থ– ইশারা, ইঙ্গিত, সংকেত ইত্যাদি। এটা رَمْزٌ، رِمْزٌ বা رُمُزٌ -এর বহুবচন। তবে এখানে رُمُوْزَهَا -এর অর্থ হলো, নুখবা -এর অর্থের মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয়।

وَيَفْتَحُ كُنُوْزَهَا : এটি ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ থেকে ব্যবহৃত। كُنُوْزٌ শব্দটি كَنْزٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ভাণ্ডার, সিন্দুক ইত্যাদি। এখানে كُنُوْزَهَا -এর অর্থ হলো, মতনের অর্থ– সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি।

عَلَى الْمُبْتَدِي : এখানে **مُبْتَدِيْ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-শিক্ষার্থী। যারা এ শাস্ত্র সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান রাখে না এবং নতুন করে জানতে ও শিখতে চায়। এখানে লেখক **اَلْمُبْتَدِيْ** -এর উল্লেখ এজন্য করেছেন যে, যারা **اَلْمُنْتَهِيْ** তথা এ শাস্ত্রে পারদর্শী তাদের জন্য **نُخْبَةٌ**-ই যথেষ্ট। শরাহ -এর প্রয়োজন নেই তাদের। অবশ্য যারা **مُبْتَدِيْ** তাদের বুঝার জন্য শরাহ জরুরি।

مِنْ ذٰلِكَ : এটা মূলত **مِمَّا خَفِيَ** -এর বয়ান। আসল ইবারত হলো– **مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمَتَنِ مِنَ الرُّمُوْزِ وَالْكُنُوْزِ** অর্থাৎ মতনে যে সমস্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয় ও তথ্যভাণ্ডার গুপ্ত রয়েছে। অতএব, **ذٰلِكَ** -এর **مُشَارٌ اِلَيْهِ** হলো পূর্বোক্ত **رُمُوْز** এবং **كُنُوْز**।

فَاَجَبْتُهُ : **اَجَابَ - يُجِيْبُ** অর্থ– জবাব দেওয়া। তবে এখানে আহ্বানে সাড়া দেওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, এটাও এক ধরনের জবাব দান।

سُؤَالَهُ : "ه" যমীর ফিরেছে **بَعْضُ الْاِخْوَانِ** তথা ঐ দীনি ভাইয়ের দিকে যিনি লেখককে প্রথমে মতন ও পরে শরাহ লেখার আবেদন করেন। অনুরূপ **اَجَبْتُهُ** -এর **مَرْجِعْ** ও ঐ **بَعْضُ الْاِخْوَانِ**।

رَجَاءَ الْاِنْدِرَاجِ فِيْ تِلْكَ الْمَسَالِكِ : **رَجَاءٌ** অর্থ– আশা, ইচ্ছা ইত্যাদি।
اَلْاِنْدِرَاجُ অর্থ– দাখিল হওয়া, প্রবেশ করা, অন্তর্ভুক্ত করা, শামিল করা ইত্যাদি। **اَلْمَسَالِكُ** অর্থ– পথ, রাস্তা ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্যের উদ্দেশ্য তিনটি হতে পারে। যথা–

১. **اِنْدِرَاجٌ** -এর **فَاعِلٌ** হবেন লেখক ইবনে হাজার (র.) আর **اَلْمَسَالِكُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হবে **مَسَالِكُ الْمُصَنِّفِيْنَ**, তখন পুরো বাক্য ও তার অর্থ হবে নিম্নরূপ–

لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِيْ وَ دُخُوْلِيْ فِيْ مَسَالِكِ الْمُصَنِّفِيْنَ لِاُصُوْلِ الْحَدِيْثِ لِتَحْصِيْلِ الثَّنَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْجَزَاءِ فِي الْعُقْبٰى .

দুনিয়ায় প্রশংসা এবং আখিরাতে ছওয়াব পেতে উসূলুল হাদীসের লেখকদের কাতারে নিজেকে শামিল করার অভিলাষে আমি দীনি ভাইয়ের দ্বিতীয় আহ্বানেও সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলাম।

২. **اِنْدِرَاجٌ** -এর **فَاعِلٌ** হবে নুখবার ছাত্র-শিক্ষার্থীরা আর **اَلْمَسْلَكُ** দ্বারা উদ্দেশ্যে হবে উসূলুল হাদীসের পরিভাষা জানার রাস্তা। তখন পুরো বাক্য ও তার অর্থ হবে নিম্নরূপ–

لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِ الطَّالِبِيْنَ لِذٰلِكَ الْمُلَخَّصِ فِيْ مَسَالِكِ مَعْرِفَةِ اِصْطِلَاحَاتِ الْمُحَدِّثِيْنَ .

মুহাদ্দিসীনে কেরামের (উসূলুল হাদীস সংক্রান্ত) পরিভাষাসমূহ জানার পথে নুখবার ছাত্র-শিক্ষার্থী যাতে ঢুকতে পারে সেই আশা নিয়ে আমি দীনি ভাইয়ের আবেদনে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলাম।

৩. **اِنْدِرَاجٌ**-এর **فَاعِلٌ** হবে লেখকের বক্ষ্যমাণ কিতাব আর **اَلْمَسْلَكُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের লিখিত কিতাবাদির সিরিয়াল। তখন পুরো বাক্য ও তার অর্থ হবে নিম্নরূপ–

لِرَجَاءِ اِنْدِرَاجِ هٰذَا الْكِتَابِ فِيْ مَسَالِكِ كُتُبِ الْاَئِمَّةِ بِاَنْ يَّنْتَفِعَ بِهٖ كَمَا نَفَعَ بِتِلْكَ الْكُتُبِ .

আইম্মায়ে হাদীস (মুহাদ্দিসীনে কেরাম)-এর উসূলুল হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত কিতাবাদির সিরিয়ালে যাতে এ কিতাবটিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সেই আশায় আমি দীনি ভাইয়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলাম। যাতে তাদের কিতাব থেকে যেভাবে উপকার গ্রহণ করা হয় তেমনি এ কিতাব থেকেও উপকৃত হতে পারে।

فَبَالَغْتُ فِىْ شَرْحِهَا : এ বাক্যের মুতলবী অর্থ হলো–
فَارَدْتُ الْمُبَالَغَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَتَنِ فِىْ شَرْحِ النُّخْبَةِ অর্থাৎ মতন লেখা শেষ করার পর সে মতন তথা নুখবার খুব শরাহ্ করার ইচ্ছা করলাম।

فِى الْاِيْضَاحِ وَالتَّوْجِيْهِ : এটা مُتَعَلِّقْ হয়েছে شَرْح মাসদারের সাথে। এখানে الْاِيْضَاح এবং اَلتَّوْجِيْه মূলত পূর্বোক্ত شَرْح -এর বয়ান। অর্থাৎ শরাহ্ বলতে উদ্দেশ্য اِيْضَاحْ এবং تَوْجِيْه। তখন অর্থ হবে এমন, আমি শরাহ -এর ক্ষেত্রে মুবালাগার ইচ্ছা করেছি মানে اِيْضَاحْ এবং تَوْجِيْه -এর ক্ষেত্রে মুবালাগার ইচ্ছা করেছি।

اِيْضَاحْ -এর শুরুতে আগত اَلِفْ لَامْ টি عِوَضْ مُضَافْ اِلَيْهِ অর্থাৎ এটা আসলে ছিল اِيْضَاحُ لَفْظِ النُّخْبَةِ অর্থাৎ নুখবার সংক্ষিপ্ত শব্দকে বিস্তারিতভাবে পেশ করা।

اَلتَّوْجِيْه -এর اَلِفْ لَامْ টিও عِوَضْ مُضَافْ اِلَيْهِ এটা আসলে ছিল تَوْجِيْهُ مَعْنَى النُّخْبَةِ অর্থাৎ নুখবার অন্তর্নিহিত অর্থকে ব্যাখা করে পেশ করা।

وَنَبَّهْتُ عَلٰى خَبَايَا زَوَايَاهَا : نَبَّهْتُ ফে'লটি بَابْ تَفْعِيْل থেকে এসেছে। এর অর্থ– অবগত করা, সতর্ক করা, সচেতন করা। خَبَايَا শব্দটি خَبِيْئَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– লুকানো, লুক্কায়িত, গোপনকৃত, গুপ্ত। خَبَايَا শব্দটি زَوَايَاهَا -এর দিকে اِضَافَتْ হয়েছে।

زَوَايَا শব্দটি اَلزَّاوِيَةُ -এর جَمْع বা বহুবচন। অর্থ– কোণ। এখানে زَوَايَاهَا বলতে উদ্দেশ্য হলো زَوَايَا اَلْفَاظِ النُّخْبَةِ অর্থাৎ নুখবার শব্দের কোণায় কোণায়।

وَنَبَّهْتُ عَلٰى خَبَايَا زَوَايَاهَا -এর পুরো ইবারত ও অর্থ হলো– فَارَدْتُ الْاِطِّلَاعَ عَلٰى نُكَاتٍ مُخْفِيَّةٍ فِىْ زَوَايَا اَلْفَاظِ النُّخْبَةِ - অর্থাৎ নুখবার শব্দের কোণায় কোণায় লুকানো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত করানোর ইচ্ছা করলাম।

لِاَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ اَدْرٰى بِمَا فِيْهِ : এটা হলো فَبَالَغْتُ -এর عِلَّةْ বা কারণ বর্ণনা। صَاحِبُ الْبَيْتِ اَدْرٰى بِمَا فِيْهِ এটা একটা প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য। কোনো বিষয়ে কারো পূর্ণ অবগতি এবং তার রহস্য কেবল সেই জানলে সাধারণত সেক্ষেত্রে এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) প্রবাদ বাক্যটি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, এর দ্বারা তিনি ইশারা করেছেন আল্লামা কামালুদ্দীন শুমুন্নী (র.) -এর দিকে। কারণ, ইবনে হাজার (র.) نُخْبَةْ -এর শরাহ লেখার পূর্বেই আল্লামা কামালুদ্দীন (র.) ৮১৭ হিজরিতে نَتِيْجَةُ النَّظَرِ فِىْ نُخْبَةِ الْفِكَرِ নামে নুখবার একটি শরাহ লেখেন। তাঁর এ শরাহটি ইবনে হাজারের শরাহ অপেক্ষা অনেক বড়। ইবনে হাজার (র.) ..... فَاِنَّ صَاحِبَ বলে এ কথা বুঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, কামালুদ্দীন আমার পূর্বে শরাহ করলেও যেহেতু نُخْبَةْ -এর রচয়িতা আমি, তাই সঙ্গত কারণেই আমার বেশি ও ভালো করে জানা আছে যে, نُخْبَةْ -এর শব্দরাজি ও অর্থের মধ্যে কোন কোন সূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্ব লুকানো রয়েছে। অতএব, আমি যেভাবে ঐ তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে পারবো তেমনি বাইরের কেউ সেভাবে পারবে না। তাই কামালুদ্দীন আমার পূর্বে শরাহ লেখলেও তার শরাহ -এর তুলনায় আমার শরাহটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গতার দাবি রাখে।

فَظَهَرَ لِىْ : 'অতঃপর' বা 'তখন গিয়ে' -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,

بَعْدَ مَا اَرَدْتُّ اَنْ اُشْرِحَ شَرْحًا كَذَا ظَهَرَ لِيْ অর্থাৎ নুখবার ভালো করে একটি শরাহ লেখার মনে মনে ইচ্ছা করার পর যখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল ....।

اَنْ اِيْرَادُهُ : এখানে 'ه' যমীর ফিরেছে কল্পিত শরাহ -এর দিকে। আর اِيْرَادٌ অর্থ– উপস্থাপন করা, পেশ করা ইত্যাদি। এ বাক্যটি ظَهَرَ -এর فَاعِلْ হওয়ায় حَالَتْ رَفْعِيْ -তে পতিত হয়েছে।

عَلٰى صُوْرَةِ الْبَسْطِ الْيَقُ : এটা مُتَعَلِّقٌ হয়েছে اِيْرَادٌ মাসদারের সাথে। صُوْرَةُ الْبَسْطِ অর্থ– বিস্তারিতভাবে। এখানে বিস্তারণ এভাবে ঘটেছে যে, হাফিজ ইবনে হাজার (র.) মতনকে শরাহ্ -এর সাথে এমনভাবে মিলিয়েছেন যে, এখন দুকিতাব মিলে এক কিতাবে পরিণত হয়েছে। ফলে সঙ্গত কারণেই কিতাবের পরিসর লম্বা ও দীর্ঘ হয়েছে। লেখক এ দীর্ঘ পরিসরকেই صُوْرَةُ الْبَسْطِ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। আর এটাকে তিনি اَلْيَقُ বা অধিক উপযোগী এ কারণে বলেছেন যে, শুধু মতন মাত্র কায়েক পৃষ্ঠায় হওয়ায় তা গ্রন্থরূপ লাভে সমর্থ ছিল না। আবার তা অধিক সংক্ষেপ হেতু তার থেকে উপকৃত হওয়ারও সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল। এর বিপরীতে মতনের সাথে শরাহ যুক্ত হওয়ায় যেমনি তা গ্রন্থরূপ পেয়েছে তেমনি তা থেকে উপকার গ্রহণও সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছে।

وَ دَمْجُهَا ضِمْنَ تَوْضِيْحِهَا اَوْفَقُ : دَمْجٌ -এর অর্থ مَزْجٌ তথা মেশানো, دَخَلَ তথা দাখিল করা ইত্যাদি। 'هَا' যমীর ফিরেছে نخبة -এর দিকে। ضِمْنَ অর্থ– অধীনে, অভ্যন্তরে। تَوْضِيْحِهَا -এর অর্থ– নুখবার ব্যাখ্যা।

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) নুখবাকে তার শরাহ -এর অধীনে এমনভাবে ঢুকিয়েছেন তথা মতনকে শরাহ -এর সাথে এমনভাবে গুলিয়ে দিয়েছেন যে, এখন কোনো একটি শব্দে শুধু মতনের দিকে খেয়াল করলে এক ধরনের اِعْرَابْ হয় আর শরাহ-এর সাথে মিলিয়ে পড়লে আরেক রকেমের اِعْرَابْ হয়। শুধুমাত্র মতনের দিকে তাকালে ضَمِيْر ফিরে এক দিকে, আর শরাহ -এর সাথে মিলিয়ে খেয়াল করলে ضَمِيْر ফিরে আরেক দিকে। এ ধরনের নজির বহু রয়েছে।

ইবনে হাজার (র.) نُخْبَةٌ -কে তার শরাহ এর অধীন চলে যাওয়াকে اَوْفَقُ বা অধিক সমীচীন এ জন্য বলেছেন যে, এতে কিতাবের দুর্বোধ্যতা হ্রাস পেয়েছে এবং কিতাবের অর্থ একটি স্বাভাবিক গতি পেয়েছে, যা এর পূর্বে অবর্তমান ছিল। دَمْجُهَا -এর عَطْف হয়েছে اِيْرَادُهُ -এর উপর।

فَسَلَكْتُ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةَ الْقَلِيْلَةَ السَّالِكِ : سَلَكَ يَسْلُكُ অর্থ চলা, পথ ধরা। তবে এখানে অর্থ অবলম্বন করা। اَلْقَلِيْلَةَ শব্দটি صِيْغَهْ صِفَتْ -এর অর্থ– কম। اَلسَّالِكُ অর্থ– পথিক।

আলোচ্য অংশটুকুর তারকীব দুভাবে হতে পারে। যথা–

১. سَلَكْتُ টা فِعْل - فَاعِلْ, هٰذِهِ টা اِسْمِ اِشَارَهْ। اَلطَّرِيْقَةُ শব্দটি مَوْصُوْف। اَلْقَلِيْلَةَ শব্দটি مُضَافْ ও السَّالِكُ শব্দটি مُضَافْ اِلَيْهِ ; مُضَافْ আর مُضَافْ اِلَيْهِ মিলে اِسْمِ اِشَارَهْ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ। অতঃপর سَلَكْتُ -এর مَفْعُوْلْ।

অবশ্য এ সময় একটি মৃদু প্রশ্ন হতে পারে যে, এ তারকীবে اَلْقَلِيْلَةُ শব্দকে مُضَافْ বলা হয়েছে অথচ مُضَافْ -এর শুরুতে اَلِفْ لَامْ হয় না। এর উত্তর হলো, مُضَافْ -এর শুরুতে اَلِفْ لَامْ হওয়া নিষিদ্ধ হলো اِضَافَتْ مَعْنَوِيْ -এর মধ্যে– اِضَافَتْ لَفْظِيَّهْ -এর মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। যেমন বলা হয়– اَلْحَسَنُ

اَلْوَجْهُ । যেহেতু اَلْقَلِيْلَةُ শব্দটি صِفَتْ مُشَبَّهْ হওয়ায় صِيْغَهْ صِفَتْ হয়েছে আর اَلسَّالِكُ হলো তার مَعْمُوْل, তাই এটা اِضَافَتْ হয়েছে।

২. এ সুরতে পার্থক্য শুধু এক স্থানে। তা হলো, اَلْقَلِيْلَةُ হবে صِيْغَهْ صِفَتْ আর اَلسَّالِكُ হবে তার فَاعِلْ - صِيْغَهْ صِفَتْ ও তার فَاعِلْ মিলে شِبْهُ جُمْلَهْ হয়ে اَلطَّرِيْقَةُ -এর صِفَتْ হবে। অবশ্য এ সুরতে একটি জোরদার প্রশ্ন হয় যে, এখানে فِعْل ও فَاعِلْ-এর মধ্যে تَطَابُقْ নেই অর্থাৎ فِعْل টি مُؤَنَّثْ আর فَاعِلْ হলো مُذَكَّرْ। এজন্য এ দ্বিতীয় সুরত হতে প্রথম সুরতটিই বেশি উত্তম। কেননা, প্রথম সুরতে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হয় না। তবে স্মরণযোগ্য যে, اَلسَّالِكُ শব্দের ك বর্ণে فَاعِلْ হিসেবে পেশ হোক কিংবা مُضَافْ اِلَيْهِ হিসেবে যের হোক উভয় সুরতে অর্থ একই হবে। আর তা হলো, আমি সে পথ অবলম্বন করলাম যার **পথিক কম**। هٰذِهِ الطَّرِيْقَةُ তথা সে পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো دَمْجُهَا ضِمْن تَوْضِيْحِهَا অর্থাৎ **নুখবার শারাহ** -এর মধ্যে নুখবাকে মিলিয়ে দেওয়া। আর এ পথের পথিক কম এ হিসেবে যে, **সাধারণত কোনো কিছুর** শরাহ করা হয় মতনকে ভিন্ন রেখে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার (র.) **হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি মতনকে শরাহ**-এর মধ্যে একীভূত করে দিয়ে শরাহ করেছেন। আর এ **কম হওয়াটা** مُطْلَقْ **ভাবেও হতে পারে, অথবা** তার এলাকার বিচারেও হতে পারে অথবা মুহাদ্দিসীনে **কেরামের রচনার বিচারেও হতে পারে।**

فَاَقُوْلُ : এটা উহ্য شَرْط -এর جَزَاءْ। **এজন্য শুরুতে** فَاءْ **বর্ণ** এসেছে। আসল ইবারত হলো এরূপ— اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ فَاَقُوْلُ অর্থাৎ বিষয়টি **যখন এরূপ তখন** আমি বলছি ...।

طَالِبًا مِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيْقَ : طَالِبًا **শব্দটি** حَالْ **হয়েছে** اَقُوْلُ -এর যমীর থেকে। مِنَ اللّٰهِ এটা طَالِبًا -এর সাথেও مُتَعَلِّقْ হতে পারে আবার اَلتَّوْفِيْقْ -এর সাথেও مُتَعَلِّقْ হতে পারে। তবে اَلتَّوْفِيْقْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ মেনে নেওয়াটা উত্তম। **কেননা**, এ সুরতে حَصْر -এর ফায়দা মিলে। অর্থাৎ আল্লাহর থেকেই তৌফিক চেয়ে।

فِيْمَا هُنَالِكَ : এটা مُتَعَلِّقْ হয়েছে اَلتَّوْفِيْق -এর সাথে। তবে এটা দ্বিতীয় مُتَعَلِّقْ - فِيْمَا هُنَالِكَ -এর অর্থ হলো— فِىْ بَيَانِ مَا فِى الْمَتْنِ মতনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে।

هُنَالِكَ এটা اِسْمِ اِشَارَهْ بَعِيْد। এর مُشَارٌ اِلَيْهِ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে।

১. مَتَنْ অর্থাৎ نُخْبَة। অবশ্য এ সময় প্রশ্ন হয় যে, যদি هُنَالِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ টা মতন হয়, তাহলে তা তো নিকটবর্তী দূরবর্তী নয়, তবে اِسْمُ اِشَارَهْ بَعِيْد ব্যবহার করা হলো কেন ? এর উত্তর তিনটি হতে পারে। যথা—

ক. لِرِعَايَةِ السَّجْعِ তথা গদ্যের পূর্বাপরের সাথে মিল ও শ্রুতিমাধুর্যের স্বার্থে।

খ. এদিকে ইঙ্গিত করতে যে, শরাহ -এর রচনাকাল মতনের রচনাকাল থেকে অনেক পরে।

গ. অথবা, এটা বুঝাতে যে, মতনের মানমর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে ও উচ্চাঙ্গের।

২. هُنَالِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হবে মতন এবং শরাহ-এর সমষ্টি। যেহেতু ইবনে হাজার (র.) মতনকে **শরাহ** -এর মাঝে একীভূত করে দিয়েছেন এবং দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে পৃথক করার উপায় নেই, তাই এ **দৃষ্টিকোণ** থেকে এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বলে মনে হয়।

اَلْخَبَرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ هٰذَا الْفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيْثِ ، وَقِيْلَ الْحَدِيْثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ، وَالْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهٖ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيْخِ وَمَا شَاكَلَهَا الْاَخْبَارِيُّ ، وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّثُ ، وَقِيْلَ بَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا ، فَكُلُّ حَدِيْثٍ خَبَرٌ ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ ، وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ لِيَكُوْنَ اَشْمَلَ ـ

অনুবাদ : এ (উসূলুল হাদীস) শাস্ত্রের ওলামায়ে কেরামের মতে 'খবর' হলো হাদীসের সমার্থবোধক। কারো মতে 'হাদীস' হলো, যা নবী করীম ﷺ থেকে এসেছে অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কিত বিষয় আর 'খবর' হলো, যা অন্যদের থেকে এসেছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্যদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। বস্তুত এ কারণে ইতিহাস ও এ জাতীয় বিষয় চর্চাকারীকে 'আখবারী' (ঐতিহাসিক) আর সুন্নতে নববী তথা হাদীস চর্চাকারীকে বলা হয় 'মুহাদ্দিস'।

আবার কারো মতে হাদীস ও খবরের মধ্যে عُمُوْمٌ خُصُوْصٌ مُطْلَقٌ তথা 'সাধারণ বিশেষ' সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকটি হাদীস খবর, কিন্তু এর বিপরীত নয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি খবর হাদীস নয়। 'হাদীস' শব্দ অপেক্ষা 'খবর' যেহেতু অধিক সমন্বয়কারী, সেহেতু মতনে 'খবর' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নুখবা– শরহে নুখবা -এর পটভূমি তুলে ধরার পর সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার (র.) ঈপ্সিত শাস্ত্রীয় আলোচনার অবতারণা করেছেন। এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হলো, খবরে ওয়াহেদ মাকবূল, খবরে ওয়াহেদ মারদূদ এবং এতদুভয় সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ও পরিভাষা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপহার দেওয়া। গ্রন্থটির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ঈপ্সিত বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক আলোচনা। তবে প্রয়োজনের বিচারে মাঝে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

وَالْخَبَرُ ... اَلْحَدِيْثُ : বিজ্ঞ লেখক খবরকে হাদীসের সমার্থবোধক বলেছেন। অথচ ইত:পূর্বে তিনি হাদীসের পরিচয় তুলে ধরেননি। লেখকের পক্ষ হতে কেউ কেউ এর কারণ এটা উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসের অর্থ ও পরিচয় সুবিদিত ও প্রকাশ্য জ্ঞান করায় লেখক এমনটি করেছেন।

اَلْخَبَرُ-এর সংজ্ঞা ও পরিচয় : اَلْخَبَرُ শব্দটির আরবি সঠিক উচ্চারণ খাবার। অর্থাৎ 'বা' অক্ষরে যবর হবে। কেননা, 'বা' অক্ষরে সাকিন দিলে (اَلْخَبْرُ) তখন তার অর্থ হয় বড় পাত্র, পাহাড়ে পানি জমা হওয়ার স্থান ইত্যাদি।

اَلْخَبَرُ শব্দটি اِسْمٌ এবং একবচন। বহুবচন হলো اِخْبَارٌ; এর আভিধানিক অর্থ– সংবাদ, খবর, বার্তা, তত্ত্ব, সন্ধান ইত্যাদি। পরিভাষায় 'খবার' কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(١) اَلْخَبَرُ : مَا يُنْقَلُ وَيُحَدَّثُ بِهٖ قَوْلًا اَوْ كِتَابَةً ـ

১. মৌখিক বা লিখিতভাবে যা বর্ণিত ও প্রকাশিত হয়।

(٢) اَلْخَبَرُ: قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ لِذَاتِهٖ ـ

২. সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনাময় উক্তি।

(٣) وَالْخَبَرُ : مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৩. নবী করীম ﷺ ব্যতিরেকে অন্যদের সম্পর্কিত তথ্য ও বর্ণনা।

اَلْخَبَرُ -এর প্রকারভেদ ও হুকুম : খবর মোট তিন প্রকার। যথা–

১. যার সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত। যেমন– দুনিয়াতে মক্কা এবং মদীনা থাকার সংবাদ ইত্যাদি।

২. যার মিথ্যা ও অসত্য হওয়া নিশ্চিত। যেমন– শুক্রবারকে শনিবার বলে সংবাদ দেওয়া, পৃথিবীতে আমেরিকা নামে কোনো দেশ নেই বলে খবর দেওয়া ইত্যাদি।

৩. যার সত্যটাও স্পষ্ট নয় আবার মিথ্যাটাও নিশ্চিত নয়। এমন খবরের স্বপক্ষে সত্য-মিথ্যার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে তার উপর কোনো হুকুম আরোপ করা সম্ভব নয়। তাই এমন খবরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে দলিল না পাওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খবরকে যে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে উসূলুল হাদীসশাস্ত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে এই তৃতীয় প্রকার খবর। অর্থাৎ মূলত তৃতীয় প্রকার খবর নিয়েই উসূলুল হাদীসের যত আলোচনা। বাকি দু প্রকারের আলোচনা হয় প্রাসঙ্গিকভাবে।

খবরের এ তৃতীয় প্রকারটি আবার তিন প্রকার। যথা–

এক. গৃহীত (مَقْبُوْلٌ)। অর্থাৎ তার মধ্যে সত্যতার গুণাবলি ও শর্ত পাওয়া যায়।

দুই. প্রত্যাখ্যাত (مَرْدُوْدٌ)। অর্থাৎ যদি তার মধ্যে সত্যতার শর্ত না মিলে কিংবা প্রত্যাখ্যানের কোনো কারণ পাওয়া যায়।

তিন. স্থগিত (مَوْقُوْفٌ)। অর্থাৎ যদি তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার দিক না পাওয়া যায় এবং প্রত্যাখানেরও সুস্পষ্ট দিক প্রমাণিত না হয়, তবে এ অবস্থায় খবরটি যখন স্থগিত তখন তা দ্বিতীয় প্রকারের মতোই হয়ে গেল।

عُلَمَاءُ هٰذَا الْفَنِّ : এ ফন বা শাস্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য উসূলুল হাদীস। আর ওলামায়ে কেরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কেরাম। উসূলুল হাদীসের বিস্তারিত সংজ্ঞা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مُرَادِفٌ : শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَةٌ হতে اِسْمُ فَاعِلٌ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرٌ। এর অর্থ– পশ্চাতে আরোহণকারী। একই বাহনে একজনের পিছনে আরেকজন আরোহণ করলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় প্রথম ব্যক্তির মুরাদিফ। তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো, সমার্থবোধক।

لِلْحَدِيْثِ : হাদীসের দুভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যথা– ১. আভিধানিক ও ২. পারিভাষিক। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. হাদীসের আভিধানিক অর্থ : حَدِيْثٌ শব্দটি فَعِيْلٌ -এর ওযনে সিফাতের সীগাহ। এটা حُدُوْثٌ মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন এবং তা قَدِيْمٌ -এর বিপরীত। অভিধানে حَدِيْثٌ শব্দের অর্থ অনেক। যথা–

১. كَلَامٌ অর্থ– কথা, বাণী। যেমন– وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا অর্থাৎ আল্লাহর থেকে কথায় অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?

২. اَلنَّبَأُ অর্থ– বার্তা, সংবাদ। যেমন– هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ অর্থাৎ আপনার কাছে কি সে সেনাবাহিনীর সংবাদ পৌছেছে অর্থাৎ ফিরআউনের ও ছামূদের?

৩. اَلْقِصَّةُ অর্থ– কাহিনী, ঘটনা। যেমন– هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ অর্থাৎ আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌছেছে ?

৪. اَلْجَدِيْدُ অর্থ– নতুন। যেমন বলা হয়– هٰذَا اَمْرٌ حَدِيْثٌ অর্থাৎ এটা নতুন বিষয়।

৫. اَلنَّصِيْحَةُ অর্থ– উপদেশ। যেমন– وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ অর্থাৎ আমি তাদেরকে উপদেশস্বরূপ করেছি।

৬. قَلِيْلُ السِّنِّ অর্থ– অল্প বয়স্ক। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ حَدِيْثُ السِّنِّ অর্থাৎ অমুকের বয়স কম।

৭. اَلرُّؤْيَا অর্থ- স্বপ্ন। যেমন- وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ অর্থাৎ আপনি আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন।

حَدِيْث শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَحَادِيْث।

২. হাদীসের পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসীনে কেরামসহ অন্যান্য ওলামাগণের মহলে حَدِيْث শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যথা-

(١) اَلْحَدِيْثُ : هُوَ اَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَفْعَالُهُ، وَسَهْوُهُ، وَتَقَارِيْرُهُ، وَتُرُوْكُهُ، وَمَا هَمَّ بِهِ فَفَعَلَهُ اَوْلَمْ يَفْعَلْهُ، وَاَحْوَالُهُ، وَشَمَائِلُهُ، وَصِفَاتُهُ الْخَلْقِيَّةُ وَالْخُلُقِيَّةُ حَتَّى الْحَرَكَاتِ، وَالسَّكَنَاتِ فِى الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ، سَوَاءٌ اكَانَ كُلُّ ذٰلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ اَوْ بَعْدَهَا -

১. হাদীস হলো নবী করীম ﷺ -এর উক্তি, কর্ম, ভ্রান্তি, অনুমোদন, বর্জন, ইচ্ছা চাই তা বাস্তবে করেন অথবা না করেন, অবস্থা, জীবনচরিত, সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণাবলি, এমনকি জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি। চাই এগুলো নবুয়ত লাভের পূর্বে হোক অথবা পরে হোক।

(٢) اَلْحَدِيْثُ : مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ، اَوْ تَرْكٍ، اَوْ هَمٍّ، اَوْ سِيْرَةٍ ، اَوْحَالَةٍ، اَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ اَوْ خُلُقِيَّةٍ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ اَوْ بَعْدَهَا -

২. হাদীস হলো, নবী করীম ﷺ -এর প্রতি সম্বন্ধিত উক্তি, কর্ম, অনুমোদন, বর্জন, ইচ্ছা, জীবনী, অবস্থা, সৃষ্টিগত বা চরিত্রগত গুণ। চাই তা নবুয়তের পূর্বের হোক অথবা পরের হোক।

(٣) اَلْحَدِيْثُ : اَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاَفْعَالُهُ، وَتُرُوْكُهُ ، وَتَقَارِيْرُهُ، وَمَا هَمَّ بِهِ ، وَاَحْوَالُهُ، وَشَمَائِلُهُ، وَسَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِشُؤُوْنِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ بِعْثَتِهِ، مِمَّا يُطْلَبُ فِيْهِ التَّاسِّىْ ، اَوْ يُمْكِنُ اَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حُكْمٌ شَرْعِىٌّ -

৩. হাদীস হলো নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত পরবর্তী ঐ সকল উক্তি, কর্ম, বর্জন, অনুমোদন, ইচ্ছা, অবস্থা, চরিত এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত গঠন কিংবা তা হতে শরয়ী হুকুম নির্ণয়ের সম্ভাবনা রাখে।

(٤) قَالَ السَّخَاوِىْ فِىْ فَتْحِ الْمُغِيْثِ ١ : ٣٩ : وَكَذَا اٰثَارُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ وَفَتَاوِيْهِمْ، مِمَّا كَانَ السَّلَفُ يُطْلِقُوْنَ عَلٰى كُلٍّ حَدِيْثًا -

৪. ফাতহুল মুগীছ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় ইমাম সাখাবী (র.) লেখেন- সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন প্রমুখের উক্তি, কর্ম, অনুমোদন ইত্যাদির উপরও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম 'হাদীস' শব্দ ব্যবহার করতেন।

(٥) قَالَ الْفَقِيْهُ نَجْمُ الدِّيْنِ الْقَمُوْلِىُّ : قَدْ كَانَ السَّلَفُ يُطْلِقُوْنَ الْحَدِيْثَ عَلَى الطُّرُقِ وَالْاَسَانِيْدِ وَاٰثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ -

৫. ফকীহ নাজমুদ্দীন (র.) বলেন, পূর্বসূরি মহান ওলামায়ে কেরাম 'হাদীস' শব্দটি হাদীসের সনদের অর্থেও ব্যবহার করতেন এবং সাহাবা, তাবেঈন প্রমুখের উক্তি কর্মের উপরেও। যেমন বলা হয়- طَرِيْقُ فُلَانٍ لِلْحَدِيْثِ الْمَبْحُوْثِ عَنْهُ اَصَحُّ مِنْ طَرِيْقِهِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, حَدِيْثُ فُلَانٍ اَصَحُّ الْاٰخَرِ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির আলোচ্য সনদ বা সূত্রটি তার অন্য সনদ অপেক্ষা সহীহ।

পাঁচ অর্থের মধ্যেকার প্রভেদ : চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তা খুবই সুস্পষ্ট, ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু প্রথম তিন অর্থের মধ্যেকার ব্যবধান যেমনি সূক্ষ্ম তেমনি বুঝারও বটে। তাই সেগুলোর পার্থক্য বা ভিন্নতা নিম্নে সবিস্তারে তুলে ধরা হলো-

হাদীসের উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে মাত্র একটি দিক থেকে। তা হলো, দ্বিতীয় অর্থের দাবি অনুযায়ী 'হাদীস' শব্দ ঐ সকল বিষয় শামিল করে যা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি

সম্বন্ধযুক্ত। চাই এ সম্বন্ধ বাস্তবতার বিচারে সঠিক হোক বা ভ্রান্ত হোক। পক্ষান্তরে হাদীসের প্রথম অর্থটি এর বিপরীত। কেননা, প্রথম অর্থ অনুযায়ী হাদীস কেবল সেটাই হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যার সম্বন্ধ বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। অর্থাৎ প্রথম অর্থ অনুযায়ী 'হাদীস' হতে হলে শুধু নবী করীম ﷺ -এর প্রতি সম্বন্ধকৃত হলেই হবে না, বরং এ সম্বন্ধ নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে।

এ ব্যাখ্যা অনুপাতে উসূলুল হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত ভাষ্য :

اَلْحَدِيْثُ يَنْقَسِمُ اِلٰى صَحِيْحٍ ، وَحَسَنٍ ، وَضَعِيْفٍ ، و.... ، وَمَوْضُوْعٍ -এর মধ্যের "**اَلْحَدِيْثُ**" শব্দটি হাদীসের আলোচিত দ্বিতীয় অর্থেই প্রযোজ্য ও ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে আমরা **كُتُبُ الْحَدِيْثِ** বা হাদীসের কিতাব যা বলি এখানেও **اَلْحَدِيْثُ** শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি–

(١) مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ۔

(٢) اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ۔

এসব রেওয়ায়েতের মধ্যস্থ **اَلْحَدِيْثُ** শব্দটি হাদীসের দ্বিতীয় অর্থে প্রযোজ্য ও ব্যবহৃত।

এর বিপরীতে নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসগুলো–

(١) نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهٗ حَتّٰى يُبَلِّغَهٗ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ۔

(٢) حَدِّثُوْا عَنِّىْ وَلَا حَرَجَ۔

(٣) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِىْ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَنْ هُمْ خُلَفَائُكَ ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ يَرْوُوْنَ اَحَادِيْثِىْ يُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ۔

(٤) مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا، وَكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا۔

এর মধ্যেকার **اَلْحَدِيْثُ** শব্দটি হাদীসের প্রথম অর্থে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যার সম্বন্ধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

এ ব্যাখ্যা হতে জানা গেল যে, হাদীসের পরিচয় হিসেবে প্রথম সংজ্ঞাটি উল্লেখ করে পুনরায় তাকে 'সহীহ', 'হাসান', 'যা'ঈফ' ইত্যাদি প্রকারে ভাগ করা যাবে না। এমন করলে সুস্পষ্ট ভুল হবে। কেননা, হাদীসের প্রথম অর্থ হিসেবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, যার সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এ কথা স্বীকার করে পরক্ষণেই যদি এমন হাদীসকে সহীহ, যা'ঈফ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিছু উক্তি সহীহ, আর কিছু উক্তি যা'ঈফ। অথচ বাস্তব কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি উক্তিও যা'ঈফ বা দুর্বল হতে পারে না। প্রত্যেকটিই দিবালোকের ন্যায় সত্য ও অভ্রান্ত।

এ আলোচনা হতে এটা বুঝার অবকাশ নেই যে, সহীহ, হাসান, যা'ঈফ ইত্যাদি ভাগে হাদীসকে আর ভাগ করা যাবে না কিংবা এমন প্রকরণ ঠিক নয়। বরং সঠিক তথ্য হলো, হাদীসের দ্বিতীয় যে অর্থ করা হয়েছে অর্থাৎ ..... **مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ** – সেই অর্থ অনুযায়ী হাদীসের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যদি রাসূলের প্রতি সম্বন্ধটা সন্দেহাতীতভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা 'সহীহ' হবে। আর যদি সম্বন্ধটা মৌলিকভাবে প্রমাণিত হলেও কিছুটা দুর্বলতা রয়ে যায়, তখন সেটা হাসান হবে। এর বিপরীতে রাসূলের প্রতি সম্বন্ধটা যদি নিতান্তই দুর্বল সূত্রে হয় এবং তা প্রমাণের স্তর কোনোভাবেই অতিক্রম না করে, তখন তা যা'ঈফ হবে। অবশ্য যা'ঈফেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সব যা'ঈফ একই মানের নয়। পূর্বে হাদীসের যে তৃতীয় অর্থ লেখা হয়েছে মুহাদ্দিসীনসহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম **اَلْحَدِيْثُ** শব্দটি সে অর্থেই বেশির ভাগ ব্যবহার করেন। এ সময় **اَلْحَدِيْثُ** শব্দটি ঐ **اَلسُّنَّةُ** -এর অর্থ দেয় যা শরিয়তের দ্বিতীয় দলিল এবং ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস।

হাদীসের এই তৃতীয় অর্থ ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে প্রভেদ দু দিক থেকে হয়। যথা–

১. তৃতীয় অর্থে হাদীস তখনই হয় যখন তার সম্বন্ধ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে হাদীস হতে কেবল ন্যূনতম সম্বন্ধই যথেষ্ট।

২. তৃতীয় অর্থে হাদীস হতে হলে তা যেমনি নবুয়ত পরবর্তী হতে হবে, তেমনি তার সাথে শরিয়ত গঠন কিংবা তা শরয়ী হুকুমের উৎস হতে হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে হাদীসের মধ্যে এমন কোনো শর্ত নেই। হাদীসের তৃতীয় ও প্রথম অর্থের মধ্যে ঠিক এ দ্বিতীয় প্রভেদটি বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি– نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا .... এর মধ্যে ব্যবহৃত اَلْحَدِيْثُ শব্দটি হাদীসের তৃতীয় অর্থেও ব্যবহৃত।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সবক ও শিক্ষা রয়েছে। আর তা হলো, اَلْحَدِيْثُ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিভিন্ন অর্থ থাকায় কুরআন-হাদীসসহ যে কোনো গ্রন্থের (যেমন– উসূলুল হাদীসের কিতাবাদি ইত্যাদি) اَلْحَدِيْثُ শব্দের ঢালাওভাবে একই অর্থ করা যাবে না। চিন্তাভাবনা করে সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য নিরূপণ না করে মনগড়া যে কোনো অর্থ করা ঠিক হবে না। পূর্বে উল্লিখিত হাদীসগুলো এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

اَلْحَدِيْثُ শব্দের উল্লিখিত বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে–

১. ফাতহুল বারী ১৩ : ২৫২-২৫৩, ২. তাওযীহুন নযর ইলা উসূলিল আছর ১ : ৩৭, ৩. লামহাতু মিন তারীখিস সুন্নতি ওয়া উলূমিল হাদীস– ১১-১৬।

খবর ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্য :

সম্মানিত লেখক 'খবর' -এর প্রকরণ উল্লেখের পূর্বে খবর ও হাদীসের ব্যাখ্যা এবং তন্মধ্যকার পার্থক্য ও পরস্পর সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তিনি এ পর্যায়ে তিনটি উক্তি তুলে ধরেছেন। যথা–

১. اَلْخَبَرُ ও اَلْحَدِيْثُ -এর মধ্যে تَسَاوِىْ বা تَرَادُفْ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ উভয়টা একই; তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম এবং অনুমোদনকে যেমনি 'খবর' বলে তেমনি 'হাদীস'ও বলে। এটাই হলো অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত।

২. কারো কারো মতে, খবর ও হাদীস-এর মধ্যে تَبَايُنْ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা বর্ণিত তাকে হাদীস বলে আর তিনি ব্যতীত অন্যদের থেকে যা বর্ণিত তাকে খবর বলে। এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যারা ইতিহাস, কাহিনী ইত্যাদি চর্চা করে তাদেরকে আখবারী বা ঐতিহাসিক বলে, আর যারা হাদীস নিয়ে গবেষণা ও তার চর্চা করে তাদেরকে মুহাদ্দিস বলা হয়।

৩. কারো কারো মতে 'খবর' ও 'হাদীস' -এর মধ্যে عُمُوْمْ خُصُوْص مُطْلَقْ -এর সম্পর্ক। হাদীস খাস আর খবর আম। অর্থাৎ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে খাস আর খবর রাসূলসহ অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এ সংজ্ঞা অনুপাতে প্রত্যেক হাদীস খবরও, কিন্তু প্রত্যেক খবর হাদীস নয়।*

اَلْحَدِيْثُ -এর সমার্থবোধক আরেকটি শব্দ হলো اَلْاَثَرُ। কেউ কেউ বলেছেন, اَلْاَثَرُ টি اَلْحَدِيْثُ -এর مُرَادِفْ বা সমার্থবোধক। আবার কারো কারো অভিমত, সাহাবী এবং তাবেঈ-এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদনকে কেবল اَثَر বলে। অর্থাৎ তাদের মতে اَلْحَدِيْثُ যেমন রাসূলের সাথে খাস তেমনি اَلْاَثَر শব্দটি সাহাবী ও তাবেঈনদের সাথে খাস।

بِالتَّوَارِيْخِ : এটা تَارِيْخٌ -এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো– اَلتَّوْقِيْتُ বা সময় নির্ণয় করা। পরিভাষায় تَارِيْخٌ বলা হয়–

---

* অবশ্য কেউ কেউ এ কথাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, এমনটি হওয়া জরুরি নয়; বরং এর বিপরীতও হতে পারে। কেননা, অনেক হাদীস খবর না হয়ে اِنْشَاءٌ হয়, ফলে তখন তা আর খবর হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খবর ও হাদীসের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক সাবেত হয়। তা হলো, نِسْبَةُ عُمُوْمٍ وَخُصُوْصٍ مِنْ وَجْهٍ।

هُوَ عِلْمٌ يُضْبَطُ بِهٖ اَوْقَاتُ الْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ، كَجُلُوْسِ السَّلَاطِيْنِ عَلَى السَّرِيْرِ، وَاسْتِيْلَائِهِمْ عَلَى الْبِلَادِ، وَ وُقُوْعِ الْقَحْطِ وَالطَّاعُوْنِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى .

অর্থাৎ যে বিদ্যা বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সময় ও কাল জানায়, তাকে বলে তারীখ বা ইতিহাস। যেমন– রাজা-বাদশাদের সিংহাসন আরোহণের সময়-ক্ষণ, রাজ্যজয়, দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির মতো অসংখ্য বিষয় কোন দেশে কখন হয়েছিল।

اَلْاَخْبَارِىُّ : এর আভিধানিক অর্থ– যারা সংবাদ আদান-প্রদানের পেশায় নিয়োজিত। তবে শব্দটি مُؤَرِّخٌ তথা ঐতিহাসিক-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, তারাও মূলত অতীতের সংবাদ পরিবেশন করেন।

اَلْمُحَدِّثُ : এখানে শব্দটি حَدِيْثٌ مَرْفُوْعٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হলেও মূলত শব্দটি এর সাথেই খাস নয়; বরং সাহাবী ও তাবেঈ -এর রেওয়ায়েতও যারা বর্ণনা করেন কিংবা তার চর্চা করেন, তাদেরকেও মুহাদ্দিস বলা হয়। এখানে تَغْلِيْبٌ বা আধিক্যের দিক বিবেচনায় বলা হয়েছে মাত্র।

فَكُلُّ حَدِيْثٍ : এখানে فَاءٌ টি تَفْصِيْلِيَّةٌ ও হতে পারে আবার تَعْلِيْلٌ তথা কারণ দর্শানের জন্যও হতে পারে। আর তা হলো এই যে, খবর ও হাদীসের মধ্যে عَامٌ – خَاصٌ -এর সম্পর্কের কারণ হলো, প্রত্যেক হাদীস খবর হয় কিন্তু এর বিপরীত হয় না তথা প্রত্যেক খবর হাদীস হয় না।

وَعَبَّرَ هُنَا : عَبَّرَ অর্থ– ব্যক্ত করা, উল্লেখ করা ইত্যাদি। এখানে هُنَا শব্দটি اِسْمُ اِشَارَهْ قَرِيْبٌ -এর অর্থে هُنَا বলতে উদ্দেশ্য মতন। অর্থাৎ اَلْحَدِيْثُ ও اَلْخَبَرُ শব্দদ্বয়ের মধ্য হতে اَلْخَبَرُ শব্দকে মতনে উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَكُوْنَ اَشْمَلَ : اَلْحَدِيْثُ ও اَلْخَبَرُ -এর মধ্য হতে মতনে اَلْخَبَرُ -কে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেহেতু اَلْحَدِيْثُ শব্দের তুলনায় اَلْخَبَرُ শব্দটি عَامٌ বা ব্যাপকার্থবোধক এবং তা সমস্ত আহকামের ক্ষেত্রে اَلْحَدِيْثُ -এর অর্থও শামিলকারী, সেহেতু মতনে اَلْخَبَرُ শব্দটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

اَلْخَبَرُ শব্দটি اَلْحَدِيْثُ -কে শামিল করার ব্যাখ্যা : যেহেতু এদের মধ্যে তিন ধরনের নিসবত বা সম্পর্ক সাবেত করা হয়েছে, তাই তিন দৃষ্টিকোণ থেকে 'শামিল' -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

১. **تَرَادُفٌ -এর অবস্থায়** : যে সুরতে খবর ও হাদীস -এর মধ্যে تَرَادُفٌ -এর সম্পর্ক সে সুরতে اَلْخَبَرُ যে اَلْحَدِيْثُ -কে পূর্ণমাত্রায় শামিলকারী তা যেমনি সুস্পষ্ট, তেমনি ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। কেননা, এ সুরতে খবর ও হাদীস একই বিষয়।

২. **تَبَايُنٌ -এর অবস্থায়** : এ সুরতে اَلْخَبَرُ শব্দটি اَلْحَدِيْثُ -কে এভাবে শামিল রাখে যে, খবর তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গায়েবের খবরের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন শর্তসমূহ অবলম্বন করতে হয়, তাহলে এ সকল শর্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবলম্বিত হবে।

৩. **عَامٌ خَاصٌ مُطْلَقٌ -এর অবস্থায়** : এ সুরতে খবরটা যেহেতু আম এবং হাদীসটি খাস আর কায়দা আছে যে– مَا ثَبَتَ لِلْاَعَمِّ ثَبَتَ لِلْاَخَصِّ অর্থাৎ কোনো বিষয় عَامٌ -এর জন্য সাবেত হলে তা এমনিই خَاصٌ -এর জন্য সাবেত হয়, সেহেতু اَلْحَدِيْثُ -কে اَلْخَبَرُ -এর শামিল করাটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُوْلِهِ إِلَيْنَا إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ طُرُقٌ أَىْ أَسَانِيْدُ كَثِيْرَةٌ ، لِأَنَّ طُرُقًا جَمْعُ طَرِيْقٍ ، وَفَعِيْلٌ فِى الْكَثْرَةِ يُجْمَعُ عَلٰى فُعُلٍ بِضُمَّتَيْنِ ، وَفِى الْقِلَّةِ عَلٰى أَفْعِلَةٍ ، وَالْمُرَادُ بِالطُّرُقِ الْأَسَانِيْدُ، وَالْإِسْنَادُ حِكَايَةُ طَرِيْقِ الْمَتْنِ ، وَالْمَتْنُ هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِىْ إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ .

অনুবাদ : খবর আমাদের পর্যন্ত হয়তো তুরুক তথা অনেক সনদে পৌঁছবে। **(অনেক সনদ বলার** কারণ হলো,) কেননা, طُرُقٌ শব্দটি طَرِيْقٌ -এর বহুবচন। আর فَعِيْلٌ -এর ওযনে আগত **শব্দটির** جَمْع كَثْرَةٌ হয় فِعْلٌ -এর ওযনে এবং جَمْع قِلَّةٌ হয় أَفْعِلَةٌ -এর ওযনে।

অবশ্য এখানে طُرُقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সনদ তথা সূত্র। 'সনদ' হলো মতন বা মূলভাষ্যের সূত্র বর্ণনা **অর্থাৎ** হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করা। সনদ যে বক্তব্যে গিয়ে শেষ হয় অর্থাৎ **রাবীদের** নামের (সনদের) শেষে যে বক্তব্য আসে তাকে 'মতন' বা মূলভাষ্য বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلسَّنَدُ -এর অর্থ : দু'ভাবে এর অর্থ বর্ণনা করা যায়। যথা–

১. আভিধানিক অর্থ : অভিধানে শব্দটি তিনভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা–

প্রথম : اَلسَّنَدُ একবচন। এর বহুবচন سَنَدَاتٌ অর্থ– ১. সনদ, ২. স্বীকৃতিপত্র, ৩. প্রতিশ্রুতিপত্র, ৪. প্রমাণপত্র, ৫. দস্তাবিজ, ৬. আইনানুগ কাগজ, ৭. রশিদ (মেমো)।

দ্বিতীয় : اَلسَّنَدُ একবচন। এর বহুবচন إِسْنَادٌ অর্থ– ১. ঠেকনা, ২. ঠেস, ৩. অবলম্বন, ৪. ভরসার স্থল, ৫. নির্ভরতার ক্ষেত্র ইত্যাদি।

তৃতীয় : اَلسَّنَدُ একবচন। এর বহুবচন أَسَانِيْد অর্থ– ১. সনদ, ২. বর্ণনার সূত্র, ৩. বর্ণনাকারীদের পরম্পরা।

২. পারিভাষিক অর্থ : সনদের পারিভাষিক অর্থ হলো– سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوْصِلَةُ إِلَى الْمَتْنِ

অর্থাৎ মতন পর্যন্ত রাবীদের পরস্পর ধারাক্রমকে সনদ বলে।

অন্যকথায়, হাদীসের মূল বক্তব্য শুরু হওয়ার পূর্বে রাবীদের যে নামগুলো থাকে ঐ নামগুলোকে সংক্ষেপে সনদ বলে।

اَلْإِسْنَادُ -এর অর্থ : অভিধানে اَلْإِسْنَادُ শব্দটি وَاحِدٌ বা একবচন। এর جَمْع বা বহুবচন হলো أَسَانِيْد অর্থ– (তর্কবাগীশদের মতে,) উদ্ধৃতি দেওয়া। (নাহুবিদদের মতে,) দু শব্দের মাঝে পূর্ণ অর্থবহ সংযোগ বা সংযোগসাধন।

পরিভাষায় اَلْإِسْنَادُ-এর কয়েকটি অর্থ আছে। যথা–

(١) اَلطَّرِيْقُ الَّذِىْ يَطْلَقُ عَلٰى مَا يُوْصَلُ إِلَى الْمَطْلُوْبِ مُطْلَقًا .

অর্থাৎ ঐ সূত্র পরম্পরা যা সরাসরি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

(٢) حِكَايَةُ طَرِيْقِ الْمَتْنِ أَىْ حِكَايَةُ أَسْمَاءِ رُوَاةِ الْمَتْنِ .

অর্থাৎ মতন তথা হাদীসের রাবীদের নামগুলো উল্লেখ করা।

উল্লেখ্য যে, এখানে أَسَانِيْد শব্দটি إِسْنَادٌ-এর বহুবচন এবং এ অর্থেই ব্যবহৃত।

(٣) عَزْوُ الْحَدِيْثِ إِلَى قَائِلِهِ مُسْنَدًا .

অর্থাৎ সনদে মুত্তাসিলের সাথে তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে قَائِلْ পর্যন্ত (অর্থাৎ যার হাদীস তার পর্যন্ত) হাদীসকে পৌছানো।

(٤) اَلْإِسْنَادُ هُوَ مُرَادِفٌ لِلسَّنَدِ .

ইসনাদ এটা সনদের সমার্থবোধক। অর্থাৎ শব্দগত পার্থক্য হলেও তাদের অর্থ এক ও অভিন্ন।*

إِسْنَادٌ শব্দটি اَلسَّنَدُ -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। যেমন– اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ ইত্যাদি।

اَلْمَتَنُ -এর অর্থ : اَلْمَتَنُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন আসে مُتُوْنٌ ও مِتَانٌ। অর্থ– পিঠ। তবে শব্দটি বিভিন্ন নিসবতে বিভিন্ন অর্থ দেয়। যেমন– مَتَنُ الشَّيْءِ অর্থ– বস্তুর বাইরের অংশ। مَتَنُ الْأَرْضِ অর্থ– ভূপৃষ্ঠের উঁচু ও সমতল অংশ। مَتَنُ الطَّرِيْقِ অর্থ– রাস্তার মধ্যস্থল। مَتَنُ الْكِتَابِ অর্থ– বইয়ের মূল অংশ (টীকা ইত্যাদি ছাড়া)। مَتَنُ اللُّغَةِ অর্থ– ভাষার মৌলিক নিয়ম-কানুন ও একক শব্দসমূহ। তবে جَوَاهِرُ الْأُصُوْلِ গ্রন্থে مَتَنْ -এর অর্থ করা হয়েছে– هِيَ فِي اللُّغَةِ مَا يَتَقَوَّى بِهِ الشَّيْءُ অর্থাৎ অভিধানে মতন হলো যার দ্বারা কোনো কিছু বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়।

পরিভাষায় مَتَنْ -এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যথা– (١) هُوَ اَلْفَاظُ الْحَدِيْثِ الَّتِيْ يَتَقَدَّمُ مِنْهَا السَّنَدُ

অর্থাৎ হাদীসের মূল শব্দসমূহ, যার পূর্বে সনদ থাকে।

(٢) هُوَ اَلْفَاظُ الْحَدِيْثِ الَّتِيْ تَتَقَوَّمُ بِهَا الْمَعَانِيْ .

অর্থাৎ হাদীসের ঐ সকল শব্দ যার দ্বারা অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(٣) هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ الْإِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ .

অর্থাৎ সনদের শেষে যে বক্তব্য আসে তার নাম মতন।

সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, হাদীসের রাবীদেরকে সনদ বলে আর সনদের পরে যে কথা থাকে তাকে মতন বলে। আর এই সনদ-মতন উভয়কে একত্রে হাদীস বা রেওয়ায়েত বলে। আবার কখনো পৃথক পৃথকভাবেও বলা হয়। অর্থাৎ রাবীদেরকে সনদ এবং মতনকে হাদীস বলা হয়।

বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বিচারে খবরের প্রকরণ

"اَلْخَبَرُ إِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لَهُ طُرُقٌ" এখান থেকে সম্মানিত লেখক اَلْخَبَرُ -এর প্রকারসমূহ বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর আলোচনার সারকথা নিম্নরূপ–

রাবীদের সংখ্যার (স্বল্পতা-বৃদ্ধির) দিক দিয়ে কিংবা আমাদের পর্যন্ত পৌছানোর পন্থাগত দিক দিয়ে খবর মৌলিকভাবে দু'প্রকার। যথা– ১. খবরে মুতাওয়াতির এবং ২. খবরে ওয়াহিদ।

খবরে ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার। যথা– ১. মাশহূর, ২. আযীয ও ৩. গরীব।

গরীবের আরেক নাম ফর্দ। এই ফরদ্ আবার দু প্রকার। ১. ফর্দে মুতলাক ও ২. ফর্দে নিসবী।

তাহলে খবর মোট চার প্রকার হলো– ১. মুতাওয়াতির, ২. মাশহূর, ৩. আযীয ও ৪. গরীব।

খবর চার প্রকারে সীমিত হওয়ার কারণ : হয়তো খবরটির রাবীর সংখ্যা অনেক হয়ে অনির্দিষ্ট হবে (অর্থাৎ সীমিত হবে না), অথবা অনেক হয়ে নির্দিষ্ট তথা সীমিত হবে। প্রথম প্রকার হলে খবর মুতাওয়াতির হবে। আর দ্বিতীয় রকম হলে হয়তো রাবীর সংখ্যা সনদের কোনো স্থানে একজন হবে বা দুজন হবে অথবা এর থেকে বেশি হবে। সনদের কোথাও রাবীর সংখ্যা একজন হলে তাকে গরীব বলে, দুজন হলে তাকে আযীয বলে আর দুয়ের বেশি হলে তাকে মাশহূর বলে।

---

* এ আলোচনা প্রমাণ করে যে, اَلْإِسْنَادُ -এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এটা سَنَدٌ -এরই অপর নাম। আর কারো মতে, سَنَدٌ এক জিনিস আর إِسْنَادٌ আরেক জিনিস। আর তা হলো, سَنَدٌ মানে সূত্র তথা রাবী। আর إِسْنَادٌ মানে ঐ সনদ বা রাবীদের উল্লেখ করা। যেমন– এভাবে বলা যে, حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ অর্থাৎ সনদ বা রাবীদের কথা উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনার নাম إِسْنَادٌ। (اَوْجَزُ الْمَسَالِكِ ١ : ١٠٨)

وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ اَحَدُ شُرُوْطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ بَلْ تَكُوْنُ الْعَادَةُ قَدْ اَحَالَتْ تَوَاطُئَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَكَذَا وُقُوْعَهُ مِنْهُمْ اِتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. فَلَا مَعْنٰى لِتَعْيِيْنِ الْعَدَدِ عَلَى الصَّحِيْحِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِى الْاَرْبَعَةِ ، وَقِيْلَ فِى الْخَمْسَةِ ، وَقِيْلَ فِى السَّبْعَةِ ، وَقِيْلَ فِى الْعَشَرَةِ ، وَقِيْلَ فِى الْاِثْنَى عَشَرَ ، وَقِيْلَ فِى الْاَرْبَعِيْنَ ، وَقِيْلَ فِى السَّبْعِيْنَ ، وَقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ ، وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيْلٍ جَاءَ فِيْهِ ذِكْرُ ذٰلِكَ الْعَدَدِ فَاَفَادَ الْعِلْمَ ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ اَنْ يَطَّرِدَ فِىْ غَيْرِهِ لِاِحْتِمَالِ الْاِخْتِصَاصِ.

অনুবাদ : সনদের এ আধিক্যটাই হলো কোনো খবর মুতাওয়াতির হবার অন্যতম শর্ত। সনদের এ আধিক্যটা সুনির্দিষ্ট সংখ্যার সীমাবদ্ধতার সাথে নয়; বরং এমন সংখ্যার সাথে হতে হবে যে, স্বভাবত বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে এরূপ মনে করা অসম্ভব হয় যে, তারা সকলে মিথ্যার উপর একমত হয়েছেন কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাক্রমে সকলের দ্বারা একই মিথ্যাচার সংঘটিত হয়েছে।

তাই নির্ভরযোগ্য মত হলো, এখানে (মুতাওয়াতিরের ক্ষেত্রে) সংখ্যা-সীমা নির্ধারণ করার কোনো অর্থ নেই। তবে কেউ কেউ চার-এ নির্ধারণ করেছেন। কেউ পাঁচ, কেউ সাত, কেউ দশ, কেউ বারো, কেউ বিশ, কেউ চল্লিশ, আবার কেউ সত্তর নির্ধারণ করেছেন। অনেকে অন্য সংখ্যাও বলেছেন। প্রত্যেকেই এমন একটি দলিল পেশ করেছেন যাতে উক্ত সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে এবং তা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দিয়েছে। অথচ এটা মোটেও জরুরি নয় যে, (একটি সংখ্যা একটি ক্ষেত্রে যেভাবে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দিয়েছে তেমনি) অন্যক্ষেত্রেও ফায়দা দেবে। কেননা, এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা (নির্দিষ্ট সংখ্যার ফায়দা দেওয়াটা) সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে সীমাবদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্বোক্ত كَثْرَةُ طُرُقٍ তথা সনদের আধিক্যটা। খবর মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য এ كَثْرَةُ اَسَانِيْد যেমন শর্ত তেমনি এটাও আরেকটি শর্ত যে, এই আধিক্যটা কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয় যে, উক্ত সংখ্যা এত হতে হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো উক্ত অধিক সংখ্যা এমন পরিমাণ হতে হবে, সাধারণত বিবেক যাদের মিথ্যার উপর পরামর্শসাপেক্ষে একমত হওয়া কিংবা ঘটনাক্রমে সকলের মিথ্যাচার করা অসম্ভব বলে মনে করে।

تَوَاطُئَهُمْ : اَلتَّوَاطُؤ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ اَنْ يَّتَّفِقَ قَوْمٌ عَلٰى اِخْتِرَاعٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ بِاَنْ لَّا يَقُوْلَ اَحَدٌ خِلَافَ صَاحِبِهٖ.

অর্থাৎ পরামর্শসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর একদল লোকের ঐকমত্য পোষণ করা যে, আমাদের কেউ অন্যের বিপরীত বলবে না।

এর বিপরীতে اَلتَّوَافُقُ বলা হয়- حُصُوْلُ هٰذَا الْاِخْتِرَاعِ مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ وَلَا اِتِّفَاقٍ عَلٰى اِخْتِرَاعٍ অর্থাৎ পরামর্শ ও পরিকল্পনা ছাড়াই কোনো বিষয়ের উপর ঐকমত্য অর্জিত হওয়া।

عَلَى الصَّحِيْحِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য জুমহুরের মাযহাবের দিকে ইশারা করা এবং এটা প্রতিপন্ন করা যে, মুতাওয়াতিরের সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারে জুমহুরের মত ও অবস্থান হলো, এর জন্য ধরাবাঁধা কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত নয়। জুমহুরের বিপরীতে আরো যে সমস্ত দুর্বল অভিমত রয়েছে সম্মানিত লেখক "قِيْلَ" শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করেছেন।

يَطَّرِدُ : -এর অর্থ হলো يَتَحَقَّقُ অর্থাৎ সাব্যস্ত হওয়া। يَطَّرِدُ -এর فَاعِلٌ এখানে উহ্য রয়েছে। আর তা হলো, ذٰلِكَ الْاِفَادَةُ অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সংখ্যার নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেওয়াটা।

لِاحْتِمَالِ الْاِخْتِصَاصِ : এর স্বাভাবিক অর্থ, খাস হওয়ার সম্ভাবনার কারণে। এর আসল রূপ হলো لِاحْتِمَالِ اِخْتِصَاصِ ذٰلِكَ الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ فِىْ ذٰلِكَ الْمَحَلِّ অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সংখ্যাটি তার স্বস্থানে সুনির্ধারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার কারণে।

খবরে মুতাওয়াতিরের আলোচনা

খবরে মুতাওয়াতির সংক্রান্ত আলোচনায় কয়েকটি দিক প্রণিধানযোগ্য। যথা- ১. মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা, ২. মুতাওয়াতিরের শর্ত, ৩. মুতাওয়াতিরের হুকুম, ৪. মুতাওয়াতিরের উদাহরণ বাস্তবে আছে কিনা, ৫. মুতাওয়াতিরের প্রকারভেদ, ৬. মুতাওয়াতিরের জন্য রাবীর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সীমা আছে কিনা?

এ ছয়টি বিষয় সম্মানিত লেখকের আলোচনায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মুতাওয়াতিরের রাবীর সংখ্যা সীমা সুনির্দিষ্ট হওয়া জরুরি কিনা?

কোনো হাদীস বা খবর মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি কিনা- এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. জেনা-ব্যাভিচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন সাক্ষীর উপর কিয়াস করে কেউ কেউ রাবীর সংখ্যা চারজন হওয়াকে জরুরি বলেছেন।

২. কারো মতে রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচজন হতে হবে। কেননা, লে'আন সাবেত হয় পাঁচবার সাক্ষ্যের মাধ্যমে।

৩. কারো মতে ৭ জন লাগবে। কেননা, আসমানের সংখ্যা সাত।

৪. কারো মতে দশজন হতে হবে। তাদের দলিল হলো- تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

৫. কেউ কেউ বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধি সংখ্যা বারো থাকায় এখানেও বারো সংখ্যার কথা বলেছেন। কুরআনে এসেছে- وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيْبًا

৬. কেউ কেউ চল্লিশ সংখ্যার কথা বলেছেন। তাদের দলিল হলো- حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এই আয়াত। কেননা, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল হওয়ার মুহূর্তে ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ।

৭. কারো অভিমত, ৭০ জন হতে হবে। তার দলিল হলো– وَاخْتَارَ مُوسٰى مِنْ قَوْمِهٖ سَبْعِيْنَ رَجُلًا এ আয়াতটি। কেননা, এখানে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ৭০ জন নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে।

৮. কারো কারো অভিমত ৩১৩ -এর পক্ষে। কেননা, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল ৩১৩।

উপরোক্ত ৮ দল মুতাওয়াতিরের জন্য সুনির্দিষ্ট সংখ্যা-সীমা নির্ধারণের প্রবক্তা। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবি কুরআন, হাদীস কিংবা যুক্তির আলোকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এর বিপরীতে জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের সুচিন্তিত অভিমত হলো, খবরে মুতাওয়াতির সাবেত হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা-সীমার সুনির্দিষ্টতা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা কোনো ধর্তব্য নয়; বরং জরুরি হলো মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহের উপস্থিতি। এ ব্যাপারে এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। কারণ, এর বিপরীতে সংখ্যা-সীমা নির্ধারণ করতে গেলে একে তো তার মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে যে, সে সংখ্যা কত হবে? দ্বিতীয়ত প্রত্যেক সংখ্যার পশ্চাতে যে দলিল পেশ করা হয়েছে, তাতে এর নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি যে, যে কোনো ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ফলপ্রসূ ও তার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক দলিলের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট স্থানেই খাস ও সীমিত হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনো সংখ্যাই আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেবে না। আর এ কায়দা ও মূলনীতি তো সুবিদিত যে–

فَاِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ.

অর্থাৎ প্রত্যেকটি দলিল দ্ব্যর্থহীন হওয়া আবশ্যক। কোনো দলিল দ্ব্যর্থবোধক কিংবা দ্বিমুখী হলে তার দালিলিক যোগ্যতা বাদ হয়ে যায়।

বস্তুত সম্মানিত লেখক " وَلَيْسَ بِلَازِمٍ اَنْ يَّطَّرِدَ فِيْ غَيْرِهٖ لِاحْتِمَالِ الْاِخْتِصَاصِ " বলে এ মূলনীতির দিকেই ইশারা করে সংখ্যা সীমিত নির্ধারণের প্রয়াসকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذٰلِكَ ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِيْهِ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلٰى انْتِهَائِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْاِسْتِوَاءِ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْكَثْرَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا يَزِيْدَ، إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوْبَةٌ مِنْ بَابِ الْأَوْلٰى ، وَأَنْ يَكُوْنَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِ الْأَمْرَ الْمُشَاهَدَ أَوِ الْمَسْمُوْعَ ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ الصِّرْفِ ـ

فَإِذَا جَمَعَ هٰذِهِ الشُّرُوْطَ الْأَرْبَعَةَ وَهِيَ عَدَدٌ كَثِيْرٌ أَحَالَتِ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ وَتَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ ، رَوَوْا ذٰلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ إِلَى الْاِنْتِهَاءِ ، وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِمُ الْحِسَّ ، وَانْضَافَ إِلٰى ذٰلِكَ أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِ ، فَهٰذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ ، وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ عَنْهُ كَانَ مَشْهُوْرًا فَقَطْ ، فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُوْرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ ، وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الشُّرُوْطَ الْأَرْبَعَةَ إِذَا حَصَلَتْ اِسْتَلْزَمَتْ حُصُوْلَ الْعِلْمِ ، وَهُوَ كَذٰلِكَ فِي الْغَالِبِ ، لٰكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْبَعْضِ لِمَانِعٍ ، وَقَدْ وَضَحَ بِهٰذَا التَّقْرِيْرِ تَعْرِيْفُ الْمُتَوَاتِرِ ـ

অনুবাদ : সুতরাং যখন খবরটি এভাবে (অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অনেক সূত্রে) বর্ণিত হবে এবং এই আধিক্যের সাথে এ (শর্ত) টাও যুক্ত হবে যে, উল্লিখিত আধিক্যটা খবরের মধ্যে খবরের শুরু (উৎসস্থল) থেকে নিয়ে শেষ (সম্মানিত লেখক) পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যথার্থভাবে বজায় থাকবে।

যথার্থভাবে বজায় থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য উল্লিখিত আধিক্যটা সনদের কোনো স্তরে কম না হওয়া। বেশি না হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এখানে (অর্থাৎ খবরের অধ্যায়ে) সনদের প্রতি স্তরে রাবী বেশি হওয়াটাই অধিক কাম্য ও প্রত্যাশিত।

আর খবরের সনদের শেষে (উৎসপ্রান্তে) দেখা অথবা শোনার কথা থাকবে। এমন বিষয় থাকলে চলবে না, যা বিবেকের দাবিতে সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ বিবেকলব্ধ বিষয়।

সুতরাং যখন খবর এই চার শর্তের সমন্বয়কারী হবে আর তা হলো– বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক হওয়া, স্বভাবত তাদের দ্বারা পরামর্শসাপেক্ষে কিংবা ঘটনাক্রমে মিথ্যা সংঘটিত হবার সম্ভাবনা না থাকা, সনদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক সংখ্যক রাবী অনেক সংখ্যক রাবী হতে বর্ণনা করা, সনদের শেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থাকা এবং এর সাথে (উল্লিখিত চার শর্তের সাথে) যখন এটাও যুক্ত হবে যে, তাদের (অনেক সংখ্যক রাবীদের) খবর শ্রোতাকে নিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাস দান করবে, তখন খবরটি 'মুতাওয়াতির' হবে। আর যে খবর থেকে নিশ্চিত বিশ্বাসটা দূরে থাকবে অর্থাৎ যে খবর 'নিশ্চিত বিশ্বাস' -এর ফায়দা দেবে না সেটা শুধু খবরে মাশহূর হবে। অতএব, প্রতিটি মুতাওয়াতির মাশহূর; এর বিপরীত নয়।

নিশ্চিত বিশ্বাস ব্যতিরেকে বাকি চার শর্ত পাওয়া গেলে তা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হওয়াকে অনিবার্য করে বলে যে কথাটি বলা হয় তা অধিকাংশ (খবরের) ক্ষেত্রে তদ্রূপ (বাস্তব) হলেও কোনো কোনো খবর আবার প্রতিবন্ধকতা হেতু ঐ (নিশ্চিত বিশ্বাসের) ফায়দা দেয় না।

এ আলোচনার দ্বারা মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা (পূর্ণ ও) সুস্পষ্ট হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَنْ يَسْتَوِىَ الْأَمْرُ : يَسْتَوِىْ অর্থ– বরাবর হওয়া, সমান হওয়া। এখানে ভাবগত অর্থ– যথার্থভাবে সাব্যস্ত হওয়া। الْأَمْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য– الْكَثْرَةُ الْغَيْرُ الْمَحْصُوْرَةُ بِحَيْثُ تُحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ أَوْ تَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. অর্থাৎ রাবীর অনির্দিষ্ট অনেক হওয়া, যাতে করে মিথ্যাচারিতার ধারণা না থাকে।

مِنْ اِبْتِدَائِهِ اِلَى اِنْتِهَائِهِ : اِبْتِدَاءٌ অর্থ– শুরু। এখানে শুরু দ্বারা উদ্দেশ্য খবরটি সর্বপ্রথম যখন থেকে নকল হওয়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের স্তর। আর اِنْتِهَاءٌ অর্থ– শেষ। এখানে সনদের শেষ স্তর দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসের কিতাবের লেখক পর্যন্ত পৌঁছার স্তর।

সনদের শুরু স্তর থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে রাবীর আধিক্য থাকার এ শর্ত কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন কোনো খবরের বাস্তবে শুরু এবং শেষ থাকবে। যদি কোনো খবরের এমন শুরু ও শেষ না থাকে, তাহলে اِسْتِوَاءٌ-এর এই শর্ত থাকবে না; বরং এটা সম্ভবই হবে না। যেমন– 'নকলে কুরআন' অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে আসা। কেননা, نَقْلُ قُرْاٰنٍ-এর বিষয়টি মুতাওয়াতির। অথচ এর অধিক সংখ্যক সনদ থাকাতো দূরের কথা একটি সনদও নেই। যেহেতু نَقْلُ قُرْاٰنٍ-এর সনদের শুরু ও শেষ নেই, তাই এই قُرْاٰن-এর মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য اِسْتِوَاءٌ বা সকল স্তরে রাবীর সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন নেই।

তবে হ্যাঁ প্রশ্ন হতে পারে, যেখানে مُتَوَاتِرْ হওয়ার জন্য سَنَدْ كَثِيْر তথা অনেক সনদ জরুরি সেখানে نَقْلُ قُرْاٰن-এর সনদ না থাকায় সেটা কি করে مُتَوَاتِرْ হলো? এর জবাব পরে আসবে। তবে সংক্ষেপ কথা হলো مُتَوَاتِرْ বিভিন্ন প্রকার। এর মধ্যে تَوَاتُرْ اِسْنَادْ-এর জন্য কেবল اِسْتِوَاءٌ-এর শর্ত জরুরি। যেহেতু نَقْلُ قُرْاٰن টা تَوَاتُرْ طَبَقَةْ বা تَوَاتُرْ مُطْلَقْ তাই এর জন্য اِسْتِوَاءٌ-এর শর্ত নেই।

اِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا .... بَابُ الْأَوْلٰى : এটা পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা। পূর্বে লেখক اِسْتِوَاءٌ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, اِسْتِوَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সনদের কোনো স্তরে উল্লিখিত সনদের আধিক্যটা কমে না যাওয়া। তবে لَا أَنْ لَا يَزِيْدَ অর্থাৎ বাড়লে ক্ষতি নেই। কয়েক স্তরে উদাহরণস্বরূপ ১০ সনদ ছিল; কিন্তু এক স্তরে এসে ১২ সনদ পাওয়া গেল। তবে এ বাড়তি ২ সনদটা اِسْتِوَاءٌ-এর বিরোধী হবে না। এ বাড়তিটা কেন ক্ষতিকর হবে না– তারই ব্যাখ্যা এসেছে .... اِذِ الزِّيَادَةُ বাক্যে।

সারকথা হলো, সনদ যত বেশি হবে ইলম অর্জনটা তত দৃঢ় ও প্রগাঢ় হবে। যেমন– ১০০ জন কোনো খবর দিলে তা যে পর্যায়ের বিশ্বাস সৃষ্টি করে ২০০ জন সে সংবাদ দিলে তাতে বিশ্বাসের মাত্রা বাড়বে বৈ কমবে না। আর সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার মূল কারণ এই বিশ্বাস অর্জন। বস্তুত এ কথাটিই লেখক আলোচ্য অংশে ব্যক্ত করেছেন যে, ... اِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا অর্থাৎ উসূলুল হাদীসশাস্ত্রে সনদ যত বেশি হবে তত ভালো। কেননা, বেশি হওয়াটাই এখানে বেশি বেশি কাম্য।

وَاَنْ يَكُوْنَ مُسْتَنِدُ ... الْمَسْمُوْعُ : লেখক এ বাক্যে مُتَوَاتِرْ-এর আরেকটি শর্তের বিবরণ দিয়েছেন। আর তা হলো, সনদের শেষে গিয়ে চাক্ষুষ দর্শন বা প্রত্যক্ষ শোনার কথা থাকতে হবে।

مُسْتَنَدْ-এর অর্থ– সানাদান বা ধারাবাহিক সূত্রে যা বর্ণনা করা হচ্ছে। اِنْتِهَائِهٖ-এর ضَمِيْر ফিরেছে مُسْتَنَدْ-এর দিকে। অর্থাৎ সানাদান যা বর্ণনা করা হচ্ছে তার শেষে থাকবে ...।

اَلْاَمْرُ الْمُشَاهِدُ : নিজ চোখে দেখা বিষয়কে বলে اَلْاَمْرُ الْمُشَاهِدُ। তথা চাক্ষুষ দর্শন। এখানে সনদের শেষ প্রান্তে যে اَلْاَمْرُ الْمُشَاهِدُ-এর থাকার কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শেষ রাবী বলবেন : رَأَيْتُ অর্থাৎ আমি নিজ চোখে দেখেছি।

اَوِ الْمَسْمُوْعُ : অথবা সনদের শেষে اَمْرِ مَسْمُوْعٌ তথা প্রত্যক্ষভাবে শোনার কথা থাকবে। অর্থাৎ শেষ রাবী বলবেন– سَمِعْتُ বা سَمِعْنَا 'আমি নিজ কানে শুনেছি বা আমরা শুনেছি।' যদি শেষ রাবী

এরূপভাবে নিজ কানে শোনা বা নিজ চোখে দেখার কথা না বলে, তাহলে তা مُتَوَاتِرٌ হবে না। মোটকথা, বিষয়টি যদি শ্রুতিগত হয়, তাহলে سَمِعْتُ বলতে হবে আর যদি দর্শনগত হয়, তাহলে রাবীকে رَأَيْتُ বলতে হবে।

لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ الصِّرْفِ : এ বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ হলো– শুধু বিবেকলব্ধ বিষয় হলে হবে না। যেমন– زِيَادَةُ عَدَدِ الْاِثْنَيْنِ عَلَى الْوَاحِدِ ,حُدُوْثُ عَالَمْ , وُجُوْدُ صَانِعْ ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সবই عَقْلِىْ তথা বিবেকগত, দর্শন বা শ্রুতিগত নয়। অতএব এগুলো مُتَوَاتِرٌ নয়।

কিন্তু এ আলোচনা হতে এটা বুঝা ঠিক হবে না যে, তাহলে যে হাদীসে عَقْلِىْ বিষয় বর্ণিত হবে তাও مُتَوَاتِرٌ হবে না। কারণ হলো, শেষ রাবীর কথায় عَقْلِىْ বিষয় থাকা আর হাদীসে عَقْلِىْ বিষয় থাকা এক নয়। এখানে রাবীর কথার মধ্যে عَقْلِىْ বিষয় থাকাকে نَفِىْ করা হয়েছে; হাদীসে উল্লিখিত عَقْلِىْ বিষয়কে নয়। কেননা, হাদীসটি سَنَدْ নয়; বরং তা مَتَنْ বা রেওয়ায়েত।

فَإِذَا جَمَعَ هٰذِهِ الشُّرُوْطَ الْاَرْبَعَةَ : فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ এ বাক্যটি اِنْتِهَائُهُمُ الْحِسّ পর্যন্ত পূর্ববর্তী বাক্য كَذٰلِكَ وَاَنْضَافَ الخ-এর تَفْسِيْر বা ব্যাখ্যা। অতএব উভয়ই এক ও অভিন্ন। উভয়টির শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীতে আগত فَهٰذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ বাক্যটি হলো এদের একটির جَزَاءٌ ; আর অপরটির جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে যার উপর এই جَزَاءٌ টি দালালত করে।

رَوَوْا ذٰلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ ... : শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সনদের সংখ্যা সমান বা বরাবর থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতি স্তরে এমন সংখ্যক সনদ থাকা, যা মিথ্যার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয় এবং অকাট্য বিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এখানে সংখ্যার বরাবরটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, হতে পারে কোনো স্তরে রাবীর সংখ্যা বেশি হয়েও ঐভাবে ইলমের ফায়দা দেবে না যেভাবে আরেক স্তরে রাবীর সংখ্যা কম হলে দেয়। কেননা, রাবীর মান নির্ণীত হয় তার গুণাবলির দ্বারা। হতে পারে কোনো স্তরে রাবীর মধ্যে এ গুণাবলি বেশি মাত্রায় থাকায় তাদের সংখ্যা কম হলেও তা বিশ্বাসের ফায়দা দেবে। আবার কোনো স্তরে রাবীর গুণাবলি স্বল্প হেতু ঐ ফায়দা তদ্রূপ দেবে না।

اَنْ يَصْحَبَ خَبَرُهُمْ إِفَادَةَ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِ : এখানে يَصْحَبُ শব্দটি فِعْل - خَبَرُهُمْ তার مَفْعُوْل আর إِفَادَةُ الْعِلْمِ হলো তার فَاعِلْ ; অর্থ হবে– শ্রোতার ইলমের ফায়দা দেওয়াটা তাদের খবরের সাথি হবে। অর্থাৎ খবরটা যখন উল্লিখিত শর্তের সাথে علم-এরও ফায়দা দেবে।

فَهٰذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ : এখানে فاء টা جزائيه; পূর্ববর্তী দুই শর্তের কোনো একটির جَزَاءٌ এই বাক্যটি। اَلْخَبَرُ الْجَامِعُ الشُّرُوْطَ الْمُتَقَدِّمَةَ مَعَ الْاِنْضِيَافِ الْمَذْكُوْرِ অর্থাৎ هٰذَا-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো উল্লিখিত সকল শর্ত যে খবরের মধ্যে পাওয়া যাবে অর্থাৎ পাঁচ শর্তবিশিষ্ট خَبَرْ সেটাই হলো মুতাওয়াতির।

وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ الْعِلْمِ عَنْهُ : مَا দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْخَبَرُ। আর عَنْهُ যমীরের مَرْجِعْ হলো مَا তথা اَلْخَبَرُ। অর্থ হবে, যে খবর থেকে ইলমের ফায়দা দেওয়াটা পিছে রবে, সেটাই হলো মাশহুর। অর্থাৎ উল্লিখিত শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে খবরটা عِلْم-এর ফায়দা দেবে না, সেটা مُتَوَاتِرْ হতে পারবে না; বরং তা কেবল মাশহূরই হবে।

فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُوْرٌ : প্রতিটি মুতাওয়াতির মাশহূর। এখানে مُتَوَاتِرْ দ্বারা তার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। নতুবা যে খবর পরিভাষায় একবার মুতাওয়াতির হয় তা আর মাশহূর হয় না; মুতাওয়াতিরই থাকে।

مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ : এর বিপরীত নয়। অর্থাৎ এটা বলা যাবে না যে, وَكُلُّ مَشْهُوْرٍ مُتَوَاتِرٌ তথা প্রতিটি মাশহূর মুতাওয়াতির। কেননা, মাশহূর যদি একবার মুতাওয়াতির হতে পারে তবে তাকে আর মাশহূর বলা যায় না।

وَقَدْ يُقَالُ : এর দ্বারা একটি মতভেদের দিকে ইশারা করছেন। তা হলো, অধিকাংশের মত যদিও এটাই যে, মুতাওয়াতির হতে মোট ৫টি শর্ত প্রয়োজন; কিন্তু কেউ কেউ বলেন পঞ্চম বিষয়টিকে অর্থাৎ عِلْم

-এর ফায়দা দেওয়াকে শর্ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের **মত হলো,** বাকি যে ৪টি শর্ত রয়েছে বিশেষ করে দ্বিতীয় শর্তের মধ্যে এই পঞ্চম শর্তটি এসে গেছে। **আর তা** এভাবে যে, যখন কোনো খবর-এর রাবীদের উপর মিথ্যার ধারণা অসম্ভব হবে তখন আর **বলা লাগে না যে,** সেটা عِلْم -এরও ফায়দা দেবে। কেননা, মিথ্যার ধারণা দূরীভূত হলে এমনি এমনিই عِلْم **-এর ফায়দা দেয়।**

وَهُوَ كَذٰلِكَ فِى الْغَالِبِ : এ বাক্যের দ্বারা লেখক কারো কারো মতটিকে এক প্রকার **সমর্থন করেছেন।** অর্থাৎ তিনি বলেন যে, স্বাভাবিক ব্যাপার তো এটাই যে, পঞ্চম শর্তের প্রয়োজন **হয় না; ৪টি শর্ত** পাওয়া গেলেই কোনো খবর মুতাওয়াতির হবে।

لٰكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْبَعْضِ لِمَانِعٍ : তবে কখনো কখনো কারণবশত ঐ ৪টি শর্ত **পাওয়া গেলেও** পঞ্চম শর্ত পাওয়া যায় না। যেমন– কোনো দার্শনিককে চন্দ্র বিদীর্ণের খবর দেওয়া। কেননা, **দার্শনিক** চন্দ্র বিদীর্ণে বিশ্বাসী নয়। অতএব, এখানে ৪টি শর্ত পাওয়া গেলেও দৃঢ় ইলম-এর ফায়দা দেয়নি। **তাই** এটা খবরে মুতাওয়াতির হবে না।

وَقَدْ وَضَحَ بِهٰذَا التَّقْرِيْرِ تَعْرِيْفُ الْمُتَوَاتِرِ : এ দীর্ঘ আলোচনার আলোকে মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট হয়েছে নিশ্চয়। بِهٰذَا التَّقْرِيْرِ দ্বারা পূর্ব বর্ণিত সকল আলোচনা উদ্দেশ্য। تَعْرِيْفُ الْمُتَوَاتِرِ দ্বারা পারিভাষিক সংজ্ঞা উদ্দেশ্য; আভিধানিক নয়। কেননা, লেখক পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন মাত্র।

মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা : মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা দুভাবে দেওয়া যায়। ১. আভিধানিক, ২. পারিভাষিক। নিম্নে উভয় সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

১. **مُتَوَاتِرٌ-এর আভিধানিক অর্থ :** اَلْمُتَوَاتِرُ শব্দটি اَلتَّوَاتُرُ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। এর অর্থ– ধারাবাহিকতা, পরম্পরা ইত্যাদি। اَلتَّوَاتُرُ অর্থ اَلتَّتَابُعُ তথা পরপর।

২. **مُتَوَاتِرٌ -এর পারিভাষিক অর্থ :** আরবিতে خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ -এর সংজ্ঞা এভাবে–

هُوَ خَبَرٌ عَنْ مَحْسُوْسٍ اَخْبَرَ بِهٖ جَمَاعَةٌ بَلَغُوْا فِى الْكَثْرَةِ مَبْلَغًا تُحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ وَتَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَيَكُوْنُ عَدَدُهُمْ عَلَى السَّوَاءِ مِنْ اِبْتِدَائِهٖ اِلَى الْاِنْتِهَاءِ بِحَيْثُ يُفِيْدُ الْعِلْمَ لِسَامِعِهٖ.

অর্থাৎ পরিভাষায় اَلْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ এমন হাদীসকে বলে যার রাবীর সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা মিথ্যার উপর একমত হয়েছেন কিংবা ঘটনাক্রমে সকলে মিথ্যা কথা বলছেন– বিবেক তা অসম্ভব মনে করে: আর এই সংখ্যাধিক্য সনদের সকল স্তরে সমান থাকে এবং সাহাবী থেকে হাদীসটি رَأَيْتُ বা سَمِعْتُ শব্দে বর্ণিত হয়, যা শোনার সাথে সাথে عِلْمٌ يَقِيْنٌ -এর ফায়দা দেয়।

مُتَوَاتِرٌ -এর শর্ত : مُتَوَاتِرٌ -এর تَعْرِيْف হতে জানা যায় যে, কোনো খবর مُتَوَاتِرٌ হতে ৫টি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যথা–

১. عَدَدٌ كَثِيْرٌ অর্থাৎ রাবী বেশি হবে।

২. اَحَالَتِ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ وَتَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ অর্থাৎ রাবী এমন সংখ্যক হতে হবে যে, তাদের ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা কিংবা ঘটনাক্রমে মিথ্যা বলার উপর একমত হওয়াকে বিবেক অসম্ভব মনে করবে।

৩. رَوَوْا ذٰلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ اِلَى الْاِنْتِهَاءِ অর্থাৎ ঐ রাবীর আধিক্যটা সনদের শুরু **স্তর থেকে** শেষ স্তর পর্যন্ত সমান থাকতে হবে।

৪. وَكَانَ مُسْتَنَدُ اِنْتِهَائِهِمُ الْحِسَّ অর্থাৎ শেষ রাবী رَأَيْتُ বা سَمِعْتُ বলে খবর বর্ণনা **করবে।**

৫. وَانْضَافَ اِلَى ذٰلِكَ اَنْ يَّصْحَبَ خَبَرُهُمْ اِفَادَةَ الْعِلْمِ لِسَامِعِهٖ অর্থাৎ পূর্বোক্ত ৪টি **শর্ত পাওয়া** যাওয়ার সাথে সাথে এটাও পাওয়া যেতে হবে যে, ঐ খবরটি শ্রোতাকে عِلْمٌ يَقِيْنٌ **-এর ফায়দা** দেবে। যদি কোনো কারণবশত খবর এই পঞ্চম ফায়দা না দেয়, তখন খবরটি **মাশহূর হয়ে যাবে,** মুতাওয়াতির হতে পারবে না। কোনো খবর مُتَوَاتِرٌ হতে এই পাঁচটি শর্তের **সবকয়টি জরুরি।**

وَخِلَافُهٗ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ اَيْضًا لٰكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوْطِ اَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ اَىْ بِثَلٰثَةٍ فَصَاعِدًا مَا لَمْ يَجْتَمِعْ شُرُوْطُ الْمُتَوَاتِرِ اَوْ بِهِمَا اَىْ بِاثْنَيْنِ فَقَطْ اَوْ بِوَاحِدٍ فَقَطْ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا اَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ اَنْ لَّا يَرِدَ بِاَقَلَّ مِنْهُمَا فَاِنْ وَرَدَ بِاَكْثَرَ فِىْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الْوَاحِدِ لَا يَضُرُّ اِذِ الْاَقَلُّ فِىْ هٰذَا الْعِلْمِ يَقْضِىْ عَلَى الْاَكْثَرِ ـ

অনুবাদ : গায়রে মুতাওয়াতির (অর্থাৎ মাশহুর) কখনও রাবীর সংখ্যার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও (অর্থাৎ অনেক অনির্দিষ্ট সনদে) বর্ণিত হয়, তবে তখন তার মধ্যে مُتَوَاتِرْ-এর কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকে। অথবা খবরটি দুয়ের অধিক তথা তিন বা তিনের বেশি সীমিত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়। তবে শর্ত হলো, তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি পাওয়া যাবে না। অথবা খবর শুধুমাত্র দু সনদে বর্ণিত হবে অথবা শুধুমাত্র একটি সনদে বর্ণিত হবে।

দু সনদে বর্ণিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুয়ের কম না হওয়া। হ্যাঁ, তবে যদি এক সনদের কোনো স্তরে রাবীর সংখ্যা দুয়ের বেশি হয়, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, উসূলুল হাদীসশাস্ত্রে কম আর বেশির মধ্যে কম-এর উপরেই ফয়সালা হয়, অর্থাৎ কমটা প্রাধান্য পায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَخِلَافُهٗ : এখানে "ہ" ضَمِيْر ফিরেছে مُتَوَاتِرْ-এর দিকে অর্থাৎ غَيْرُ مُتَوَاتِرْ ; আর তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْخَبَرُ الْمَشْهُوْرُ।

لٰكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوْطِ : তবে কিছু শর্ত থাকবে না। এখানে اَلشُّرُوْط-এর পূর্বে اَلِفْ لَامْ টি عِوَضْ مُضَافْ اِلَيْهِ কেননা, আসলে ইবারত হলো بَعْضُ شُرُوْطِ الْمُتَوَاتِرِ। সারকথা হলো, مُتَوَاتِرْ-এর ন্যায় خَبَرْ مَشْهُوْر টাও কখনও অনির্দিষ্ট অনেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়। কিন্তু সে مُتَوَاتِرْ না হয়ে مَشْهُوْر হওয়ার কারণ হলো, مُتَوَاتِرْ -এর অন্যান্য শর্তের কোনো শর্ত তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। যেমন– এমন অনেক সংখ্যক রাবী হয় না যাদেরকে মিথ্যার উপর একমত হওয়ার কল্পনা করতে বিবেক অসম্ভব মনে করে, অথবা শেষ রাবী رَاَيْتُ বা سَمِعْتُ দ্বারা বর্ণনা করে না, অথবা সনদের প্রতি স্তরে অনেক রাবী হয় না ইত্যাদি।

اَوْ بِهِمَا : এটা عَطْف হয়েছে مَعْطُوْف فِعْل গুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ طُرُقٌ-এর উপর। মূল ইবারত এভাবে–

اِنَّ الْخَبَرَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ طُرُقٌ بِلَا حَصْرٍ، اَوْ مَعَ حَصْرٍ اَوْ اَنْ يَّرِدَ بِهِمَا فَقَطْ اَوْ بِوَاحِدٍ ـ

اِذِ الْاَقَلُّ فِىْ هٰذَا الْعِلْمِ : এখানে هٰذَا الْعِلْمِ বলতেও عِلْمِ اُصُوْلِ حَدِيْث উদ্দেশ্য।

يَقْضِىْ عَلَى الْاَكْثَرِ : يَقْضِىْ অর্থ يَغْلِبُ অর্থাৎ প্রাধান্য পায়। কম সনদটা বেশি সনদের উপর প্রাধান্য পাওয়ার অর্থ হলো, কম সনদের দিকে লক্ষ্য করে ফয়সালাটা হয় যে, সেটা مَشْهُوْر না عَزِيْز না غَرِيْب ইত্যাদি। যেমন– কোনো একটি হাদীস প্রথম থেকে অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মধ্যখানে এসে এক স্তরে একজন রাবী ছিল মাত্র, তখন ঐ হাদীস غَرِيْب হয়ে যাবে। এখানে এটা দেখা হবে না যে, প্রথমদিকে সনদে অনেক রাবী ছিল; বরং দীর্ঘ সনদের যে স্তরে সর্বনিম্ন রাবী থাকবে, তার হিসেবে ফয়সালা হবে। এটাই হলো اِذِ الْاَقَلُّ فِىْ هٰذَا الْعِلْمِ يَقْضِىْ عَلَى الْاَكْثَرِ-এর তাৎপর্য।

فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ وَهُوَ الْمُفِيْدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِيْنِيِّ فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلٰى مَا يَأْتِيْ تَقْرِيْرُهُ بِشُرُوْطِهِ الَّتِيْ تَقَدَّمَتْ ، وَالْيَقِيْنُ هُوَ الْاِعْتِقَادُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ وَهٰذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ يُفِيْدُ الْعِلْمَ الضَّرُوْرِيَّ وَهُوَ الَّذِيْ يَضْطَرُّ الْاِنْسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ ، وَقِيْلَ لَا يُفِيْدُ الْعِلْمَ إِلَّا نَظَرِيًّا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْمُتَوَاتِرِ حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ كَالْعَامِّيِّ إِذِ النَّظَرُ تَرْتِيْبُ أُمُوْرٍ مَعْلُوْمَةٍ أَوْ مَظْنُوْنَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلٰى عُلُوْمٍ أَوْ ظُنُوْنٍ وَلَيْسَ فِي الْعَامِّيِّ أَهْلِيَّةُ ذٰلِكَ ، فَلَوْ كَانَ نَظَرِيًّا لَمَا حَصَلَ لَهُمْ.

অনুবাদ : প্রথমটি মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির হাদীস পূর্বোল্লিখিত শর্তের সাথে ইলমে ইয়াকীন তথা অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেয়। এ উক্তি ইলমে নযরীকে বাদ দিয়ে দিল– যার বিবরণ সামনে আসছে। ইয়াকীন অর্থ সেই দৃঢ়বিশ্বাস যা বাস্তবের অনুকূল। এটিই নির্ভরযোগ্য মত যে, খবরে মুতাওয়াতির আবশ্যিক ইলমের ফায়দা দেয়। আর তা হলো, মানুষ যে ইলম অর্জনে বাধ্য হয় এবং তা এড়াতে পারে না।

অনেকের অভিমত হলো, খবরে মুতাওয়াতির ইলমী নযরী তথা যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। এ অভিমতটি ঠিক নয়। কারণ, মুতাওয়াতির দ্বারা ইলম তারও অর্জিত হয় যার যুক্তি বিন্যাসের যোগ্যতা নেই। যেমন– সাধারণ লোক। কেননা, 'যুক্তি' -এর অর্থ হলো, কতিপয় জ্ঞাত কিংবা ধারণকৃত বিষয়কে এমনভাবে সাজানো, যার আলোকে নতুন কোনো জ্ঞান বা ধারণা অর্জিত হয়। আর এ (সাজানোর) যোগ্যতা সাধারণ লোকের নেই। অতএব, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অর্জিত জ্ঞান যদি যৌক্তিক হয়, তাহলে তা সাধারণ লোকদের অর্জিত হতো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ : এখানে اَلْأَوَّلُ দ্বারা যদিও উদ্দেশ্য ঐ খবর مَا لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرٍ কিন্তু এর সাথে তার শর্তাবলিও যুক্ত আছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো, যে খবরটি অনির্দিষ্ট অনেক রাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের পূর্বোক্ত ৫টি শর্ত বিদ্যমান সেটাই হলো مُتَوَاتِرٌ।

এখানে اَلْمُتَوَاتِرُ শব্দটি তারকীবে খবর হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো খবরটা নাকিরা হয়, আর মা'রিফা হলে حَصْر -এর ফায়দা দেয়। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়াবে– প্রথমটিই কেবল مُتَوَاتِرٌ; অন্যগুলো নয়। আর এটাই বাস্তব কথা যে, ৪ প্রকার খবর -এর মধ্যে প্রথমটিই কেবল مُتَوَاتِرٌ অন্যগুলোর নাম ভিন্ন ভিন্ন।

وَهُوَ الْمُفِيْدُ لِلْعِلْمِ : এখানে هُوَ টা مُبْتَدَأٌ এটা ফিরেছে اَلْمُتَوَاتِرُ -এর দিকে। اَلْمُفِيْدُ টা খবর। এখানে প্রশ্ন হয় যে, খবরটা مَعْرِفَةٌ হওয়ায় তা حَصْر -এর অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ مُتَوَاتِرٌ -ই কেবল عِلْم

يَقِيْن-এর ফায়দা দেয়। অথচ مُتَوَاتِرْ ছাড়াও مُشَاهَدَةْ অর্থাৎ চাক্ষুষ দর্শনটাও ইলমের ফায়দা দেয়। এর জবাব হলো, এটা حَصْر إِضَافِيْ হলেও حَصْر অর্থাৎ খবরের অন্যান্য প্রকারের মধ্যে কেবল এ প্রকারটা অর্থাৎ مُتَوَاتِرْ টা عِلْم يَقِيْن-এর ফায়দা দেয়, অন্যগুলো عِلْم يَقِيْن-এর ফায়দা দেয় না। অথবা, এখানে উদ্দেশ্য হলো مُسْنَدْ-কে مُسْنَدْ إِلَيْهِ-এর মধ্যে حَصْر করা। অর্থাৎ خَبَرْ مُتَوَاتِرْ টা শুধু عِلْم يَقِيْن-এর ফায়দা দেয়, অন্য কোনো ফায়দা নয়।

لَا يُفِيْدُ الْعِلْمَ إِلَّا نَظَرِيًّا : মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে শুধু عِلْم نَظَرِيْ অর্জিত হয়। যেমন– এভাবে বলা যে, এটা এমন খবর যার রাবীদের মিথ্যার উপর একমত হতে বিবেক অসম্ভব মনে করে। আর যে খবর এমন তা সত্য। অতএব এ খবরটি সত্য।

أَوْ مَظْنُوْنَةً : যেমন– যায়েদ রাতে ঘুরছে, আর রাতে যে ঘুরে সে চোর, অতএব যায়েদ চোর। ইত্যাদি।

ইলমের প্রকারভেদ : ইলম দু প্রকার। ১. يَقِيْنِيْ যার অপর নাম ضَرُوْرِيْ ও ২. نَظَرِيْ।

عِلْم ضَرُوْرِيْ-এর সংজ্ঞা : যে ইলম অর্জন করতে মানুষ বাধ্য; অর্জনকে ঠেকাতে পারে না অর্থাৎ কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই যে ইলম অর্জিত হয়, তাকে عِلْم ضَرُوْرِيْ বলে। এ عِلْم প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিরও অর্জিত হয় যার চিন্তাভাবনার যোগ্যতাও নেই। যেমন– সাধারণ অজ্ঞ লোকেরও অর্জিত হয়।

عِلْم نَظَرِيْ-এর সংজ্ঞা : যে ইলম চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকে عِلْم نَظَرِيْ বলে।

মুতাওয়াতিরের হুকুম : এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, مُتَوَاتِرْ টা عِلْم-এর ফায়দা দেয়; কিন্তু পরে এ ব্যাপারে মতভেদ হয়ে গেছে যে, কোন عِلْم-এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ عِلْم ضَرُوْرِيْ না عِلْم نَظَرِيْ এর?

১. জুমহুরের অভিমত : জুমহুরের অভিমত হলো, مُتَوَاتِرْ টা عِلْم ضَرُوْرِيْ-এর ফায়দা দেয়।

২. অন্যদের অভিমত : আশায়েরাদের মধ্য হতে ইমামুল হারামাইন, মু'তাযিলাদের মধ্য হতে হযরত কা'বী এবং আবুল হাসান বসরীর মত হলো– مُتَوَاتِرْ টা عِلْم نَظَرِيْ-এর ফায়দা দেয়।

সঠিক অভিমত নির্ণয় : এ দু মাযহাবের মধ্য হতে জমহুরের অভিমত বাস্তবভিত্তিক ও সঠিক। কারণ, مُتَوَاتِرْ দ্বারা তারও عِلْم অর্জিত হয়, যার চিন্তাভাবনার যোগ্যতা নেই। যদি তা نَظَرِيْ-এর ফায়দা দিত, তবে কেবল চিন্তাভাবনার যোগ্যতাসম্পন্নদের অর্জিত হতো সকলের নয়। কিন্তু مُتَوَاتِرْ যখন জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের ইলমের ফায়দা দেয় অর্থাৎ সবাই বুঝে যে, এটা বাস্তবই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস, তখন বুঝা গেল যে, এটা عِلْم ضَرُوْرِيْ-এর ফায়দা দেয়।

وَلَاحَ بِهٰذَا التَّقْرِيْرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ وَالْعِلْمِ النَّظَرِيِّ ، إِذِ الضَّرُوْرِيُّ يُفِيْدُ الْعِلْمَ بِلَا اِسْتِدْلَالٍ ، وَالنَّظَرِيُّ يُفِيْدُهُ وَلٰكِنْ مَعَ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى الْاِفَادَةِ وَاَنَّ الضَّرُوْرِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ ، وَالنَّظَرِيَّ لَا يَحْصُلُ اِلَّا لِمَنْ لَهُ اَهْلِيَّةُ النَّظَرِ ، وَاِنَّمَا اُبْهِمَتْ شُرُوْطُ التَّوَاتُرِ فِى الْاَصْلِ لِاَنَّهُ عَلٰى هٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الْاِسْنَادِ ، اِذْ عِلْمُ الْاِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ صِحَّةِ الْحَدِيْثِ وَضُعْفِهِ لِيُعْمَلَ بِهِ اَوْ يُتْرَكَ بِهِ مِنْ حَيْثُ صِفَاتِ الرِّجَالِ وَصِيَغِ الْاَدَاءِ ، وَالْمُتَوَاتِرُ لَا يُبْحَثُ عَنْ رِجَالِهِ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ ـ

অনুবাদ : এ আলোচনা থেকে অবধারিত জ্ঞান (ইলমে জরুরী) ও যৌক্তি জ্ঞান (ইলমে নযরী) -এর মধ্যেকার পার্থক্য পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অবধারিত জ্ঞান অর্জিত হয় যুক্তিবিন্যাস ব্যতিরেকে, আর যৌক্তিক জ্ঞান যুক্তিবিন্যাসের দ্বারা অর্জিত হয়। তা ছাড়া অবধারিত জ্ঞান প্রত্যেক শ্রোতারই অর্জিত হয়। আর যৌক্তিক জ্ঞান কেবলমাত্র তার অর্জিত হয়, যার যুক্তিবিন্যাসের যোগ্যতা রয়েছে। মতনের মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তগুলো উহ্য রাখা হয়েছে। কারণ হলো, এ পদ্ধতিতে মুতাওয়াতিরটা 'ইলমুল ইসনাদ'-এর আলোচ্য বিষয় নয়। ইলমুল ইসনাদ হলো, যে শাস্ত্রে হাদীসের শুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যাতে সে মোতাবেক আমল করা যায় কিংবা তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। এই বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সাব্যস্ত করা হয় বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের গুণাবলি ও হাদীস বর্ণনার ভাষার উপর ভিত্তি করে। পক্ষান্তরে মুতাওয়াতির হাদীসের ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না; বরং কোনোরূপ আলোচনা-সমালোচনা ছাড়াই সে মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاحَ : لَاحَ অর্থ– স্পষ্ট হওয়া, পরিষ্কার হওয়া।

اِسْتِدْلَال : এখানে اِسْتِدْلَال শব্দটি نَظَر - فِكْر অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ بِلَا اِسْتِدْلَالٍ মানে بِلَا نَظَرٍ وَفِكْرٍ চিন্তাভাবনা তথা যুক্তিবিন্যাস ছাড়া।

لٰكِنْ مَعَ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى الْاِفَادَةِ : এর অর্থ– ফায়দা দেওয়ার উপর যুক্তিবিন্যাসের সাথে। অর্থাৎ যে যুক্তি ও চিন্তাভাবনায় নতীজা দেয় তার চিন্তাভাবনার মাধ্যমে।

اَهْلِيَّةُ النَّظَرِ : এর অর্থ– চিন্তা করার যোগ্যতা থাকা। অর্থাৎ কিভাবে যুক্তি সাজাতে হয় তার যোগ্যতা থাকা। যেমন– صُغْرٰى -কে আগে উল্লেখ করে পরে كُبْرٰى -কে এভাবে উল্লেখ করা যে, زَيْدٌ يَطُوْفُ بِاللَّيْلِ، وَكُلُّ مَنْ يَطُوْفُ بِاللَّيْلِ فَهُوَ سَارِقٌ، فَزَيْدٌ سَارِقٌ অর্থাৎ যায়েদ রাতে ঘুরছে আর যে রাতে ঘুরে সে চোর হয়। সুতরাং যায়েদ চোর।

وَاِنَّمَا اُبْهِمَتْ : اُبْهِمَتْ শব্দটি **بَابُ اِفْعَالْ** থেকে **وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ مَجْهُوْل**-এর সীগাহ। এর অর্থ– **مُبْهَمْ** বা উহ্য রাখা হয়েছে।

شُرُوْطُ التَّوَاتُرِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য **مُتَوَاتِرْ**-এর পূর্বোক্ত ৫টি শর্ত।

فِى الْاَصْلِ : اَصْل দ্বারা উদ্দেশ্য মতন অর্থাৎ **نُخْبَة**।

لِاَنَّهٗ : এখানে **ضَمِيْر** টি ফিরেছে **اَلْمُتَوَاتِرْ**-এর দিকে।

عَلٰى هٰذِهِ الْكَيْفِيَةِ : هٰذِهِ الْكَيْفِيَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য **شَرْحُ نُخْبَة**-এর মধ্যে উল্লিখিত **كَيْفِيَة** আর তা হলো, **مُتَوَاتِرْ**-এর শর্তাবলি উল্লেখ করা।

لِيُعْمَلَ بِهٖ اَوْ يُتْرَكَ بِهٖ : এখানে উভয় **فِعْل** টি **مَجْهُوْل** হবে। **لِيُعْمَلَ بِهٖ**-এর অর্থ হবে, খবরটি আমলযোগ্য হলে তদনুযায়ী আমল করা। আর **يُتْرَكُ بِهٖ**-এর অর্থ হলো, খবরটি যদি যা'ঈফ হয় অর্থাৎ আমলযোগ্য না হয়, তবে তা বর্জন করা হবে।

صِفَاتُ الرِّجَالِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাবীদের গুণাবলি। অর্থাৎ তাদের **ضَبْط، عَدَالَتْ** ইত্যাদি গুণাবলী।

صِيَغُ الْاَدَاءِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীস বর্ণনার শব্দ। যথা– **سَمِعْتُ، حَدَّثَنَا، اَخْبَرَنَا، اَنْبَانَا** ইত্যাদি।

عَنْ رِجَالِهٖ : এর অর্থ হবে **عَنْ صِفَتِهِمْ** অর্থাৎ রাবীদের সিফাত নিয়ে।

মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি উহ্য রাখার কারণ : **خَبَرْ مُتَوَاتِرْ**-এর দুটি দিক। ১. অন্যান্য খবরের মতো এটাও একটি খবর। ২. তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আমাদের সামনের (**شَرْحُ نُخْبَة**) কিতাবের অবস্থা দুটি ১. মতন অর্থাৎ **نُخْبَة** ও ২. শরাহ অর্থাৎ **شَرْحُ نُخْبَة** বা **نُزْهَةُ النَّظْرِ**। খবরে মুতাওয়াতিরটা প্রথমদিক থেকে অর্থাৎ অন্যান্য খবরের ন্যায় একটি খবর হওয়ার দিক থেকে তার আলোচনা ইলমুল ইসনাদে হতে পারে। এ জন্য লেখক মতনের মধ্যে **اَلْمُتَوَاتِرْ**-এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যখন মুতাওয়াতিরের দ্বিতীয় দিকটা লক্ষণীয় হবে, তখন সেটা ইলমুল ইসনাদের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বস্তুত এ কারণে শর্তাবলির উল্লেখ মতনের মধ্যে না করে; বরং শরাহ-এর মধ্যে করা হয়েছে। অতএব, মতন ও শরাহ মিলে যেমন কিতাব পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, তেমনি মতনে **اَلْمُتَوَاتِرُ** আর শরাহ -এ **شُرُوْط** আলোচনা করায় আলোচনাও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।

فَائِدَةٌ ذَكَرَ اِبْنُ الصَّلَاحِ اَنَّ مِثَالَ الْمُتَوَاتِرِ عَلَى التَّفْسِيْرِ الْمُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجُوْدُهُ اِلَّا اَنْ يَدَّعِىَ ذٰلِكَ فِىْ حَدِيْثِ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوْعٌ ، وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ ، لِاَنَّ ذٰلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الْاِطِّلَاعِ عَلٰى كَثْرَةِ الطُّرُقِ وَاَحْوَالِ الرِّجَالِ وَصِفَاتِهِمُ الْمُقْتَضِيَةِ لِاِبْعَادِ الْعَادَةِ اَنْ يَّتَوَاطَئُوْا عَلَى الْكِذْبِ اَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمْ اِتِّفَاقًا ، وَمِنْ اَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُوْدًا وَجُوْدَ كَثْرَةٍ فِى الْاَحَادِيْثِ اَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُوْرَةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِاَيْدِىْ اَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا الْمَقْطُوْعَةَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا اِلٰى مُصَنِّفِيْهَا اِذَا اجْتَمَعَتْ عَلٰى اِخْرَاجِ حَدِيْثٍ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ اِلٰى اٰخِرِ الشُّرُوْطِ اَفَادَ الْعِلْمَ الْيَقِيْنِىَّ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهِ اِلٰى قَائِلِهِ وَمِثْلُ ذٰلِكَ فِى الْكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ كَثِيْرٌ ـ

অনুবাদ : ফায়দা : ইবনুস সালাহ্ উল্লেখ করেছেন, উপরিউক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী মুতাওয়াতির হাদীসের পরিমাণ খুবই কম। শুধুমাত্র مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজ বাসস্থান নির্ধারণ করে।" এ হাদীসের ক্ষেত্রে দাবি করা যায় যে, এটা মুতাওয়াতির হাদীস।

তার এই স্বল্পতার দাবি ঠিক নয়। অন্যরা যারা এরূপ হাদীস অস্তিত্বহীন বলে দাবি করেছেন তাদের অভিমতও সঠিক নয়। উভয় দলের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে পরামর্শক্রমে বা ঘটনাক্রমে রাবীদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বিবেক অসম্ভব মনে করার দাবিদার সিফাতসমূহ, রাবীদের অবস্থা এবং অনেক সনদ সম্পর্কে কম অবগতির কারণে। মুতাওয়াতির মওজুদ থাকার সবচেয়ে বড় দলিল হলো, হাদীসের যে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞজনদের হাতে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে এবং এসবের প্রণেতাদের সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই– যদি এ সকল কিতাবে একযোগে একটি হাদীস সংকলিত হয় এবং তার এত অধিক সংখ্যক সনদ থাকে যে, স্বভাবত মিথ্যা সংঘটিত হবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়, এভাবে মুতাওয়াতির হাদীসের সকল শর্ত পূরণ হয়, তাহলে এটি যে নবী করীম ﷺ -এর হাদীস, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারবো। এ ধরনের হাদীস প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে প্রচুর রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَعِزُّ وُجُوْدُهُ : عَزَّ يَعِزُّ অর্থ– কম হওয়া, স্বল্প হওয়া। "ه" যমীর ফিরেছে مُتَوَاتِرٌ -এর দিকে। **অর্থাৎ** مُتَوَاتِرٌ -এর অস্তিত্ব খুব কম; নেই বললেই চলে। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে ইবনুস সালাহ ও তাদের **দাবি** এক ও অভিন্ন, যারা বলে حَدِيْثُ مُتَوَاتِرٌ -এর অস্তিত্ব নেই।

حَدِيْثُ مَنْ كَذَبَ الخ : এ হাদীস ১০০ -এরও অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারাও আছেন। এভাবে পরবর্তী স্তরেও অনেক রাবী কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় এটি حَدِيْث مُتَوَاتِرْ -এর উদাহরণ।

مَمْنُوْع : এর শাব্দিক অর্থ– নিষিদ্ধ। এখানে উদ্দেশ্য হলো, সঠিক নয়।

وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনে হিব্বান (র.) এবং হাযিম (র.)। কারণ, তাঁদের দাবি হলো, حَدِيْثُ مُتَوَاتِرْ নেই।

وَاَحْوَالُ الرِّجَالِ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে বলা হয়েছে. عِلْمُ الْاِسْنَادِ-এর মধ্যে মুতাওয়াতিরের اَحْوَالُ رِجَالٌ নিয়ে আলোচনা হয় না, অথচ এখান থেকে বুঝা যায় যে, আলোচনা হয় ? এর উত্তর হল, عِلْم الْاِسْنَادُ-এর মধ্যে যে مُتَوَاتِرْ নিয়ে আলোচনা হয় না সেটা হলো مُتَوَاتِرْ সাব্যস্ত হওয়ার পর। আর এখানে যে আলোচনার কথা বলা হয়েছে, এটা হলো مُتَوَاتِرْ টি مُتَوَاتِرْ সাব্যস্ত হওয়ার আগে। অর্থাৎ مُتَوَاتِرْ সাব্যস্ত হওয়ার পরে গিয়ে তার রাবীদের সম্পর্কে আর আলোচনা হয় না, কিন্তু مُتَوَاتِرْ হওয়ার আগে আলোচনা করা হয়।

اِلٰى اٰخِرِ الشُّرُوْطِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য مُتَوَاتِرْ -এর অন্যান্য শর্ত।

মুতাওয়াতিরের উদাহরণ বাস্তবে আছে কিনা? এ ব্যাপারে তিন ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. **ইবনে হিব্বান এবং হাযিম (র.)-এর অভিমত :** তাঁদের দাবি হলো, বাস্তবে মুতাওয়াতিরের কোনো উদাহরণ নেই।

২. **ইবনুস সালাহ -এর অভিমত :** তাঁর দাবি হলো, মুতাওয়াতিরের উল্লিখিত সংজ্ঞা এবং শর্তানুযায়ী মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব একেবারেই কম। শুধুমাত্র مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ .... এ হাদীসটির ব্যাপারে মুতাওয়াতির দাবি করা হয়।

৩. **জুমহুরের অভিমত :** জুমহুর ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হলো, মুতাওয়াতিরের অস্তিত্ব ও উদাহরণ প্রচুর থাকা সম্ভব। শুধু তা-ই নয় এমন হাদীস বাস্তবে অনেক আছে, যাতে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি বিদ্যমান। বিশেষত বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ, সারা মুসলিম বিশ্বে যার পঠন-পাঠন হয় এবং ওলামায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত, যখন এ সমস্ত কিতাবে একযোগে এমন হাদীস বর্ণিত হবে, যার রাবীদের ব্যাপারে মিথ্যার ধারণা হয় না এবং তাতে মুতাওয়াতিরের অন্যান্য শর্তও বিদ্যমান, তখন নিশ্চিতভাবে ঐ হাদীস মুতাওয়াতির হবে। যেমন– ১. দুই মোজার উপর মাসাহ -এর হাদীস, ২. কিয়ামতের দিন শাফাআতের হাদীস, ৩. হাউজে কাওসারের হাদীস, ৪. দুই পা ধৌত করার হাদীস ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত মতভেদটি حَدِيْث مُتَوَاتِرْ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যে কোনো مُتَوَاتِرْ -এর ক্ষেত্রে নয়। কেননা, مُطْلَقْ مُتَوَاتِرْ যে অনেক রয়েছে সে ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। যেমন– কুরআন বর্ণিত হয়ে আসা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা ইত্যাদি।

উক্ত ইখতিলাফের ভিন্ন ব্যাখ্যা : উপরে مُتَوَاتِرْ -কে কেন্দ্র করে যে ইখতিলাফ বর্ণনা করা হয়েছে আরেক দৃষ্টিতে বিচার করলে উক্ত ইখতিলাফ বাকি থাকে না; বরং তা শাব্দিক ইখতিলাফে পরিণত হয়। আর তা এভাবে যে, ইবনুস সালাহ এবং ইবনে হিব্বানের উক্তি تَوَاتُرْ لَفْظِيْ -এর ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাঁদের দাবি হলো تَوَاتُرْ لَفْظِيْ নেই বা থাকলেও খুব কম। আর জুমহুরের উক্তি تَوَاتُرْ مَعْنَوِيْ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ تَوَاتُرْ مَعْنَوِيْ অনেক আছে, تَوَاتُرْ لَفْظِيْ নয়। আর এদের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। কেননা, বাস্তবে تَوَاتُرْ لَفْظِيْ নেই কিন্তু تَوَاتُرْ مَعْنَوِيْ অনেক আছে। تَوَاتُرْ لَفْظِيْ বলা হয়, হাদীসের শব্দই مُتَوَاتِرْ ভাবে বর্ণিত হয়ে আসা। আর تَوَاتُرْ مَعْنَوِيْ হলো, শব্দ নয় বরং অর্থটা (শব্দটা ভিন্ন হয়ে) এক হয়ে مُتَوَاتِرْ হয়ে আসা। مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ এগুলো مُتَوَاتِرْ مَعْنَى , لَفْظًا মুতাওয়াতির নয়।

مُتَوَاتِرْ-এর প্রকারভেদ : মুতাওয়াতির মোট চার প্রকার। যথা– ১. تَوَاتُرْ اِسْنَادْ ২. تَوَاتُرْ طَبْقَةْ ৩. تَوَاتُرْ عَمَلْ ৪. تَوَاتُرْ قَدْرِ مُشْتَرَكْ নিম্নে প্রত্যেকটার সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণিত হলো–

১. **تَوَاتُرْ اِسْنَادْ-এর সংজ্ঞা :** হাদীসটিকে সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে এমন সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করবেন যাদের ব্যাপারে এমন চিন্তা করা সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেছেন কিংবা তাদের সকলের দ্বারা ঘটনাক্রমে মিথ্যাচার সংঘটিত হয়েছে। এর আরেক নাম تَوَاتُرْ مُحَدِّثِيْنَ ।

تَوَاتُرْ اِسْنَادْ-এর উদাহরণ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে নিজ বাসস্থান নির্ধারণ করে।

ইবনুস সালাহ বলেন, বাষট্টিজন সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, শতাধিক সাহাবী এবং ইমাম নববী বলেন, প্রায় দুইশত সাহাবী এটি বর্ণনা করেছেন।

তবে আসল কথা হলো, হাদীসটি ৩৩ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সনদ হাসান আর কিছু সহীহ। এ ছাড়া যা'ঈফ সনদে আরও প্রায় ৫০ জন সাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ অগ্রহণযোগ্য সনদে আরো প্রায় ২০ জন সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। –[ফাতহুল বারী ১ : ২৪৫]

২. **تَوَاتُرْ طَبْقَةْ-এর সংজ্ঞা :** প্রতি যুগের একদল লোক হতে পরবর্তী যুগের আরেকদল গ্রহণ করে থাকে। এভাবে সবসময় চলতে থাকে।

تَوَاتُرْ طَبْقَةْ-এর উদাহরণ : যেমন– কুরআন মাজীদের তাওয়াতুর। পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র মানুষ তা পাঠ করছে, চর্চা করছে, মুখস্থ করছে, এক তবকা (স্তরের লোক) থেকে আরেক তবকা (স্তরের লোক) গ্রহণ করছে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সনদের প্রয়োজন হয় না এবং হয়ও না। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য লোক কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ কুরআনই মুহাম্মদ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন এবং এ মর্মে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তাঁর নিকট থেকে অগণিত সাহাবী তা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অগণিত সাহাবী থেকে অগণিত তাবেয়ী, তাঁদের নিকট থেকে অগণিত তাবয়ে-তাবেয়ী ..... এভাবে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এখানে মুহাদ্দিসগণের নিয়ম অনুযায়ী অনেকগুলো তো দূরের কথা, একটি সনদও উপস্থাপন করা দুষ্কর। আর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা, সনদের প্রয়োজন মূলত খবরে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে হয়। কারণ, সেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

৩. تَوَاتُرْ عَمَلْ -এর সংজ্ঞা : মহানবী ﷺ -এর যুগ থেকে প্রতি যুগে কোনো বিষয়ে এমন বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ আমল করে আসবেন, যাদের ব্যাপারে এমন মনে করা সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই ভিত্তিহীন বিষয়ে কিংবা ভুল বিষয়ে আমল করছেন।

تَوَاتُرْ عَمَلْ -এর উদাহরণ : যেমন– অজুর মধ্যে মিসওয়াক করা। এটি একটি সুন্নত এবং এটির সুন্নত হওয়ার আকিদা রাখা ফরজ। কেননা, এটা তাওয়াতুরে আমলী তথা প্রতি যুগের লোকদের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

৪. تَوَاتُرْ قَدْر مُشْتَرَكْ -এর সংজ্ঞা : অনেক সময় রাবীগণের বর্ণনায় ভাষাগত পার্থক্য থাকে বা কোনো কোনো রাবী ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা করেন, অন্য রাবীগণ আবার অন্যভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু কিছু ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল থাকে।

এ সংজ্ঞাটি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, হাদীসের لَفْظ টা مُتَوَاتِرْ না হয়ে যদি অর্থ বা مَعْنٰى টা مُتَوَاتِرْ হয়, তাহলে তাকে مُتَوَاتِرْ قَدْر مُشْتَرَكْ বলে। অর্থাৎ لَفْظ টা مُتَوَاتِرْ হবে না, কিন্তু তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা বিভিন্ন হাদীসে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হবে। এর অপর নাম تَوَاتُرْ مَعْنَوِىْ।

تَوَاتُرْ قَدْر مُشْتَرَكْ -এর উদাহরণ : যেমন– কেউ বর্ণনা করে, হাতিম একশত দিনার দান করেছে। আবার কেউ বর্ণনা করে, হাতিম একশত উট দান করেছে। এখানে ঘটনার বর্ণনায় বিভিন্নতা থাকলেও যে বিষয়ে মিল রয়েছে তা হলো, হাতিম দান করেছে।

এর আরেকটি উদাহরণ যেমন– مَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ। অনেক হাদীসে মোজার উপর মাসাহের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু কোনো বর্ণনায় এসেছে মোজার উপরে, কোনো বর্ণনায় এসেছে মোজার নিচে, কোনো বর্ণনায় একবার, আবার কোনো বর্ণনায় তিনবার ইত্যাদি। এখানে বর্ণনার মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে মিল রয়েছে, আর তা হলো– মোজার উপর মাসাহ করা প্রমাণিত।

মুতাওয়াতিরের হুকুম : প্রথম তিন প্রকার مُتَوَاتِرْ -এর হুকুম হলো, তার অস্বীকারকারী কাফির। আর চতুর্থ প্রকার مُتَوَاتِرْ -এর হুকুম হলো, যদি হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি সুস্পষ্ট বিষয় হয়, তবে তার অস্বীকারকারীও কাফির হবে। আর যদি হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি দ্ব্যর্থবোধক نَظْرِىْ হয় (তথা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে হয়), তাহলে তার অস্বীকারকারী কাফির হবে না।

مُتَوَاتِرْ-এর আরেকটি প্রকরণ : لَفْظ (শব্দ) এবং مَعْنٰى (অর্থ) -এর দিক থেকে مُتَوَاتِرْ আবার দু প্রকার। ১. تَوَاتُرْ لَفْظِىْ ২. تَوَاتُرْ مَعْنَوِىْ নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা উদাহরণসহ দেওয়া হলো–

১. تَوَاتُرْ لَفْظِىْ -এর সংজ্ঞা : যদি (হাদীসের) শব্দ এবং মতন তাওয়াতুরভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে তাকে تَوَاتُرْ لَفْظِىْ বলে। যেমন– নকলে কুরআন।

২ تَوَاتُرْ مَعْنٰى -এর সংজ্ঞা : যদি (হাদীসের) শব্দ ও মন তাওয়াতুরভাবে নয়; বরং বিভিন্ন রেওয়ায়েতের শব্দ বিভিন্ন, কিন্তু সকল হাদীসের অর্থ এক হয়, তাহলে তাকে تَوَاتُرْ مَعْنَوِىْ বা অর্থগত দিক থেকে تواتر বলে। যেমন– মোজার উপর মাসাহের হাদীস, শাফাআতের হাদীস ইত্যাদি।

وَالثَّانِى وَهُوَ اَوَّلُ اَقْسَامِ الْاَحَادِ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُوْرَةٌ بِاَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِوُضُوْحِهٖ وَهُوَ الْمُسْتَفِيْضُ عَلٰى رَأْىِ جَمَاعَةٍ مِنْ اَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِانْتِشَارِهٖ مِنْ فَاضَ الْمَاءُ يَفِيْضُ فَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بَيْنَ الْمُسْتَفِيْضِ وَالْمَشْهُوْرِ بِاَنَّ الْمُسْتَفِيْضَ يَكُوْنُ فِىْ اِبْتِدَائِهٖ وَانْتِهَائِهٖ سَوَاءً وَالْمَشْهُوْرُ اَعَمُّ مِنْ ذٰلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ عَلٰى كَيْفِيَّةٍ اُخْرٰى وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هٰذَا الْفَنِّ ثُمَّ الْمَشْهُوْرُ يُطْلَقُ عَلٰى مَا حَرَّرْنَا وَعَلٰى مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْاَلْسِنَةِ فَيَشْمَلُ مَالَهُ اِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا بَلْ مَا لَا يُوْجَدُ لَهُ اِسْنَادٌ اَصْلًا ـ

অনুবাদ : খবরের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে খবরে মাশহূর। আর এ খবরে মাশহূরটি হলো খবরে ওয়াহিদের তিন প্রকারের প্রথম প্রকার। আর তা হলো, ঐ খবর যার সনদ দুয়ের অধিক (তথা সর্বনিম্ন ৩ বা তার চেয়ে বেশি) হয়ে সীমিত হয়। সুস্পষ্ট এবং প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে তাকে মাশহূর নাম রাখা হয়েছে। ফকীহগণের একশ্রেণির মতে এর নাম মুসতাফীয। (চারদিকে) ছড়িয়ে পড়া এবং ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে তাকে মুসতাফীয নামকরণ করা হয়েছে। فَاضَ الْمَاءُ يَفِيْضُ فَيْضًا এ প্রবাদ বাক্য থেকে এ নামটি উদ্ভূত। অর্থাৎ পানি চতুর্দিকে খুব ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের অনেকে মাশহূর ও মুসতাফীযের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, যে হাদীসের সনদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমান সংখ্যক, তাকে মুসতাফীয বলে। আর মাশহূর হলো এর চেয়ে ব্যাপক। (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদ সংখ্যা সমান হওয়া শর্ত নয়; বরং দুয়ের অধিক থাকলেই চলবে।) অনেকে আবার অন্যভাবে পার্থক্য করেছেন। এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়।

যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, এটিই মাশহূর হাদীসের মূল পরিচয়। তবে অনেক সময় মাশহূর হাদীস বলতে বুঝানো হয়– যা মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। সে হিসেবে যে হাদীসের মাত্র একটি সনদ রয়েছে এমনকি যার কোনো সনদই নেই, তাও মাশহূর শ্রেণির অন্তর্গত হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالثَّانِىْ ... وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ : এখানে اَلثَّانِىْ শব্দটি مُبْتَدَأٌ আর وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ হলো তার খবর। তবে খবরের শুরুতে هُوَ যমীর নিয়ে আসার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এখানে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে যথেষ্ট বাক্যের ব্যবধান রয়েছে।

وَهُوَ اَوَّلُ اَقْسَامِ الْاَحَادِ : এটা হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ -

مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُوْرَةٌ : এটা হলো বদল। মুবদাল মিনহু হলো وَهُوَ اَوَّلُ اَقْسَامِ الْاَحَادِ ।

فَاضَ الْمَاءُ يَفِيْضُ فَيْضًا : এটি একটি আরব্য প্রবাদ বাক্য। যখন পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাগ-বাগিচা প্লাবিত হয়ে যায়, তখন এ বাক্যটি বলা হয়। এখানে مُسْتَفِيْضٌ শব্দের অর্থ ও ক্রিয়ামূল বুঝাতে এ

প্রবাদ বাক্যটি উল্লিখিত হয়েছে। نَيْضًا শব্দ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটা بَابُ ضَرَبَ -এর অর্থ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بَيْنَ ... : এখানে مِنْهُمْ -এর যমীর ফিরেছে পূর্ববর্তী اَئِمَّةُ الْفُقَهَاءِ -এর প্রতি। অর্থাৎ ফকীহগণের থেকে কিছু লোক।

খবরে মাশহূর প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে সম্মানিত লেখক তিনটি আলোচনার অবতারণা করেছেন। ১. সংজ্ঞা এবং নামকরণের কারণ, ২. মাশহূর ও মুসতাফীযের মধ্যে পার্থক্য ও ৩. মাশহূরের প্রকারভেদ। তবে আরো **দুটি বিষয়ের** অবতারণা হলে আলোচনাটি পূর্ণ হতো। যথা- ১. মাশহূরের হুকুম। অবশ্য লেখক এ **হুকুম** সম্পর্কে পরে আলোচনা করবেন ও ২. মাশহূরের উদাহরণ। নিম্নে পর্যায়ক্রমে লেখক কর্তৃক আলোচিত ৩টি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

মাশহূরের আভিধানিক সংজ্ঞা : اَلْمَشْهُوْرُ শব্দটি اِسْم مَفْعُوْل -এর সীগাহ। এর অর্থ- পরিচিত, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।

মাশহূরের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় মাশহূর বলে প্রত্যেক ঐ খবরকে যার রাবী প্রতি তবকায় কমপক্ষে তিনজন বা তার চেয়ে বেশি হয় এবং তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তাবলি না থাকে।

আরবিতে حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَاَكْثَرَ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ অর্থাৎ মাশহূর ঐ হাদীসকে বলে যার সনদের প্রতি স্তরে তিনজন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেন এবং তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে না।

মাশহূর-এর নামকরণ : اَلْمَشْهُوْرُ অর্থ- প্রসিদ্ধ। যেহেতু মানুষের মাঝে এ হাদীসের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি অর্জিত হয়, তাই এ জাতীয় হাদীসকে মাশহূর বলা হয়।

মুসতাফীয-এর নামকরণ : মাশহূরের অপর নাম মুসতাফীয। একে এ নামকরণের কারণ হলো, মুসতাফীয মানে ছড়িয়ে পড়া, প্রসারিত। যেহেতু এ হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করে চারদিকে (বানের পানির মতো) ছড়িয়ে পড়ে, এ জন্য তাকে মুসতাফীয বলা হয়।

মাশহূরের উদাহরণ : এর উদাহরণ হিসেবে **মুসলিম** শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়. হলো- مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালো কাজ বা বিষয়ের পথ দেখায়, সেও ভালো কাজকারীর মতো ছওয়াব পায়।

মাশহূর ও মুসতাফীযের মধ্যে পার্থক্য : اَلْمَشْهُوْرُ এবং اَلْمُسْتَفِيْضُ -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? এ ব্যাপারে তিন ধরনের অভিমত রয়েছে। যথা-

১. **কতিপয় ফকীহ্ -এর অভিমত :** তাদের মতে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেই مَشْهُوْرٌ সেই مُسْتَفِيْض - এদের মধ্যে نِسْبَتْ تَسَاوِىْ -এর সম্পর্ক।

২. **কিছু ফকীহ্ -এর অভিমত :** তবে কিছু ফকীহ্ বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর তা হলো-

ক. মুসতাফীয ঐ খবর, যার সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাবীদের সংখ্যা একই সমান থাকে।

খ. আর মাশহূর হলো এর চেয়ে ব্যাপক। অর্থাৎ তাতে রাবীর সংখ্যা সমান হওয়া জরুরি নয়। বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে। তবে তিন -এর কম হলে হবে না। অতএব এ হিসেবে এ ফকীহ্গণের মতে এতদুভয়ের মধ্যে عَامْ خَاصْ مُطْلَقْ-এর নিসবত রয়েছে। مُسْتَفِيْض টা খাস আর اَلْمَشْهُوْر টা হলো عَامْ।

৩. আর কিছু ফকীহ্ -এর অভিমত : কিছু ফকীহ বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে نِسْبَتْ تَبَايُنْ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আর তা হলো−

ক. اَلْمَشْهُوْر -এর মধ্যে রাবীর সংখ্যা ধর্তব্য। অর্থাৎ প্রতি স্তরে রাবী কমপক্ষে তিনজন বা তার বেশি হতে হবে।

খ. আর مُسْتَفِيْض -এর মধ্যে রাবীর সংখ্যা কোনো ধর্তব্য নয়; বরং এখানে মূল দেখার বিষয় হলো, মানুষ তাকে কবুল করেছে কিনা। যদি অনেক মানুষ কবুল করে নেয়, তাহলে তা মুসতাফীয।

মাশহূরের প্রকারভেদ : মাশহূর মোট দু প্রকার। ১. মাশহূরে ইসতিলাহী ও ২. মাশহূরে লুগাবী। নিম্নে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো−

১. মাশহূরে ইসতিলাহী -এর সংজ্ঞা : কিতাবে মাশহূরের যে সংজ্ঞাটি উল্লিখিত হয়েছে সেটি مَشْهُوْر اِصْطِلَاحِيْ -এর সংজ্ঞা। আর তা হলো, প্রত্যেক ঐ খবর যার সনদের কোনো স্তরে তিন-এর কম রাবী না হয় এবং তার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্ত পাওয়া যায় না।

২. মাশহূরে লুগাবী-এর সংজ্ঞা : কখনো আভিধানিক অর্থ (প্রসিদ্ধ) বিবেচনায় ঐ খবরকেও মাশহূর বলা হয়, যেটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চাই তার রাবী তিনজন হোক বা বেশি হোক এমনকি তার কোনো সনদ না থাকলেও সেটা মাশহূর।

مَشْهُوْر لُغَوِيْ এবং مَشْهُوْر اِصْطِلَاحِيْ-এর মধ্যে عَامْ خَاصْ مُطْلَقْ-এর সম্পর্ক। مَشْهُوْر لُغَوِيْ টা عَامْ আর مَشْهُوْر اِصْطِلَاحِيْ টা খাস। কেননা مَشْهُوْر لُغَوِيْ-এর মধ্যে عَزِيْز وَغَرِيْب সব রয়েছে। কিন্তু مَشْهُوْر اِصْطِلَاحِيْ -এর মধ্যে عَزِيْز وَغَرِيْب নেই।

وَالثَّالِثُ اَلْعَزِيْزُ وَهُوَ اَنْ لَا يَرْوِيَهُ اَقَلَّ مِنْ اِثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ وَسُمِّيَ بِذٰلِكَ اِمَّا لِقِلَّةِ وُجُوْدِهِ وَاِمَّا لِكَوْنِهِ اَعَزَّ اَيْ قَوِيَ بِمَجِيْئِهِ مِنْ طَرِيْقٍ اُخْرٰى وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيْحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَهُوَ اَبُوْ عَلِيِّ الْجُبَّائِيُّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَاِلَيْهِ يُوْمِيْ كَلَامُ الْحَاكِمِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ اَلصَّحِيْحُ هُوَ الَّذِيْ يَرْوِيْهِ الصَّحَابِيُّ الزَّائِلُ عَنْهُ اِسْمُ الْجَهَالَةِ بِاَنْ يَّكُوْنَ لَهُ رَاوِيَانِ ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ اَهْلُ الْحَدِيْثِ اِلٰى وَقْتِنَا كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَصَرَّحَ الْقَاضِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيُّ فِيْ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ بِاَنَّ ذٰلِكَ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ ، وَاَجَابَ عَمَّا اُوْرِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ بِجَوَابٍ فِيْهِ نَظَرٌ، لِاَنَّهُ قَالَ فَاِنْ قِيْلَ حَدِيْثُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فَرْدٌ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ اِلَّا عَلْقَمَةُ ، قُلْنَا قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ ، وَلَوْلَا اَنَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهُ لَاَنْكَرُوْهُ ، كَذَا قَالَ ، وَتُعُقِّبَ بِاَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوْا عَنْهُ اَنْ يَّكُوْنُوْا سَمِعُوْهُ مِنْ غَيْرِهِ۔

অনুবাদ : খবরের তৃতীয় প্রকারের নাম আযীয। এ হচ্ছে– যে খবর কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি থেকে দুইজন ব্যক্তি বর্ণনা করেন অর্থাৎ সনদের প্রতি স্তরে কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি থাকবেন, তাকে বলা হয় আযীয।

আযীয শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে– স্বল্প ও শক্তিশালী। এ ধরনের (আযীযের) খবরের সংখ্যা একেবারেই স্বল্প। আবার একাধিক সনদের কারণে এ খবর তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী। এ দ্বিবিধ অর্থের যে কোনোটি বিচারে এর নামকরণ হতে পারে। কোনো হাদীস সহীহ বলে গণ্য হবার জন্য কমপক্ষে [illegible]ীয শ্রেণীর হতে হবে– এরূপ কোনো শর্ত নেই। অবশ্য কেউ কেউ এরূপ মনে করেন। যেমন– মু[illegible] মতবাদের আবূ আলী জুব্বায়ী। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ (র.) -এর বক্তব্যও এদিকে ইঙ্গিত করে। তি[illegible]ার 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে বলেছেন– "সহীহ হাদীস হলো– যা এমন একজন সাহাবী বর্ণনা করবেন যা[illegible] অপরিচিতি দূর হয়েছে এভাবে যে, তাঁর নিকট থেকে কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি বর্ণনা করবেন অতঃপর হাদীস চর্চাকারীগণ পর্যায়ক্রমে আমাদের সময় পর্যন্ত গ্রহণ করবেন। যেমন– সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য।"

কাজি আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটি (আযীয হওয়া) ইমাম বুখারীর শর্ত ছিল। তাঁর এ বক্তব্যের উপর যে প্রশ্ন উঠতে পারে তিনি তার একটি জবাব দিয়েছেন। কিন্তু সে উত্তরও প্রশ্নাতীত নয়। তিনি বলেন– যদি প্রশ্ন করা হয় যে, (ইমাম বুখারীর) নিয়ত সংক্রান্ত (প্রথম) হাদীসটি তো এক সনদবিশিষ্ট। কেননা, হযরত ওমর (রা.) থেকে হযরত আলকামা (র.) ব্যতীত আর কেউ এটা বর্ণনা করেননি। তাহলে আমরা বলবো– হযরত ওমর (রা.)

মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে। তারা যদি এটা না জানতেন, তাহলে তারা দ্বিমত প্রকাশ করতেন।

এই হলো কাজি আবূ বকরের বক্তব্য। এর সমালোচনায় বলা যায়, তাঁরা (সাহাবীরা) সবাই নীরব ছিলেন বলে এরূপ সাব্যস্ত হয় না যে, তাঁরা অন্যের নিকট এটি শুনেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهُوَ اَنْ لَّا يَرْوِيْهِ اَقَلَّ مِنْ : এ সংজ্ঞার উপর অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন যে, এ সংজ্ঞা তো مُتَوَاتِرْ এবং مَشْهُوْر-এর উপর صَادِقْ আসে। কেননা, সেগুলোও দুয়ের অধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়। তাই তারা عَزِيْز-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন– هُوَ مَا يَرْوِيْهِ اِثْنَانِ وَلَوْ فِىْ طَبَقَةٍ আযীয ঐ خَبَرْ কে বলে, যার কোনো এক তবকায় হলেও দুজন রাবী বর্ণনা করে।

كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ : এর সুরত হলো, কোনো এক মামলায় আদালতে আসল সাক্ষীকে উপস্থিত করা সম্ভব না হলে তখন ঐ সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে দুজন সাক্ষী। তারা আদালতে বলবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই মামলায় অমুক সাক্ষী।

ব্যাখ্যাকারদের কেউ কেউ বলেছেন, এটা সম্ভবত ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব মোতাবেক। নতুবা হানাফী মাযহাব মতে এক সাক্ষীর পক্ষে একজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট, দুজন প্রয়োজন হয় না।

আযীযের আভিধানিক অর্থ : اَلْعَزِيْزُ-এর অর্থ দুটি হতে পারে।

১. قَلِيْل তথা কম ও ২. قَوِىْ তথা শক্তিশালী। اَلْعَزِيْزُ শব্দটি দুই বাব থেকে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. عَزَّ يَعِزُّ তথা বাবে ضَرَبَ থেকে। তখন অর্থ হবে– কম হওয়া। যেহেতু এ রকম খবরের অস্তিত্ব কম সেহেতু একে আযীয বলা হয়।

২. عَزَّ يَعُزُّ তথা বাবে نَصَرَ থেকে। তখন অর্থ হবে– শক্তিশালী হওয়া। যেহেতু এ খবর অন্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়ায় অধিকতর শক্তিশালী হয়, তাই একে আযীয বলা হয়।

আযীযের পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় عَزِيْز ঐ খবরকে বলা হয় যার সনদের কোনো এক স্থানে অথবা সকল স্থানে রাবীর সংখ্যা দুজন হয়। যদি কোনো স্থানে রাবীর সংখ্যা দুয়ের অধিক হয়, তাহলে এতে ঐ খবর عَزِيْز হতে কোনো অসুবিধা নেই। দেখার বিষয় হলো কোনো এক স্থানে হলেও রাবীর সংখ্যা দুই কিনা। যদি দুই হয়, তাহলে অপর স্থানে যতই বেশি হোক না কেন তা عَزِيْز-ই হবে।

আরবিতে خَبَرْ عَزِيْز-এর সংজ্ঞা : هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ اِثْنَانِ وَلَوْ فِىْ طَبَقَةٍ

অর্থাৎ কোনো একটি স্তরে হলেও যে হাদীসের রাবী দুজন হয়, তাকে خَبَرْ عَزِيْز বলে।

খবর সহীহ হওয়ার জন্য আযীযের শর্তারোপ : খবর সহীহ হতে হলে আযীয হতে হবে কিনা, নাকি গরীব হলেও সহীহ হতে পারে– এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন–

১. মু'তাযিলা মতবাদের নেতা ইমাম আবূ আলী জুব্বায়ী -এর অভিমত হলো, খবর সহীহ হতে কমপক্ষে আযীয হওয়া শর্ত। ফলে তার মতে গরীব হাদীস সহীহ নয়।

হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ তার কিতাবে সহীহ -এর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন যে, সহীহ ঐ হাদীস যাকে মাশহূর সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন অতঃপর তার থেকে দুজন রাবী অতঃপর প্রত্যেক রাবী থেকে দুজন বর্ণনা করবে এভাবে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছবে। বিষয়টির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি شَهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِ তথা এক সাক্ষীর জন্য দুজন সাক্ষী হওয়া-এর কথা বলেছেন– যা প্রমাণ করে যে, তার মতে সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত।

২. তবে জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মত হলো, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য عَزِيْز হওয়া শর্ত নয়; বরং গরীব হাদীসও সহীহ হতে পারে। যার বড় প্রমাণ বুখারী শরীফের প্রথম اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসটি। কারণ, এ হাদীসটি সকলের মতে সহীহ। অথচ তা গরীব। অনুরূপভাবে বুখারীর শেষ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ... হাদীসটিও গরীব।

এ দু দলের মধ্যে জুমহুরের মাযহাবই সত্য এবং সঠিক। কারণ, সামনে সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা আসছে। অথচ সেখানে গরীব না হওয়ার কোনো শর্ত নেই।

আযীয হওয়া বুখারীর শর্ত কিনা? কোনো হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করার জন্য তা আযীয হওয়া শর্ত নাকি ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে গরীব হাদীসও উল্লেখ করেছেন– এ ব্যাপারে কাজি আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এটা ইমাম বুখারীর শর্ত। তবে জুমহুরের মত [illegible] খবর আযীয হওয়া ইমাম বুখারীর শর্ত নয়। এর বড় দলিল বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস– [illegible] بِالنِّيَّاتِ [illegible] اِنَّمَا কেননা, এটা গরীব হয়েও বুখারীতে উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপ শেষ হাদীস– .... [illegible] خَفِيْفَتَانِ [illegible] ও বড় দলিল। কেননা, সেটাও গরীব। এজন্য ইবনে রুশাইদ বলেন, ইবনুল আরাবীর দাবি ভুল প্রমাণের [illegible] বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসটিই যথেষ্ট। কেননা, নিয়তের এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুধু হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) থেকে শুধু আলকামা (র.) বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য ইবনুল আরাবী (র.) জুমহুরের দলিলের জবাব এভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সামনে খুতবা দানকালে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আলকামা (র.) এ সময় অন্যান্য সাহাবীদের সাথে উপস্থিত থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেন। তাই যদি অন্য কোনো সাহাবী এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে না শুনতেন, তাহলে তারা এর প্রতিবাদ করতেন। অথচ সবাই নীরব ছিলেন। সুতরাং অন্য যে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং অনুরূপ আলকামার সাথিদের মধ্য হতে যারা এ হাদীসটি হযরত ওমর (রা.) হতে শুনেছেন, তারা রেওয়ায়েত করার মধ্যে শরিক হয়ে গেলেন। অতএব, এ হাদীসটি গরীব নয়; বরং আযীযই। অতএব, বুখারীর শর্ত মোতাবেক হলো।

কিন্তু ইবনুল আরাবীর এ উত্তর দু কারণে ঠিক নয়।

১. সাহাবায়ে কেরামের চুপ থাকাটা এর দলিল নয় যে, তাঁরাও রাসূল ﷺ থেকে হাদীসটি শুনে থাকবেন। এতদ্ব্যতীত আযীয হওয়ার জন্য শোনা শর্ত না. বরং দুই রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া শর্ত, যা এখানে অনুপস্থিত।

وَبِأَنَّ هٰذَا لَوْ سُلِّمَ فِیْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مُنِعَ فِیْ تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ عَنْهُ، ثُمَّ تَفَرَّدَ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ بِهٖ عَنْ عَلْقَمَةَ ، ثُمَّ تَفَرَّدَ یَحْیَی بْنَ سَعِیْدٍ بِهٖ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلٰی مَا هُوَ الصَّحِیْحُ الْمَعْرُوْفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِیْنَ ، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابِعَاتٌ لَا یُعْتَبَرُ بِهَا ، وَكَذَا لَا نُسَلِّمُ جَوَابَهٗ فِیْ غَیْرِ حَدِیْثِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ رَشِیْدٍ وَلَقَدْ كَانَ یَكْفِی الْقَاضِیَ فِیْ بُطْلَانِ مَا ادَّعٰی اَنَّهٗ شَرْطُ الْبُخَارِیِّ اَوَّلُ حَدِیْثٍ مَذْكُوْرٍ فِیْهِ وَادَّعٰی ابْنُ حِبَّانَ نَقِیْضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ اِنَّ رِوَایَةَ اِثْنَیْنِ عَنْ اِثْنَیْنِ اِلٰی اَنْ یَّنْتَهِیَ لَا یُوْجَدُ اَصْلًا ، قُلْتُ اِنْ اَرَادَ اَنَّ رِوَایَةَ اِثْنَیْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَیْنِ فَقَطْ اِلٰی اَنْ یَنْتَهِیَ لَا یُوْجَدُ اَصْلًا فَیُمْكِنُ اَنْ یُّسَلَّمَ ، وَاَمَّا صُوْرَةُ الْعَزِیْزِ الَّتِیْ حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُوْدَةٌ بِاَنْ لَا یَرْوِیَهٗ اَقَلُّ مِنْ اِثْنَیْنِ عَنْ اَقَلَّ مِنْ اِثْنَیْنِ ، وَمِثَالُهٗ مَا رَوَاهُ الشَّیْخَانِ مِنْ حَدِیْثِ اَنَسٍ (رض) وَالْبُخَارِیُّ مِنْ حَدِیْثِ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰی اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ اَلْحَدِیْثُ وَ رَوَاهُ عَنْ اَنَسٍ قَتَادَةُ وَعَبْدُ الْعَزِیْزِ بْنُ صُهَیْبٍ وَ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ شُعْبَةُ وَسَعِیْدٌ وَ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیْزِ اِسْمَاعِیْلُ بْنُ عُلَیَّةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَ رَوَاهُ عَنْ كُلٍّ جَمَاعَةٌ وَالرَّابِعُ الْغَرِیْبُ وَهُوَ مَا یَتَفَرَّدُ بِرِوَایَتِهٖ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِیْ اَیِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهٖ مِنَ السَّنَدِ عَلٰی مَا سَیُقَسَّمُ اِلَیْهِ الْغَرِیْبُ الْمُطْلَقُ وَالْغَرِیْبُ النِّسْبِیُّ ۔

অনুবাদ : দ্বিতীয়ত হযরত ওমর (রা.)-এর বেলায় হয়তো মানা গেল যে, তিনি এর একমাত্র বর্ণনাকারী নন। কিন্তু তাঁর নিকট থেকে তো একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন আলকামা; অতঃপর তাঁর নিকট থেকে একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম এবং অতঃপর তার নিকট থেকে একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ। মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট এটিই এ হাদীসের প্রসিদ্ধ সনদ। অবশ্য প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর মুতাবি' বা সহযোগী রয়েছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় মতে তা বিবেচ্য নয়। তেমনি হযরত ওমর (রা.) ব্যতীত অন্যদের বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে কাজি সাহেবের জবাব টিকে না। ইবনে রুশাইদ বলেন– কাজি আবূ বকর যে এটি ইমাম বুখারীর শর্ত বলে দাবি করেছেন, তা অসার হবার জন্য বুখারী শরীফে বর্ণিত প্রথম হাদীসটিই যথেষ্ট। ইবনে হিব্বান তার দাবির বিপরীত দাবি করেছেন। তিনি বলেন– "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে দুজন থেকে দুজনের বর্ণনা আদৌ পাওয়া যাবে না।" ইবনে হিব্বানের বক্তব্যের অর্থ যদি হয়, "মাত্র দুজন থেকে দুজন বর্ণনা করবেন– এভাবে শেষ পর্যন্ত আসবে– এরূপ হাদীস আদৌ পাওয়া যাবে না" –তাহলে তা মানা যেতে পারে। কিন্তু আযীয হাদীসের যে

ধরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরে কমপক্ষে দুজন বর্ণনাকারী থাকবেন– তা অনেক পাওয়া যায়।

আযীয হাদীসের উদাহরণ– বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে এবং বুখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিক প্রিয় হই তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে।”

হযরত আনাস (রা.) হতে এটি বর্ণনা করেছেন কাতাদা ও আব্দুল আযীয ইবনে সুহাইব, কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন শু'বা ও সাঈদ এবং আব্দুল আযীয থেকে ইসমাঈল ইবনে উলায়্যা ও আব্দুল ওয়ারিছ। অতঃপর প্রত্যেকের নিকট থেকে একদল লোক এটি বর্ণনা করেছেন।

খবরের চতুর্থ প্রকারের নাম গরীব। তা হলো– যে খবর একক ব্যক্তির বর্ণিত। সনদের যে কোনো স্থানে এই এককত্ব আসতে পারে। অবশ্য সকল স্তরে একজন রাবী থাকলে, তাকে গরীবে মুতলাক (غَرِيْبٌ مُطْلَقٌ) বলে আর স্থানবিশেষে একজন রাবী থাকলে, তাকে গরীবে নিসবী (غَرِيْبٌ نِسْبِيٌّ) বলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, হযরত ওমর (রা.) অনুরূপ হযরত আলকামার সাথে হাদীস রেওয়ায়েতে অন্যে শরিক আছেন, কিন্তু তার পরে যে রাবী আছেন তিনি তো গরীব। কেননা, আলকামা হতে শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আর তার থেকে শুধুমাত্র ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রেওয়ায়েত করেন। এটাই এ হাদীসের প্রসিদ্ধ সনদ। হ্যাঁ তবে এ সমস্ত রাবীর মুতাবি' আছেন। তবে তা ধর্তব্য নয় বিধায় আযীয হওয়া বুখারীর শর্ত থাকল না।

ইবনে হিব্বানের দাবি বনাম লেখকের অভিমত : ইবনে হিব্বান এ ব্যাপারে ইবনুল আরাবীর বিপরীত দাবি করেছেন যে, কোনো হাদীস এমন নেই, যার রেওয়ায়েত প্রতি স্তরে দুজন দুজন থেকে হয়েছে। এভাবে স[illegible]ব শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সম্মানি[illegible] দাবির প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ইবনে হিব্বানের উক্তির অর্থ যদি এই হয় যে, দু[illegible] দুজনের রেওয়ায়েত– এভাবে শেষ পর্যন্ত হবে, তাহলে তার কথা মেনে নেওয়া যায় যে, এরূপ হাদীসে[illegible]ত নেই। কিন্তু যদি তার কথার উদ্দেশ্য এই হয় যে, আযীয হলো, প্রত্যেক স্তরে কমপক্ষে দুজন রাবী হবে[illegible], [illegible]াঁ তবে কোথাও বেশি হলে ক্ষতি নেই, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে ইবনে হিব্বানের কথা ঠিক নয়। কারণ, এমন হাদীস বাস্তবে অনেক আছে। এর একটি উদাহরণ হলো– لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এ হাদীসটি। এটি বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) হতে। আর শুধু বুখারীতে অন্যস্থানে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে।

عَلٰى مَا سَيُقْسَمُ : এর দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য যে, গরীবের প্রকারভেদ এখানে বর্ণনা করা হবে না; বরং তা সামনে আসবে।

اَلْغَرِيْبُ الْمُطْلَقُ : এটা তারকীবে উহ্য মুবতাদার খবর। আর সে মুবতাদা হলো هُوَ যমীর। وَالْغَرِيْبُ النِّسْبِيُّ এটা عطف হয়েছে اَلْغَرِيْبُ الْمُطْلَقُ -এর উপরে। আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف মিলে হলো مَا سَيُقْسَمُ اِلَيْهِ -এর বয়ান। سَيُقْسَمُ -এর যমীর ফিরেছে اَلْغَرِيْبُ -এর দিকে। পূর্ণ ইবারত হবে এরূপ– عَلٰى مَا سَيُقْسَمُ الْغَرِيْبُ اِلَيْهِ وَهُوَ الْغَرِيْبُ الْمُطلق وَالْغَرِيْبُ النِّسْبِيُّ

وَالْغَرِيْبُ النِّسْبِيُّ : শব্দটির সহীহ উচ্চারণ 'নিসবী'। ব্যক্তি বিশেষের কারণে গরীব হওয়ায় তাকে গরীবে নিসবী বলা হয়।

وَكُلُّهَا اَىْ اَلْاَقْسَامُ الْاَرْبَعَةُ الْمَذْكُوْرَةُ سِوَى الْاَوَّلِ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ اٰحَادٌ، وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَبَرُ وَاحِدٍ ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ فِى اللُّغَةِ مَا يَرْوِيْهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَفِى الْاِصْطِلَاحِ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوْطَ التَّوَاتُرِ ، وَفِيْهَا اَىْ فِى الْاٰحَادِ الْمَقْبُوْلُ وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ ، وَفِيْهَا الْمَرْدُوْدُ وَهُوَ الَّذِىْ لَمْ يُرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ لِتَوَقُّفِ الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ اَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُوْنَ الْاَوَّلِ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ فَكُلُّهُ مَقْبُوْلٌ لِاِفَادَتِهِ الْقَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ اَخْبَارِ الْاٰحَادِ لٰكِنْ اِنَّمَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمَقْبُوْلِ مِنْهَا لِاَنَّهَا اِمَّا اَنْ يُوْجَدَ فِيْهَا اَصْلُ صِفَةِ الْقَبُوْلِ وَهُوَ ثُبُوْتُ صِدْقِ النَّاقِلِ اَوْ اَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ وَهُوَ ثُبُوْتُ كِذْبِ النَّاقِلِ اَوْ لَا فَالْاَوَّلُ يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقَ الْخَبَرِ لِثُبُوْتِ صِدْقِ نَاقِلِهِ فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَالثَّانِىْ يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ كِذْبَ الْخَبَرِ لِثُبُوْتِ كِذْبِ نَاقِلِهِ فَيُطْرَحُ وَالثَّالِثُ اِنْ وُجِدَتْ قَرِيْنَةٌ تُلْحِقُهُ بِاَحَدِ الْقِسْمَيْنِ اُلْتُحِقَ بِهِ وَاِلَّا فَيُتَوَقَّفُ فِيْهِ وَاِذَا تُوُقِّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ صَارَ كَالْمَرْدُوْدِ لَا لِثُبُوْتِ صِفَةِ الرَّدِّ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ يُوْجَدْ صِفَةٌ تُوْجِبُ الْقَبُوْلَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : প্রথমটি অর্থাৎ মুতাওয়াতির ব্যতীত অবশিষ্ট (তিন) প্রকারগুলোকে এক নামে খবরে আহাদ বলে। আর তিন প্রকারের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে বলে খবরে ওয়াহিদ। খবরে ওয়াহিদের আভিধানিক অর্থ– যা এক ব্যক্তির বর্ণিত। আর পরিভাষায় এর অর্থ– যে হাদীসে মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহ অনুপস্থিত।

খবরে ওয়াহিদ দু প্রকার। যথা– ১. মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। জুমহুরের মতে এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। ২. মারদূদ বা পরিত্যাজ্য। যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সত্যতা প্রবলতর নয়– তা এ শ্রেণীর অন্তর্গত

এরূপ (চার প্রকার খবরের মধ্যে) শ্রেণিকরণের কারণ হলো, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল পেশ করতে হলে তা নির্ভর করে এর বর্ণনাকারীদের অবস্থা পর্যালোচনার উপর। কিন্তু প্রথমটি অর্থাৎ মুতাওয়াতির এমন নয়। এর প্রত্যেকটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা, এর বর্ণনাকারীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ এর ব্যতিক্রম। তা সত্ত্বেও মাকবূল শ্রেণির খবরে ওয়াহিদ মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব হবার কারণ হলো– যদি এতে গ্রহণযোগ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য তথা বর্ণনাকারীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে প্রবল ধারণা হয় হাদীসটি সত্য হবার। তাই সে মোতাবেক আমল করতে হয়। আর যদি তাতে প্রত্যাখ্যানের মূল বৈশিষ্ট্য তথা বর্ণনাকারীর মিথ্যাবাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে প্রবল ধারণা হয় হাদীসটি মিথ্যা হবার। তাই তা পরিহার করা হয়। তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ যেখানে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান কোনোটিরই মূল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না– এরূপ ক্ষেত্রে কোনো নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রথমোক্ত দু শ্রেণির

অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত না হলেও তা কোথাও দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না। কোনো খবরের উপর আমল স্থগিত হলে তা মারদূদ বা প্রত্যাখ্যানের মতো হয়ে যাবে। তবে এ প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা তার মধ্যে প্রত্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্য পাওয়ার কারণে নয়; বরং গ্রহণের বৈশিষ্ট্য না পাওয়ার কারণে। আল্লাহ অধিক অবগত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَقْبُوْلُ وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهٖ : এর দ্বারা মু'তাযিলাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্য। কারণ তারা বলেন, খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব নয়।

খবরে ওয়াহিদের আভিধানিক অর্থ : অভিধানে খবরে ওয়াহিদ অর্থ– এক ব্যক্তির খবর। অর্থাৎ ঐ খবর, যা এক ব্যক্তি বর্ণনা করে। যেহেতু এটা সর্বনিম্ন এক ব্যক্তি বর্ণনা করে, তাই একে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়।

খবরে ওয়াহিদের পারিভাষিক অর্থ : আরবিতে خَبَرُ وَاحِدٍ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ لَمْ يَجْمَعْ فِيْهِ شَرَائِطُ التَّوَاتُرِ

পরিভাষায় খবরে ওয়াহিদ ঐ খবরকে বলে, যার মধ্যে মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহ অনুপস্থিত থাকে বা পাওয়া যায় না।

খবরে ওয়াহিদের প্রকারভেদ এবং সীমাবদ্ধতার কারণ (وَجْهُ حَصْر) : খবরে ওয়াহিদ মাশহূর হোক, আযীয [illegible]ক কিংবা গরীব– তা দু প্রকার। কতিপয় মাকবূল অর্থাৎ আমলযোগ্য আর কিছু হলো মারদূদ তথা [illegible] ও আমলের অযোগ্য। এ দুপ্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, খবরে ওয়াহিদের মধ্যে কবুলের [illegible] তথা রাবীর সত্যবাদিতা পাওয়া যাবে অথবা প্রত্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্য তথা রাবীর অসত্যবাদিতা [illegible] যাবে। অথবা, এ দুটির কোনোটিই পাওয়া যাবে না। প্রথম প্রকারকে মাকবূল বলে আর দ্বিতীয়টি হলো ম[illegible]। আর তৃতীয় অর্থাৎ যার মধ্যে গ্রহণ কিংবা বর্জনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না– এটা আবার দু প্রকার। হয়[illegible] তার সাথে কবুল বা রদের কোনো নিদর্শন পাওয়া যাবে অথবা পাওয়া যাবে না। যদি কবুলের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহলে কবুলের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর রদের বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তার সাথে এমন কোনো নিদর্শনও না থাকে, তাহলে খবরটির উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে। আর যখন আমল স্থগিত হয়ে গেল, তখন সেটা কার্যত মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল।

মোটকথা, خَبَرُ وَاحِدٍ ৪ প্রকার হয়। যথা–

১. খবরের মধ্যে কবুলের সিফাত পাওয়া গেলে তা মাকবূল হবে।
২. খবরের মধ্যে রদের সিফাত পাওয়া গেলে তা মারদূদ হবে।
৩. যার নিদর্শন পাওয়া যাবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।
৪. নিদর্শন না পাওয়া গেলে মারদূদ হবে।

তবে এ মারদূদ হওয়াটা তার মধ্যে রদের সিফাত পাওয়া যাবার কারণে নয়; বরং কবুলের সিফাত তার মধ্যে না পাওয়া যাওয়ার কারণে। অতএব মোট খবর দুই প্রকারই– মাকবূল ও মারদূদ।

জুমহুরের মতে মাকবূল বলে– যার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয়, আর মারদুদ হলো– যার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয় না।

খবরে মুতাওয়াতির ও খবরে আহাদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ : আগেই বলা হয়েছে, ৪ প্রকার খবরের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ খবরে মুতাওয়াতির ছাড়া বাকি তিন প্রকার অর্থাৎ মাশহূর, আযীয ও গরীবকে একত্রে খবরে আহাদ বলা হয়। এই মুতাওয়াতির ও আহাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, খবরে মুতাওয়াতিরের উপর সর্বাবস্থায় আমল করা ওয়াজিব। কারণ, তার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে না, কিন্তু খবরে আহাদ এমনটি না হওয়ায় তার রাবীদের অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। রাবি ভালো হলে তা আমল ওয়াজিব করে আর রাবী ভালো না হলে তথা মিথ্যাবাদী হলে তা আমল ওয়াজিব করে না; বরং তা মারদূদ হয়ে যায়।

وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا اَىْ فِىْ اَخْبَارِ الْاٰحَادِ الْمُنْقَسِمَةِ اِلٰى مَشْهُوْرٍ وَعَزِيْزٍ وَغَرِيْبٍ مَا يُفِيْدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِمَنْ اَبٰى ذٰلِكَ وَالْخِلَافُ فِى التَّحْقِيْقِ لَفْظِيٌّ لِاَنَّ مَنْ جَوَّزَ اِطْلَاقَ الْعِلْمِ قَيَّدَهٗ بِكَوْنِهٖ نَظَرِيًّا وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنِ الْاِسْتِدْلَالِ وَمَنْ اَبَى الْاِطْلَاقَ خَصَّ لَفْظَ الْعِلْمِ بِالْمُتَوَاتِرِ وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهٗ ظَنِّيٌّ لٰكِنَّهٗ لَا يَنْفِىْ اَنَّ مَا احْتُفَّ بِالْقَرَائِنِ اَرْجَحُ مِمَّا خَلَا عَنْهَا.

অনুবাদ : যে খবরে ওয়াহিদ মাশহুর, আযীয ও গরীবের দিকে বিভক্ত হয় তা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী عِلْم نَظَرِىّ-এর ফায়দা দেয়। তবে অনেকে এটা অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে এ মতান্তরটা বাহ্যিক ও শাব্দিক (আসলে কোনো ইখতিলাফ নেই)। কেননা, যারা عِلْم-এর ফায়দা দেয় বলেন, তারা তার সাথে نَظَرِىّ-এর শর্ত যোগ করে বলেন অর্থাৎ عِلْم نَظَرِىّ-এর ফায়দা দেয়। আর যারা عِلْم-এর ফায়দাকে অস্বীকার করেন তারা عِلْم-কে مُتَوَاتِرْ-এর সাথে খাস করেন অর্থাৎ বলেন, عِلْم ضَرُوْرِىْ-এর ফায়দা দেয় কেবল খবরে মুতাওয়াতির। অস্বীকারকারীদের মতে, مُتَوَاتِرْ ছাড়া যত খবর আছে সবই হলো ظَنِّىْ অর্থাৎ ধারণার ফায়দা দেয় মাত্র। তবে তাদের এই অস্বীকারটা এটাকে নিষেধ করে না যে, নিদর্শন বিজড়িত খবরসমূহ নিদর্শনহীন খবরের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য। (অর্থাৎ তারা عِلْمْ ضَرُوْرِىْ-এর ফায়দাকে অস্বীকার করে, عِلْم نَظَرِىّ-এর ফায়দাকে নয়। আর যারা عِلْم-এর ফায়দাকে সাবেত করেন তারাও عِلْم نَظَرِىّ-কেই সাবেত করেন। অতএব কোনো ইখতিলাফ নেই।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খবরে আহাদের হুকুম এবং ফায়দা : পূর্বে বলা হয়েছে যে, খবরে ওয়াহিদ চাই মাশহূর হোক, আযীয হোক কিংবা গরীব– এর মধ্য হতে কিছু মাকবূল আর কিছু মারদূদ। মারদূদ যা তা দলিলের ও আমলের অযোগ্য। আর যা মাকবূল তার হুকুম ও ফায়দা কি তা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন–

১. বিশুদ্ধ মাযহাব হলো, خَبَرْ وَاحِدْ مَقْبُوْل টা عِلْم يَقِيْن نَظَرِىّ-এর ফায়দা দেয়, عِلْم ضَرُوْرِىْ-এর ফায়দা নয়।

২. অনেকে এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, এটা عِلْم-এর ফায়দা দেয় না।

তবে বাস্তব বিচারে এ মতভেদটা বাহ্যিক ও শাব্দিক মাত্র; দু দলের মধ্যে মূলত কোনো ইখতিলাফ নেই। আর তা এভাবে যে, যারা বলেন, এটা عِلْم-এর ফায়দা দেয় না, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো عِلْم ضَرُوْرِىْ। অর্থাৎ মূল বক্তব্য হলো, خَبَرْ وَاحِدْ টা عِلْم ضَرُوْرِىْ-এর ফায়দা দেয় না। কারণ, এটা مُتَوَاتِرْ-এর সাথে খাস। অর্থাৎ কেবল خَبَرْ مُتَوَاتِرْ-ই عِلْمُ ضَرُوْرِىْ-এর ফায়দা দেয়। আর হুবহু এটাই হলো জুমহুরের মাযহাব। কেননা, তারা যে বলেন, خَبَرْ وَاحِدْ টা عِلْم-এর ফায়দা দেয়– এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য عِلْمُ نَظَرِىّ; অতএব উভয় দলের মতামত এক হওয়ায় কোনো ইখতিলাফ থাকে না।

তবে এ ইখতিলাফটা কেবল তখন প্রযোজ্য, যখন خَبَرْ وَاحِدْ-এর সাথে করীনা বা নিদর্শন যুক্ত থাকবে। যদি خَبَرْ وَاحِدْ এই নিদর্শনশূন্য হয়, তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে ظَنْ غَالِبْ-এরই ফায়দা দেয়, عِلْم-এর নয়।

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, যে خَبَرْ وَاحِدْ টা করীনা সংশ্লিষ্ট হয় তা সর্বদা ঐ خَبَرْ وَاحِدْ-এর উপর প্রাধান্য পায় যার সাথে কোনো এমন করীনা নেই। আর করীনা হলো তিনটি। যথা– ১. বুখারী-মুসলিমের রেওয়ায়েত হওয়া, ২. খবরে মাশহূরটা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়া ও ৩. বড় বড় মুহাদ্দিস কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়া। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

وَالْخَبَرُ الْمُحْتَفُّ بِالْقَرَائِنِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا مِمَّا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ ، فَإِنَّهُ اِحْتَفَّ بِهِ قَرَائِنُ مِنْهَا جَلَالَتُهُمَا فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ وَتَقَدُّمُهُمَا فِيْ تَمْيِيْزِ الصَّحِيْحِ عَلٰى غَيْرِهِمَا وَتَلَقِّيْ الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُوْلِ وَهٰذَا التَّلَقِّيْ وَحْدَهُ أَقْوٰى فِيْ إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ إِلَّا أَنَّ هٰذَا يَخْتَصُّ بِمَا لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مِمَّا فِى الْكِتَابَيْنِ وَبِمَا لَمْ يَقَعِ التَّخَالُفُ بَيْنَ مَدْلُوْلَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِى الْكِتَابَيْنِ حَيْثُ لَا تَرْجِيْحَ لِاِسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيْدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيْحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَمَا عَدَا ذٰلِكَ فَالْاِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلٰى تَسْلِيْمِ صِحَّتِهِ.

অনুবাদ : নিদর্শন বিজড়িত হাদীস কয়েক শ্রেণীর। ১. বুখারী ও মুসলিম শরীফে একযোগে বর্ণিত হাদীস, যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে উন্নীত নয়। (কারণ,) এতে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে। ক. হাদীসশাস্ত্রে তাঁদের (বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর) মর্যাদা, খ. হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ে তাদের অগ্রগামিতা ও গ. ওলামায়ে কেরামের নিকট তাঁদের কিতাব দুটি (ব্যাপক) গৃহীত হওয়া। মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত না হলে নিছক সনদের আধিক্যের চেয়ে শুধুমাত্র 'গৃহীত হওয়া' বৈশিষ্ট্যটা কোনো হাদীস দ্বারা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পক্ষে অধিকতর মজবুত দলিল। অবশ্য এ নিয়ম সেই হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– বুখারী ও মুসলিম শরীফের যে হাদীস সম্পর্কে হাফিজুল হাদীসগণ কোনো সমালোচনা করেননি এবং উক্ত দু গ্রন্থের যে দু হাদীসের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে এমন বৈপরীত্য নেই যে, কোনোটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। কেননা, পরস্পর বিরোধী দু হাদীসের মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত সে দুটি দ্বারা সত্যতার জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এ ছাড়া যা (বুখারী ও মুসলিমে) রয়েছে, তা সহীহ বলে মেনে নিতে সকলেই একমত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিদর্শন বিজড়িত খবরে ওয়াহিদের শ্রেণিভেদ : নিদর্শন বিজড়িত খবর তিন প্রকার। যথা–

১. শায়খাইন তথা ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ।

২. ভিন্ন ভিন্ন একাধিক সনদে বর্ণিত খবরে মাশহূর।

৩. গরীব ছাড়া হাফিজে হাদীসগণ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত খবরে ওয়াহিদ। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো–

প্রথম প্রকারের বিবরণ : ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) কর্তৃক **বুখারী ও মুসলিম** শরীফে **বর্ণিত** খবরে ওয়াহিদ চাই তা মাশহূর হোক, কিংবা আযীয কিংবা গরীব– তা **বিভিন্ন কারণে** নিশ্চিত **যৌক্তিক** জ্ঞানের ফায়দা দেয়। যথা–

১. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী **হওয়া**।

২. সহীহ হাদীসকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে পৃথককরণ ও যাচাই-বাছাইয়ে অন্যান্য **ইমামদের তুলনায়** ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) -এর অগ্রগামী হওয়া।

৩. তাঁদের কিতাব তথা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সহীহ গ্রন্থ হিসেবে ওলামায়ে কেরাম **তথা উম্মতে** মুসলিমাহ কর্তৃক গৃহীত হওয়া। এই তৃতীয় কারণটি এমন শক্তিশালী যে, বিভিন্ন সনদে **বর্ণিত খবরে** মাশহূরও নিশ্চিত যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দানের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের হতে পারে না। **অবশ্য দুটি** অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। আর তা হলো–

১. শায়খাইনের রেওয়ায়েতটি যদি হাফিজে হাদীস ও হাদীস বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সমালোচিত হয়।

২. অথবা, শায়খাইনের দুই রেওয়ায়েতে এমন কোনো বিরোধ থাকে যে, একটি রেওয়ায়েতকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। কেবল এ দু অবস্থায় শায়খাইনের রেওয়ায়েত নিশ্চিত যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। মোটকথা হলো, শায়খাইনের সমালোচিত কিংবা বিরোধপূর্ণ হাদীস ছাড়া তাতে আর যত রেওয়ায়েত রয়েছে সর্বসম্মত মতে তা সহীহ এবং নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়।

শায়খাইনের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা : হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কেরাম বুখারী ও মুসলিমের যে সমস্ত হাদীসের সমালোচনা করেছেন তার সর্বমোট সংখ্যা ২১০। এর মধ্যে শুধু মুসলিম শরীফে ১০০টি, আর শুধু বুখারীতে ৭৮টি। অবশিষ্ট ৩২টি উভয় গ্রন্থের।

فَانْ قِيْلَ اِنَّمَا اتَّفَقُوْا عَلٰى وُجُوْبِ الْعَمَلِ بِهٖ لَا عَلٰى صِحَّتِهٖ مَنَعْنَاهُ وَسَنَدُ الْمَنْعِ اَنَّهُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى وُجُوْبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيْحَيْنِ فِىْ هٰذَا مَزِيَّةٌ وَالْاِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلٰى اَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةٌ فِيْمَا يَرْجِعُ اِلٰى نَفْسِ الصِّحَّةِ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِاِفَادَةِ مَا اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ الْعِلْمَ النَّظَرِىَّ الْاُسْتَاذُ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْاِسْفَرَايِيْنِىُّ وَمِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُمَيْدِىُّ وَاَبُوْ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ وَغَيْرُهُمَا ، وَيَحْتَمِلُ اَنْ يُقَالَ الْمَزِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ كَوْنُ اَحَادِيْثِهِمَا اَصَحَّ الْحَدِيْثِ ـ

অনুবাদ : প্রশ্ন হতে পারে, বুখারী ও মুসলিম শরীফের সকল হাদীস মোতাবেক আমল ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সকলের ঐকমত্য রয়েছে, বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নয়।

এ প্রশ্ন আমরা মানবো না। না মানার কারণ হলো, ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রতিটি সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করা ওয়াজিব যদিও তা বুখারী-মুসলিমের সংকলিত না হোক। সুতরাং এদিক বিচারে বুখারী-মুসলিমের বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য থাকল না। অথচ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ দু গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে।

বুখারী-মুসলিম শরীফের একযোগে বর্ণিত হাদীস থেকে যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হওয়ার কথা যারা স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মনীষী আবূ ইসহাক ইসফিরাইনী এবং ইমামুল হাদীস আবূ আব্দুল্লাহ হুমাইদী, আবুল ফযল ইবনে তাহির প্রমুখ।

এটাও বলা যেতে পারে যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে মর্যাদার অধিকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কতিপয়ের অভিমত এই যে, বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 'আমল ওয়াজিব হওয়া'র ব্যাপারে, বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নয়। তাদের এ কথা ঠিক নয়। কারণ হলো–

১. হাদীস জগতে বুখারী-মুসলিমের ভিন্ন একটি মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট স্বীকৃত। আর খবরে ওয়াহিদ যে আমলকে ওয়াজিব করে এ কথা সকল হাদীসের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। চাই সে খবরে ওয়াহিদ বুখারী-মুসলিম শরীফের হোক কিংবা অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে থাকুক।

   ফলে বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে ঐকমত্যটা যদি 'বিশুদ্ধতা'র বিচারে না হয়, তাহলে বাস্তবে বুখারী-মুসলিমের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য আর রইবে না।

২. এ কথাও বলা যেতে পারে যে, বুখারী-মুসলিমের ব্যাপারে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নয়; বরং অধিকতর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে। অর্থাৎ বুখারী-মুসলিমের হাদীস অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস থেকে অধিক বিশুদ্ধ ও সহীহ। অতএব সহীহ তথা বিশুদ্ধ হাদীস যদি 'ধারণা' -এর ফায়দা দেয় তবে অবশ্যই 'অধিকতর বিশুদ্ধ' হাদীস 'যৌক্তিক জ্ঞান'-এর ফায়দা দেবে। যাতে বিশুদ্ধ ও অধিকতর বিশুদ্ধ -এর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضُعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ وَغَيْرُهُمَا .

وَمِنْهَا الْمُسَلْسَلُ بِالْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِيْنَ حَيْثُ لَا يَكُوْنُ غَرِيْبًا كَالْحَدِيْثِ الَّذِي يَرْوِيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَثَلًا ، وَيُشَارِكُهُ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَيُشَارِكُهُ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَإِنَّهُ يُفِيْدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالْاِسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُوَاتِهِ ، وَأَنَّ فِيْهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوْجِبَةِ لِلْقَبُوْلِ مَا يَقُوْمُ مَقَامَ الْعَدَدِ الْكَثِيْرِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا مَثَلًا لَوْ شَافَهَهُ بِخَبَرٍ لَعَلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيْهِ فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ أَيْضًا مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ اِزْدَادَ قُوَّةً وَ بَعُدَ عَمَّا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ ، وَهٰذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيْثِ الْمُتَبَحِّرِ فِيْهِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ الْمُطَّلِعِ عَلَى الْعِلَلِ وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذٰلِكَ لِقُصُوْرِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُوْرَةِ لَا يَنْفِي حُصُوْلَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ الْمَذْكُوْرِ ، وَمُحَصَّلُ الْأَنْوَاعِ الثَّلٰثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَخْتَصُّ بِالصَّحِيْحَيْنِ وَالثَّانِي بِمَا لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَالثَّالِثُ بِمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ ، وَيُمْكِنُ اِجْتِمَاعُ الثَّلٰثَةِ فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ فَلَا يَبْعُدُ حِ الْقَطْعُ بِصِدْقِهِ ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : ২. যে মাশহূর হাদীসের এরূপ বিভিন্ন সনদ রয়েছে যা বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা ও সূক্ষ্ম ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত। এ ধরনের হাদীস যৌক্তিক জ্ঞান দান করে বলে যারা রায় দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে মনীষী আবূ মানসূর বাগদাদী, আবূ বকর ইবনে ফূরাক প্রমুখ।

৩. শক্তিশালী হাফিজুল হাদীস ইমামগণ ধারাবাহিকভাবে যে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে শর্ত হলো, তা গরীব শ্রেণির না হওয়া চাই। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং তাঁর সাথে আরো একজন একত্রে যে হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। আবার ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁর সাথে আরো একজন একত্রে সেটি ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেন। এ ধরনের হাদীস যেই শুনবে তারই عِلْمِ نَظَرِيٌّ বা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হবে। আর সে যুক্তি হলো, বর্ণনাকারীরা উচ্চমর্যাদার

অধিকারী এবং তাদের এমন গুণাবলি রয়েছে যাতে গ্রহণযোগ্যতা অবধারিত হয়। অন্যদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা যা অর্জিত হয়, উক্ত ইমামদের গুণাবলিই তার জন্য যথেষ্ট। ইলমে হাদীসের সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্ক রয়েছে এবং যিনি মানুষের অবস্থাদি জানেন, তিনি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করবেন না যে, ইমাম মালিক (র.) -এর মতো ব্যক্তি যদি সরাসরি কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী। সেই সাথে যদি আরো যুক্ত হয় এমন ব্যক্তি যিনি উক্ত পর্যায়ের, তাহলে বিষয়টি আরো মজবুত হয় এবং ভুলের আশঙ্কা আর থাকে না।

যে তিন শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হলো, তা দ্বারা যৌক্তিক জ্ঞান অর্জিত হয় শুধুমাত্র এমন হাদীসশাস্ত্র বিশারদের যিনি এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী, হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত এবং সনদের সূক্ষ্ম দোষত্রুটির বিষয়ে সচেতন। উল্লিখিত গুণাবলির অভাবে কারো যদি জ্ঞান অর্জিত না হয় তাহলে পণ্ডিত আলিমেরও তা অর্জিত হবে না– এমন বলা যাবে না।

সারকথা, প্রথম শ্রেণি বুখারী ও মুসলিমের সাথে নির্ধারিত। দ্বিতীয় হলো যার একাধিক সনদ রয়েছে এবং তৃতীয় হলো যা ইমামদের বর্ণিত। একই হাদীসের ক্ষেত্রে উক্ত তিন বৈশিষ্ট্য সমবেত হতে পারে। সুতরাং তখন হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই অবশিষ্ট থাকে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ : বিভিন্ন সনদে বর্ণিত ঐ খবরে মাশহূর যা বৈপরীত্য, দুর্বলতা এবং সূক্ষ্ম ত্রুটি হতে মুক্ত হয়। এটাও যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। একাধিক আলিম এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন– ওস্তাদ আবূ মানসূর বাগদাদী, ওস্তাদ আবূ বকর ইবনে ফূরাক প্রমুখ।

তৃতীয় প্রকারের বিবরণ : গরীব ব্যতীত ঐ খবরে ওয়াহিদ, যা হাদীসের ইমামগণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন। যেমন– কোনো একটি হাদীস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর মতো আরেক ব্যক্তিত্ব ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণনা করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর মতো আরেক ব্যক্তিত্ব ইমাম মালিক (র.) হতে বর্ণনা করেন। এ হাদীসও عِلْمٌ نَظَرِىٌّ তথা যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেবে। যুক্তি হলো, তাদের মাঝে এমন গুণাবলি রয়েছে, যা হাদীসকে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উপনীত করে। কেননা, তারা একাই কয়েক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত এবং মৌখিকভাবে যখন তাঁরা কোনো খবর দেন তখন তার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাহলে তাঁদের সাথে যদি তাঁদেরই মতো আরেক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনায় যোগ দেন, তাহলে তাঁর সত্যতার ব্যাপারে শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই তা যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেবে।

এক ব্যক্তি অনেকের স্থলাভিষিক্ত : ব্যক্তির মতো ব্যক্তি হলে এক ব্যক্তিই যে অনেক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার এ ইরশাদ– اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً

হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর মাঝে বিশেষ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় তাঁকে اُمَّةً (উম্মত) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত তিন প্রকারই যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়। তবে এ ফায়দা সকলকে দেয় না; বরং এর জন্য তিন প্রকার বিশেষ গুণ থাকতে হবে। যথা–

১. হাদীসশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে।
২. রাবী বিশেষজ্ঞ হতে হবে।
৩. সমালোচনা ও সূক্ষ্ম দোষ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

যাদের মধ্যে উল্লিখিত তিন গুণ বিদ্যমান থাকবে না তাদেরকে উল্লিখিত তিন প্রকার যৌক্তিক জ্ঞানের ফায়দা দেবে না।

কখনো একই হাদীসের মধ্যে উল্লিখিত তিন প্রকারই সমবেত হতে পারে। তখন সে হাদীস অবশ্যই যৌক্তিক জ্ঞান (عِلْمٌ نَظَرِىٌّ) -এর ফায়দা দেবে।

ثُمَّ الْغَرَابَةُ **إِمَّا أَنْ** تَكُوْنَ فِى اَصْلِ السَّنَدِ اَىْ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ يَدُوْرُ الْاِسْنَادُ **عَلَيْهِ** وَيَرْجِعُ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ اِلَيْهِ وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِىْ فِيْهِ الصَّحَابِىُّ **اَوْ لَا** يَكُوْنُ كَذٰلِكَ بِاَنْ يَّكُوْنَ التَّفَرُّدُ فِىْ اَثْنَائِهِ كَاَنْ يَرْوِيْهِ عَنِ **الصَّحَابِىِّ اَكْثَرُ** مِنْ وَاحِدٍ ثُمَّ يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهٖ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ **فَالْاَوَّلُ الْفَرْدُ** الْمُطْلَقُ كَحَدِيْثِ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهٖ تَفَرَّدَ بِهٖ **عَبْدُ اللّٰهِ** بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ يَنْفَرِدُ بِهٖ رَاوٍ عَنْ ذٰلِكَ الْمُنْفَرِدُ **كَحَدِيْثِ** شُعَبِ الْاِيْمَانِ تَفَرَّدَ بِهٖ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَتَفَرَّدَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِىْ جَمِيْعِ رُوَاتِهٖ اَوْ اَكْثَرِهِمْ ، وَفِىْ مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَالْمُعْجَمِ الْاَوْسَطِ لِلطَّبْرَانِىْ اَمْثِلَةٌ كَثِيْرَةٌ لِذٰلِكَ .

অনুবাদ : কোনো হাদীস গরীব হওয়ার কারণ তথা বর্ণনাকারীর এককত্ব হতে পারে সনদের মূল স্তরে অর্থাৎ যে স্থানে সনদ আবর্তিত হয় ও যেখানে গিয়ে সকল সনদ মিলিত হয়, যদিও সে পর্যন্ত একাধিক সনদ থাকে। এ হলো সনদের যে প্রান্তে সাহাবী থাকেন। আবার কখনো তা এরূপ হয় না; বরং সনদের মাঝখানে এককত্ব আসে। তা এভাবে যে. সাহাবী থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন। অতঃপর তাদের মধ্যকার একজন থেকে মাত্র একজন তা বর্ণনা করেন। প্রথম প্রকারের নাম ফরদে মুতলাক। এর উদাহরণ মনিবের সাথে আজাদকৃত গোলামের সম্পর্ককে বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে শুধুমাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার এটি বর্ণনা করেন।

কখনো কখনো দেখা যায়, উক্ত একক ব্যক্তি থেকেও মাত্র একজন ব্যক্তিই বর্ণনা করেন। যেমন– ঈমানের শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত হাদীস।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শুধুমাত্র আবূ সালিহ এটি বর্ণনা করেন। আর আবূ সালিহ থেকেও শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারই তা বর্ণনা করেছেন।

কখনো কখনো এককত্বের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে সকল বর্ণনাকারী কিংবা অধিকাংশ বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে। মুসনাদে বায্‌যার ও ইমাম তাবারানীর মু'জামুল আওসাত-এ এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গরীবের বর্ণনা : গরীবের আলোচনায় তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

১. গরীবের সংজ্ঞা, ২. গরীবের প্রকারভেদ ও ৩. ফরদ এবং গরীবের মধ্যকার পার্থক্য। নিম্নে **তিনটি** বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

غَرِيْبٌ (গরীব)-এর সংজ্ঞা : অভিধানে গরীব অর্থ– অপরিচিত। আর পরিভাষায় প্রত্যেক **ঐ হাদীসকে** গরীব (হাদীস) বলে, যার রাবী মাত্র একজন হয়। চাই এ একজন সনদের একস্থানে হোক **কিংবা কয়েক** স্থানে অথবা প্রতি স্থানে। সনদে রাবী একজন হওয়াকে গরাবাত এবং তাফাররুদ বলে।

আরবিতে غَرِيْب -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِىْ اَىِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ ـ

অর্থাৎ হাদীসের রাবী একজন হওয়া। এই একক হওয়াটা সনদের যে কোনো স্থানেই হোক না কেন।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, تَفَرُّدُ صَحَابِىْ ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী যদি মাত্র একজন হন এবং অন্য কোনো সাহাবী সে হাদীসটি বর্ণনা না করেন, তাহলে সে হাদীসটি উল্লিখিত পরিভাষা হতে ভিন্ন অর্থাৎ সেটি গরীব হবে না।

غَرِيْب -এর প্রকারভেদ : غَرِيْب -এর অপর নাম ফরদ (فَرْد)। এ فَرْد দু প্রকার। ১. فَرْد مُطْلَق (ফরদে মুতলাক) ও ২. فَرْد نِسْبِىْ (ফরদে নিসবী)। فَرْد এ দু প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, تَفَرُّدْ তথা সনদে একাকীত্ব হওয়াটা হয়তো তাবেয়ীর ক্ষেত্রে হবে অথবা এর পরবর্তী কোথাও গিয়ে হবে। যদি তাবেয়ীর স্তরে হয়, তাহলে তাকে فَرْد مُطْلَق বলে। আর অন্য কোথাও হলে তাকে فَرْد نِسْبِىْ বলে।

فَرْد مُطْلَق সম্পর্কে আলোচনা : এর অপর নাম غَرِيْب مُطْلَق (গরীবে মুতলাক)। যে হাদীসের সনদের মূল স্তরে تَفَرُّدْ (একাকীত্ব) হয় অর্থাৎ সাহাবী থেকে বর্ণনাকারী তাবেয়ী যিনি তিনি একাই হাদীসটি বর্ণনা করেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি–

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ ـ

অর্থাৎ "রক্তীয় সম্পর্কের মতো وَلَاءْ -ও একপ্রকার (নিকটতম) সম্পর্ক। এর ক্রয়-বিক্রয়, দান এবং উত্তরাধিকারত্ব বৈধ নয়।" একে حَدِيْثُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ বলে। এ হাদীসটি হযরত ওমর (রা.) হতে শুধুমাত্র বিখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বর্ণনা করেন।

আরবিতে فَرْد مُطْلَق -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ تَكُوْنُ الْغَرَابَةُ فِىْ اَصْلِ سَنَدِهٖ اَىْ فِىْ مَوْضِعِ الَّذِىْ يَدُوْرُ الْاِسْنَادُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ ـ

অর্থাৎ যে হাদীসে غَرَابَتْ সংঘটিত হয় সনদের মূল স্তরে অর্থাৎ যে স্তরে গিয়ে সনদ ঘুরে এবং ফিরে।

وَقَدْ يَنْفَرِدُ بِهِ رَاوٍ ... : ফরদে মুতলাকের ক্ষেত্রে তাবেয়ীর স্তরে যে تَفَرُّدْ পতিত হয় এটা কখনো পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে। যেমন– شُعَبُ الْاِيْمَانِ -এর হাদীস। অর্থাৎ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً এ হাদীসটি। এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শুধুমাত্র আবূ সালিহ আর আবূ সালিহ থেকে শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (র.) বর্ণনা করেন।

وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ : এ تَفَرُّدْ কখনো সনদের অধিকাংশ স্থানে এমনকি সকল স্থানে অব্যাহত থাকে। এর উদাহরণ মুসনাদে বায্যার প্রভৃতি গ্রন্থে বিপুল মাত্রায় রয়েছে। যেহেতু فَرْد مُطْلَق -এর কোনো কোনো হাদীসে সনদের প্রতি স্তরে تَفَرُّدْ সংঘটিত হয়, সেজন্য তাকে فَرْد مُطْلَق করে নাম রাখা হয়েছে।

وَالثَّانِى اَلْفَرْدُ النِّسْبِىُّ سُمِّىَ نِسْبِيًّا لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيْهِ حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى شَخْصٍ مُّعَيَّنٍ وَاِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ فِىْ نَفْسِهٖ مَشْهُوْرًا وَيَقِلُّ اِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْغَرِيْبَ وَالْفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا اِلَّا اَنَّ اَهْلَ الْاِصْطِلَاحِ غَايَرُوْا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ وَقِلَّتِهٖ ، فَالْفَرْدُ اَكْثَرُ مَا يُطْلِقُوْنَهٗ عَلَى الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ وَالْغَرِيْبُ اَكْثَرُ مَا يُطْلِقُوْنَهٗ عَلَى الْفَرْدِ النِّسْبِىِّ ، وَهٰذَا مِنْ حَيْثُ اِطْلَاقُ الْاِسْمِ عَلَيْهِمَا ، وَاَمَّا مِنْ حَيْثُ اِسْتِعْمَالِهِمُ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فِى الْمُطْلَقِ وَالنِّسْبِىِّ تَفَرَّدَ بِهٖ فُلَانٌ اَوْ اَغْرَبَ بِهٖ فُلَانٌ وَقَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا اِخْتِلَافُهُمْ فِى الْمُنْقَطِعِ وَالْمُرْسَلِ ، هَلْ هُمَا مُتَغَايِرَانِ اَوْلَا ، فَاَكْثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى التَّغَايُرِ لٰكِنَّهٗ عِنْدَ اِطْلَاقِ الْاِسْمِ وَاَمَّا عِنْدَ اِسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمُشْتَقِّ فَيَسْتَعْمِلُوْنَ الْاِرْسَالَ فَقَطْ فَيَقُوْلُوْنَ اَرْسَلَهٗ فُلَانٌ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ مُرْسَلًا اَمْ مُنْقَطِعًا ، وَمِنْ ثَمَّ اَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَا يُلَاحِظُ مَوَاقِعَ اِسْتِعْمَالِهِمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ اَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُوْنَ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ لِمَا حَرَّرْنَاهُ ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِىْ ذٰلِكَ ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকারের নাম ফরদে নিসবী বা সম্পর্কিত একক। কেননা, এতে এককত্ব এসেছে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়ে। যদিও মৌলিকভাবে হাদীসটি মাশহূর। তবে এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে 'ফরদ' শব্দের ব্যবহার খুব কম হয়ে থাকে; বরং এক্ষেত্রে 'গরীব' শব্দটির বেশি ব্যবহার হয়। যদিও আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় দিক দিয়ে শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে; কিন্তু পরিভাষাবিদগণ শব্দ দুটির ব্যবহারের আধিক্য ও স্বল্পতার দিক দিয়ে পার্থক্য করেন। 'ফরদ' শব্দটিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ফরদে মুতলাক' -এর বেলায় ব্যবহার করেন আর 'গরীব' শব্দটিকে ব্যবহার করেন 'ফরদে নিসবী' -এর বেলায়। তবে এ পার্থক্য করা হয় اِسْم বা বিশেষ্য ব্যবহারের দিক দিয়ে। কিন্তু যখন এ থেকে উৎপন্ন ফে'ল বা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, তখন আর কোনো পার্থক্য করা হয় না। মুতলাক ও নিসবী উভয় ক্ষেত্রে তারা বলেন– تَفَرَّدَ بِهٖ فُلَانٌ (তাফাররদা বিহী ফুলানুন) কিংবা اَغْرَبَ بِهٖ فُلَانٌ (আগরাবা বিহী ফুলানুন)।

ঠিক এরই কাছাকাছি মতপার্থক্য 'মুনকাতি' ও 'মুরসাল' শব্দদ্বয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এ দুটি সমার্থক না ভিন্নার্থক– এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ভিন্নার্থক বলে মত পোষণ করেন। তবে এ ভিন্নতা اِسْم বা

বিশেষ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কিন্তু ক্রিয়া ব্যবহার করতে হলে তারা শুধুমাত্র 'ইরসাল' ক্রিয়ামূল থেকে তা ব্যবহার করেন। তা মুরসাল হোক কিংবা মুনকাতি'।

যারা মুহাদ্দিসীনে কেরামের এ ব্যবহারক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন না, তারা অনেক মুহাদ্দিস সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন যে, তারা মুরসাল ও মুনকাতি' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। খুব কম লোকই এ সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে সতর্ক করে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফরদে নিসবী সম্পর্কে আলোচনা : ফরদে নিসবী-এর অপর নাম গরীবে নিসবী। আর তা বলা হয়, সনদের মধ্যখানে কিংবা শেষে تَفَرُّدٌ বা এককত্ব হওয়া। অর্থাৎ তাবেয়ীর স্তরের পরের কোনো স্তরে হাদীসের রাবী মাত্র একজন হওয়া। যেমন– নিয়তের হাদীস। এটা বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস। এর চার স্তরে সনদ গরীব তথা একক। যদিও এর পরে গিয়ে তা মাশহূর হয়ে গেছে। যেহেতু সুনির্দিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে এর মধ্যে تَفَرُّدٌ বা এককত্ব হয় এজন্য তাকে ফরদে নিসবী বলে।

আরবিতে فَرْدٌ نِسْبِىٌّ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ الْحَدِيْثُ الْغَرِيْبُ الَّذِىْ تَكُوْنُ الْغَرَابَةُ فِىْ اَثْنَاءِ سَنَدِهٖ كَاَنْ يَرْوِيْهِ عَنِ الصَّحَابِىِّ اَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ثُمَّ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهٖ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ .

অর্থাৎ غَرِيْبٌ نِسْبِىٌّ বলা হয় ঐ হাদীসকে, যে হাদীস সাহাবী থেকে একাধিক রাবী রেওয়ায়েত করেন; কিন্তু সনদের পরবর্তী কোনো স্তরে একজন রাবী কর্তৃক রেওয়ায়েত হয়।

ফরদ এবং গরীব-এর মধ্যে পার্থক্য : অর্থের দিক বিচারে ফরদ ও গরীব-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি অপরটির সমার্থক। অবশ্য তাদের মধ্যে ব্যবহারগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, পরিভাষায় فَرْدٌ (ফরদ) শব্দের ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফরদে মুতলাকের উপর হয়। আর 'গরীব' শব্দের ব্যবহার বেশি হয় ফরদে নিসবী-এর ক্ষেত্রে। অতএব, ব্যবহারের দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে تَبَايُنٌ -এর নিসবত। এ পার্থক্যটা মূলত হলো فَرْدٌ এবং غَرِيْبٌ শব্দের ব্যবহারের দিক দিয়ে। এ শব্দদ্বয়ের فِعْلٌ -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং ফরদে মুতলাকের উপর যেমন تَفَرَّدَ بِهٖ فُلَانٌ শব্দ ব্যবহৃত হয় তেমনি ফরদে নিসবী-এর ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ফরদে নিসবী -এর উপর যেমন– اَغْرَبَ بِهٖ فُلَانٌ ব্যবহার হয় তেমনি ফরদে মুতলাকের উপরও তা ব্যবহার হয়।

وَخَبَرُ الْاٰحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ هُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهٖ ، وَهٰذَا اَوَّلُ تَقْسِيْمِ الْمَقْبُوْلِ اِلٰى اَرْبَعَةِ اَنْوَاعٍ لِاَنَّهٗ اِمَّا اَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ الْقَبُوْلِ عَلٰى اَعْلَاهَا اَوْ لَا اَلْاَوَّلُ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهٖ وَالثَّانِيْ اِنْ وُجِدَ مَا يُجْبَرُ ذٰلِكَ الْقُصُوْرَ كَكَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ اَيْضًا لٰكِنْ لَا لِذَاتِهٖ ، وَحَيْثُ لَا جُبْرَانَ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهٖ ، وَاِنْ قَامَتْ قَرِيْنَةٌ تُرَجِّحُ جَانِبَ قَبُوْلِ مَا يَتَوَقَّفُ فِيْهِ فَهُوَ الْحَسَنُ اَيْضًا لٰكِنْ لَا لِذَاتِهٖ وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّحِيْحِ لِذَاتِهٖ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهٖ .

অনুবাদ : যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারীরা আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শায কিংবা মু'আল্লাল নয়– এরূপ হাদীসের নাম সহীহ লিযাতিহী। এটা হলো খবরে মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য খবরের প্রথম বিভক্তি, যা চার প্রকারে বিভক্ত হয়। কেননা, বর্ণনাকারীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার গুণাবলি উচ্চমাত্রায় থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। থাকলে তার নাম সহীহ লিযাতিহী। যদি না থাকে, তাহলে ঘাটতি পূরণ হবার ব্যবস্থা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা তথা সনদের সংখ্যাধিক্য থাকলে তার নাম সহীহ লিগায়রিহী, আর ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা না থাকলে তার নাম হাসান লিযাতিহী। মাওকূফ বা স্থগিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার দিকটি প্রাধান্য দেওয়ার মতো নিদর্শন পাওয়া গেলে সে হাদীসের নাম হয় হাসান লিগায়রিহী।

এ চার প্রকারের মধ্যে সহীহ লিযাতিহী -এর মর্যাদা সবচেয়ে উন্নত। তাই এর আলোচনা প্রথমেই আসে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খবরে মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য খবরের প্রকারভেদ : সম্মানিত লেখক তাঁর কিতাবে দু বার খবরে মাকবূলকে ভাগ করেছেন। ১. সহীহ লিযাতিহী ও হাসান লিযাতিহী ইত্যাদির দিকে এবং ২. নাসিখ ও মানসূখ ইত্যাদির দিকে।

এখানে প্রথম প্রকারের বিভক্তি হচ্ছে। আর তা হলো, বর্ণনাকারীদের গুণবিচার তথা স্তরভেদে খবরে মাকবূল চার প্রকার। যথা–

১. সহীহ লিযাতিহী (اَلصَّحِيْحُ لِذَاتِهٖ)।

২. সহীহ লিগায়রিহী (اَلصَّحِيْحُ لِغَيْرِهٖ)

৩. হাসান লিযাতিহী (اَلْحَسَنُ لِذَاتِهٖ)।

৪. হাসান লিগায়রিহী (اَلْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ)।

চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হবার কারণ বা দলিল : যে সমস্ত গুণ ও শর্ত থাকলে খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য হয় তা খবরের মধ্যে থাকবে বা থাকবে না। (যদি না থাকে তার নাম হাসান লিগায়রিহী।) যদি থাকে, তাহলে তা আবার দু প্রকার। হয়তো ঐ গুণাবলি ও শর্ত পূর্ণ মাত্রায় থাকবে অথবা পূর্ণ মাত্রায় থাকবে না। পূর্ণ মাত্রায় থাকলে তার নাম সহীহ লিযাতিহী। আর পূর্ণ মাত্রায় না থাকলে তা আবার দু প্রকার। হয়তো সনদের আধিক্য ইত্যাদির দ্বারা ঐ কমতি বা ত্রুটি পূরণ হবে অথবা হবে না। যদি পূরণ হয়, তাহলে তার নাম সহীহ লিগায়রিহী। আর পূরণ না হলে তার নাম হাসান লিযাতিহী। আর যদি খবর কিছুটা দুর্বল হয়, রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে কিংবা খবরটি মাওকূফ থাকে, কিন্তু তার সাথে সনদের আধিক্য ইত্যাদি কোনো নিদর্শন মিলে, যা গ্রহণযোগ্যতার দিককে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তার নাম হাসান লিগায়রিহী।

সহীহ লিযাতিহী-এর বর্ণনা : খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার গুণাবলি ও শর্ত সহীহ লিযাতিহী -এর মধ্যে বেশি পাওয়া যাওয়ায় যেহেতু চার প্রকারের মধ্যে তার মান সবচেয়ে উন্নত ও উর্ধ্বে, তাই তার সম্পর্কে আলোচনাও হয় সবার পূর্বে। সহীহ লিযাতিহী-এর মধ্যে ৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। যথা– ১. সংজ্ঞা ২. শর্ত ও গুণাবলির বিস্তারিত বিবরণ, ৩. সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও ৪. সহীহ লিযাতিহী হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ও স্তরভেদ। নিম্নে উক্ত ৪টি বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হলো–

সহীহ লিযাতিহী-এর সংজ্ঞা : সম্মানিত লেখক সহীহ লিযাতিহী -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন–

خَبَرُ الْاٰحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ هُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِه -

অর্থাৎ যে খবরে ওয়াহিদ অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারী আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং খবরটি শায কিংবা তার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি না থাকে, তাহলে এরূপ খবরের নাম সহীহ লিযাতিহী। এ ধরনের খবরের বিশুদ্ধতা যেহেতু স্বয়ং খবরের কারণেই; বাইরের কোনো কারণে নয়, তাই তাকে সহীহ লিযাতিহী বলে। এর হুকুম হলো তা মাকবূল অর্থাৎ প্রমাণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এর মর্যাদা অন্য প্রকারের তুলনায় বেশি। এজন্য অন্য প্রকারের সাথে বৈপরীত্য দেখা দিলে এটা প্রাধান্য পাবে।

وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلِ مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلٰى مُلَازَمَةِ التَّقْوٰى وَالْمُرُوَّةِ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّقْوٰى اِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّئَةِ مِنْ شِرْكٍ اَوْ فِسْقٍ اَوْ بِدْعَةٍ وَالضَّبْطُ ضَبْطَانِ ، ضَبْطُ صَدْرٍ ، وَهُوَ اَنْ يُثْبِتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ مَتٰى شَاءَ ، وَضَبْطُ كِتَابٍ وَهُوَ صِيَانَتُهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيْهِ وَصَحَّحَهُ اِلٰى اَنْ يُؤَدِّيَهُ مِنْهُ ، وَقَيَّدَهُ بِالتَّامِ اِشَارَةً اِلَى الرُّتْبَةِ الْعُلْيَا فِيْ ذٰلِكَ ، وَالْمُتَّصِلُ مَا سَلِمَ اِسْنَادُهُ مِنْ سُقُوْطٍ فِيْهِ بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلٌّ مِنْ رِجَالِهِ سَمِعَ ذٰلِكَ الْمَرْوِيَّ مِنْ شَيْخِهِ ، وَالسَّنَدُ تَقَدَّمَ تَعْرِيْفُهُ ، وَالْمُعَلَّلُ لُغَةً مَا فِيْهِ عِلَّةٌ ، وَاصْطِلَاحًا مَا فِيْهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ ، وَالشَّاذُّ لُغَةً اَلْفَرْدُ ، وَاصْطِلَاحًا مَا يُخَالِفُ فِيْهِ الرَّاوِيْ مَنْ هُوَ اَرْجَحُ مِنْهُ ، وَلَهُ تَفْسِيْرٌ اٰخَرُ سَيَاْتِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : আদিল হবার অর্থ হলো, এমন গুণের অধিকারী হওয়া যা তাকে তাকওয়া ও ব্যক্তিত্ব অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। তাকওয়া বলতে বুঝায় শিরক, কবীরা গুনাহ ও বিদআত কাজ থেকে বিরত থাকা। (মুত্তাকী বলে পরিগণিত হবার জন্য সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত কিনা সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের অভিমত হলো, সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা অনেক সময় মানবীয় আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাই তা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা শর্ত নয়। তবে কোনো সগীরা গুনাহ বারবার করলে তাকে আর মুত্তাকী বলা যাবে না। কেননা, তখন সেটি কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।)

যব্‌ত বা আয়ত্ত দুভাবে হয়– হৃদয়ঙ্গম করে ও লেখে রেখে। হৃদয়ঙ্গম করার অর্থ যা শুনবে তা এমনভাবে মুখস্থ রাখবে যে, প্রয়োজনের সময় পেশ করতে পারে। আর লেখে রেখে থাকলে তা বর্ণনার সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে হবে।

আয়ত্তশক্তির সাথে 'পূর্ণ' কথাটি জুড়ে দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তা থাকতে হবে পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ তা উচ্চমাত্রায় থাকা জরুরি।

সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন হবার অর্থ হলো, মাঝখান থেকে কারো নাম বাদ না পড়া। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণনাকারী উক্ত হাদীস নিজ শায়খ থেকে সরাসরি শুনে থাকবেন।

মু'আল্লাল (مُعَلَّلٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ– যাতে কোনো ইল্লত তথা দোষ-ব্যাধি রয়েছে। পরিভাষায় মু'আল্লাল হলো, যাতে এমন কোনো সূক্ষ্ম দোষ রয়েছে, যা হাদীসটির বিশুদ্ধতা খর্ব করে।

শায (شَاذٌّ) -এর আভিধানিক অর্থ– একাকী। পরিভাষায় শায বলে, যে হাদীসের বর্ণনাকারী তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা থেকে ভিন্নরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য এর অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে, যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সহীহ লিযাতিহী -এর শর্তের বিস্তারিত বিবরণ : সহীহ লিযাতিহী-এর পূর্বোক্ত সংজ্ঞা হতে জানা যায় যে, কোনো খবর সহীহ লিযাতিহী হতে হলে তার মধ্যে ৫টি গুণ কিংবা শর্ত থাকা অনিবার্য। যথা–

১. عَدَالَتُ رُوَاتْ তথা বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

২. تَامُّ الضَّبْطِ তথা বর্ণনাকারীদের পূর্ণ আয়ত্তশক্তিসম্পন্ন হওয়া।

৩. مُتَّصِلُ السَّنَدِ তথা সূত্রের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন হওয়া।

৪. عَدَمُ عِلَّتْ তথা সনদে কোনো ইল্লত বা দোষ-ত্রুটি না থাকা।

৫. عَدَمُ شَاذْ তথা সনদটি شَاذْ না হওয়া।।

৫টি শর্তের বিবরণ : عَدْلِ : بِنَقْلِ عَدْلٍ শব্দটি مَصْدَرْ হলেও اِسْمُ فَاعِلْ তথা عَادِلْ-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ রাবী আদিল হওয়া। আদালাতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هِيَ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلٰى مُلَازَمَةِ التَّقْوٰى وَالْمُرُوَّةِ.

অর্থাৎ আদালাত এমন এক যোগ্যতার নাম, যা মানুষকে তাকওয়া অর্জন এবং ভদ্রতা-ব্যক্তিত্ব অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। যার মধ্যে এই যোগ্যতা থাকে অর্থাৎ যিনি মুত্তাকী ও ভদ্র হন, তাকে বলে আদিল। তাকওয়া হলো শিরক, বিদআত, অন্যায় ইত্যাদি গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা।

تَامُّ الضَّبْطِ : ضَبْط শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ– হেফাজত করা, সংরক্ষণ করা। চাই তা বক্ষে ধারণ করে হোক কিংবা খাতার পৃষ্ঠায় তথা লেখে রেখে হোক। এ সংরক্ষণ দু প্রকার।

১. **ضَبْطُ صَدْرٍ :** অর্থাৎ এভাবে মনে রাখা ও সংরক্ষণ করা যে, যখনই ইচ্ছা মুখস্থ বলে দিতে পারে।

২. **ضَبْطُ كِتَابَتْ :** অর্থাৎ খবর শোনার পরে লেখে রেখে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যে, হাদীস ছাত্রের কাছে আদায় বা বর্ণনা করা পর্যন্ত ঐ লিখিতভাবে সংরক্ষিত থাকে।

تَامُّ الضَّبْطِ : এখানে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। আসলে ছিল اَلضَّبْطُ التَّامُّ । এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য রাবী বা বর্ণনাকারীর জন্য كَامِلْ ضَبْط তথা পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হওয়া জরুরি।

مُتَّصِلُ السَّنَدِ : সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো স্তরে রাবীর পতন না হওয়া। অর্থাৎ সকল স্তরে রাবী থাকা। যার সারকথা হলো, হাদীসের প্রত্যেক রাবী নিজের শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেছেন বর্ণনা করবেন। এ রকম অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়াকে 'ইত্তিসাল' বলে।

সনদের সংজ্ঞা পূর্বে চলে গেছে যে, সূত্র পরম্পরাকে সনদ বলে।

غَيْرُ مُعَلَّلْ : مُعَلَّلْ শব্দটি تَعْلِيْل মাসদার হতে اِسْمُ مَفْعُوْلْ-এর সীগাহ। অর্থ– ইল্লতযুক্ত, যার মধ্যে ইল্লত থাকে। পরিভাষায় مُعَلَّلْ বলে ঐ হাদীসকে, যার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম দোষ লুক্কায়িত থাকে। আর غَيْرُ مُعَلَّلْ-এর অর্থ হলো, হাদীসটি এমন কোনো সূক্ষ্ম দোষ থেকে মুক্ত হওয়া।

غَيْرُ شَاذْ : এটা شُذُوْذ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। এজন্য শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হবে তাশদীদযোগে শায (شَاذّ)। এর অর্থ– একাকী। পরিভাষায় শায বলা হয় ঐ হাদীসকে, যার মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে। অর্থাৎ দুজন ভিন্নরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। নির্ভরযোগ্য রাবীর এমন বিরোধিতা করাকে 'শুযূয' বলে। এর অন্য সংজ্ঞাও আছে, যা সামনে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

تَنْبِيْهٌ قَوْلُهُ وَخَبَرُ الْاٰحَادِ كَالْجِنْسِ وَبَاقِيْ قُيُوْدِهٖ كَالْفَصْلِ ، وَقَوْلُهُ
بِنَقْلِ عَدْلٍ اِحْتِرَازٌ عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ الْعَدْلِ وَقَوْلُهُ هُوَ يُسَمّٰى فَصْلًا يَتَوَسَّطُ
بَيْنَ الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبَرِ يُؤْذِنُ بِاَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ وَلَيْسَ بِنَعْتٍ لَهُ
وَقَوْلُهُ لِذَاتِهٖ يَخْرُجُ مَا يُسَمّٰى صَحِيْحًا بِاَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ،
وَيَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ اَيْ رُتَبُ الصَّحِيْحِ بِسَبَبِ تَفَاوُتِ هٰذِهِ الْاَوْصَافِ الْمُقْتَضِيَّةِ
لِلصَّحِيْحِ فِى الْقُوَّةِ فَاِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيْدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِىْ عَلَيْهِ
مَدَارُ الصِّحَّةِ اِقْتَضَتْ اَنْ يَّكُوْنَ لَهَا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بِحَسْبِ
الْاُمُوْرِ الْمُقَوِّيَةِ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَمَا يَكُوْنُ رُوَاتُهُ فِى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ
الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِىْ تُوْجِبُ التَّرْجِيْحَ كَانَ اَصَحَّ مِمَّا
دُوْنَهُ فَمِنَ الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا فِىْ ذٰلِكَ مَا اَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ اَنَّهُ اَصَحُّ
الْاَسَانِيْدِ كَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ وَكَمُحَمَّدِ بْنِ
سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ وَكَاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ
ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ دُوْنَهَا فِى الرُّتْبَةِ كَرِوَايَةِ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ
جَدِّهٖ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ مُوْسٰى وَ كَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ وَ دُوْنَهَا فِىْ
الرُّتْبَةِ كَسُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاِنَّ الْجَمِيْعَ يَشْمَلُهُمْ اِسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ .

অনুবাদ : বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভাষ্যে উল্লিখিত "خَبَرُ الْاٰحَادِ" টুকু جِنْس , বাকি শর্তগুলো فَصْل; بِنَقْلِ عَدْلٍ বলে বাদ দেওয়া হয়েছে ঐ হাদীস– গায়রে আদিল রাবী যা রেওয়ায়েত করেন। هُوَ সর্বনামটি فَصْل - এটা মুবতাদা ও খবরের মাঝে এসে এটা জানায় যে, (তারকীবে) এর পরের বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্যের খবর ; পূর্বের সিফাত নয়। لِذَاتِهٖ বলার দ্বারা ঐ হাদীস বেরিয়ে গেছে, যাকে বাইরের কোনো কারণে সহীহ বলে নাম রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সহীহ লিগায়রিহী। যেমনটি পূর্বে চলে গেছে।

সহীহ লিযাতিহী হাদীসের মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সহীহ বলে গণ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলিতে দৃঢ়তার দিক দিয়ে তারতম্যের কারণে এরূপ হয়ে থাকে। কেননা, এ ধরনের হাদীস থেকে যেহেতু প্রবলতর ধারণা অর্জিত হয় আর এরই উপর বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, তাই এর চাহিদা হলো এক্ষেত্রে সমূহ স্তর থাকা যার কোনোটি অপেক্ষা কোনোটি উচ্চ হবে– শক্তিদায়ক বিষয়াবলির বিচারে। সুতরাং যে হাদীসের বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণতা, আয়ত্তশক্তি এবং অগ্রাধিকার প্রদায়ক অন্যান্য গুণাবলিতে উচ্চস্তরে অবস্থান করবেন, সে হাদীস অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ব্যক্তিদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বলে

গণ্য হবে। উচ্চস্তরের মধ্যে রয়েছে, যে সনদ সম্পর্কে কোনো কোনো ইমাম 'বিশুদ্ধতম' বিশেষণ প্রয়োগ **করেছেন**– তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস। এরূপ সনদ রয়েছে কয়েকটি। যথা– ১. ইমাম যুহরী (র.) সালিম (র.) হতে, তিনি (সালিম) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে। ২. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) ওবায়দা ইবনে আমর (র.) হতে, তিনি (ওবায়দা) হযরত আলী (রা.) হতে। ৩. ইবরাহীম নাখায়ী (র.) আলকামা (র.) হতে, তিনি (আলকামা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে।

মর্যাদার দিক দিয়ে পরবর্তী স্তরের হলেন– ১. বুরায়দ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আবূ বুরদা (র.) হতে, তিনি (আবূ বুরদা) হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা.) হতে। ২. হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) ছাবিত (র.) হতে, তিনি (ছাবিত) হযরত আনাস (রা.) হতে– এ দু সনদের কোনোটির মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস।

এরও পরবর্তী স্তর হলো, ১. সুহাইল ইবনে আবূ সালিহ (র.) পিতা আবূ সালিহ (র.) হতে, আর তিনি (আবূ সালিহ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে। ২. আলা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) পিতা আব্দুর রহমান হতে, তিনি (আব্দুর রহমান) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে– এ দু সনদের কোনো একটির মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস।

সুতরাং (উল্লিখিত) সকল রাবী عَادِلٌ এবং পূর্ণ ضَبْط তথা আয়ত্তশক্তির অধিকারী। (যার ফলে এ সকল সনদে বর্ণিত সকল হাদীস সহীহ।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : خَبَرُ الْاٰحَادِ এটা **جِنْس**-এর স্থানে। বাকি শর্তগুলো **فَصْل**-এর ন্যায়। যথা–

১. **بِنَقْلِ عَدْلٍ** : এটা প্রথম শর্ত। এ শর্তের কারণে প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে যার বর্ণনাকারী **عَادِلٌ** নয় তথা মিথ্যাবাদী, মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, ফাসিক, অজ্ঞাত এবং বিদআতির বর্ণিত হাদীস বাদ পড়েছে।

২. **تَامِّ الضَّبْطِ** : এটা দ্বিতীয় শর্ত। **ضَبْط** শব্দটি মাসদার। এর অর্থ– হেফাজত করা। চাই বক্ষে হোক কিংবা গ্রন্থে। **ضَبْط** দু প্রকার। ১. **ضَبْط صَدْر** অর্থাৎ এমনভাবে মুখস্থ করা যাতে যে কোনো সময় বলতে ও শুনিয়ে দিতে পারে। ২. **ضَبْط كِتَابَتْ** অর্থাৎ শোনার পরে লেখে এমনভাবে হেফাজত করা যেন আদায় তথা বর্ণনা করা পর্যন্ত ঠিক থাকে।

تَامُّ الضَّبْطِ-এর মধ্যে **اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ** হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, হাদীস সহীহ হওয়ার পর রাবীর জন্য **ضَبْط كَامِلٌ** তথা পূর্ণ সংরক্ষণ গুণ থাকা জরুরি।

৩. **مُتَّصِلُ السَّنَدِ** : এটা তৃতীয় শর্ত। সনদ মুত্তাসিল তথা ধারাবাহিকভাবে অবিচ্ছিন্ন হওয়া। অর্থাৎ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সনদের কোনো স্তর থেকে রাবীর পতন না হওয়া; বরং প্রত্যেক রাবী নিজ শায়খ থেকে শুনে বর্ণনা করবেন। সনদ এমন ধারাবাহিক হওয়াকে **اِتِّصَالٌ** বলে।

৪. **غَيْرِ مُعَلَّلٍ** : এটা চতুর্থ শর্ত। এটা **تَعْلِيْل** মাসদার হতে **اِسْمُ مَفْعُوْل**-এর সীগাহ। অর্থ– যার মধ্যে **عِلَّتْ** বা ত্রুটি থাকে। পরিভাষায় **مُعَلَّلٌ** ঐ হাদীসকে বলে, যার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম দোষত্রুটি থাকে। পরে এর বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৫. **شَاذٌّ** : এটা পঞ্চম শর্ত। এটা **شُذُوْذ** থেকে **اِسْمُ فَاعِلٍ**-এর সীগাহ। অর্থ– একাকী, নিঃসঙ্গ। পরিভাষায় **شَاذٌّ** ঐ হাদীসকে বলে, যে হাদীসের মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য (**اَوْثَق**) রাবীর বিরোধিতা করে। এমন বিরোধিতা করাকে **شُذُوْذ** বলে। এর অন্য সংজ্ঞাও আছে যা সামনে স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

শর্তাবলির ব্যাখ্যা : خَبَرُ الْاٰحَادِ : এটা جِنْس-এর স্থানে। **বাকি শর্তগুলো فَصْل - بِنَقْلِ عَدْلٍ** : এটা প্রথম শর্ত। এ শর্তের কারণে প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে, **যার রাবী عَادِلْ নয়।** যেমন– মিথ্যাবাদী, মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত, ফাসিক, অজ্ঞাত এবং বিদআতির হাদীস **বাদ পড়েছে।**

تَامُّ الضَّبْطِ : এটা দ্বিতীয় শর্ত। এ শর্তের কারণে **حَسَنْ لِذَاتِهٖ** এবং **صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ বাদ পড়েছে।** কারণ, এর রাবী **تَامُّ الضَّبْطِ**-এর অধিকারী নয়। সাথে সাথে ঐ হাদীসও বাদ **পড়েছে যার রাবী ضَابِطٌ** তথা হেফাজতকারী নয় বরং গাফেল, অধিক ভুলকারী ইত্যাদি। **مُتَّصِلُ السَّنَدِ : এটা তৃতীয় শর্ত। এর** দ্বারা প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে যার সনদ মুত্তাসিল নয়। যেমন– মুরসাল হাদীস, **মু'আল্লাক হাদীস** ইত্যাদি। **غَيْرُ مُعَلَّلٍ** : এটা চতুর্থ শর্ত। এর দ্বারা **حَدِيْثٌ مُعَلَّلٌ** বাদ পড়েছে। **وَلَا شَاذٌّ : এটা পঞ্চম** শর্ত। এর দ্বারা শায হাদীস বাদ পড়েছে। যেহেতু **حَسَنْ لِغَيْرِهٖ**-এর মধ্যে উল্লিখিত শর্ত **বিদ্যমান নেই** বিধায় সমষ্টিগত শর্তের দ্বারা সেগুলোও বাদ পড়েছে।

সহীহ লিযাতিহী হাদীসের মধ্যে তারতম্যের কারণ : যেহেতু সহীহ লিযাতিহী হাদীসের ভিত্তি **عَدَالَةٌ, ضَبْطٌ** ইত্যাদি গুণের উপর আর এ সমস্ত গুণের মধ্যে তারতম্য ও প্রভেদ হয়, তাই সহীহ লিযাতিহী হাদীসের পরস্পরের মধ্যেও মর্যাদাগত তারতম্য হয়। শক্তি এবং বিশুদ্ধতার বিচারে কোনোটির স্তর কোনোটির উপরে হয়। এই মর্যাদাগত পার্থক্য দুই হিসেবে হতে পারে। ১. যে কোনো সহীহ হাদীসের মধ্যে অর্থাৎ তা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) -এর মধে থাক বা অন্য কোনো হাদীসের কিতাবে থাক। ২. নির্দিষ্ট কিতাবের সহীহ হাদীসের মধ্যে। প্রথম প্রকার হিসেবে স্তর হয় তিনটি আর দ্বিতীয় প্রকার হিসেবে স্তর হয় সাতটি।

যে কোনো সহীহ হাদীসের তিন স্তর : সহীহ হাদীস যদি সুনির্দিষ্ট কিতাবের না হয়; বরং যে কোনো হাদীসের কিতাবের হয়, তাহলে সে হাদীসসমূহের মধ্যে মর্যাদাগত তিনটি স্তর হতে পারে। ১. সর্বোচ্চ স্তর, ২. মধ্যস্তর ও ৩. নিম্নস্তর।

সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা ও উদাহরণ : সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদায় উন্নীত হবে ঐ সকল সহীহ হাদীস যার সনদ সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণ এ স্বীকৃতি দেন যে, **هٰذَا اَصَحُّ الْاَسَانِيْدِ** তথা এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ। নিম্নোক্ত তিনটি সনদ এ জাতীয়– **(١) اَلزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ**

১. ইমাম যুহরী (র.) সালিম (র.) হতে, তিনি পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে।

(٢) مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ .

২. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) ওবায়দা (র.) হতে, তিনি হযরত আলী (রা.) হতে।

(٣) اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

৩. ইবরাহীম নাখায়ী (র.) আলকামা (র.) হতে, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে।

যেহেতু এ সকল সনদের ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণ 'সর্বোচ্চ সহীহ' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাই এ সনদের সকল হাদীস সহীহ।

মধ্যস্তরের উদাহরণ : সহীহ হাদীসের মধ্যস্তরের সনদগুলো নিম্নরূপ–

(١) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ مُوْسٰى .

১. বুরাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) আবূ বুরদা হতে, তিনি হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রা.) হতে।

(٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ ـ

২. হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) ছাবিত হতে, তিনি হযরত আনাস (রা.) হতে।

এ দুই সনদের হাদীস সহীহ হাদীসের দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বনিম্ন স্তরের উদাহরণ : সহীহ হাদীসের সর্বনিম্ন স্তরগুলো নিম্নরূপ–

(١) سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

১. সুহাইল ইবনে আবূ সালিহ (র.) তার পিতা আবূ সালিহ হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে।

(٢) اَلْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ـ

২. আলা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) তার পিতা আব্দুর রহমান হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে।

এ দু সনদের হাদীস সহীহ হাদীসের তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ হাদীসের এই মোট তিনটি স্তর বা তবকা। এই তিন স্তরের হাদীসের সকল রাবীদের মাঝে আদালাত, যবত ইত্যাদি সহীহ লিযাতিহী -এর সকল গুণাগুণ বিদ্যমান। যার ফলে উপরোল্লিখিত সনদসমূহে আগত বা বর্ণিত সকল হাদীস সহীহ লিযাতিহী। তবে প্রথম স্তরের রাবীদের মধ্যে এ গুণগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের রয়েছে। এজন্য এ স্তরের হাদীস অন্য স্তরের হাদীস থেকে অগ্রবর্তী হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় স্তরের হাদীস তৃতীয় স্তর থেকে অগ্রবর্তী হবে। তবে তৃতীয় স্তরের হাদীস ঐ ব্যক্তির হাদীসের থেকে অগ্রবর্তী হবে একাকী বর্ণনা করলে যার হাদীস সহীহ বলে বিবেচিত হয় না। বরং 'হাসান' বলে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ ১. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) আসিম ইবনে ওমর থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা.) হতে। ২. ওমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা হতে, পিতা দাদা হতে– এ সনদের হাদীস। সুতরাং এ দু সনদের হাদীসের উপর তৃতীয় স্তরের হাদীস অগ্রবর্তী হবে। মোটকথা, সহীহ হাদীসের স্তর যত নিম্নই হোক না কেন তা 'হাসান' হাদীসের উপর অগ্রবর্তী (مُقَدَّمٌ) হবে।

إِلَّا أَنَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى مِنَ الصِّفَاتِ الْمُرَجِّحَةِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ رِوَايَتِهِمْ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا وَفِي الَّتِي تَلِيهَا مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَهَا عَلَى الثَّالِثَةِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يُعَدُّ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ هُوَ حَسَنًا كَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَقِسْ عَلَى هٰذِهِ الْمَرَاتِبِ مَا يُشْبِهُهَا فِي الصِّفَاتِ الْمُرَجِّحَةِ وَالْمَرْتَبَةُ الْأُولَى هِيَ الَّتِي أَطْلَقَ عَلَيْهَا بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهَا أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا، نَعَمْ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ أَرْجَحِيَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُطْلِقُوهُ.

অনুবাদ : তবে প্রথম স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদায়ক এমন গুণাবলি রয়েছে যার চাহিদা হলো তাদের বর্ণনাকে পরবর্তী স্তরের ব্যক্তিদের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া। আর পরবর্তী স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে আয়ত্তশক্তির এমন দৃঢ়তা রয়েছে যার চাহিদা হলো তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিদের বর্ণনার উপর এদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তা সত্ত্বেও এই তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিদের আয়ত্তশক্তি এমন দৃঢ় যে, যাদের একক বর্ণনা 'হাসান' শ্রেণির বলে গণ্য হয়, তাদের চেয়েও এদের বর্ণনা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। যেমন– মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) আসিম ইবনে ওমর থেকে, তিনি (আসিম) হযরত জাবির (রা.) হতে। আর আমর ইবনে শুয়াইব পিতা শুয়াইব হতে, তিনি (শুয়াইব) দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে। তুমি এই স্তরসমূহের উপর ঐ স্তরকে কিয়াস বা তুলনা করো যা অগ্রাধিকার দানকারী গুণাবলির মধ্যে তার (এই স্তরসমূহের) মতো। (সহীহ হাদীসের মধ্যে) সর্বোচ্চ স্তরের হলো, কোনো ইমাম যাকে 'বিশুদ্ধতম সনদ' বলেছেন। নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো একটি নির্দিষ্ট সনদকে 'বিশুদ্ধতম' না বলা চাই। তবে ইমামরা যাকে এরূপ (বিশুদ্ধতম) বলেছেন– সামগ্রিকভাবে সেগুলো ইমামরা যে ক্ষেত্রে এরূপ বলেননি সে তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পূর্বে বর্ণিত তিন সনদেরই ব্যাপারে যদিও কতিপয় মুহাদ্দিসীনে কেরাম (যেমন– ইমাম **বুখারী, ইমাম** আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখ) أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ তথা 'বিশুদ্ধতম' **বলেছেন, কিন্তু** সঠিক ও বাস্তব কথা হলো, কোনো বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট সনদ সম্পর্কে এমন না **বলাটাই উচিত। এটাই** বিশুদ্ধতম ও গ্রহণযোগ্য উক্তি। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, **অবশ্য এটা ঠিক যে,** আইয়াম্মে হাদীস যদি কোনো সনদের ব্যাপারে এ মন্তব্য করেন যে, 'এটা **বিশুদ্ধতম' তবে অবশ্যই সে** সনদটি ঐ সনদের তুলনায় অগ্রাধিকারী হবে, যে সনদ সম্পর্কে তারা এমনটি **বলেননি।**

وَيَلْتَحِقُ بِهٰذَا التَّفَاضُلِ مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلٰى تَخْرِيْجِهٖ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَا انْفَرَدَ بِهٖ اَحَدُهُمَا وَمَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَا انْفَرَدَ بِهٖ مُسْلِمٌ لِاِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلٰى تَلَقِّىْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُوْلِ وَاخْتِلَافِ بَعْضِهِمْ فِىْ اَيِّهِمَا اَرْجَحُ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ اَرْجَحُ مِنْ هٰذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مِمَّا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ.

অনুবাদ : একই নিয়মে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) একযোগে যে হাদীসটি সংকলন করেছেন তা যে কোনো একজনের সংকলিত হাদীসের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য। আবার ইমাম বুখারীর একক সংকলিত হাদীস ইমাম মুসলিমের একক সংকলিত হাদীসের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা, পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরাম এ দু জনের গ্রন্থদ্বয় গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এ দু-টির মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য সে বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। তাই এদিক দিয়ে যে হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের দুজনের ঐকমত্য রয়েছে, তার মর্যাদা যে হাদীসের ক্ষেত্রে তারা একমত হননি সে তুলনায় অধিক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সহীহ হাদীসের তিন স্তরের আলোচনা যেটা পূর্বে করা হয়েছে– এটা ছিল যে কোনো কিতাবের সহীহ হাদীসের স্তরবিন্যাস। এমনিভাবে সুনির্দিষ্ট কিতাবের সহীহ হাদীসের মধ্যেও স্তরের ব্যবধান হয়। সুনির্দিষ্ট কিতাবের বিচারে সহীহ হাদীস পর্যায়ক্রমে সাত প্রকার। যথা–

১. মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস। অর্থাৎ যে সমস্ত হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) উভয়ে বর্ণনা করেছেন।

২. যে সমস্ত হাদীস শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন। (ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেননি।)

৩. যে সমস্ত হাদীস শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। (ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেননি।)

৪. যে সমস্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী অর্থাৎ তাঁদের রাবী কর্তৃক বর্ণিত, তবে তা বুখারী কিংবা মুসলিমে নেই।

৫. যে সমস্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হয়।

৬. যে সমস্ত হাদীস শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হয়।

৭. যে সমস্ত সহীহ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে নেই, আবার উভয়ের শর্ত অনুযায়ী কিংবা যে কোনো একজনের শর্ত অনুযায়ীও হয় না।

এভাবে স্তরবিন্যাসের কারণ : বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহের মাঝে এভাবে স্তরবিন্যাসের কারণ **হলো,** ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম, শুধু তা-ই নয় সমগ্র উম্মত সহীহ **বুখারী** ও সহীহ মুসলিম কিতাবদ্বয় ঐকমত্যে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তবে এর পরে গিয়ে **ওলামায়ে** কেরামের মধ্যে এ প্রশ্নে মতভেদ হয়েছে যে, বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কোন কিতাবটি অগ্রগণ্য (رَاجِحٌ)। জুমহুর ওলামায়ে কেরাম বুখারী শরীফের অগ্রগণ্যতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত

করেছেন। এজন্য যে সমস্ত হাদীস বুখারী-মুসলিম উভয়ে রেওয়ায়েত করেছেন, তা ঐ সমস্ত হাদীসের তুলনায় প্রাধান্য পাবে যেগুলো শুধুমাত্র তাদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন। এরপরে বুখারীর হাদীস মুসলিমের উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ হলো, জুমহুর স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে উত্তম। এ ব্যাপারে কারো ভিন্নমত নেই।

মোটকথা, মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের স্তর এক নম্বরে। অন্য সকল গ্রন্থের হাদীসের তুলনায় তা প্রাধান্য পাবে। এরপরে দ্বিতীয় স্তরে হলো বুখারী শরীফের হাদীস। এরপরে তৃতীয় স্তরের হলো মুসলিম শরীফের হাদীস। মুসলিমের হাদীস অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসের উপর অগ্রগণ্য হবে। কারণ, বুখারী শরীফের পরে মুসলিম শরীফ ওলামায়ে কেরামের কাছে ব্যাপক মাকবূল কিতাব হিসেবে সমাদৃত।

বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়ার মর্মার্থ : বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বুখারী ও মুসলিমে যে রাবীগণ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হওয়া। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যে সমস্ত রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন অন্যান্য লেখকগণ সে সমস্ত রাবীর বর্ণিত অন্য হাদীস বর্ণনা করবেন।

বুখারী ও মুসলিমের রাবীদের মধ্যে এত শক্তির কারণ হলো, তাদের মধ্যে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার শর্তগুলো তথা আদালাত, যবত ইত্যাদি গুণ এমন পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান যে, সমগ্র উম্মত তাদেরকে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের বর্ণনাসমৃদ্ধ গ্রন্থদ্বয়– বুখারী ও মুসলিমকে ব্যাপকভাবে বরণ করে নিয়েছে।

কিছু রাবী এমন আছেন যাদের থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন রাবীর থেকে অন্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হওয়াকে বলে মুত্তাফাক আলাইহি -এর শর্ত অনুযায়ী হওয়া।

কিছু রাবী এমন আছেন যাদের থেকে কেবল ইমাম বুখারী (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন রাবীর থেকে অন্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হওয়াকে বলে বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হওয়া।

কিছু রাবী এমন আছেন যাদের থেকে কেবল ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন রাবীর থেকে অন্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হওয়াকে বলে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়া।

যেহেতু এই তিন প্রকারের মধ্যে 'মুত্তাফাক আলাইহি-এর শর্ত অনুযায়ী হওয়াটা অধিক শক্তিশালী, তাই এমনভাবে বর্ণিত হাদীস অন্য দু প্রকার হতে অগ্রগণ্য হবে। অনুরূপ বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হওয়াটা যেহেতু মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হওয়া -এর তুলনায় অধিক শক্তিশালী, তাই অন্য কিতাবের যে হাদীস বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হবে তা ঐ হাদীস হতে অগ্রগণ্য হবে যা কেবল মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হয়।

স্তরবিন্যাসের ফলাফল প্রকাশ : সহীহ হাদীসের মধ্যে এ সাত স্তর বিন্যাসের ফল তখন পাওয়া যাবে যখন এ সাত প্রকারের মধ্যে تَعَارُضْ বা বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। দ্বন্দ্বের সময় প্রাধান্য পাবে সেই স্তরের হাদীস যার স্তর অগ্রগামী। যেমন– বুখারী ও মুসলিমের রাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস যদি বিরোধী হয় (বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে) ঐ হাদীসের, যা কেবল বুখারী বা মুসলিমের রাবী কর্তৃক বর্ণিত, তাহলে এমতাবস্থায় বুখারী ও মুসলিমের হাদীসটি জয়ী হবে ও প্রাধান্য পাবে। অনুরূপ শুধু বুখারীর রাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস যদি বিরোধী হয় শুধু মুসলিমের রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের, তাহলে এক্ষেত্রে বুখারীর রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে এক স্তরের হাদীস আরেক স্তরের উপর প্রাধান্য পাবে।

وَقَدْ صَرَّحَ الْجُمْهُورُ بِتَقْدِيْمِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ فِي الصِّحَّةِ وَلَمْ يُوْجَدْ عَنْ أَحَدِ التَّصْرِيْحِ بِنَقِيْضِهِ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِيْ عَلِيِّ النَّيْسَابُوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُوْدَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ إِذِ الْمَنْفِيُّ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقْتَضِيْهِ صِيْغَةُ أَفْعَلُ مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِيْ كِتَابٍ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ يَمْتَازُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفِ الْمُسَاوَاةَ وَكَذٰلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُغَارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيْحَ مُسْلِمٍ عَلٰى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ فَذٰلِكَ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلٰى حُسْنِ السِّيَاقِ وَجَوْدَةِ الْوَضْعِ وَالتَّرْتِيْبِ وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذٰلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصَحِّيَّةِ وَلَوْ أَفْصَحُوْا بِهِ لِرَدِّهِ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُوْدِ، فَالصِّفَاتُ الَّتِيْ تَدُوْرُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ فِيْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَتَمُّ مِنْهَا فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ ، وَشَرْطُهُ فِيْهَا أَقْوٰى وَأَسَدُّ .

অনুবাদ : অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বুখারী শরীফকে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। স্পষ্টত কারো থেকে এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় না। অবশ্য ইমাম আবূ আলী নিশাপুরী (র.) -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয় যে, তিনি বলেছেন– 'আসমানের নিচে মুসলিম শরীফের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো গ্রন্থ নেই।' তিনিও এখানে মুসলিম শরীফকে বুখারী শরীফের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বলেননি। তিনি নাকচ করেছেন মুসলিম শরীফ অপেক্ষা 'অধিকতর বিশুদ্ধ' গ্রন্থের অস্তিত্ব কেননা, أَفْعَلُ তথা إِسْمُ تَفْضِيْلٍ -এর দাবি অনুযায়ী বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মুসলিমের সাথে শরিক কিতাবের ঐ অধিক বিশুদ্ধতাকে নফী (নাকচ) করা হয়েছে, যার (অধিক বিশুদ্ধতা) দ্বারা সে কিতাবটি মুসলিমের উপর অগ্রগামী হয়। তিনি (দুই কিতাব) বরাবর হওয়ার বিষয়টি নফী (নাকচ) করেননি। পশ্চিম এলাকার কোনো কোনো মনীষী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা মুসলিম শরীফকে বুখারী শরীফের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটিও বর্ণনার সৌকর্য ও বিন্যাসের আঙ্গিক বিচারে। তারা পরিষ্কার ভাষায় এমন কথা বলেননি যে, মুসলিম শরীফের অগ্রগণ্যতা বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে। যদি এমনটি তারা সুস্পষ্টভাবে বলতেন, বাস্তব অবস্থার সাক্ষ্য তাহলে তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করত। কেননা, যে গুণাবলির উপর বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, তা মুসলিম শরীফের তুলনায় বুখারী শরীফে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় ও কঠোরভাবে রয়েছে। এ ব্যাপারে তার (বুখারীর) শর্তও অধিক মজবুত ও সংহত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুখারী অগ্রগণ্য নাকি মুসলিম? এ ব্যাপারে কোনোই মতভেদ নেই যে, বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্ধ হাদীসের অন্যান্য সকল গ্রন্থ হতে অগ্রগণ্য। কারণ, উম্মত তাদের দু কিতাবকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ কর

১. জুমহুর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, বিশুদ্ধতার দিক বিচারে **বুখারী মুসলিমের তুলনায়** অগ্রগণ্য। এ ব্যাপারে কারো ভিন্নমত নেই।

২. আবূ আলী নিশাপুরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন–

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ.

"আসমানের নিচে মুসলিমের থেকে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই।"

৩. পশ্চিম এলাকার কতিপয় মনীষী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মুসলিম শরীফ বুখারী **শরীফ হতে শ্রেষ্ঠ।**

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের **পরে সবচেয়ে** বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো মুয়াত্তা মালিক।

আবূ আলী নিশাপুরীর উক্তির জবাব : 'আসমানের নিচে মুসলিম থেকে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই' – আবূ আলী নিশাপুরীর এ উক্তিটি জুমহুরের মতামতের বিরোধী নয়। কারণ, এ উক্তি হতে সর্বোচ্চ এটা বুঝা যায় যে, মুসলিম শরীফ হতে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই। কিন্তু এটা হতে পারে যে, মুসলিমের মতো সহীহ আরো অনেক কিতাব আছে। আর উক্ত উল্লিখিত উক্তির দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'অধিক বিশুদ্ধ কিতাব' অস্বীকার করা উদ্দেশ্য; সম সহীহ কিতাবের কথা নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। এর বড় প্রমাণ হলো, তাঁর উক্তিতে আগত **أَصَحُّ** শব্দটি **اِسْمُ تَفْضِيْل**-এর সীগাহ, যা অতিরিক্ত অর্থ বুঝায়। আর নিয়ম আছে– **اِسْمُ تَفْضِيْل**-এর পূর্বে **حَرْفُ نَفْىْ** (তথা **لَا** – **مَا** ইত্যাদি) প্রবিষ্ট (**دَاخِل**) হলে ঐ অতিরিক্ত অর্থের **نَفْىْ** হয়, মূল **فِعْل**-এর নয়। এই সূত্র অনুযায়ী এখানে **اِسْمُ تَفْضِيْل**-এর পূর্বে **مَا نَفِيَّة** প্রবিষ্ট হওয়ায় 'অতিরিক্ত বিশুদ্ধতা'কে নাকচ করেছে যে, মুসলিমের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব দুনিয়াতে নেই। হ্যাঁ, তবে এটা হতে পারে যে, তার মতো সহীহ ও বিশুদ্ধ কিতাব আরও থাকবে।

মোটকথা, আবূ আলী নিশাপুরীর উক্তি অনুযায়ী বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ না হলেও বিশুদ্ধতার বিচারে উভয় কিতাব সমপর্যায়ের। মুসলিম শরীফ বুখারী হতে অধিক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় না।

পশ্চিমা এলাকার লোকদের উক্তির জবাব : পশ্চিমা এলাকার কতিপয় মনীষী বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম শরীফকে শ্রেষ্ঠ বলে যেটা অভিহিত করেছেন, সেটা বিশুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং সুন্দর বিন্যাস এবং চমৎকার ধারার দিক থেকে। আর জুমহুরও এটা স্বীকার করে যে, বিন্যাসগত সৌন্দর্যের বিচারে মুসলিম শরীফ বুখারী শরীফ হতে অগ্রগণ্য।

বিন্যাসের দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ অগ্রগণ্য হলেও বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারীর উপরে কোনো কিতাব নেই। এ ব্যাপারে সবাই একমত। ভিন্নমত কেউ পোষণ করে না। যদি কেউ এমনটি করত, তাহলে বাস্তব অবস্থার সাক্ষ্যই তা প্রত্যাখ্যান করত। কারণ, যে সকল গুণের উপর বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, তা মুসলিমের তুলনায় বুখারী শরীফের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় বিদ্যমান।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তির জবাব : মুয়াত্তা মালিক সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বলে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে মন্তব্য করেছেন তা বুখারী শরীফ রচনার পূর্বের সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বুখারী শরীফ রচিত হওয়ার পূর্বে মুয়াত্তা মালিকই ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। বুখারী শরীফ রচনার পরে এই খেতাবে ভূষিত হয় বুখারী শরীফ। এর বড় দলিল এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর ইন্তেকালের পরে বুখারী শরীফ লেখা হয়। আর উক্ত উক্তিটি ছিল তাঁর বেঁচে থাকাকালীন সময়ের।

اَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْاِتِّصَالِ فَلِاشْتِرَاطِهِ اَنْ يَّكُوْنَ الرَّاوِىْ قَدْ ثَبَتَ لَهُ لِقَاءُ مَنْ رُوِىَ عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاكْتَفٰى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ الْمُعَاصَرَةِ وَاُلْزِمَ الْبُخَارِىُّ بِاَنَّهُ يَحْتَاجُ اَنْ لَا يَقْبَلَ الْعَنْعَنَةَ اَصْلًا وَمَا اُلْزِمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِاَنَّ الرَّاوِىْ اِذَا ثَبَتَ لَهُ اللِّقَاءُ لَا يَجْرِىْ فِىْ رِوَايَتِهِ اِحْتِمَالُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ قَدْ سَمِعَ لِاَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرْيَانِهِ اَنْ يَّكُوْنَ مُدَلِّسًا وَالْمَسْئَلَةُ مَفْرُوْضَةٌ فِىْ غَيْرِ الْمُدَلِّسِ ـ

অনুবাদ : সনদের ইত্তিসাল তথা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সংযোগের দিক দিয়ে ইমাম বুখারীর প্রাধান্য রয়েছে। কেননা, তিনি শর্ত করেছেন, বর্ণনাকারী জীবনে একবার হলেও তার পূর্ববর্তী রাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন– এমন প্রমাণ থাকতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) শুধুমাত্র সমসাময়িকতাই যথেষ্ট মনে করেছেন। তিনি ইমাম বুখারীর উপর আপত্তি তুলেছেন যে, এতে করে তিনি 'আনআনা' হাদীস মোটেই গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর এ অভিযোগ ইমাম বুখারীর উপর বর্তায় না। কেননা, কোনো রাবী সম্পর্কে একবার হলেও সাক্ষাৎ লাভের প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে এরূপ সম্ভাবনা আর থাকে না যে, তিনি উক্ত শায়খ থেকে হাদীসটি শুনেননি। যদি এরূপ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে উক্ত রাবী একজন মুসাল্লিস। অথচ মুদাল্লিস নয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই আলোচনা চলছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুখারীর প্রাধান্যের কারণ : পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বুখারী অগ্রগণ্য। কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বুখারী মুসলিমের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। এখান থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাধান্যের দিকগুলো আলোচনা করা হচ্ছে।

বুখারী প্রাধান্য পাওয়ার কারণ কয়েকটি রয়েছে। যথা–

১. শর্তের দিক দিয়ে। কোনো হাদীস 'মুত্তাসিল' হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (র.) শর্তারোপ করেন যে, বর্ণনাকারীকে তার পূর্ববর্তী রাবীর সাথে জীবনে একবার হলেও সাক্ষাৎ হতে হবে।

এর বিপরীতে ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস মুত্তাসিল হওয়ার জন্য বর্ণনাকারী ও তার পূর্ববর্তী রাবী সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তাদের মধ্যে সাক্ষাতের শর্তারোপ করেন না।

বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা হলো, কোনো রাবী যদি তার শায়খ থেকে হাদীস শোনার কথা স্পষ্ট বর্ণনা করে, যেমন এভাবে বলে যে, سَمِعْتُ فُلَانًا 'আমি অমুক থেকে শুনেছি' অথবা حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ 'আমাকে অমুক বর্ণনা করেছে', তাহলে নিঃসন্দেহে হাদীসটি 'মুত্তাসিল' হবে।

এর বিপরীতে রাবী যদি তার শায়খ থেকে শোনার কথা স্পষ্ট ভাষায় না বলে বরং عَنْ فُلَانٍ "অমুক থেকে" –এভাবে হাদীস বর্ণনা করে, তাহলে এক্ষেত্রে রাবী ও শায়খের জীবনকাল যদি এক সময়ের না

হয় বা এক সময়ের হলেও তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াটা **প্রমাণিত হয়, তাহলে হাদীস সন্দেহাতীতভাবে** মুনকাতি' (مُنْقَطِعْ) হবে।

কিন্তু যদি রাবী ও শায়খের সময়কাল এক হয় এবং তাদের মাঝে সাক্ষাৎ না **ঘটার বিষয়টি প্রমাণিত না হয়;** বরং উভয়ের মাঝে সাক্ষাতের সম্ভাবনাই বেশি থাকে এবং রাবী মুদাল্লিস না হয়, **তাহলে এ হাদীস ইমাম** মুসলিম (র.) -এর মতে মুত্তাসিল হবে। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) -এর মতে মুত্তাসিল **হবে না।**

নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী (র.)-এর এই অর্থাৎ জীবনে একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তটি **কঠিন এবং** قُوَّتْ اِتِّصَالْ তথা সন্দেহাতীতভাবে মুত্তাসিল হওয়ার ফায়দা দেয়। তাই এ শর্তের দিক বিচারে **বুখারী শরীফ** মুসলিম শরীফের তুলনায় অগ্রগণ্য এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

ইমাম মুসলিমের প্রশ্ন ও লেখকের উত্তর : ইমাম বুখারী (র.)-এর উল্লিখিত শর্তের প্রেক্ষিতে **ইমাম** মুসলিম (র.)-এর পক্ষ হতে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র.) -এর এ শর্ত আবশ্যক **করে যে,** তিনি তার কিতাবে حَدِيْثُ مُعَنْعَنْ (অর্থাৎ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ করে বর্ণনা) মোটেও বর্ণনা করবেন না। কারণ, حَدِيْثُ مُعَنْعَنْ -এর মধ্যে সাক্ষাতের পরেও শায়খ থেকে হাদীস না শোনার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ রাবী তার শায়খের সাথে সাক্ষাতের পরেও এই সম্ভাবনা থাকে যে, বর্ণনাকৃত হাদীসটি তিনি (রাবী) শায়খ থেকে শ্রবণ করেননি। এ কারণে বুখারীর কর্তব্য যে, তিনি তার কিতাবে حَدِيْثُ مُعَنْعَنْ মোটেও উল্লেখ করবেন না। অথচ তিনি তার কিতাবে অনেক حَدِيْثُ مُعَنْعَنْ রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম বুখারীর হয়ে সম্মানিত লেখক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম বুখারীর প্রতি এ প্রশ্ন উত্থাপিতই হয় না। কারণ, ইমাম বুখারী যখন সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তার حَدِيْثُ مُعَنْعَنْ-এর মধ্যে সাক্ষাৎ প্রমাণিত। আর এটা এক রকম আবশ্যক যে, সাক্ষাতের পরে রাবী শায়খ থেকে হাদীস অবশ্যই শুনবেন। নতুবা রাবী মুদাল্লিস হয়ে যাবেন। অথচ আলোচনা চলছে ঐ রাবীর হাদীস সম্পর্কে যিনি মুদাল্লিস নন। মোটকথা, যদিও সাক্ষাতের পরেও শায়খ থেকে হাদীস না শোনার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা, তাহলে রাবী মুদাল্লিস হয়ে যাবেন। অথচ আলোচনা চলছে غَيْرُ مُدَلِّسْ রাবী -এর عَنْعَنَةْ (عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ) বর্ণনার হুকুম নিয়ে– مُدَلِّسْ রাবী-এর عَنْعَنَةْ -এর হুকুম নিয়ে নয়। কারণ, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রাবী যদি মুদাল্লিস হয়, তাহলে তার عَنْعَنَةْ টা مُتَّصِل হতে হলে প্রতিটি রেওয়ায়েতে এমন কোনো শব্দ থাকতে হবে, যা সেই রেওয়ায়েত শায়খ থেকে রাবী শুনেছে বলে খবর দেয়।

وَاَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ فَلِاَنَّ الرِّجَالَ الَّذِيْنَ تُكُلِّمَ فِيْهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ اَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْنَ تُكُلِّمَ فِيْهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ مَعَ اَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ اِخْرَاجِ حَدِيْثِهِمْ بَلْ غَالِبُهُمْ مِنْ شُيُوْخِهِ الَّذِيْنَ اَخَذَ عَنْهُمْ وَمَارَسَ حَدِيْثَهُمْ بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِى الْاَمْرَيْنِ ، وَاَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الشُّذُوْذِ وَالْاِعْلَالِ فَلِاَنَّ مَا انْتُقِدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْاَحَادِيْثِ اَقَلُّ عَدَدًا مِمَّا انْتُقِدَ عَلٰى مُسْلِمٍ هٰذَا مَعَ اِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلٰى اَنَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ اَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِى الْعُلُوْمِ وَاَعْرَفَ عَنْهُ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيْثِ، وَاَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيْذُهُ وَخِرِّيْجُهُ وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيْدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ اٰثَارَهُ حَتّٰى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَوْلَا الْبُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ ، وَمِنْ ثَمَّ اَىْ وَمِنْ هٰذِهِ الْجِهَةِ وَهِىَ اَرْجَحِيَّةُ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عَلٰى غَيْرِهِ قُدِّمَ صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ عَلٰى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ صَحِيْحُ مُسْلِمٍ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْبُخَارِيِّ فِىْ اِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلٰى تَلَقِّىْ كِتَابِهِ بِالْقَبُوْلِ اَيْضًا سِوٰى مَا عُلِّلَ ـ

অনুবাদ : ন্যায়পরায়ণতা ও আয়ত্তশক্তির দিক দিয়েও বুখারী শরীফ অগ্রগণ্য। কেননা, বুখারী শরীফের সমালোচিত ব্যক্তিদের তুলনায় মুসলিম শরীফের সমালোচিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অধিক। তা ছাড়া ইমাম বুখারী (র.) এ ধরনের ব্যক্তিদের নিকট থেকে তেমন বেশি হাদীস গ্রহণ করেননি; বরং তাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ ওস্তাদ, যাদের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের হাদীস তিনি (সরাসরি তাদের থেকে) চর্চা করেছেন। এ উভয় বিষয়ে ইমাম মুসলিম ব্যতিক্রম।

শায ও মু'আল্লাল না হওয়ার দিক দিয়েও বুখারী শরীফ অগ্রগণ্য। কেননা, বুখারী শরীফের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা মুসলিম শরীফের সমালোচিত হাদীসের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক। সর্বোপরি ওলামায়ে কেরাম সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিমের তুলনায় ইলমী যোগ্যতায় যেমন উচ্চ অবস্থানের অধিকারী, তেমনি হাদীসশাস্ত্রেও অধিক বিজ্ঞ। ইমাম মুসলিম ছিলেন তাঁর ছাত্র এবং ফসল। তিনি নিয়মিত তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা নিতেন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। ইমাম দারাকুতনী এও পর্যন্ত বলেছেন, ইমাম বুখারী না থাকলে ইমাম মুসলিম (হাদীসশাস্ত্রে) মনোযোগী হতেন না এবং আসতেন না অর্থাৎ এই শাস্ত্রে পা রাখতে পারতেন না। অন্য সকল কিতাবের চেয়ে ইমাম বুখারীর শর্ত অধিকতর কঠোর হওয়ার কারণে বুখারী শরীফকে হাদীস বিষয়ে লিখিত সকল গ্রন্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতঃপর মুসলিম শরীফের স্থান। কেননা, ওলামায়ে কেরামের নিকট সমাদৃত হওয়ার দিক দিয়ে এটিও বুখারী শরীফের সমান। অবশ্য সমালোচিত হাদীসগুলো বাদ দিয়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. ضَبْط ও عَدَالَتْ-এর দিক দিয়ে : ضَبْط তথা আয়ত্তশক্তি এবং عَدَالَتْ তথা ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকেও বুখারী মুসলিমের তুলনায় অগ্রগণ্য। মুসলিমের তুলনায় বুখারীর এই অগ্রগণ্যতার কারণ দুটি। যথা–

১. মুসলিমের তুলনায় বুখারীতে বিতর্কিত ও সমালোচিত রাবীর রেওয়ায়েত কম।

২. ইমাম বুখারী যে সমস্ত বিতর্কিত রাবীদের রেওয়ায়েত এনেছেন তারা হলেন তাঁর সরাসরি ওস্তাদ, যাদের ضَبْط ও عَدَالَتْ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন।

ইমাম মুসলিম (র.) এর ব্যতিক্রম। একে তো তাঁর কিতাবের সমালোচিত ও বিতর্কিত রাবীর রেওয়ায়েত বেশি। তদুপরি যাদের থেকে তিনি এ সকল বিতর্কিত রেওয়ায়েত এনেছেন তারা তাঁর সরাসরি ওস্তাদ নন; বরং ওস্তাদের ওস্তাদ, যাদের ضَبْط ও عَدَالَتْ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন না। অধিকাংশই ছিলেন তাবেয়ী বা তাবয়ে-তাবেয়ীন স্তরের লোক।

ইমাম সাখাবীর বর্ণনা মতে যে সমস্ত রাবী থেকে ইমাম বুখারী একাই রেওয়ায়েত করেছেন তাদের সর্বমোট সংখ্যা ৪৩৫। এর মধ্যে বিতর্কিত হলেন ৮০ জনের মতো। আর ইমাম মুসলিম (র.) যে সমস্ত রাবীদের থেকে একাই রেওয়ায়েত করেছেন তাদের সংখ্যা ৬১০। এদের মধ্যে বিতর্কিত হলেন ১৬০ জন। অর্থাৎ বুখারীর তুলনায় দ্বিগুণ।

৩. **শায ও ইল্লত না হওয়ার দিক দিয়ে :** এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বুখারী মুসলিমের তুলনায় অগ্রগণ্য। কারণ, মুসলিমের তুলনায় বুখারী শরীফে শায ও মু'আল্লাল হাদীসের সংখ্যা কম। এর বিবরণ হলো, বুখারী ও মুসলিমের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট ২১০। এর মধ্যে ৩২টি উভয় কিতাবের। ৮০টি শুধু বুখারীতে। আর বাকি ৯৮ টি মুসলিম শরীফে আছে। এ হিসাব অনুপাতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা বুখারীর তুলনায় মুসলিমে কমপক্ষে ১৮টি বেশি।

৪. **লেখকের দিক দিয়ে :** লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকেও বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের চেয়ে অগ্রগণ্য। কারণ, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, সাধারণত সকল ইলম বিশেষত ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ এবং মর্যাদায় উর্ধ্বে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম মুসলিম হলেন ইমাম বুখারীর ছাত্র। তিনি হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। ইমাম দারাকুতনী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন– لَوْلَا الْبُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ

অর্থাৎ যদি ইমাম বুখারী না হতেন তাহলে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মুসলিম (র.) পা রাখতে পারতেন না, সফলকাম হতে পারতেন না।

আর এটা স্বাভাবিক কথা যে, লেখক যত উঁচুমানের হন তার কিতাবের মানও তত বেশি হয়, তাই বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফের তুলনায় অগ্রগণ্য।

মোটকথা, যে সমস্ত সিফাত ও শর্তের কারণে হাদীস বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছে তার মধ্যে বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ ইত্যাদি গ্রন্থ হতে অধিক উত্তম এবং অগ্রগণ্য। বস্তুত এ কারণেই হাদীসের সকল কিতাবের উপরে বুখারী শরীফের মান। এর পরের স্তরে হলো মুসলিম শরীফ। কেননা, মুসলিমের শর্তও বুখারীর কাছাকাছি। এতদ্ব্যতীত বুখারীর মতো মুসলিম শরীফকেও ওলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৫. **মাসআলা ইজতিহাদ করার দিক দিয়ে :** মুসলিমের উপর বুখারীর প্রাধান্যের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (র.) হাদীসের আলোকে মাসআলা ইস্তিম্বাত (উৎসারণ) করেছেন। এমনকি তিনি এক এক হাদীস হতে কয়েকটি মাসআলা বের করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে এমনটি করেননি।

ثُمَّ يُقَدَّمُ فِى الْاَرْجَحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْاَصَحِّيَّةِ مَا وَافَقَهُ شَرْطُهُمَا ، لِاَنَّ الْمُرَادَ بِهِ رُوَاتُهُمَا مَعَ بَاقِى شُرُوْطِ الصَّحِيْحِ وَ رُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الْاِتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِيْلِهِمْ بِطَرِيْقِ اللُّزُوْمِ فَهُمْ مُقَدَّمُوْنَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِى رِوَايَاتِهِمْ وَهٰذَا اَصْلٌ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ اِلَّا بِدَلِيْلٍ فَاِنْ كَانَ الْخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعًا كَانَ دُوْنَ مَا اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ اَوْ مِثْلَهُ وَاِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ اَحَدِهِمَا فَيُقَدَّمُ شَرْطُ الْبُخَارِىِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبْعًا لِاَصْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هٰذَا سِتَّةُ اَقْسَامٍ يَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا فِى الصِّحَّةِ وَثَمَّ قِسْمٌ سَابِعٌ وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا اِجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا ـ

অনুবাদ : বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে অতঃপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেই হাদীসগুলোকে যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্ত মোতাবেক। শর্ত বলতে বুঝানো হয় তাঁদেরই ব্যক্তিবর্গ। অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যাদের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ দু গ্রন্থের ব্যক্তিবর্গের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অনিবার্যরূপে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আর এটি এমন এক মূলনীতি যা কোনো দলিল ব্যতীত উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং যে হাদীস একযোগে উভয়ের শর্ত মোতাবেক, তা মুসলিম শরীফের হাদীসের চেয়ে উচ্চস্তরের কিংবা তার সমান বলে গণ্য হবে। আর যদি মাত্র একজনের শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে ইমাম বুখারীর শর্তকে ইমাম মুসলিমের শর্তের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। মূলগ্রন্থ অনুসারে এ বিন্যাস করা হয়েছে।

সারকথা আমরা ৬টি শ্রেণি খুঁজে পেলাম– বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে যেগুলোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। অতঃপর সপ্তম একটি শ্রেণিও রয়েছে। তা হলো– যা বুখারী-মুসলিমের শর্ত মোতাবেক নয়। যুগল কিংবা একক কোনোভাবেই তাতে উক্ত দু কিতাবের শর্ত অনুসরণ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখের জন্য ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) যে সকল শর্ত ধর্তব্য করেছেন বুখারী ও মুসলিমের কোথাও তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই। তবে যে সকল ওলামায়ে কেরাম বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত পন্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা সেসব শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেহেতু গবেষণা কর্মে মতান্তর হওয়া স্বাভাবিক, তাই বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ হয়েছে। "শায়খাইনের শর্ত অথবা কোনো একজনের শর্ত"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে রাবীগণ থেকে বুখারী ও মুসলিম উভয়ে অথবা কোনো একজন হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সকল রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করা এবং হাদীস বর্ণনা করতে ঐ ভাবধারা অবলম্বন করা যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ অভিমত ও ব্যাখ্যাটিই সমর্থন করেছেন।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) "মুকাদ্দামাতুশ শায়খ"-এ লেখেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের **শর্ত** অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ আয়ত্তশক্তি (ضَبْط), ন্যায়পরায়ণতা عَدَالَت, শায না হওয়া, মুনকার না হওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এমন গুণবিশিষ্ট রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা– বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ হতে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

وَهٰذَا التَّفَاوُتُ اِنَّمَا هُوَ بِالنَّظْرِ اِلَى الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ اَمَّا لَوْ رُجِّحَ قِسْمٌ عَلٰى مَا فَوْقَهٗ بِاُمُوْرٍ اُخْرٰى تَقْتَضِى التَّرْجِيْحَ عَلٰى مَا فَوْقَهٗ فَاِنَّهٗ يُقَدَّمُ عَلٰى مَا فَوْقَهٗ اِذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفُوْقِ مَا يَجْعَلُهٗ فَائِقًا كَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيْثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلًا وَهُوَ مَشْهُوْرٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ لٰكِنْ حَفَّتْ قَرِيْنَةٌ صَارَ بِهَا يُفِيْدُ الْعِلْمَ فَاِنَّهٗ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيْثِ الَّذِىْ يُخْرِجُهُ الْبُخَارِىُّ اِذَا كَانَ فَرْدًا مُطْلَقًا وَكَمَا لَوْ كَانَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ لَمْ يُخْرِجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا اَصَحَّ الْاَسَانِيْدِ كَمَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاِنَّهٗ يُقَدَّمُ عَلٰى مَا انْفَرَدَ بِهٖ اَحَدُهُمَا مَثَلًا لَاسِيَّمَا اِذَا كَانَ فِىْ اِسْنَادِهٖ مَنْ فِيْهِ مَقَالٌ ـ

অনুবাদ : এখানে যে মর্যাদার তারতম্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তা ন্যায়পরায়ণতা ও আয়ত্তশক্তির দিক দিয়ে। অবশ্য কোনো একটি শ্রেণিকে যদি অগ্রাধিকার দানকারী অন্যান্য কারণে তার উপরস্থ শ্রেণির চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা, অনেক সময় নিম্নস্তরের বস্তুর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে যার ভিত্তিতে সেটিকেই উন্নত বলে গণ্য করতে হয়। মনে করা যাক, মুসলিম শরীফের একটি হাদীস যা মাশহূর শ্রেণির অর্থাৎ মুতাওয়াতির শ্রেণির নয়; কিন্তু তার সাথে এমন নিদর্শন যুক্ত হয়েছে যাতে তা দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। এ হাদীসটিকে বুখারী শরীফের সেই হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে যা 'মুতলাক ফরদ'। অথবা মনে করা যাক, একটি হাদীস বুখারী কিংবা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়নি; কিন্তু তা বর্ণিত হয়েছে এমন সনদে যা 'বিশুদ্ধতম' বিশেষণের অধিকারী। যেমন– ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন নাফে থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে। এরূপ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের যে কারো একক বর্ণনার চেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। বিশেষত যে সনদ সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে তার তুলনায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইতঃপূর্বে হাদীসের যে প্রকরণ ও স্তরবিন্যাস উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল বিশুদ্ধতার দিক বিচারে। উল্লিখিত প্রকারের কোনো প্রকারে যদি বিশুদ্ধতার সাথে সাথে এমন কোনো নিদর্শন যোগ হয়, যা তার ঊর্ধ্বস্তরের উপর অগ্রাধিকার দাবি করে, তাহলে সে প্রকারকে তার ঊর্ধ্বস্তরের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। যথা–

১. একটি হাদীস শুধু মুসলিমে আছে; বুখারীতে নেই। এ হাদীসটি আবার মাশহূর। এখন যদি এই হাদীসের সাথে এমন কোনো নিদর্শন যোগ হয়, যার দ্বারা হাদীসটি মুতাওয়াতিরের মতো عِلْمُ يَقِيْن তথা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়, তাহলে মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি বুখারী শরীফের ঐ হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে, যা মাত্র একক সনদে বর্ণিত। অথচ এর পূর্বে বিশুদ্ধতার বিচারে বুখারীর হাদীসটি মুসলিমের হাদীসের তুলনায় অগ্রগামী ছিল।

২. ঠিক এমনিভাবে বুখারী ও মুসলিম যে হাদীস বর্ণনা করেনি, যদি সেই হাদীসের সনদের ব্যাপারে ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয় যে, তা اَصَحُّ الْاَسَانِيْد বা বিশুদ্ধতম সনদ। যেমন– হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম মালিক (র.) থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত নাফে (র.) থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে। তাহলে এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে না থাকা সত্ত্বেও ঐ হাদীসের উপর অগ্রগণ্য হবে যে হাদীস শুধুমাত্র ইমাম বুখারী অথবা শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে যদি বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের সনদ যা'ঈফ হয়, তাহলে তখন উক্ত হাদীস অবশ্যই এই যা'ঈফ হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে।

فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ اَىْ قَلَّ يُقَالُ خَفَّ الْقَوْمُ خُفُوْفًا قَلُّوْا وَالْمُرَادُ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوْطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِىْ حَدِّ الصَّحِيْحِ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ لَا لِشَئٍ خَارِجٍ وَهُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ حَسَنُهُ بِسَبَبِ الْاِعْتِضَادِ نَحْوُ حَدِيْثُ الْمَسْتُوْرِ اِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَخَرَجَ بِاِشْتِرَاطِ بَاقِى الْاَوْصَافِ الضَّعِيْفِ وَهٰذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيْحِ فِى الْاِحْتِجَاجِ بِهِ وَاِنْ كَانَ دُوْنَهُ وَمُشَابِهٌ لَهُ فِىْ اِنْقِسَامِهِ اِلٰى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ

অনুবাদ : আয়ত্তশক্তিতে যদি ঘাটতি হয় অর্থাৎ কম হয় (যেমন বলা হয়– লোক কম হয়েছে) এবং তার সাথে সহীহ -এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত অবশিষ্ট শর্তসমূহ বহাল থাকে, তাহলে তাকে বলা হয় 'হাসান লিযাতিহী'। বাইরের কোনো কারণে (হাসান) নয়। হাসান লিগায়রিহী ঐ হাদীস যার হাসানটা (রাবীর আধিক্য ইত্যাদির) শক্তির কারণে হয়। যেমন– একাধিক সনদে বর্ণিত অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস। (এটা হাসান লিগায়রিহী।) সহীহ লিযাতিহী-এর অবশিষ্ট শর্তারোপের দ্বারা যা'ঈফ হাদীস (হাসানের সংজ্ঞা হতে) বেরিয়ে গেছে। হাসান-এর এ প্রকার (অর্থাৎ হাসান লিযাতিহী) মর্যাদার দিক দিয়ে (সহীহ হতে) নিম্নমানের হলেও সহীহ-এর সমপর্যায়ের এবং তারতম্যপূর্ণ বিভিন্ন স্তরের দিকে বিভক্ত হওয়ার দিক থেকে (হাসান লিযাতিহীটা) সহীহ লিযাতিহী-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাসান লিযাতিহী-এর সংজ্ঞা : আরবিতে সংজ্ঞাটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

هُوَ خَبَرُ الْاٰحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَافِّ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ ـ

অর্থাৎ যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারী আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও কম আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শায কিংবা মু'আল্লাল নয়– এরূপ হাদীসের নাম হাসান লিযাতিহী।

নামকরণের কারণ : যেহেতু এ জাতীয় হাদীসের হাসান তথা ভালো হওয়াটা হলো ذات বা সত্তাগত, বাইরের কোনো কারণে নয়, তাই তাকে বলা হয় হাসান লিযাতিহী।

হাসান লিযাতিহী-এর হুকুম : সহীহ লিযাতিহী হাদীসের মতো হাসান লিযাতিহী হাদীসও দলিল ও আমলযোগ্য। অর্থাৎ হাসান লিযাতিহী হাদীস দ্বারা যেমনিভাবে দলিল দেওয়া যায় তেমনি তার উপর আমলও করা যায়।

সহীহ লিযাতিহী হাদীস যেমন বিভিন্ন স্তরের হয়, তেমনি হাসান লিযাতিহী-এর মধ্যেও বিভিন্ন স্তর হয়। যার একটির স্তর অপরটির তুলনায় উর্ধ্বে হয়। অবশ্য সহীহ লিযাতিহী ও হাসান লিযাতিহী হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সহীহ লিযাতিহী হাদীস প্রাধান্য পাবে। কারণ, সহীহ -এর মর্তবা হাসান থেকে উর্ধ্বে।

হাসান লিযাতিহী-এর উদাহরণ : এর উদাহরণ ঐ সমস্ত হাদীস যা عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ এবং مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرٍ جَدِّهِ এবং সনেদ বর্ণিত হয়।

হাসান লিযাতিহী ও সহীহ লিযাতিহী -এর মধ্যে পার্থক্য : সহীহ **লিযাতিহী ও হাসান লিযাতিহী**-এর সংজ্ঞা ও শর্ত প্রায় বরাবর। মাত্র একটি স্থানে পার্থক্য। আর তা হলো, **সহীহ লিযাতিহী-এর মধ্যে** রাবীর মাঝে تَامُّ الضَّبْطِ তথা পূর্ণ আয়ত্তশক্তি হয়। আর হাসান লিযাতিহী -এর রাবীর **মধ্যে** خَافُّ الضَّبْطِ তথা কম আয়ত্তশক্তি হয়। এটুকুই যা প্রভেদ। এ ছাড়া সহীহ-এর বাকি সকল শর্ত হাসানের **জন্যও প্রযোজ্য**।

হাসান লিগায়রিহী -এর সংজ্ঞা : যে হাদীস মূলত মাওকূফ, গায়রে মাকবূল এবং **যা'ঈফ ও অজ্ঞাত** ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হয়, সে হাদীসের সাথে যদি সনদের আধিক্য ইত্যাদি এমন নিদর্শন **যুক্ত হয়, যা** হাদীসটি কবুল হওয়ার দিককে প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে হাদীসকে হাসান লিগায়রিহী বলে।

আরবিতে اَلْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- هُوَالْحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ اِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهٗ

অর্থাৎ যা'ঈফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগায়রিহী বলে।

হাসান লিগায়রিহী -এর উদাহরণ : দারাকুতনী গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ হাদীসটি হাসান লিগায়রিহী। কারণ, এ হাদীসের যত সনদ আছে তার মধ্যে আপত্তি রয়েছে। তারপরেও ইমাম নববী (র.) এবং ইবনুস সালাহ (র.) সনদের আধিক্য হেতু হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

নামকরণের কারণ : যেহেতু এ জাতীয় নিদর্শনের কারণে তা বাইরের কারণের উপর মাওকূফ **অর্থাৎ** সংযুক্ত নিদর্শনের কারণে তা হাসান হয়, তাই তার নামকরণ করা হয়েছে হাসান লিগায়রিহী করে।

হাসান লিগায়রিহী-এর হুকুম : হাসান লিযাতিহী-এর মতো হাসান লিগায়রিহীও আমল ও দলিলযোগ্য। কিন্তু এর মর্তবা যেহেতু খবরে মাকবূলের অন্যান্য প্রকার থেকে নিচু, তাই বিরোধের সময় তা অগ্রাধিকার পাবে না, অর্থাৎ مَجْرُوْحٌ হবে।

رَاوِىْ مَسْتُوْر -এর সংজ্ঞা : যে রাবীর عَدَالَتْ এবং جَرْحٌ কোনোটিই সুপ্রমাণিত নয়, তাকে رَاوِىْ مَسْتُوْر বলে।

وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ لِأَنَّ لِلصُّوْرَةِ الْمَجْمُوْعَةِ قُوَّةً تَجْبُرُ الْقَدْرَ الَّذِىْ قَصُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِى الْحَسَنِ عَنْ رَاوِى الصَّحِيْحِ وَمِنْ ثَمَّ يُطْلَقُ الصِّحَّةُ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِىْ يَكُوْنُ حَسَنًا لِذَاتِهِ لَوْ تَفَرَّدَ إِذَا تَعَدَّدَ وَهٰذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ ـ

অনুবাদ : হাসান লিযাতিহী হাদীসের সনদ সংখ্যা অধিক হলে তাকে বলা হয় সহীহ লিগায়রিহী। এ ধরনের হাদীসকে সহীহ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, সামগ্রিক রূপের মাধ্যমে এমন শক্তি অর্জিত হয়, যার ফলে সহীহ লিযাতিহী -এর রাবী অপেক্ষা হাসান লিযাতিহী-এর রাবীর মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ হয়ে যায়। সে কারণে যে সনদ একক হলে হাসান লিযাতিহী হয়, সেটির একাধিক সনদ থাকলে তাকে সহীহ বলে সাব্যস্ত করা হয়। এটা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কেবল একটি সিফাত আসে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهٰذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ : এখানে هٰذَا -এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো সহীহ ও হাসানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা। حَيْثُ يَنْفَرِدُ الْوَصْفُ দ্বারা উদ্দেশ্য حَدِيْثُ الْوَصْفِ অর্থাৎ صَحِيْحٌ বা حَسَنٌ সারকথা হলো, যে হাদীসের সাথে কেবল একটি সিফাত আসবে এভাবে যে, هٰذَا حَدِيْثٌ বা هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ এবং একত্রে দুটো সিফাত এভাবে আসবে না যে, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ সেক্ষেত্রে কেবল সহীহ ও হাসানের উক্ত সংজ্ঞা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কোনো হাদীসে দুটি সিফাত একসাথে আসে যেমন এভাবে যে, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ তাহলে সেখানে حَسَنٌ ও صَحِيْحٌ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য হবে যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সহীহ লিগায়রিহী -এর সংজ্ঞা : আরবিতে সংজ্ঞাটি এভাবে দেওয়া যায়– هُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ অর্থাৎ হাসান লিযাতিহী হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে বলে, সহীহ লিগায়রিহী।

সনদ বেশি হলে হাসান হওয়ার কারণ : হাসান লিযাতিহী হাদীসের সনদ বেশি হলে হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। এর কারণ হলো, অসংখ্য ও একাধিক সনদের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, রাবীর মধ্যে কম আয়ত্তশক্তি থাকায় হাসান লিযাতিহী-এর মধ্যে যে ত্রুটি ও কমতি সংঘটিত হয়েছিল তা পূরণ হয়ে বিশুদ্ধতার স্তরে পৌঁছে দেয়। বস্তুত এ ক্ষতিপূরণের কারণেই হাসান লিযাতিহী হাদীসটি সহীহ হয়ে যায়।

নামকরণের কারণ : এ জাতীয় হাদীস সহীহ হলেও যেহেতু তা নিজস্ব শক্তি বলে হয় না ; বরং অন্যের কারণে অর্থাৎ সনদের আধিক্যের কারণে হয়, তাই তাকে সহীহ লিগায়রিহী বলে।

সহীহ লিগায়রিহী-এর হুকুম : সহীহ লিযাতিহী-এর মতো সহীহ লিগায়রিহীও দলিলযোগ্য। অবশ্য পরস্পর বিরোধের সময় সহীহ লিগায়রিহী হাদীস হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহী-এর উপর অগ্রাধিকার পাবে এবং সহীহ লিযাতিহী-এর পরবর্তী স্তরে থাকবে।

সহীহ লিগায়রিহী-এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী -এর উদাহরণ।

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِىْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ـ

এ হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (র.) মন্তব্য করেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এ হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী। কারণ, এ হাদীসটি অনেক সনদে বর্ণিত। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে আমর ব্যতীত অন্যান্য সনদের হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। এজন্য এ হাদীসটি সহীহ লিগায়রিহী হবে কেবল মুহাম্মদ ইবনে আমরের সনদে।

সহীহ লিগায়রিহী ও হাসান লিযাতিহী-এর মধ্যে পার্থক্য : সহীহ লিগায়রিহী -এর মধ্যে সনদ অনেক (একাধিক) হয়, আর হাসান লিযাতিহী -এর মধ্যে সনদ হয় একটি।

فَإِنْ جَمَعَا أَيِ الصَّحِيْحَ وَالْحَسَنَ فِيْ وَصْفٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ فَلِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ فِي النَّاقِلِ هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ شُرُوْطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ عَنْهَا وَهٰذَا حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدُ بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ وَعُرِفَ بِهٰذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَقَالَ الْحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيْحِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذٰلِكَ الْقُصُوْرِ وَنَفْيُهُ وَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ فِيْ حَالِ نَاقِلِهِ اِقْتَضٰى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ فَيُقَالُ فِيْهِ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ صَحِيْحٌ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ وَغَايَةُ مَا فِيْهِ أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُوْلَ حَسَنٌ أَوْ صَحِيْحٌ وَهٰذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ الْعَطْفِ مِنَ الَّذِيْ بَعْدَهُ وَعَلٰى هٰذَا فَمَا قِيْلَ فِيْهِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ دُوْنَ مَا قِيْلَ فِيْهِ صَحِيْحٌ لِأَنَّ الْجَزْمَ أَقْوٰى مِنَ التَّرَدُّدِ وَهٰذَا حَيْثُ التَّفَرُّدِ ـ

অনুবাদ : যদি একই হাদীসের ক্ষেত্রে 'সহীহ' ও 'হাসান' উভয় বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যেমন- ইমাম তিরমিযী প্রমুখের উক্তি حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ, তাহলে এটা হবে রাবীর ব্যাপারে মুহাদ্দিসের (মুজতাহিদের) এ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে, রাবীর মধ্যে বিশুদ্ধতার শর্তাবলি আছে নাকি সে ব্যাপারে ত্রুটি বা কমতি রয়েছে ? এ ব্যাখ্যা ঐ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার সনদ মাত্র একটি। (আর যার সনদ অনেক তার জবাব সামনে আসছে।)

এ আলোচনা দ্বারা তাদের জবাব জানা গেছে, যারা হাসান ও সহীহ সিফাতদ্বয় একত্রিত হওয়াকে জটিল ও কঠিন মনে করেন এবং (প্রশ্নের সুরে) বলেন যে, সংজ্ঞার আলোকে 'হাসান' 'সহীহ' থেকে নিম্নমানের। (তাহলে দুটি সিফাত একত্রিত হয় কিভাবে? কেননা,) দুই সিফাত একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো (হাসান হওয়ায়) রাবীর আয়ত্তগত ত্রুটিকে সাব্যস্ত করা এবং (সহীহ হিসেবে) ঐ ত্রুটিকে নাকচ করা, (আর একই সাথে এটা অসম্ভব।)

জবাবের সারকথা হলো, হাদীসের রাবীর মধ্যে মুহাদ্দিসগণের সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগাটা মুজতাহিদের জন্য দাবি করে যে, তিনি উক্ত হাদীসের দুই সিফাতের একটি সিফাত আনবেন (উল্লেখ করবেন) না; বরং (এভাবে) বলবেন, রাবীর মধ্যে 'হাসান'-এর সিফাত থাকায় এক দলের মতে হাদীসটি হাসান আর রাবীর মধ্যে সহীহ-এর সিফাত থাকায় আরেক দলের মতে হাদীসটি সহীহ।

বেশির থেকে বেশি এক্ষেত্রে এক দলের (أَئِمَّةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيْلٍ) কাছে হাসান এবং অপর দলের কাছে সহীহ (-এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে) حَسَنٌ صَحِيْحٌ থেকে حَرْفُ تَرَدُّدٍ (তথা أَوْ-কে) ফেলে দেওয়া হয়েছে। (এ প্রশ্ন করা যেতে পারে।) কেননা, উচিত ছিল এভাবে বলা যে, حَسَنٌ أَوْ صَحِيْحٌ , (জবাব হলো,) এখান থেকে হরফে আতফ (أَوْ) -কে ঐভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে যেভাবে এর পরে (দ্বিতীয় জবাবের মধ্য থেকে) ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এ জবাবের ভিত্তিতে যে হাদীসের বেলায় حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলা হয়, তা মর্যাদাগতভাবে নিম্নপর্যায়ের হবে ঐ হাদীস থেকে যার ব্যাপারে শুধু صَحِيْحٌ বলা হয়েছে। কেননা, দ্বিধার সাথে প্রয়োগকৃত বিশেষণের চেয়ে দৃঢ়তার সাথে ব্যবহৃত বিশেষণটি অধিক শক্তিশালী। এটা সনদ এককের দিক দিয়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهٰذَا حَيْثُ التَّفَرُّدِ : وَهٰذَا বলতে উদ্দেশ্য وَهٰذَا الْجَوَابُ , অর্থাৎ সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) হাদীসের দুই সিফাত তথা حَسَنٌ ও صَحِيْحٌ একত্রিত হবার ব্যাপারে যে জবাব প্রদান করেছেন তা কেবলমাত্র ঐ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার সনদ মাত্র একটি। আর যার সনদ দুই বা ততোধিক হয়, সেখানে একত্রে দুই সিফাত ব্যবহারের জবাব সামনে তিনি উল্লেখ করবেন।

প্রথম প্রশ্ন ও তার উত্তর : হাদীসের সিফাত একই সাথে حَسَنٌ صَحِيْحٌ আনায় ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথম প্রশ্নটি হলো, কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, একই হাদীসের একসাথে দুটি সিফাত আনা এবং এভাবে বলা যে, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ । যেমনটি ইমাম তিরমিযী (র.), হযরত আলী ইবনে মাদীনী (র.) এবং হযরত ইয়াকূব ইবনে আবী শায়বা (র.) করেছেন– এটা যেমনি জটিল তেমনি মুশকিলও বটে। কারণ হলো, কোনো হাদীসকে 'হাসান' বলার অর্থ হলো, হাদীসটির রাবীর আয়ত্তশক্তি কম। পুনরায় ঐ হাদীসকেই 'সহীহ' বলার অর্থ হলো, রাবীর আয়ত্তশক্তি মোটেও কম নয়; বরং পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। সুতরাং একই রাবীর একই সময় আয়ত্তশক্তি কম হওয়া ও পূর্ণ হওয়া– একটা অপরটির যেমনি বিপরীত তেমনি এটা সম্ভবও না।

সম্মানিত লেখক এ প্রশ্নের দুটি উত্তর প্রদান করেছেন। একটি উত্তর ঐ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে হাদীসটির সনদ মাত্র একটি। আর অপর উত্তরটি হলো ঐ হাদীসের যা একাধিক সনদে বর্ণিত।

প্রথম উত্তর : যে হাদীসের সনদ মাত্র একটি, সে হাদীসের সিফাত একসাথে দুটো এনে এভাবে বলা যে, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ – এক্ষেত্রে লেখকের উত্তর নিম্নরূপ–

রাবী বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতান্তর হতে এটা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ রাবী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি যে, এ হাদীসের রাবীর মধ্যে সহীহ -এর শর্ত বিদ্যমান নাকি হাসান-এর শর্ত বিদ্যমান। কেউ হাসান -এর শর্ত বিদ্যমান বলেছেন, কেউ বলেছেন সহীহ -এর শর্ত বিদ্যমান। তাদের এ ধরনের ইখতিলাফের কারণে ইমাম তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের হুকুম লাগাতে গিয়ে দোটানায় পড়েছেন। যারা রাবীর মধ্যে হাসান-এর শর্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তাদের অনুকরণে হাদীসটি হাসান বলতে হয়, আবার যারা রাবীর মধ্যে সহীহ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান বলেছেন, তাদের অনুসরণে হাদীসটিকে সহীহ বলতে হয়। এর মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দানেরও কোনো কারণ নেই। এমতাবস্থায় তারা শেষমেষ উভয় উক্তি নকল করে দেওয়া ভালো মনে করেছেন যে, حَسَنٌ عِنْدَ قَوْمٍ অর্থাৎ একদলের মতে হাদীসটি হাসান এবং صَحِيْحٌ عِنْدَ قَوْمٍ অর্থাৎ আরেক দলের মতে হাদীসটি সহীহ। অর্থাৎ রাবীর হুকুমের ক্ষেত্রে যে সন্দেহ রাবী বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম হতে সৃষ্টি হয়েছে তা মুহাদ্দিসগণ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলে তুলে ধরেছেন।

এ জবাবের ভিত্তিতে যে সমস্ত হাদীসের ব্যাপারে هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলা হয়েছে তা ঐ হাদীসের তুলনায় মর্যাদায় নিম্নস্তরের হবে যার ব্যাপারে هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ বলা হয়েছে। কারণ, যে হাদীসের ব্যাপারে هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ বলা হয়েছে তার صَحِيْحٌ হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু যে হাদীসের ব্যাপারে هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলা হয়েছে তার صَحِيْحٌ হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ। আর মূলনীতি আছে– اَلْجَزْمُ اَقْوٰى مِنَ التَّرَدُّدِ অর্থাৎ নিশ্চিতটা সন্দেহপূর্ণ হতে অধিক শক্তিশালী। অবশ্য حَسَنٌ صَحِيْحٌ বিশিষ্ট হাদীস ঐ হাদীসের উপর অগ্রাধিকার রাখে যার ব্যাপারে শুধু حَسَنٌ শব্দ এসেছে।

وَالَّا اَىْ اِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ فَاِطْلَاقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيْثِ يَكُوْنُ بِاعْتِبَارِ الْاِسْنَادَيْنِ اَحَدُهُمَا صَحِيْحٌ وَالْاٰخَرُ حَسَنٌ وَعَلٰى هٰذَا فَمَا قِيْلَ فِيْهِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ فَوْقَ مَا قِيْلَ فِيْهِ صَحِيْحٌ فَقَطْ اِذَا كَانَ فَرْدًا لِاَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّىْ.

فَاِنْ قِيْلَ قَدْ صَرَّحَ التِّرْمِذِىُّ بِاَنَّ شَرْطَ الْحَسَنِ اَنْ يَرْوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَكَيْفَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ الْاَحَادِيْثِ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ فَالْجَوَابُ اَنَّ التِّرْمِذِىَّ لَمْ يُعَرِّفِ الْحَسَنَ مُطْلَقًا وَ اِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْهُ وَقَعَ فِىْ كِتَابِهٖ وَهُوَ مَا يَقُوْلُ فِيْهِ حَسَنٌ مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ اُخْرٰى وَ ذٰلِكَ اَنَّهُ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ الْاَحَادِيْثِ حَسَنٌ وَفِىْ بَعْضِهَا صَحِيْحٌ وَفِىْ بَعْضِهَا غَرِيْبٌ وَفِىْ بَعْضِهَا حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِىْ بَعْضِهَا حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَفِىْ بَعْضِهَا صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَفِىْ بَعْضِهَا حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَتَعْرِيْفُهُ اِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْاَوَّلِ فَقَطْ، وَعِبَارَتُهُ تُرْشِدُ اِلٰى ذٰلِكَ حَيْثُ قَالَ فِىْ اَوَاخِرِ كِتَابِهٖ وَمَا قُلْنَا فِىْ كِتَابِنَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ فَاِنَّمَا اَرَدْنَا بِهٖ حَسَنٌ اِسْنَادِهٖ عِنْدَنَا وَكُلُّ حَدِيْثٍ يُرْوٰى وَلَا يَكُوْنُ رَاوِيْهِ مُتَّهَمًا بِالْكِذْبِ وَيُرْوٰى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذٰلِكَ وَلَا يَكُوْنُ شَاذًّا فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

অনুবাদ : আর যদি সনদ একটি না হয় (বরং বেশি হয়) তাহলে সে সময় একই হাদীসের উপর একসাথে দুই সিফাত আনাটা হবে দুই সনদের দিক দিয়ে। যার একটি 'সহীহ' আর অপরটি 'হাসান'। এ জবাবের ভিত্তিতে যে হাদীসের ব্যাপারে حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলা হয় তা ঐ হাদীসের তুলনায় উঁচু স্তরের হবে যার ব্যাপারে শুধু صَحِيْحٌ বলা হয়, যখন তার সনদ মাত্র একটি হবে। কেননা, সনদের আধিক্য হাদীসকে শক্তিশালী করে তোলে।

যদি প্রশ্ন করা হয় ইমাম তিরমিযী (র.) স্পষ্ট বলেছেন যে, 'হাসান' হবার জন্য শর্ত হলো একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়া। অতঃপর তিনি কিভাবে কোনো কোনো হাদীসের বেলায় এরূপ বলতেন যে, 'এটি হাসান গরীব, এই সনদ ব্যতীত অন্য কোনো সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই'?

এর জবাব হলো, ইমাম তিরমিযী (র.) নির্বিচারে যে কোনো 'হাসান' হাদীসের এরূপ সংজ্ঞা দান করেননি; বরং তিনি হাসান-এর একটি শ্রেণির সংজ্ঞা দিয়েছেন মাত্র, যা তাঁর কিতাবে স্থান লাভ করেছে। তিনি যে হাদীসকে শুধুমাত্র 'হাসান' বলেছেন অর্থাৎ এর সাথে অন্য কোনো বিশেষণ ব্যবহার করেননি– এ সংজ্ঞা

সে 'হাসান' -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, তিনি কোনো হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন– 'হাসান', কোনোটির বেলায় বলেছেন– 'সহীহ', কোনোটির বেলায় 'গরীব' আবার কোনোটির ব্যাপারে বলেছেন– 'হাসান সহীহ', কোনোটির ক্ষেত্রে 'হাসান গরীব', কোনো কোনো হাদীসকে 'সহীহ গরীব' আবার কোনো কোনো হাদীসকে বলেছেন– 'হাসান সহীহ গরীব'। (অর্থাৎ একই হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি একসাথে তিনটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।) তার সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণির (অর্থাৎ শুধু 'হাসান' -এর) বেলায় প্রযোজ্য। ইমাম তিরমিযীর ভাষ্যও এদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা, তিনি তাঁর কিতাবের শেষে বলেছেন, আমি আমার এ কিতাবে যেখানে বলেছি 'হাদীসটি হাসান' –উদ্দেশ্য, আমার মতে হাদীসটির সনদ খুব সুন্দর। আর তা হলো– এমন একটি হাদীস যার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহভাজন নয়, তা একাধিক সনদে বর্ণিত এবং সেটি শায নয়। এরূপ হাদীসই আমার মতে হাসান হাদীস।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় উত্তর : যদি হাদীসের সনদ একাধিক হয়, তখন একই হাদীসের সিফাত حَسَنٌ صَحِيْحٌ উল্লেখ করার জবাব সম্মানিত লেখক এটা প্রদান করেছেন যে, এ সময় দুই সিফাতের মর্মার্থ দাঁড়াবে :

حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ سَنَدٍ، وَصَحِيْحٌ بِاعْتِبَارِ سَنَدٍ.

অর্থাৎ এক সনদের বিচারে হাদীসটি হাসান এবং আরেক সনদের বিচারে হাদীসটি সহীহ। অতএব আর বৈপরীত্য হলো না। কারণ, হতে পারে এক সনদের রাবীর মধ্যে আয়ত্তশক্তি কম এবং অপর সনদের রাবীর মধ্যে আয়ত্তশক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে।

এ জবাবের ভিত্তিতে যে হাদীসের ব্যাপারে هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলা হয় তা মর্যাদায় ঐ হাদীস থেকে উর্ধ্বে হবে যার ব্যাপারে শুধু هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ বলা হয়।

যদি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, লেখকের উভয় জবাব প্রমাণ করে যে, حَسَنٌ صَحِيْحٌ -এর মাঝখানে وَاوْ অথবা اَوْ حَرْفُ عَطْف ছিল, তা কেন ফেলে দেওয়া হলো ? উত্তরে বলা হবে, অধিক ব্যবহারের কারণে حَرْفُ عَطْف বিলোপ করা হয়েছে। আর এমন বিলোপ করার অনেক নজির রয়েছে। যেমন আরবরা বলে– أَكَلْتُ سَمَكًا لَبَنًا অর্থাৎ আমি মাছ, দুধ খেয়েছি। অনুরূপ– كُلْ سَمَكًا لَحْمًا অর্থাৎ তুমি মাছ, গোশ্ত খাও। অথচ এ বাক্যদ্বয় মূলত ছিল যথাক্রমে اَكَلْتُ سَمَكًا وَلَبَنًا এবং كُلْ سَمَكًا وَ لَحْمًا -এর আরো অনেক জবাব হতে পারে, যার বিস্তারিত বিবরণ জামে তিরমিযীতে আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর : ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, তিনি তিরমিযী শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, কোনো হাদীস 'হাসান' হওয়ার জন্য তার সনদ একাধিক থাকা শর্ত। অথচ তিনি আবার তিরমিযী শরীফের বিভিন্ন হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন যে, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ অর্থাৎ এটি হাসান গরীব হাদীস; এর এই সনদ ব্যতীত অন্য সনদ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাই প্রশ্ন হয় এটা কিভাবে সম্ভব হলো ? কেননা, 'হাসান' দ্বারা বুঝা যায়, তার একাধিক সনদ রয়েছে আর গরীব দ্বারা বুঝা যায়, তার সনদ একটি। আর একই সময়ে একই হাদীসের এক সনদ হওয়া এবং একাধিক সনদ হওয়া একটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিষয়, যা হতে পারে না।

প্রশ্নের উত্তর : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) **ইমাম তিরমিযী (র.) -এর পক্ষ থেকে** এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর জামে **তিরমিযীতে হাদীসের ব্যাপারে সাত** ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা–

১. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ অর্থাৎ এটি হাসান হাদীস।

২. هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ অর্থাৎ এটি সহীহ হাদীস।

৩. هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ অর্থাৎ এটি গরীব হাদীস।

৪. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ অর্থাৎ এটি হাসান সহীহ হাদীস।

৫. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ অর্থাৎ এটি হাসান গরীব হাদীস।

৬. هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ অর্থাৎ এটি সহীহ গরীব হাদীস।

৭. هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ অর্থাৎ এটি হাসান সহীহ গরীব হাদীস।

এই সাত ধরনের শব্দের মধ্যে ইমাম তিরমিযী (র.) যার জন্য 'একাধিক সনদ হওয়া' শর্ত করেছেন তা হলো প্রথম প্রকার। অর্থাৎ শুধু প্রথম প্রকার তথা যেখানে তিনি কেবল 'হাসান' শব্দ এভাবে বলেছেন যে, هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ – সে ক্ষেত্রেই কেবল তার এ শর্তটি প্রযোজ্য যে, এই 'হাসান' হতে হলে তার সনদ একাধিক হতে হবে। এ শর্ত এই প্রথম প্রকার ছাড়া অন্যান্য ৬ প্রকারের জন্য প্রযোজ্য নয়, যদিও সেখানে 'হাসান' শব্দ আছে।

এর বড় প্রমাণ ইমাম তিরমিযী (র.) -এর নিজেরই একটি ভাষ্য, যা তিনি তিরমিযী শরীফের শেষদিকে উল্লেখ করেছেন। তা হলো–

وَمَا قُلْنَا فِىْ كِتَابِنَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا اَرَدْنَا بِهٖ حُسْنَ اِسْنَادِهٖ عِنْدَنَا وَكُلُّ حَدِيْثٍ يُرْوٰى وَلَايَكُوْنُ رَاوِيْهِ مُتَّهِمًا بِالْكِذْبِ وَيُرْوٰى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوُ ذٰلِكَ وَلَا يَكُوْنُ شَاذًّا فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

অর্থাৎ আমি আমার এ কিতাবে যেখানে বলেছি 'হাদীসটি হাসান'– উদ্দেশ্য হলো, আমার মতে হাদীসটির সনদ খুব সুন্দর। আর তা হলো– এমন একটি হাদীস যার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহভাজন নয়, তা একাধিক সনদে বর্ণিত এবং সেটি শায নয়। এরূপ হাদীসই আমার মতে হাসান হাদীস।

সুতরাং ইমাম তিরমিযী (র.)-এর এ ভাষ্যই প্রমাণ করে যে, একাধিক সনদের শর্ত কেবল উক্ত সাত প্রকারের প্রথম প্রকারের বেলায় প্রযোজ্য এবং প্রথম প্রকারেই তা সীমাবদ্ধ। আর তা হলো যেখানে শুধুমাত্র حَسَنٌ শব্দ এসেছে। এছাড়া বাকি অন্যান্য প্রকারে যেখানে حَسَنٌ শব্দের সাথে অন্য শব্দ যেমন– صَحِيْحٌ বা غَرِيْبٌ এসেছে, সেখানে উক্ত শর্ত প্রযোজ্য নয়। এ হিসেবে যেখানে حَسَنٌ শব্দের সাথে غَرِيْبٌ শব্দ এভাবে ব্যবহার হয়েছে– هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ সেখানে 'হাসান'-এর জন্য একাধিক সনদ হওয়া শর্ত নয়। যার ফলে غَرِيْبٌ শব্দের সাথে حَسَنٌ শব্দের একত্রিত হওয়ার দ্বারা বৈপরীত্য আবশ্যক হবে না।

فَعُرِفَ بِهٰذَا اَنَّهٗ اِنَّمَا عَرَّفَ الَّذِىْ يَقُوْلُ فِيْهِ حَسَنٌ فَقَطْ اَمَّا مَا يَقُوْلُ فِيْهِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ اَوْ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اَوْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلٰى تَعْرِيْفِهٖ كَمَا لَمْ يُعَرِّجْ عَلٰى تَعْرِيْفِ مَا يَقُوْلُ فِيْهِ صَحِيْحٌ فَقَطْ اَوْ غَرِيْبٌ فَقَطْ فَكَاَنَّهٗ تَرَكَ ذٰلِكَ اِسْتِغْنَاءً بِشُهْرَتِهٖ عِنْدَ اَهْلِ الْفَنِّ وَاقْتَصَرَ عَلٰى تَعْرِيْفِ مَا يَقُوْلُ فِيْهِ فِىْ كِتَابِهٖ حَسَنٌ فَقَطْ اِمَّا لِغُمُوْضِهٖ وَاِمَّا لِاَنَّهٗ اِصْطِلَاحٌ جَدِيْدٌ وَلِذٰلِكَ قَيَّدَهٗ بِقَوْلِهٖ عِنْدَنَا وَلَمْ يَنْسِبْهُ اِلٰى اَهْلِ الْحَدِيْثِ كَمَا فَعَلَ الْخَطَّابِىُّ وَبِهٰذَا التَّقْرِيْرِ يَنْدَفِعُ كَثِيْرٌ مِنَ الْاِيْرَادَاتِ الَّتِىْ طَالَ الْبَحْثُ فِيْهَا وَلَمْ يَسْتَقِرَّ وَجْهُ تَوْجِيْهِهَا فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰى مَا اَلْهَمَ وَعَلَّمَ ـ

অনুবাদ : এ থেকে জানা গেল যে, যে হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'হাসান' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে তিনি সেটিরই সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর যে হাদীসের বেলায় তিনি একসাথে একাধিক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার সংজ্ঞা দানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। শুধুমাত্র 'সহীহ' কিংবা 'গরীব' বলা হাদীসের বেলায় যেমনটি হয়েছে। কারণ, এগুলোর সংজ্ঞা অতিপ্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে 'হাসান' বলতে তিনি এক স্বতন্ত্র ধরনের হাদীস বুঝিয়েছেন বলেই তার সংজ্ঞা দানের প্রয়োজন পড়েছে। কেননা, এ অর্থটি সূক্ষ্ম। সেজন্যই তিনি 'আমার মতে' কথাটি যোগ করেছেন; মুহাদ্দিসীনে কেরামের দিকে সম্পর্কিত করেননি। ইমাম খাত্তাবী (র.) যেমনটি করেছেন। এ আলোচনার দ্বারা ঐ সমস্ত প্রশ্নের অধিকাংশই দূর হয়ে যায়, যার আলোচনা দীর্ঘ হয়েছে অথচ তার (উত্থাপিত প্রশ্নের) একটি ব্যাখ্যাও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সুতরাং আমাকে এ জবাব শিক্ষা দেওয়া এবং অন্তরে উদ্রেক করার জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : ইমাম তিরমিযী (র.) -এর উপর আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনি শুধু ঐ 'হাসান'-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন যেটা তাঁর কিতাবে একক সিফাত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ 'হাসান'-এর সংজ্ঞা তিনি দেননি যা 'গরীব' বা 'সহীহ'-এর সাথে মিলে এসেছে। তাই প্রশ্ন হয়, তিনি কেবল একক হাসান -এর সংজ্ঞা দিলেন কেন এবং গরীব ও সহীহ-এর সাথে মিলে আসা হাসান- এর সংজ্ঞা দেননি কেন ?

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইমাম তিরমিযী (র.)-এর পক্ষ হতে উল্লিখিত প্রশ্নের এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, পৃথক পৃথকভাবে সহীহ ও গরীব-এর সংজ্ঞা যেমনিভাবে প্রসিদ্ধ, তেমনিভাবে ঐ হাসান-এর সংজ্ঞাও প্রসিদ্ধ যা গরীব বা সহীহ -এর সাথে মিলে আসে। অতএব, প্রসিদ্ধতার কারণে তিনি হাসান গরীব এবং হাসান সহীহ-এর মধ্যস্থ হাসান -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেননি বা দেননি। কিন্তু যে হাসান একক সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা যেহেতু ১. সূক্ষ্ম এবং ২. নতুন পরিভাষা, সে কারণে তার স্বতন্ত্র সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আর এটা যে তাঁরই সৃষ্ট নতুন পরিভাষা সেদিকে তিনি عِنْدَنَا বা 'আমার মতে' বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

সারকথা হলো, 'হাসান (حَسَنٌ) শব্দ যখন গরীব (غَرِيْبٌ) বা সহীহ (صَحِيْحٌ) -এর সাথে মিলে আসে, তখন সে হাসান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় হাসান-এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। আর حَسَنٌ শব্দ যখন এককভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার দ্বারা ইমাম তিরমিযী (র.) প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা উদ্দেশ্য হয়।

وَ زِيَادَةُ رَاوِيْهِمَا اَىِ الْحَسَنِ وَالصَّحِيْحِ مَقْبُوْلَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ اَوْثَقُ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لِاَنَّ الزِّيَادَةَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ لَا تَنَافِىْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا فَهٰذِهِ تُقْبَلُ مُطْلَقًا لِاَنَّهَا فِىْ حُكْمِ الْحَدِيْثِ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِىْ يَتَفَرَّدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرْوِيْهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهٗ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُوْلِهَا رَدًّا لِلرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى فَهٰذِهِ هِىَ الَّتِىْ يَقَعُ التَّرْجِيْحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوْحُ ـ

অনুবাদ : সহীহ ও হাসান স্তরের ব্যক্তির বর্ণনায় যদি কিছু বাড়তি অংশ থাকে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবার জন্য শর্ত হলো অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার সাথে এর বৈপরীত্য সৃষ্টি না হওয়া চাই। বাড়তি বিষয়টির সাথে যদি অন্যদের বর্ণনার বৈপরীত্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ধরে নেওয়া হবে যে, এটি একটি স্বতন্ত্র হাদীস, যা নির্ভরযোগ্য রাবী তার শায়খ থেকে একাকী বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ সেটি বর্ণনা করেননি। আর যদি দুটি বর্ণনার মাঝে এরূপ বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় যে, একটি মেনে নিলে অপরটি প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য হয়, তাহলে যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। সে মতে অগ্রাধিকার প্রদত্ত হাদীসটিকে গ্রহণ এবং অপরটিকে পরিহার করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'রাবীর বৃদ্ধি' -এর মর্মার্থ ও তার পদ্ধতি : একই হাদীস বর্ণনায় কোনো রাবীর সনদ অথবা মতনে যদি কিছু অংশ বৃদ্ধি পায় বা বাড়তি থাকে, তাহলে পরিভাষায় তাকে 'যিয়াদাতে রাবী' বা রাবীর বৃদ্ধি বলে। এর কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

১. যা'ঈফ রাবী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করা। এমতাবস্থায় যা'ঈফ রাবীর রেওয়ায়েত বর্জিত হবে এবং নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েত মাকবূল হবে।

২. নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক তার মতো নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করা ।

৩. সহীহ বা হাসান রাবীর বৃদ্ধি অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করা। এই দু প্রকারের হুকুম নিম্নে বর্ণিত হলো।

নির্ভরযোগ্য রাবীর বৃদ্ধির হুকুম : হাসান অথবা সহীহ হাদীসের রাবী অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী যদি তার অধিক কিংবা সমপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ কিছু বাড়তি অংশ বর্ণনা করে, তাহলে এ বাড়তি অংশের হুকুমের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যথা–

১. জুমহুরের মতে এর হুকুম কিছুটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর তা হলো, এ রকম বৃদ্ধির তিনটি **ধরন হতে** পারে। যথা–

ক. নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতমুখী হবে না।

খ. অথবা, বিপরীতমুখী হবে।

গ. দুটির অর্থের মধ্যে সামান্য ব্যবধান হবে।

নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতটি যদি অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতের বিপরীতমুখী না হয় **এভাবে** যে, উভয় হাদীসের উপর আমল করা যায়, তাহলে এ ধরনের 'বৃদ্ধি অংশ' গৃহীত হবে। কারণ, এ **বৃদ্ধিটা** তখন স্বতন্ত্র একটি হাদীস বলে বিবেচিত হবে, যা সে রাবী তার শায়খ থেকে একা শুনে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং যেমনিভাবে তার স্বতন্ত্র হাদীস মাকবূল হয় তেমনি বৃদ্ধি অংশও মাকবূল হবে।

নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ :

إِنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلٰى هُوَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ هَلْ لَهُ أَحَدٌ ؟ قَالُوْا لَا إِلَّا غُلَامٌ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَهُ مِيْرَاثَهُ لَهُ۔

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করে। একজন আজাদকৃত গোলাম ছাড়া লোকটির আর কোনো ওয়ারিস ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদেরকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তার কোনো ওয়ারিস আছে? জবাবে সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না; তবে একজন আজাদকৃত গোলাম আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ গোলামকে (ডেকে) মৃত লোকটির পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে দেন।

এ হাদীসটি ইবনে উয়াইনা এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ উভয়ে রেওয়ায়েত করেন। তবে ইবনে উয়াইনা মুত্তাসিলভাবে আর হাম্মাদ মুরসালভাবে। (এখানে ইবনে উয়াইনা সনদ বেশি উল্লেখ করে হাম্মাদ থেকে বৃদ্ধি করেছেন।) সুতরাং যদিও ইবনে উয়াইনা নির্ভরযোগ্য (ثِقَةٌ) এবং হাম্মাদ অধিক নির্ভরযোগ্য (أَوْثَقُ), কিন্তু উভয়ের রেওয়ায়েত মাকবূল। কারণ, উভয়ের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্য বা বিরোধ নেই।

আর দ্বিতীয় ধরনটি অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর বর্ধিত অংশটি যদি أَوْثَقُ রাবীর বিপরীত এভাবে হয় যে, একটির উপর আমল করলে অন্যটির উপর আমল করা সম্ভব হয় না, তাহলে তখন প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর এই প্রাধান্য দেওয়া যায় বিভিন্ন দিক বিচারে। যেমন– ১. রাবীর ফকীহ হওয়া, ২. সনদ عَالِيْ হওয়া, ৩. এমন কিতাবের হাদীস হওয়া, যা সাধারণভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। যথা– বুখারী ও মুসলিম। ৪. রাবী আয়ত্তশক্তির অধিকারী হওয়া, ৫. বেশি নির্ভরযোগ্য হওয়া ইত্যাদি। এ সকল দিক বিবেচনায় তখন অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস প্রাধান্য পাবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে।

এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক বর্ণিত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস–
اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

অর্থাৎ কবরস্থান এবং স্নানাগার ছাড়া পৃথিবীর সকল স্থানে নামাজ পড়া যায়।

এ হাদীসটি **عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ** – সনদে হাম্মাদ বিন সালামা রেওয়ায়েত করেছেন। আর সুফিয়ান ছাওরী **عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ** - সনদে বর্ণনা করেছেন। এখানে হাম্মাদের রেওয়ায়েত "আবূ সাঈদ" বর্ধিত অংশ, কিন্তু ছাওরী যেহেতু হাম্মাদ থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য, তাই প্রাধান্যের ভিত্তিতে ছাওরীর রেওয়ায়েত মাকবূল হবে।

আর তৃতীয় ধরন অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর হাদীস ও أَوْثَقُ রাবীর হাদীসের মধ্যে সামান্য ব্যবধান এভাবে **হবে** যে, একজনের রেওয়ায়েত عَامٌ আর অপরজনেরটা خَاصٌ, তাহলে এমতাবস্থায় ছিকাহ রাবীর বর্ধিত অংশটি জুমহুরের মতে মাকবূল হবে। অবশ্য সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার (র.)-এর মতে **এ** জাতীয় বর্ধিত অংশ মাকবূল হবে না।

وَاشْتَهَرَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلُ بِقَبُوْلِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ وَلَا يَتَأَتّٰى ذٰلِكَ عَلٰى طَرِيْقِ الْمُحَدِّثِيْنَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِطُوْنَ فِى الصَّحِيْحِ اَنْ لَّا يَكُوْنَ شَاذًّا ثُمَّ يُفَسِّرُوْنَ الشُّذُوْذَ بِمُخَالَفَةِ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ اَوْثَقُ مِنْهُ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ غَفَلَ عَنْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ مَعَ اِعْتِرَافِهٖ بِاشْتِرَاطِ اِنْتِفَاءِ الشُّذُوْذِ فِىْ حَدِّ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ وَكَذٰلِكَ الْحَسَنُ وَالْمَنْقُوْلُ عَنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى الْقَطَّانِ وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَاَبِىْ زُرْعَةَ وَاَبِىْ حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِمْ اِعْتِبَارُ التَّرْجِيْحِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يُعْرَفُ عَنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ اِطْلَاقُ قَبُوْلِ الزِّيَادَةِ ـ

অনুবাদ : একদল মনীষী সম্পর্কে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, তারা কোনোরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াই বাড়তি অংশগ্রহণ করার পক্ষপাতী। যেসব মুহাদ্দিস সহীহ হাদীসের জন্য 'শায' না হওয়ার শর্ত প্রয়োগ করেন এবং এর অর্থ করেছেন– 'অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর খেলাপ না হওয়া' তাদের মূলনীতির সাথে এ নিয়ম খাপ খায় না। সহীহ ও হাসান হাদীসের সংজ্ঞায় 'শায' না হওয়ার শর্ত স্বীকার করেও যারা এ ব্যাপারে উদাসীন তাদের প্রতি অবাক লাগে। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, আবূ যুরআ রাযী, আবূ হাতিম, ইমাম নাসায়ী, ইমাম দারাকুতনী (র.) প্রমুখ ইমামুল হাদীসের অভিমত **হলো**, বাড়তি বিষয় সংযোজিত হাদীস ও অপর হাদীসের মধ্যে যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে **হবে**। নির্বিচারে বাড়তি অংশগ্রহণ করার কথা তাদের কেউই বলেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. জুমহুরের মতে নির্ভরযোগ্য রাবীর বৃদ্ধির হুকুম ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হলেও একদল ওলামা থেকে বর্ণিত আছে যে, নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবূল। তবে এ ব্যাপারে জুমহুরের অভিমতই সঠিক এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এর কারণ বা দলিল দুটি। যথা–

১. দ্বিতীয় অভিমতটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমতের সাথে খাপ খায় না অর্থাৎ তাদের অবস্থানের বিরোধী। কারণ, তারা হাদীস সহীহ বা হাসান হওয়ার জন্য শায না হওয়া অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীর তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা না করার শর্তারোপ করেন। যার ফলে নির্ভরযোগ্য রাবী যদি তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে বাড়তি অংশ বর্ণনা করে, তাহলে সে হাদীস হাসান বা সহীহ থাকবে না। আর যখন হাদীসটি সহীহ বা হাসান থাকল না, তখন তা নির্বিচারে মাকবূল হবে কিভাবে? এজন্য বড়ই বিস্মিত হতে হয় তাদের উক্তির প্রতি, যারা কোনো হাদীস সহীহ হওয়ার

জন্য শায না হওয়ার শর্ত করেন, আর পরক্ষণেই বলেন যে, নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবূল। কারণ, এটা যে স্ববিরোধী উক্তি তা বলাই বাহুল্য।

২. আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, ইয়াহইয়া কাত্তান, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, আবূ যুরআ, আবূ হাতিম, ইমাম নাসায়ী, দারাকুতনী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কেরাম হতে বর্ণিত আছে যে, বিরোধের সময় নির্ভরযোগ্যরাবী বর্ণনা নির্বিচারে মাকবূল হবে না; বরং তখন অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাবে।

৩. নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবূল নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের নামের সঠিক উচ্চারণ ও ইন্তেকাল :

১. اَلْمَهْدِيْ : মীম বর্ণে যবর। হা বর্ণে সাকিন। দাল বর্ণে যের। ইয়া বর্ণটি তাশদীদবিশিষ্ট। ইবনে মাহদীর ইন্তেকাল ১৯৭ হিজরি।

২. قَطَّانْ : ক্বাফ বর্ণে যবর। ত্বা বর্ণে তাশদীদ এবং যবর। ইয়াহইয়া আল-কাত্তানের ইন্তেকাল ১৯৮ হিজরি।

৩. مَعِيْن : মীম বর্ণে যবর। আইন বর্ণে যের। ইয়া বর্ণে সাকিন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের ইন্তেকাল ২৩৩ হিজরি।

৪. حَنْبَلْ : হা বর্ণে যবর। নূন বর্ণে সাকিন। 'বা' বর্ণে যবর। ইবনে হাম্বল (র.) -এর ইন্তেকাল ২৪১ হিজরি।

৫. اَلْمَدِيْنِيْ : মীম বর্ণে যবর। দাল বর্ণে যের। ইয়া বর্ণে সাকিন। বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। ইবনে মাদীনীর ইন্তেকাল ২৩৩ বা ২৩৪ হিজরি।

৬. اَلْبُخَارِيُّ : 'বা' বর্ণে পেশ। 'খ' বর্ণে যবর। 'র' বর্ণে যের। ইয়া বর্ণটি তাশদীদযুক্ত। ইমাম বুখারীর ইন্তেকাল ২৫৬ হিজরি।

৭. اَبُوْ زُرْعَةَ : "যা' বর্ণে পেশ। 'র' বর্ণে সাকিন। আইন বর্ণে যবর। আবূ যুরআর ইন্তেকাল ২৭৩ বা ২৭৪ হিজরি।

৮. اَبِىْ حَاتِمْ : 'হা' বর্ণে যবর। 'তা' বর্ণে যের।

৯. نَسَائِيْ নূন বর্ণে যবর। সীন বর্ণে যবর। খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহরের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। ইমাম নাসায়ীর ইন্তেকাল ৩০৩ হিজরি।

১০. اَلدَّارَقُطْنِيْ : এটি একটি একক শব্দ। বাগদাদের একটি মহল্লার নাম দারাকুতন। দাল বর্ণে যবর। 'র' বর্ণে যবর। ক্বাফ বর্ণে পেশ। ত্বা বর্ণে সাকিন। নূন বর্ণে যের। ইমাম দারাকুতনীর ইন্তেকাল ৩৪৮ হিজরি।

وَاَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ اِطْلَاقُ كَثِيْرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْقَوْلَ بِقَبُوْلِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مَعَ اَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَاِنَّهُ قَالَ فِيْ اَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلٰى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِيْ فِي الضَّبْطِ مَا نَصُّهُ وَيَكُوْنُ اِذَا شَرِكَ اَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ فَاِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيْثُهُ اَنْقَصَ كَانَ فِيْ ذٰلِكَ دَلِيْلٌ عَلٰى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيْثِهِ وَمَتٰى خَالَفَ مَا وُصِفَ اَضَرَّ ذٰلِكَ بِحَدِيْثِهِ اِنْتَهٰى كَلَامُهُ ، وَمُقْتَضَاهُ اَنَّهُ اِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ حَدِيْثُهُ اَزْيَدَ اَضَرَّ ذٰلِكَ بِحَدِيْثِهِ فَدَلَّ عَلٰى اَنَّ زِيَادَةَ الْعَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُوْلُهَا مُطْلَقًا وَاِنَّمَا يُقْبَلُ مِنَ الْحَافِظِ فَاِنَّهُ اِعْتَبَرَ اَنْ يَكُوْنَ حَدِيْثُ هٰذَا الْمُخَالِفِ اَنْقَصَ مِنْ حَدِيْثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ ـ

অনুবাদ : শাফেয়ী মতাবলম্বী অনেকের নির্বিচারে বাড়তি অংশ গ্রহণযোগ্য বলাটা এর থেকে আরো বিস্ময়কর। অথচ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভাষ্য এর বিপরীত বুঝায়। কেননা, তিনি "আয়ত্তশক্তির দিক দিয়ে রাবীর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি" প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই বলেন যে, "তিনি এমন হবেন যে, হাফিজুল হাদীসগণের কারো সাথে একযোগে হাদীস বর্ণনা করলে তিনি তার খেলাপ (গড়মিল) করবেন না। যদি পার্থক্য করেন আর তার হাদীসটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, হাদীসটির উৎস সঠিক। আর যদি তিনি উল্লিখিত সিফাতের খেলাপ করেন (অর্থাৎ তার হাদীসটি বড় হয়,) তাহলে এ খেলাপ করাটা তার হাদীসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাফিজুল হাদীস-এর বর্ণনার সাথে গড়মিল (খেলাপ) বর্ণনাটি বড় হলে তা উক্ত বর্ণনাকারীর জন্য ক্ষতির কারণ হবে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যে কোনো আদিল ব্যক্তির বাড়তি বর্ণনা নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং হাফিজুল হাদীস-এর বর্ণনায় বাড়তি অংশ থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তিনি গড়মিল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাফিজুল হাদীসের বর্ণনার চেয়ে সেটির ছোট হওয়ার দিক বিবেচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শাফেয়ী মতাবলম্বী যে সকল ওলামায়ে কেরাম নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশকে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য বলেছেন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নিজে শাফেয়ী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বে তাদের প্রতি একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদের এহেন কথায় বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেন, তাদের এ উক্তি খোদ ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর সুস্পষ্ট ভাষ্যের পরিপন্থি। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, "যদি নির্ভরযোগ্য রাবী হাফিজে হাদীস তথা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য (اَوْثَقْ) রাবী-এর সাথে হাদীস বর্ণনায় গড়মিল করে আর নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীসের শব্দ কম হয়, তাহলে এই কম হওয়াটাই তার হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার উপর বড় প্রমাণ। আর যদি সে কম বর্ণনা না করে; বরং অন্যভাবে বর্ণনা করে হাফিজুল হাদীস রাবীর সাথে গড়মিল করে, তাহলে এই গড়মিল করাটা তার হাদীসের জন্য ক্ষতিকর হবে।"

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যখন নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী হতে হাদীসের কম অংশ বর্ণনা না করে; বরং অন্যভাবে যেমন বৃদ্ধি ইত্যাদি করে তার বিরোধিতা করে, তাহলে এটা ক্ষতিকর হবে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য রাবীর যে কোনো বাড়তি অংশই যদি গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) বৃদ্ধি করে বর্ণনা করাকে কেন ক্ষতিকর বললেন ? বরং তিনি ক্ষতিকর না বলে উপকারী বলতেন। তাই প্রমাণ হলো, শাফেয়ী মতাবলম্বীদের যারা নির্ভরযোগ্য রাবীর বাড়তি অংশ নির্বিচারে মাকবুল দাবি করেন তাদের দাবি সঠিক নয়।

وَجَعَلَ نُقْصَانَ هٰذَا الرَّاوِىْ مِنَ الْحَدِيْثِ دَلِيْلًا عَلٰى صِحَّتِهٖ لِاَنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى تَحَرِّيْهِ وَجَعَلَ نُقْصَانَ هٰذَا الرَّاوِىْ مِنَ الْحَدِيْثِ دَلِيْلًا عَلٰى صِحَّتِهٖ لِاَنَّهٗ يَدُلُّ عَلٰى تَحَرِّيْهِ وَجَعَلَ مَا عَدَا ذٰلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيْثِهٖ فَدَخَلَتْ فِيْهِ الزِّيَادَةُ فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهٗ مَقْبُوْلَةً مُطْلَقًا لَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً بِحَدِيْثِ صَاحِبِهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

فَاِنْ خُوْلِفَ بِاَرْجَحَ مِنْهُ لِمَزِيْدِ ضَبْطٍ اَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ وُجُوْهِ التَّرْجِيْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَحْفُوْظُ وَمُقَابِلُهٗ وَهُوَ الْمَرْجُوْحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذُّ ، مِثْلُ ذٰلِكَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا تُوُفِّىَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلَّا مَوْلًى هُوَ اَعْتَقَهُ الْحَدِيْثُ وَتَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلٰى وَصْلِهٖ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهٗ وَخَالَفَهٗ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ اِبْنَ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ اَلْمَحْفُوْظُ حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ اِنْتَهٰى كَلَامُهٗ فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ اَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَمَعَ ذٰلِكَ رَجَّحَ اَبُوْ حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ اَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ وَعُرِفَ مِنْ هٰذَا التَّقْرِيْرِ اَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُوْلُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ وَهٰذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِىْ تَعْرِيْفِ الشَّاذِّ بِحَسْبِ الْاِصْطِلَاحِ -

অনুবাদ : ছোট হওয়াকেই তিনি হাদীসটির বিশুদ্ধতার প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে এ থেকে বর্ণনাকারীর অনুসন্ধিৎসু ও সাবধানী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট হওয়ার ব্যতিক্রমকে তিনি ক্ষতিকর বিবেচনা করেছেন। এতে বাড়তিও শামিল। সুতরাং তিনি যদি নির্বিচারে বাড়তি অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতী হতেন, তাহলে এটিকে (বড় হওয়াকে) ক্ষতিকর সাব্যস্ত করতেন না। (একই জাতীয়) দুটি হাদীসের মধ্যে (শাব্দিক কমবেশি হওয়ার মাধ্যমে) গড়মিল দেখা গেলে বর্ণনাকারীর আয়ত্তশক্তি, সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি দিক দিয়ে যেটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়, তার নাম হয় মাহফূয এবং অপরটিকে শায বলে। এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস, যা ইবনে উয়াইনা আমর ইবনে দীনার হতে, তিনি আওসাজা হতে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সে একজন আজাদকৃত গোলাম ছাড়া কোনো ওয়ারিশ রেখে যায়নি...। ইবনে উয়াইনার মতোই এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ প্রমুখ। আর অন্যরূপ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ। তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আওসাজা থেকে এটি বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম আবূ হাতিম (র.) বলেন, ইবনে উয়াইনার হাদীসটিই 'মাহফূয'।

উল্লেখ্য, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আদিল ও আয়ত্তশক্তির পূর্ণ মাত্রার অধিকারী। তা সত্ত্বেও ইমাম আবূ হাতিম (র.) এমন একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক।

এ আলোচনা থেকেই শায -এর সংজ্ঞাও পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনার সাথে গড়মিল হয়, তাহলে সেটিকে বলা হয় শায। এটিই পরিভাষার দিক দিয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবীর গড়মিলের বর্ণনা ও তার প্রকারভেদ : একই হাদীস রেওয়ায়েত করতে গিয়ে যদি কোনো রাবী অপর রাবী হতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে রাবীর বিরোধিতা বা মুখালাফাতে রাবী বলে। মুখালাফাতে রাবী (রাবীর গড়মিল) এবং যিয়াদাতে রাবী (রাবীর বর্ধিত করা) -এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুখালাফাতটা যিয়াদাত হতে আম বা ব্যাপক। মুখালাফতটা হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদিভাবে হতে পারে, কিন্তু যিয়াদাতটা শুধু সনদ বা মতনে বৃদ্ধির মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

মুখালাফাতে রাবী ৪ প্রকার। যথা–

১. সনদের মধ্যে বৃদ্ধি। ২. মতনের মধ্যে বৃদ্ধি। ৩. সনদের মধ্যে হ্রাস। ৪. মতনের মধ্যে হ্রাস।

যে রাবী মুখালাফাত বা গড়মিল করেন, তা দু ধরনে হতে পারে।

১. নিজে নির্ভরযোগ্য হয়ে তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করবে।

২. দুর্বল রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করবে।

এদের মধ্যে প্রথম ধরনের আলোচনা সম্মানিত লেখক শায এবং মাহফূয-এর মধ্যে আর দ্বিতীয় ধরনের আলোচনা মা'রূফ এবং মুনকার-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

'মাহফূয' -এর আভিধানিক অর্থ : مَحْفُوْظٌ শব্দটি اَلْحِفَاظَةُ ক্রিয়ামূল হতে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ -এর সীগাহ। অর্থ– সংরক্ষিত।

মাহফূয -এর পারিভাষিক অর্থ : নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে যদি এমন রাবীর সাথে বিরোধিতা কিংবা গড়মিল করে যিনি আয়ত্তশক্তি, অধিক সনদ, ফিক্হ, سَنَدٌ عَالٍ ইত্যাদি কোনো কারণে উক্ত রাবী হতে অগ্রাধিকার রাখে, তাহলে অগ্রাধিকারীর হাদীসকে উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় মাহফূয বলে।

আরবিতে اَلْمَحْفُوْظُ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ– هُوَ الْخَبَرُ الَّذِىْ رَوَاهُ الثِّقَاتُ اَوِ الْاَوْثَقُ مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ

অর্থাৎ ছিকাহ রাবী কিংবা اَوْثَقُ রাবীর রেওয়ায়েত, যা অপর কোনো ছিকাহ রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়, তাকে اَلْمَحْفُوْظُ বলে।

মাহফূয -এর নামকরণ : যেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, এমন হাদীস ভুল ও বিভ্রাট থেকে সংরক্ষিত থাকে, তাই তাকে মাহফূয (সংরক্ষিত) করে নাম রাখা হয়েছে।

শায -এর আভিধানিক অর্থ : شَاذٌّ শব্দটি شَذَّ يَشُذُّ হতে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ -এর সীগাহ। অভিধানে شَاذٌّ অর্থ– একাকী হওয়া, নিঃসঙ্গ।

শায-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় شَاذٌّ -এর সংজ্ঞায় কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত হয়েছে। যথা–

১. **ইমাম শাফেয়ী, আহলে হিজায এবং জুমহুরের অভিমত :** সংখ্যাগরিষ্ঠ এ ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, ثِقَةٌ রাবী যদি اَوْثَقُ রাবীর مُخَالَفَتْ করে, তাহলে ثِقَةٌ রাবীর হাদীসকে শায বলে।

২. **ইমাম খলীলির অভিমত :** তার মতে শায প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার রাবী একজন হয়। চাই সে নির্ভরযোগ্য হোক বা অনির্ভরযোগ্য, অপর রাবীর مُخَالَفَتْ করুক বা না করুক। অবশ্য রাবী অনির্ভরযোগ্য হলে তার হাদীস বর্জিত হবে। আর রাবী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার হাদীস মাওকূফ (স্থগিত) হবে, দলিল ও আমলযোগ্য হবে না।

৩. হাকিমের অভিমত : তাঁর মতে শায প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যা নির্ভরযোগ্য রাবী একাকী বর্ণনা করেন এবং তার কোনো মুতাবি'(সহায়ক) না থাকে। চাই কারো مُخَالَفَتْ করুক বা না করুক।

৪. আরেকটি সংজ্ঞা : লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) 'মারদূদের প্রকারে' শায-এর আরেক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, যে রাবীর স্মরণশক্তি লোপ পাওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে তার হাদীসকে শায বলে।

নির্ভরযোগ্য ও সঠিক অভিমত : شَاذّ -এর উপরিউক্ত চার প্রকার সংজ্ঞার মধ্যে লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) -এর মতে জুমহুরের অভিমতটিই সর্বোচ্চ সঠিক এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা, এ সংজ্ঞার মধ্যে দুটি শর্ত রয়েছে। ১. ثِقَةٌ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া ও ২. أَوْثَقْ রাবী-এর مُخَالَفَتْ করা। জুমহুরের এ সংজ্ঞাটিই যে অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়, তার প্রতি সম্মানিত লেখক– هٰذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِىْ تَعْرِيْفِ الشَّاذِ بِحَسْبِ الْاِصْطِلَاحِ বলে ইঙ্গিত করেছেন।

আরবিতে اَلشَّاذُّ -এর সংজ্ঞা হলো– هُوَ الْخَبَرُ الَّذِىْ رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ اَوِ الْاَوْثَقُ

অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর হাদীস যদি অপর ছিকাহ (ثِقَةٌ) বা أَوْثَقْ রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়, তাহলে তাকে اَلْحَدِيْثُ الشَّاذُّ বলে।

শায-এর নামকরণ : শায হাদীসের রাবী যেহেতু বাড়তি অংশ বর্ণনায় অন্যান্য রাবী হতে একাকী হয়ে যায়, তাই তাকে شاذ (একাকী) বলে।

শায ও মাহফুয -এর উদাহরণ : এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

اِنَّ رَجُلًا تُوُفِّىَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلَّا مَوْلًى هُوَ اَعْتَقَهُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَهُ اَحَدٌ ؟ قَالُوْا اِلَّا غُلَامٌ اَعْتَقَهُ فَجَعَلَهُ مِيْرَاثَهُ لَهُ .

এ হাদীস যেমনি মাহফূয-এর উদাহরণ তেমনি শায -এরও উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) এ হাদীসটি عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উল্লেখ রয়েছে। হাম্মাদ ইবনে যায়েদও এ হাদীসটি عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ . সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীসের বর্ণনাকারী দুজন হলেন। ১. ইবনে উয়াইনা এবং ২. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ। ইবনে উয়াইনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করে হাদীসটি মুত্তাসিলভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বাদ দিয়ে হাদীসটি মুরসালভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। প্রসিদ্ধ হাফিজুল হাদীস আবূ হাতিম (র.) বলেন, ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতটি মাহফূয। সুতরাং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আদিল এবং আয়ত্তশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আবূ হাতিম ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতকে মাহফূয বলেছেন। কারণ, ইবনে উয়াইনার মতো ইবনে জুরাইজও হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে উল্লেখ করে মুত্তাসিলভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং রাবী বা সনদের আধিক্যের কারণে ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়েতটি প্রাধান্য পাবে এবং তা মাহফূয ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতটি শায হবে

শায -এর প্রকারভেদ : শায মোট চার প্রকার। যথা–

١. شُذُوْذٌ بِزِيَادَةِ السَّنَدِ . ১. অর্থাৎ সনদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শায

٢. شُذُوْذٌ بِزِيَادَةٍ فِى الْمَتَنِ . ২. অর্থাৎ মতন বৃদ্ধির মাধ্যমে শায।

٣ شُذُوْذٌ بِنَقْصٍ فِى السَّنَدِ . ৩. অর্থাৎ সনদ হ্রাসের মাধ্যমে শায।

٤. شُذُوْذٌ بِنَقْصٍ فِى الْمَتَنِ . ৪. অর্থাৎ মতন হ্রাসের মাধ্যমে শায।

শাযের পূর্ববর্তী উদাহরণটা ছিল তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত। অর্থাৎ সেখানে সনদ হ্রাসের মাধ্যমে শায হয়েছে।

وَاِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضُّعْفِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوْفُ وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ مِثَالُهُ مَا رَوَاهُ اِبْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ مِنْ طَرِيْقِ حُبَيْبِ بْنِ حَبِيْبٍ وَهُوَ اَخُوْ حَمْزَةَ اِبْنُ حَبِيْبِ الزَّيَّاتُ الْمُقْرِئُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرٌ لِاَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ مَوْقُوْفًا وَهُوَ الْمَعْرُوْفُ وَعُرِفَ بِهٰذَا اَنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ عُمُوْمًا وَخُصُوْصًا مِنْ وَجْهٍ لِاَنَّ بَيْنَهُمَا اِجْتِمَاعًا فِىْ اِشْتِرَاطِ الْمُخَالَفَةِ وَافْتِرَاقًا فِىْ اَنَّ الشَّاذَّ رِوَايَةُ ثِقَةٍ اَوْ صَدُوْقٍ وَالْمُنْكَرُ رِوَايَةُ ضَعِيْفٍ وَقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوّٰى بَيْنَهُمَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : যদি নির্ভরযোগ্য রাবীর গড়মিল হয় দুর্বল রাবীর সাথে, তাহলে যেটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতকে) তাকে বলে, মা'রূফ এবং অপরটিকে বলে মুনকার। এর উদাহরণ ইবনে আবূ হাতিম (র.) কর্তৃক বর্ণিত ঐ হাদীস, যা তিনি হুবায়্যেব (হামযা ইবনে হাবীব-এর ভাই) ইবনে হাবীব যায়্যাত মুকরী থেকে, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আয়যার ইবনে হুরাইস থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করবে, রোজা রাখবে এবং মেহমানদারি করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ হাতিম বলেন, এটি মুনকার। কেননা, তিনি ব্যতীত অন্য নির্ভরযোগ্য রাবীগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এটি 'মাওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সেটিই অর্থাৎ এ মাওকূফ রেওয়ায়েতটি মা'রূফ। এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শায ও মুনকার-এর মধ্যে উমূম খুসূস মিন ওয়াজহিন বা 'দ্বিপক্ষীয় সাধারণ বিশেষ' সম্পর্ক বিদ্যমান। গড়মিল হবার শর্তের দিক দিয়ে দুটির মধ্যে মিল রয়েছে (অর্থাৎ শায যেমন আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে শায হয়, তেমনি মুনকারও আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে মুনকার হয়)। আবার দুটির মধ্যে এদিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে যে, শায হলো নির্ভরযোগ্য বা সত্যবাদী রাবীর বর্ণনা, পক্ষান্তরে মুনকার হলো দুর্বল রাবীর বর্ণনা। এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করার কারণে অনেকে দুটিকে এক করে দেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মা'রূফ -এর আভিধানিক অর্থ : عَرَفَ يَعْرِفُ ফে'ল থেকে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ -এর সীগাহ اَلْمَعْرُوْفُ ; এর আভিধানিক অর্থ– প্রসিদ্ধ, পরিচিত ইত্যাদি।

মা'রূফ -এর পারিভাষিক অর্থ : দুর্বল রাবী যদি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করে, তাহলে নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলে।

আরবিতে اَلْمَعْرُوْفُ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ الْخَبَرُ الَّذِىْ رَوَاهُ الثِّقَةُ مُنَافِيًا لِمَا رَوَاهُ الضَّعِيْفُ অর্থাৎ সিকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা যা'ঈফ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়।

মা'রূফ -এর নামকরণ : হাদীসে মা'রূফ যেহেতু মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে মাশহূর ও প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তাই তাকে মা'রূফ বা প্রসিদ্ধ/পরিচিত বলে।

মুনকার-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُنْكَرُ শব্দটি بَابُ اِفْعَالٌ হতে اِسْمُ مَفْعُوْلٌ -এর সীগাহ। এর অর্থ- অস্বীকৃত, অসমর্থিত, গর্হিত ইত্যাদি।

মুনকার-এর পারিভাষিক অর্থ : দুর্বল রাবী যদি নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে গড়মিল করে, তাহলে দুর্বল রাবীর রেওয়ায়েতকে মুনকার বলে।

আরবিতে اَلْمُنْكَرُ-এর সংজ্ঞা হলো- هُوَ الْخَبَرُ الَّذِيْ رَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ অর্থাৎ যা'ঈফ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা ছিকাহ রাবী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতের খেলাপ হয়।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) اَسْبَابُ طَعْنٍ -এর মধ্যে মুনকার -এর আরেকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করে বলেছেন- فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ اَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ اَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ فَحَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ

অর্থাৎ হাদীসে মুনকার প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার রাবী অতিমাত্রায় ভুল, অত্যন্ত উদাসীন এবং ফিসক-এর দোষে দোষী। চাই তার রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ হোক বা না হোক।

মুনকার -এর নামকরণ : যেহেতু মুনকার হাদীস কবুল করতে মুহাদ্দিসীনে কেরাম অস্বীকার করেছেন এবং এমন হাদীসের তারা সমর্থন করেন না, তাই তাকে মুনকার বলে।

মা'রূফ এবং মুনকার -এর উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

এ হাদীসটি যেমনি মা'রূফ-এর উদাহরণ তেমনি মুনকার -এরও উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, এ হাদীসটি ইবনে আবূ হাতিম حُبَيِّبُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ সূত্রে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, এটি মুনকার। কারণ, হুবায়্যেব ইবনে হাবীব ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীগণও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সেখানে عَنِ النَّبِيِّ (ص) নেই। সুতরাং দুর্বল রাবী হুবায়্যেব ইবনে হাবীব সনদের মধ্যে বৃদ্ধি (নবী করীম ﷺ -এর কথা) করে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করেছেন। ফলে তার মারফূ' রেওয়ায়েতটি মুনকার এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাওকূফ রেওয়ায়েতটি মা'রূফ হবে।

শায এবং মুনকার-এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা-

১. **ইবনুস সালাহ -এর অভিমত :** বিশিষ্ট এ মুহাদ্দিস বলেন, মুনকার শায -এরই অপর নাম এবং উভয় সমার্থোবোধক। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
   এ অভিমতটি যে সঠিক নয় হাফিজ ইবনে হাজার (র.) قَدْ غَفَلَ مَنْ سَوّٰى بَيْنَهُمَا বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

২. **জুমহুরের অভিমত :** জুমহুরের মতে শায ও মুনকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে عُمُوْمٌ خُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ -এর সম্পর্ক। তবে এটা মানতিকী পরিভাষা হিসেবে নয়; বরং আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে মাত্র। আর তা হলো, উভয়টার মধ্যে مُخَالِفٌ -এর দিক দিয়ে মিল রয়েছে। এটাই হলো তাদের عَامٌ -এর দিক। আর তা হলো, শায যেমন আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে শায হয়, তেমনি মুনকারও আরেকটির সাথে গড়মিল করার কারণে মুনকার হয়। আর উভয়ের মধ্যে অমিল রয়েছে এদিক দিয়ে যে, শায -এর রাবী ثِقَةٌ বা নির্ভরযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে মুনকার -এর রাবী ضَعِيْفٌ বা দুর্বল হয়। এটা হলো তাদের خَاصٌ হওয়ার দিক অর্থাৎ শাযটা ثِقَةٌ রাবীর সাথে খাস আর মুনকার-টা ضَعِيْفٌ রাবীর সাথে খাস।

শায ও মুনকার -এর মধ্যে এ পার্থক্যটা বেশির ভাগ বিচারে। নতুবা কোনো কোনো সময় একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়।

মাহফূয ও মা'রূফ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে দুদিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। যথা-

১. মাহফূয -এর বিপরীতটা হয় শায আর মা'রূফ -এর বিপরীতটা হয় মুনকার।
২. মাহফূয রাবীর বিপরীত রাবী শক্তিশালী হয়। আর মা'রূফ রাবীর বিপরীত রাবী হয় দুর্বল।

حُبَيِّبُ بْنُ حَبِيْبٍ : এখানে প্রথম নামটির সঠিক উচ্চারণ হুবায়্যেব। আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ হাবীব। হুবায়্যেব হলেন হামযার ভাই।

وَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْفَرْدِ النِّسْبِيِّ اِنْ وُجِدَ بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِهِ فَرْدًا قَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَالْمُتَابَعَةُ عَلٰى مَرَاتِبَ اِنْ حَصَلَتْ لِلرَّاوِىْ نَفْسَهُ فَهِىَ التَّامَّةُ وَاِنْ حَصَلَتْ لِشَيْخِهِ فَمَنْ فَوْقَهُ فَهِىَ الْقَاصِرَةُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ .

অনুবাদ : কোনো ফরদে নিসবী হাদীস সম্পর্কে প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, সেটি ফরদ বা একক সনদবিশিষ্ট। পরে তার সমার্থক একটি হাদীস পাওয়া গেল। এই পরবর্তী হাদীসটিকে বলা হয় মুতাবি'। মুতাবা'আতের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যদি খোদ রাবীর ক্ষেত্রে এটা অর্জিত হয়, তাহলে তার নাম পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত। আর যদি তার শায়খ কিংবা আরো উপরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে অর্জিত হয়, তাহলে তার নাম অসম্পূর্ণ মুতাবা'আত। যে কোনো ধরনের হোক না কেন, মুতাবা'আত দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুতাবাআতের আলোচনায় কয়েকটি দিক প্রণিধানযোগ্য। ১. মুতাবে', মুতাবা' এবং মুতাবা'আতের অর্থ। ২. মুতাবা'আতের স্তর। ৩. মুতাবা'আতের উদাহরণ। ৪. মুতাবা'আতের শর্ত। ৫. মুতাবা'আতের হুকুম। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এগুলোর আলোচনা পেশ করা হলো–

মুতাবি', মুতাবা' এবং মুতাবা'আত-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে মুতাবা'আত অর্থ– সমর্থন করা। মুতাবি' অর্থ-সমর্থনকারী। মুতাবা' অর্থ– সমর্থনপুষ্ট।

মুতাবি', মুতাবা' এবং মুতাবা'আত -এর পারিভাষিক অর্থ : যে ফরদে নিসবী হাদীসকে প্রথমে ফরদ তথা একক রাবীবিশিষ্ট মনে করা হয়েছিল। এরপর অনুসন্ধান করে এমন এক ব্যক্তি পাওয়া গেল যিনি ঐ একক মনে করা রাবীর সমার্থক হাদীস রেওয়ায়েত করেন, তাহলে এই খুঁজে পাওয়া ব্যক্তিকে বলে মুতাবি' (সমর্থনকারী) আর পূর্বের রাবীকে বলে মুতাবা' (সমর্থনপুষ্ট) আর এভাবে হাদীস বর্ণনা করাকে বলে মুতাবা'আত।

আরবিতে اَلْحَدِيْثُ الْمُتَابِعُ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الْمُشَارِكُ لِلَّذِىْ ظُنَّ اَنَّهُ فَرْدٌ لَفْظًا وَمَعْنًى اَوْ مَعْنًى فَقَطْ مَعَ الْاِتِّحَادِ فِى الصَّحَابِىِّ

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবীকে মুহাদ্দিসগণ مُتَفَرِّدٌ ধারণা করেছেন, لَفْظًا وَ مَعْنًى অথবা শুধু مَعْنًى সেই হাদীসের অনুরূপ কোনো হাদীস যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তাকে اَلْحَدِيْثُ الْمُتَابِعُ বলে। তবে শর্ত হলো উভয় হাদীসের সর্বশেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হতে হবে।

মুতাবা'আতের স্তর : মুতাবা'আত দু প্রকার। ১. تَامَّةٌ বা পূর্ণাঙ্গ। ২. قَاصِرَةٌ বা অসম্পূর্ণ। নিম্নে প্রত্যেকটার সংজ্ঞা দেওয়া হলো–

১. **مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ -এর সংজ্ঞা :** যদি মুতাবা'আত বা সমর্থনটা খোদ রাবীর (মুসান্নিফের) ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তাকে مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ বা পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত বলে।

২. **مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ -এর সংজ্ঞা :** যদি মুতাবা'আত বা সমর্থনটা রাবীর শায়খ বা তারও উপরের কোনো রাবীর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তাকে مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ বা অসম্পূর্ণ মুতাবা'আত বলে। এর অপর নাম مُتَابَعَتٌ نَاقِصَةٌ ।

مِثَالُ الْمُتَابَعَةِ التَّامَّةِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ ، فَهٰذَا الْحَدِيْثُ بِهٰذَا اللَّفْظِ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ فَعَدُّوْهُ فِيْ غَرَائِبِهِ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ لٰكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعًا وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ كَذٰلِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ وَهٰذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ وَ وَجَدْنَا لَهُ أَيْضًا مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِيْ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِلَفْظِ "فَكَمِّلُوْا ثَلَاثِيْنَ" وَفِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ فَاقْدِرُوْا ثَلَاثِيْنَ وَلَا اقْتِصَارَ فِيْ هٰذِهِ الْمُتَابَعَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَامَّةً أَوْ قَاصِرَةً عَلَى اللَّفْظِ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالْمَعْنٰى لَكَفٰى لٰكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذٰلِكَ الصَّحَابِيِّ .

অনুবাদ : পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আতের উদাহরণ– কিতাবুল উম্ম-এ ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালিক (র.) থেকে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– "মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। অতএব তোমরা চাঁদ না দেখে রোজা রাখবে না, তা না দেখে রোজা ছাড়বেও না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তোমরা ত্রিশদিনের মেয়াদ পূর্ণ করবে।" হাদীসটি সম্পর্কে অনেকে মনে করেন, ইমাম মালিক (র.) থেকে এ শব্দে একমাত্র ইমাম শাফেয়ী (র.)-ই বর্ণনা করেছেন। তাই তারা এটিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত গরীব হাদীস বলে গণ্য করেন। কেননা, ইমাম মালিক (র.)-এর অন্য ছাত্ররা এটিকে এভাবে বর্ণনা করেন– 'যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তোমরা পরিমাণ রক্ষা করবে।' কিন্তু আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর একজন মুতাবে'-এর সন্ধান পেলাম। তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নাবী ইমাম বুখারী (র.) তার বরাত দিয়ে ইমাম মালিক (র.) থেকে এরূপই সংকলন করেছেন। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ মুতাবা'আত।

আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অসম্পূর্ণ মুতাবা'আতও পাই। **সহীহ ইবনে খুযায়মাতে** আসিম ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা **মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ** থেকে তিনি দাদা **আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর** (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'তাহলে তোমরা ত্রিশদিন পূর্ণ করবে।' তা ছাড়া **মুসলিম শরীফে উবায়দুল্লাহ ইবনে** ওমর নাফে থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, **'তাহলে তোমরা ত্রিশ দিনের** পরিমাণ রক্ষা করবে।'

মুতাবা'আত পূর্ণাঙ্গ কিংবা অসম্পূর্ণ কোনো ক্ষেত্রেই একই শব্দে হবার শর্ত নেই; বরং **অর্থের দিক দিয়ে** মিল থাকলেই যথেষ্ট হবে। তবে শর্ত হলো একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ-এর উদাহরণ : এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ۔

এ হাদীসটি **مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ**-এর উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর 'উম্ম' নামক কিতাবে **عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ** সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। একদল মুহাদ্দিস (যাদের মধ্যে ইমাম বায়হাকীর নাম উল্লেখযোগ্য) ধারণা করেছিলেন যে, ইমাম মালিক (র.) হতে হাদীসটি **فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ** শব্দে কেবলমাত্র ইমাম শাফেয়ী (র.) রেওয়ায়েত করেন। এ ধারণার ভিত্তিতে তারা এ হাদীসকে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর গরীব শ্রেণির হাদীস বলে গণ্য করেন। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.) ছাড়া ইমাম মালিক (র.) -এর অন্যান্য ছাত্রগণ এ সনদেই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু তাদের হাদীসে শব্দ এসেছে– **فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهٗ** ; পরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর **مُتَابِعٌ** তথা সমর্থনকারী বিদ্যমান। আর তিনি হলেন ইমাম কা'নাবী (র.)। ইমাম বুখারী (র.) **عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ** সূত্রে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, যার শব্দ হচ্ছে– **فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ** ; সুতরাং এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নাবী (র.) খোদ রাবী তথা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর **مُتَابَعَةٌ** এভাবে করেছেন যে, উভয়ে ইমাম মালিক (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। অতএব, এটা **مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ** হলো।

مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ-এর উদাহরণ : আলোচ্য হাদীসটি **مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ**-এরও উদাহরণ। আর তা এভাবে যে, সহীহ ইবনে খুযাইমা গ্রন্থে এ হাদীসটি **عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ اِبْنِ عُمَرَ** সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শব্দ এসেছে– **فَكَمِّلُوْا ثَلَاثِيْنَ** অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে **عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ** সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শব্দ এসেছে– **فَاقْدِرُوْا ثَلَاثِيْنَ** সুতরাং সহীহ ইবনে খুযাইমার সনদে মুহাম্মদ এবং মুসলিমের সনদে নাফে' (র.) **'ইবনে দীনার'** -এর **مُتَابَعَةٌ** করেছেন। আর ইবনে দীনার হলেন খোদ রাবী তথা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর শায়খের শায়খ। অতএব এটা **مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ** হলো। অবশ্য **فَاَكْمِلُوْا**-এর স্থলে **فَكَمِّلُوْا** এবং **فَاقْدِرُوْا** শব্দ এসেছে। শব্দের এ পার্থক্য বা ভিন্নতা **مُتَابَعَةٌ**-এর জন্য অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক নয়।

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ, মুহাম্মদ এবং নাফে' হলেন مُتَابِعٌ তথা **সমর্থক**। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে দীনার হলেন مُتَابَعٌ বা সমর্থনপুষ্ট।

مُتَابَعَةٌ-এর মতো مُتَابِعٌ-ও দু প্রকার। ১. مُتَابِعٌ تَامٌ ও مُتَابِعٌ نَاقِصٌ উল্লিখিত উদাহরণে ইবনে মাসলামাহ হলেন مُتَابِعٌ تَامٌ আর মুহাম্মদ ও নাফে' হলেন مُتَابِعٌ نَاقِصٌ।

مُتَابَعَةٌ -এর শর্ত : যে কোনো مُتَابَعَةٌ (চাই تَامَّةٌ হোক কিংবা قَاصِرَةٌ) -এর জন্য হুবহু শাব্দিকভাবে مُتَابَعَةٌ টা জরুরি নয়; বরং مُتَابَعَةٌ -এর জন্য দুটি শর্ত অনিবার্য। যথা–

১. উভয় রেওয়ায়েত অর্থ ও উদ্দেশ্য এক হওয়া। সুতরাং যদি শব্দ এবং মূলধাতু ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ-এ বর্ণিত উদাহরণটি এর উজ্জ্বল নজির।

২. مُتَابِعٌ (সমর্থক) এবং مُتَابَعٌ (সমর্থনপুষ্ট) উভয় রেওয়ায়েত একই সাহাবী থেকে হতে হবে। যেমন– পূর্বে উল্লিখিত সকল রেওয়ায়েত একই সাহাবী অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। এ দুই শর্ত ব্যক্ত করতে সম্মানিত লেখক وَلَا اقْتِصَارَ ... ذٰلِكَ الصَّحَابِيِّ বাক্য উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য এ বাক্যাংশ উল্লেখ করার আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে যে, সম্মানিত লেখক এ বাক্যের দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর সে প্রশ্ন হলো, কেউ হয়তো বলতে পারে مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ -এর মধ্যে مُتَابَعَةٌ পাওয়া যায়নি। কেননা, مُتَابِعٌ (মুতাবি')-এর রেওয়ায়েতে فَاكْمِلُوْا عِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ আর দুই মুতাবা' রেওয়ায়েতে فَكَمِّلُوْا ثَلَاثِيْنَ এবং فَاقْدِرُوْا ثَلَاثِيْنَ শব্দ এসেছে। অর্থাৎ মুতাবি' ও মুতাবা' -এর মধ্যে শব্দের মিল নেই। এ প্রশ্নের উত্তর সম্মানিত লেখক উক্ত বাক্যের মাধ্যমে এই দিয়েছেন যে, مُتَابَعَةٌ-এর জন্য দুই রেওয়ায়েতের শব্দ হুবহু এক হওয়া জরুরি নয়; বরং উভয়ের অর্থ এক হওয়াই যথেষ্ট।

مُتَابَعَةٌ -এর হুকুম : مُتَابَعَةٌ টা تَامَّةٌ হোক কিংবা قَاصِرَةٌ তা শক্তির ফায়দা দেয়। অর্থাৎ মুতাবি'-এর মাধ্যমে মুতাবা' হাদীসের বিশুদ্ধতা জোরালো হয়। অবশ্য এ ফায়দা প্রদানে مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ টা مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ হতে অধিক কার্যকর এবং ফলপ্রদ।

وَاِنْ وُجِدَ مَتَنٌ يَرْوِىْ مِنْ حَدِيْثِ صَحَابِيٍّ اٰخَرَ يَشْبَهُهُ فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى اَوْ فِى الْمَعْنٰى فَقَطْ فَهُوَ الشَّاهِدُ وَمِثَالُهُ فِى الْحَدِيْثِ الَّذِىْ قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِىُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً فَهٰذَا بِاللَّفْظِ وَاَمَّا بِالْمَعْنٰى فَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) بِلَفْظِ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ وَخَصَّ قَوْمٌ الْمُتَابَعَةَ بِمَا حَصَلَ بِاللَّفْظِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ ذٰلِكَ الصَّحَابِىِّ اَمْ لَا وَالشَّاهِدُ بِمَا حَصَلَ بِالْمَعْنٰى كَذٰلِكَ وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ وَبِالْعَكْسِ وَالْاَمْرُ فِيْهِ سَهْلٌ ـ

অনুবাদ : যদি একটি হাদীসের সাথে অন্য সাহাবী থেকে এমন একটি হাদীস পাওয়া যায় যা শব্দ ও অর্থ কিংবা শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে তাকে বলা হয় শাহিদ। এর উদাহরণ আমাদের পূর্বোল্লিখিত হাদীসটি, যা ইমাম নাসায়ী (র.) মুহাম্মদ ইবনে যুবায়েরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হুবহু হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের মতোই একই শব্দে সংকলন করেছেন। এ হলো শব্দগত শাহিদ-এর উদাহরণ। অর্থগত শাহিদ-এর উদাহরণ হলো ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীসটিকে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ-এর বরাত দিয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে সংকলন করেছেন এ শব্দে– যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তোমরা শাবান মাসের মেয়াদ ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

অনেকের মতে শব্দের দিক দিয়ে মিল থাকলে তার নাম মুতাবা'আত, একই সাহাবী থেকে বর্ণিত হোক বা না হোক। আর অর্থের দিক দিয়ে মিল থাকলে তার নাম শাহিদ। আবার অনেক সময় শাহিদ অর্থে মুতাবা'আত আর মুতাবা'আত অর্থে শাহিদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপারে অর্থাৎ একটি অপরটির স্থলে ব্যবহারের দিক দিয়ে বিষয়টি (জটিল নয়; বরং) সহজ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْاَمْرُ فِيْهِ سَهْلٌ : فِيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য اِطْلَاقُ الْمُتَابَعَةِ عَلَى الشَّاهِدِ وَبِالْعَكْسِ - আর এটা সহজ হওয়ার কারণ হলো مُتَابَعَةٌ বলুন অথবা شَاهِدٌ বলুন তার দ্বারা উদ্দেশ্য অপর রেওয়ায়েতের শক্তি পৌঁছানো। আর এটা যেমনিভাবে শাহিদ দ্বারা হয়, তেমনি মুতাবা'আত দ্বারাও হয়। তাই একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হলে তাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

شَاهِدٌ এবং شَهَادَتٌ -এর অর্থ : কোনো হাদীস ফরদে নিসবী প্রমাণিত হওয়ার পর অপর কোনো সাহাবী থেকে যদি এমন কোনো 'মতন' পাওয়া যায় যা শব্দগত এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র অর্থগত দিক দিয়ে ঐ ফরদে নিসবী হাদীসের মতো হয়, তাহলে এ দ্বিতীয় সাহাবীর রেওয়ায়েতকে শাহিদ এবং এমন এক রকম হওয়াকে শাহাদাত বলে।

আরবিতে اَلشَّاهِدُ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الْمُشَارِكُ لِلَّذِىْ ظُنَّ اَنَّهُ فَرْدٌ لَفْظًا وَ مَعْنًى اَوْ مَعْنًى فَقَطْ مَعَ الْاِخْتِلَافِ فِى الصَّحَابِىِّ ـ

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবীকে মুহাদ্দিসগণ مُتَفَرِّدٌ ধারণা করেছেন لَفْظًا وَ مَعْنًى অথবা مَعْنًى , সেই হাদীসের অনুরূপ কোনো হাদীস পাওয়া গেলে যদি উভয় হাদীসের সর্বশেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবী ভিন্ন হয়, তবে তাকে اَلْحَدِيْثُ الشَّاهِدُ বলে।

শাহিদ -এর প্রকারভেদ : শাহিদ দু প্রকার। যথা–

١. شَاهِدٌ بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى ১. অর্থাৎ শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ।

٢. شَاهِدٌ بِالْمَعْنٰى ২. অর্থাৎ অর্থগত শাহিদ।

নিম্নে প্রত্যেকটার সংজ্ঞা দেওয়া হলো–

১. **শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ :** দুই সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের অর্থ এক হওয়ার সাথে সাথে উভয়ের শব্দও যদি হুবহু একই হয়, তাহলে তাকে শব্দগত ও অর্থগত (شَاهِدٌ بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى) বলে।

২. **অর্থগত শাহিদ :** দুই সাহাবীর রেওয়ায়েতের অর্থ এক হয়ে যদি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে তাকে অর্থগত শাহিদ (شَاهِدٌ بِالْمَعْنٰى) বলে।

শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ-এর উদাহরণ : নাসায়ী শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীস, যাতে বর্ণিত হয়েছে– فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ ইমাম নাসায়ী (র.) এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মুহাম্মদ ইবনে যুবায়ের -এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এ হাদীসের শব্দ হুবহু হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ঐ হাদীসের শব্দের মতো, যা مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ -এর উদাহরণে উল্লিখিত হয়েছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদীস শব্দগত ও অর্থগত শাহিদ।

অর্থগত শাহিদ -এর উদাহরণ : বুখারী শরীফে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি–

فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

কেননা, ইমাম বুখারী (র.) হাদীসটি مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি যদিও হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের সাথে হুবহু শাব্দিকভাবে মিল নেই, তথাপি উভয় হাদীসের অর্থ একই। যার ফলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর এ হাদীসটি অর্থগত শাহিদ হবে।

মুতাবি' এবং শাহিদ-এর মধ্যে পার্থক্য : এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. **জুমহুরের অভিমত :** জুমহুরের মতে مُتَابَعَةٌ ও شَهَادَتٌ -এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুতাবা'আত -এর জন্য সাহাবী একই হওয়া শর্ত, আর শাহাদাত -এর জন্য সাহাবী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া শর্ত।

২. **একদল মুহাদ্দিসের অভিমত :** জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিপরীতে একদল মুহাদ্দিস অন্যভাবে মুতাবা'আত ও শাহাদাত -এর মধ্যে পার্থক্য করেন। যথা–

ক. مُتَابَعَةٌ টা مُوَافَقَةٌ بِاللَّفْظِ-এর সাথে খাস। অর্থাৎ উভয় রেওয়ায়েতের শব্দ যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে তা মুতাবা'আত। চাই উভয় হাদীসের সাহাবী এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হোন না কেন।

খ. شَاهِدٌ টা مُوَافَقَةٌ بِالْمَعْنٰى -এর সাথে খাস। অর্থাৎ উভয় রেওয়ায়েত যদি অর্থগতভাবে এক হয়; শব্দগতভাবে নয়, তাহলে তাকে শাহিদ বলে। চাই উভয় হাদীসের সাহাবী একজনই হোন না কেন।

উল্লেখ্য যে, মুতাবা'আত ও শাহিদ-এর মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্যটা বেশিরভাগে ব্যবহারের দিক দিয়ে। নতুবা কোনো কোনো সময় একটি অপরটির স্থলেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিবেচ্য হবে তখন তাদের মধ্যে نِسْبَتْ تَبَايُنْ হবে। আর যখন উভয় একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হবে, তখন তাদের মধ্যে نِسْبَتْ تَسَاوِىْ হবে।

وَاعْلَمْ اَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيْدِ وَالْاَجْزَاءِ لِذٰلِكَ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ يُظَنُّ اَنَّهٗ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهٗ مُتَابِعٌ اَمْ لَا هُوَ الْاِعْتِبَارُ ، وَقَوْلُ اِبْنِ الصَّلَاحِ مَعْرِفَةُ الْاِعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ قَدْ يُوْهِمُ اَنَّ الْاِعْتِبَارَ قَسِيْمٌ لَهُمَا وَلَيْسَ كَذٰلِكَ بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ اِلَيْهِمَا وَجَمِيْعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اَقْسَامِ الْمَقْبُوْلِ تَحْصُلُ فَائِدَةُ تَقْسِيْمِهٖ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهٖ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : জামি‘, মুসনাদ, জুয (ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের হাদীসের কিতাব থেকে ‘ফরদ’ হাদীসের মুতাবি‘ ও শাহিদ অনুসন্ধানের নাম ই‘তিবার (اِعْتِبَارْ)। ইবনুস সালাহ -এর একটি উক্তি এক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেছেন, “ই‘তিবার, মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদ -এর অবগতি।” এ থেকে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, এটি (ই‘তিবার) হয়তো শাহিদ ও মুতাবি‘-এর মতোই একটি শ্রেণি। অথচ তা নয়; বরং এ (ই‘তিবার) হলো, উক্ত দু শ্রেণিকে খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া।

মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য হাদীসের যে সমুদয় শ্রেণির উল্লেখ করা হলো, যখন দুটি হাদীসের মধ্যে বিরোধিতা পরিলক্ষিত হবে, তখন এর উপকারিতা পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِعْتِبَارْ -এর সংজ্ঞা : اِعْتِبَارْ হলো মুতাবি‘ এবং শাহিদ চেনার প্রক্রিয়ার নাম। এটা তাদের কোনো শ্রেণি নয়। যারা اِعْتِبَارٌ-কে شَاهِدْ ও مُتَابِعْ -এর শ্রেণি ভেবেছেন এবং উল্লেখ করেছেন তারা ভুল করেছেন। যেমন– ইবনুস সালাহ -এর একটি উক্তি থেকে এমনটি বুঝে আসে যে, তিনি اِعْتِبَارْ -কে شَاهِدْ ও مُتَابِعْ -এরই একটি শ্রেণি ভেবেছেন।

اِعْتِبَارْ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ– هُوَ تَتَبُّعُ الْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ

অর্থাৎ কোনো হাদীসকে ‘ফরদ’ ধারণা করার পর জামি‘, মুসনাদ, জুয ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে তার মুতাবি‘ বা শাহিদ অন্বেষণ করাকে ই‘তিবার বলে।

কেউ কেউ اَلْاِعْتِبَارُ-এর সংজ্ঞা একটু বিস্তারিতভাবে এভাবে প্রদান করেছেন যে–

اَلْاِعْتِبَارُ هُوَ تَتَبُّعُ الطُّرُقِ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيْدِ وَالْاَجْزَاءِ لِذٰلِكَ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ يُظَنُّ اَنَّهٗ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهٗ مُتَابِعٌ اَوْ شَاهِدٌ اَمْ لَا.

অর্থাৎ اَلْاِعْتِبَارُ হলো, যে হাদীসকে فَرْد ধারণা করা হয় তার কোনো مُتَابِعْ বা شَاهِدْ আছে কিনা তা জানার জন্য বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ ঘাটাঘাটি করা, সনদসমূহ পর্যালোচনা করা।

একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর : সম্মানিত লেখক .... وَجَمِيْعُ مَا تَقَدَّمَ ইবারত এনে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কেউ বলতে পারে, এখানে মাকবুল খবরের যত প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে সবই তো মাকবূল, তাহলে এগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসের কি দরকার?

এর উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, খবরে মাকবূলকে এভাবে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করার ফলাফল হাদীসের মধ্যে تَعَارُضْ বা বৈপরীত্য সৃষ্টি হলে প্রকাশ পাবে। কারণ, তখন নিম্নস্তরের

হাদীসের উপর উচ্চস্তরের হাদীস প্রাধান্য পাবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কখনো সহীহ্ হাদীস ও হাসান **হাদীসের মধ্যে** বৈপরীত্য দেখা দেয়, তখন সহীহ্ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। কারণ, তার মর্যাদা হাসানের **তুলনায় উর্ধ্বে।**

বিভিন্ন পরিভাষার সংজ্ঞা : এখানে আগত তিনটি পরিভাষার সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো–

১. اَلْجَوَامِعُ : এ শব্দটি جَامِعٌ -এর বহুবচন। جَامِعٌ হাদীসের এরূপ গ্রন্থকে বলা হয় যাতে আটটি বিষয়ের হাদীস সংকলিত হয়। এ আটটি বিষয় একটি পঙ্ক্তিতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

سِيَرْ آدَابْ وَتَفْسِيْر وَعَقَائِدْ ٭ فِتَنْ اَشْرَاط وَاَحْكَام وَمَنَاقِبْ

তথা সীরাত, আদব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতনা, কিয়ামতের আলামত, আহকাম, ফাযায়িল-মানাকিব।

سِيَرْ শব্দটি سِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সেসব বিষয় যেগুলোতে প্রিয়নবী ﷺ -এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে

آدَابْ শব্দটি اَدَبٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সামাজিক শিষ্টাচার। যেমন– খাওয়া ও পান করার আদব।

تَفْسِيْر অর্থাৎ কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসগুলো।

عَقَائِدْ অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

فِتَنْ শব্দটি فِتْنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সেসব বড় বড় ঘটনা যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

اَشْرَاط তথা কিয়ামতের আলামতসমূহ।

اَحْكَام তথা আমল সংক্রান্ত বিধিবিধান। যেগুলো ফিক্হ-এর কিতাবে পাওয়া যায়। এগুলোকে সুনানও বলে।

مَنَاقِبْ এটি مَنْقَبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ মহিলা, পুরুষ সাহাবী এবং বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণির ফাযায়িল।

২. اَلْمَسَانِيْدُ : এটি مُسْنَدٌ -এর বহুবচন। মুসনাদ হলো হাদীসের এরূপ কিতাব যাতে হাদীসসমূহকে সাহাবায়ে কেরামের তারতীব অনুসারে সংকলন করা হয়। অর্থাৎ একজন সাহাবীর সমস্ত রেওয়ায়েত একবারে উল্লেখ করা হবে। চাই যে কোনো অধ্যায়ের সাথে তা সম্পৃক্ত করা হোক। অতঃপর দ্বিতীয় সাহাবীর হাদীস। ....

অতঃপর কোনো কোনো সময় হুরূফে হিজার তারতীব ধর্তব্য হয়। কোনো সময় আগে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ধর্তব্যে এনে এরূপ সাহাবীর হাদীস প্রথমে উল্লেখ করা হয়। আবার কোনো কোনো সময় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ধর্তব্য হয়। এরূপভাবে মুহাজির ও আনসার শ্রেণির তারতীবেও মুসনাদগুলো বিন্যস্ত করা হয়।

৩. اَلْاَجْزَاءُ : এটি جُزْءٌ -এর বহুবচন। اَلْجُزْءُ এরূপ কিতাবকে বলে যাতে কোনো একটি শাখাগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীস একত্রিত করা হয়। যেমন–

١. جُزْءُ الْقِرَاءَةِ لِلْاِمَامِ الْبُخَارِيِّ (رحـ)

٢. جُزْءُ الْقِرَاءَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ (رحـ)

٣. جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْبُخَارِيِّ (رحـ)

٤. جُزْءُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ

٥. جُزْءُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ لِلْخَطِيْبِ الْبَغْدَادِيِّ

ثُمَّ الْمَقْبُوْلُ يَنْقَسِمُ اَيْضًا اِلَى مَعْمُوْلٍ بِهٖ وَغَيْرِ مَعْمُوْلٍ بِهٖ لِاَنَّهُ اِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ اَىْ لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ فَهُوَ الْمُحْكَمُ وَاَمْثِلَتُهُ كَثِيْرَةٌ وَاِنْ عُوْرِضَ فَلَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مُعَارِضُهُ مَقْبُوْلًا مِثْلَهُ اَوْ يَكُوْنَ مَرْدُوْدًا وَالثَّانِىْ لَا اَثَرَ لَهُ لِاَنَّ الْقَوِىَّ لَا يُؤَثِّرُ فِيْهِ مُخَالَفَةُ الضَّعِيْفِ وَاِنْ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهٖ فَلَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يُّمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُوْلَيْهِمَا بِغَيْرِ تَعَسُّفٍ اَوْ لَا فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهُوَ النَّوْعُ الْمُسَمّٰى بِمُخْتَلَفِ الْحَدِيْثِ وَمَثَّلَ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِحَدِيْثِ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ مَعَ حَدِيْثِ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْاَسَدِ وَكِلَاهُمَا فِى الصَّحِيْحِ وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا اَنَّ هٰذِهِ الْاَمْرَاضَ لَا تُعْدِىْ بِطَبْعِهَا لٰكِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ مُخَالَطَةَ الْمَرِيْضِ بِهَا لِلصَّحِيْحِ سَبَبًا لِاَعْدَائِهٖ مَرَضَهُ.

অনুবাদ : মাকবূল হাদীস আবার আমলযোগ্য ও আমলের অযোগ্য-এর দিকে বিভক্ত হয়। কেননা, যে হাদীসের বিপরীতে কোনো হাদীস নেই সেটি মুহকাম বা অবশ্য পালনীয়। এর প্রচুর নজির রয়েছে। আর যদি তার বিপরীত কোনো হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে দেখতে হবে সেটি অনুরূপ গ্রহণযোগ্য না প্রত্যাখ্যাত। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হলে তো তার কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা, কোনো শক্তিশালীর উপর তার দুর্বল প্রতিপক্ষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। আর যদি সমান পর্যায়ের দুটি হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহলে প্রথমত চেষ্টা করতে হবে দু হাদীসের অর্থের মধ্যে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সমন্বয় সাধনের। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তার নাম হয় 'মুখতালিফুল হাদীস।'

ইবনুস সালাহ 'মুখতালিফুল হাদীস'-এর একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন– لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ

অর্থাৎ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ বলতেও কিছু নেই।

আবার তিনি এ-ও ইরশাদ করেছেন– فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْاَسَدِ

অর্থাৎ সিংহ থেকে পালানোর মতো কুষ্ঠরোগী থেকে পালাবে।

দুটি হাদীসই সহীহ সনদে বর্ণিত। প্রথম হাদীসটি রয়েছে মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফে, আর দ্বিতীয় হাদীসটি রয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে। হাদীস দুটি দৃশ্যত পরস্পর বিরোধপূর্ণ। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় হলো– এ সকল রোগ প্রকৃতিগতভাবে সংক্রামক নয়, কিন্তু এতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির সংশ্রবকে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিতে এ রোগ সংক্রমিত হবার কারণ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পূর্বে আলোচনা হয়েছে خَبَرٌ প্রথমত দু প্রকার। ১. خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ এবং ২. خَبَرُ اٰحَادٍ - অতঃপর খবর রাবীর সিফাতের দিক দিয়ে দু প্রকার। ১. مَقْبُوْل এবং ২. مَرْدُوْد - خَبَرِ مَقْبُوْل আবার সত্তাগত দিক দিয়ে চার প্রকার। ১. সহীহ লিযাতিহী, ২. সহীহ লিগায়রিহী, ৩. হাসান লিযাতিহী ও ৪. হাসান লিগায়রিহী।

খবরে মাকবূল আবার تَعَارُضْ-এর দিক দিয়ে দু প্রকার। ১. مَعْمُوْلٌ بِهٖ তথা আমলযোগ্য ও ২. غَيْرُ مَعْمُوْلٍ بِهٖ অর্থাৎ আমলের অযোগ্য। অর্থাৎ কিছুর উপরে আমল করা হবে আর কিছুর উপরে আমল করা হবে না।

খবরে মাকবূলটা আমলযোগ্য হওয়া– না হওয়ার দিক দিয়ে মোট সাত প্রকার হয়। যথা– ১. مُحْكَمْ ২. مُخْتَلَفُ الْحَدِيْثِ ৩. نَاسِخْ ৪. مَنْسُوْخْ ৫. رَاجِحْ ৬. مَرْجُوْحْ ও ৭. مُتَوَقَّفٌ فِيْهِ

সাত প্রকারে সীমিত হওয়ার কারণ : خَبَرْ مَقْبُوْل প্রথমত দু প্রকার। হয়তো সেটা مَعْمُوْلٌ بِهٖ হবে অথবা হবে না। কারণ, خَبَرْ مَقْبُوْل-এর বিরোধী অন্য কোনো খবর হবে বা হবে না। যদি না হয়, তাহলে তাকে مُحْكَمْ বলে। আর যদি বিরোধী হয়, তাহলে সেই বিরোধী হাদীস প্রথম হাদীসের মতো মাকবূল হবে অথবা মারদূদ। যদি মারদূদ হয়, তাহলে তার বিরোধীতায় মাকবূল হাদীসের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া পড়বে না। আর যদি দ্বিতীয়টিও প্রথমটির মতো মাকবূল হয়, তাহলে হয়তো এ দু হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি সম্ভব হয়, তাহলে তাকে مُخْتَلَفُ الْحَدِيْثِ বলে। আর যদি সমন্বয় সাধন না করা যায়, তাহলে হয়তো উভয় হাদীসের তারিখ জানা যাবে অথবা যাবে না। সুতরাং তারিখ ইত্যাদির দ্বারা যদি একটির আগে ও অপরটির পরে হওয়া জানা যায়, তাহলে পরেরটার দ্বারা পূর্বেরটা مَنْسُوْخْ হয়ে যাবে এবং نَاسِخْ -এর উপর আমল হবে। আর যদি হাদীসের আগে-পিছে হওয়া না জানা যায়, তাহলে হয়তো একটি হাদীসকে অপর হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে প্রাধান্য দিতে হবে এবং رَاجِحْ -এর উপর আমল হবে। আর যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে– যতক্ষণ তাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের কোনো ব্যবস্থা না হয়। এই মোট সাত প্রকার হলো। এর মধ্যে চার প্রকার হলো আমলযোগ্য (مَعْمُوْلٌ بِهٖ)। আর তা হলো– ১. مُحْكَمْ ২. مُخْتَلَفُ الْحَدِيْثِ ৩. نَاسِخْ ও ৪. رَاجِحْ আর বাকি তিন প্রকার হলো আমলের অযোগ্য। আর তা হলো– ১. مَنْسُوْخْ ২. مَرْجُوْحْ ও ৩. مُتَوَقَّفٌ فِيْهِ-

মাকবূল হাদীসের মধ্যকার বিরোধ নিরসন পদ্ধতি : একটি خَبَرْ مَقْبُوْل -এর সাথে যদি অপর একটি خَبَرْ مَقْبُوْل -এর বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা নিরসনের পদ্ধতি তিনটি। আর তা পর্যায়ক্রমে এভাবে–

১. সম্ভব হলে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে।
২. নতুবা সম্ভব হলে একটির দ্বারা অপরটি মানসূখ করতে হবে।
৩. তাও সম্ভব না হলে একটার উপর অপরটির প্রাধান্য দিতে হবে। এটাও সম্ভব না হলে উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে।

مُحْكَمْ -এর সংজ্ঞা : مُحْكَمْ শব্দটি بَابُ إِفْعَالٌ হতে إِسْمُ مَفْعُوْل-এর সীগাহ। এর অর্থ– সুদৃঢ়, মজবুত। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় الْحَدِيْثُ الْمُحْكَمُ হলো– هُوَ الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ الَّذِىْ سَلِمَ مِنْ مُعَارَضَةِ مِثْلِهٖ অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবূল অনুরূপ কোনো হাদীসে মাকবূলের বিরোধী হয় না, তাকে اَلْحَدِيْثُ الْمُحْكَمْ বলে।

বি. দ্র. অধিকাংশ হাদীস এই مُحْكَمْ জাতীয়।

মুখতালিফুল হাদীস-এর সংজ্ঞা : এটা প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার تَعَارُضْ তার মতো অন্য খবরে মাকবূলের সাথে হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে تَطْبِيْق দেওয়া তথা সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব হয়। আরবিতে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়–

هُوَ الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ الَّذِىْ يُعَارِضُهُ مَقْبُوْلًا اٰخَرَ مِثْلَهٗ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُوْلَيْهِمَا .

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবূল তার অনুরূপ আরেকটি হাদীসে মাকবূলের مُتَعَارِضْ হয়, তবে উভয় হাদীসের مَفْهُوْم -এর মাঝে تَطْبِيْق দেওয়া সম্ভব হয়, তাকে مُخْتَلَفُ الْحَدِيْثِ বলে।

মুখতালিফুল হাদীস-এর উদাহরণ : নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত দুটি হাদীস এর উদাহরণ।

১. **لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ**۔

২. **فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ**۔

এ উভয় হাদীস মাকবূল এবং সহীহ অথচ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। কারণ, প্রথম হাদীসে **রোগ সংক্রামক** (ছোঁয়াছে) না হওয়া এবং দ্বিতীয় হাদীসে পালানোর নির্দেশ দানের দ্বারা রোগের সংক্রামক হওয়া **বুঝা যায়**।

দু হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন : উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ অবসানের লক্ষ্যে **একাধিক মহল** থেকে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১. **ইবনুস সালাহ-এর সমন্বয় সাধন :** ইবনুস সালাহ (র.) উক্ত হাদীসদ্বয়কে মুখতালিফুল **হাদীস-এর** উদাহরণ পেশ করে তাদের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন যে, রোগের **সত্তা ও** প্রকৃতির মধ্যে সংক্রমণের গুণ ও শক্তি নেই। এ কথা বলা হয়েছে **لَاعَدْوٰى** হাদীসে। অবশ্য **অসুস্থ** ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করলে কখনো আল্লাহ তা'আলা এই উঠা-বসাটা সুস্থ **লোকের** অসুস্থ হওয়ার কারণ বানিয়ে দেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ **فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ** হাদীসে **রোগী** থেকে পালাবার কথা বলেছেন।

২. **ইবনে হাজার -এর সমন্বয় সাধন :** উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেন, রোগ সংক্রমণ না হওয়াটা **عَامٌ** (ব্যাপক বিষয়)। এটা প্রকৃতিগতভাবেও সংক্রমণ হয় না আবার সুস্থ ব্যক্তির সাথে অসুস্থ ব্যক্তির উঠাবসার কারণেও হয় না। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি দুটি দলিল পেশ করেছেন। যথা–

১. এক হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– **لَا يَعْدِىْ شَئٌ شَيْئًا** অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো কিছুতে সংক্রামক হয় না। (প্রকৃতিগতভাবেও না আবার কারণ হিসেবেও না।)

২. আরববাসীদের সাধারণ ধারণা-বিশ্বাস অনুযায়ী এক সাহাবী যখন সংক্রমণের স্বপক্ষে নবী করীম ﷺ -এর সামনে একটি দলিল এভাবে পেশ করেন যে, খোস-পাঁচড়াযুক্ত উট সুস্থ উটের পালের মধ্যে কিছুদিন রাখলে সুস্থ উঠগুলোও খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত হয়ে যায় (যা প্রমাণ করে রোগ সংক্রমণ হয়)। আরবের এ ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাসের মূলভিত্তি গুঁড়িয়ে দিতে তখন তিনি তাকে পাল্টা এই প্রশ্ন করেন যে, **فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ؟** অর্থাৎ তাহলে বলো, প্রথমটিতে কিসে সংক্রমণ করল?

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সাহাবীর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, অনেক সময় বাহ্যিকভাবে রোগ সংক্রমণ হয় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নিজে নিজে সংক্রামক হয় না। আর হবেই বা কিভাবে, তার মধ্যে সংক্রমণের সত্তাগত শক্তিই নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণীর সারকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে প্রথম উটকে সংক্রমণ ছাড়াই রোগগ্রস্ত করেন, তেমনি অপর উটকেও সংক্রমণ ছাড়াই রোগগ্রস্ত করেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ **فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ ...** হাদীসে রোগ থেকে পালানোর নির্দেশ দিয়েছেন খারাপ আকিদা-বিশ্বাস লালন ও **ক্ষতি** থেকে বাঁচার জন্য। আর তা এভাবে যে, কোনো সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা **করল**। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তারও ঐ রোগ হলো, তাহলে এ ব্যক্তি মানব প্রবৃত্তিবশত এই ধারণা **করবে** যে, হয়তো অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করার কারণেই তার এই রোগ হয়েছে। এতে **করে তার** আকিদা বিনষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ আকিদা বিনষ্ট ও তার মাধ্যমে **ক্ষতি হতে** বাঁচানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেভাগেই অসুস্থ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ **দিয়েছেন। (রোগ** সংক্রমণের কারণে না।) যাতে করে তার ভ্রান্ত ধারণার উপলক্ষ মূলোৎপাটিত **হয়ে যায় এবং ভুল** ধারণার কোনো সুযোগ আর না থাকে।

مُخْتَلَفُ الْحَدِيْثِ -এর তাহকীক : **مُخْتَلَفٌ** শব্দটি **اِخْتِلَافٌ** ক্রিয়ামূল হতে **اِسْمُ فَاعِلٍ** -এর সীগাহ। এর অর্থ– দ্বন্দ্বমুখর, মতভেদপূর্ণ ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ শব্দটি **اِسْمُ مَفْعُوْلٍ** -এর সীগাহ তথা **لَامٌ** বর্ণে যবর দিয়েও পড়েছেন।

ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذٰلِكَ عَنْ سَبَبِهٖ كَمَا فِىْ غَيْرِهٖ مِنَ الْاَسْبَابِ كَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا اِبْنُ الصَّلَاحِ تَبْعًا لِغَيْرِهٖ ، وَالْاَوْلٰى فِى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا اَنْ يُّقَالَ اَنَّ نَفْيَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ لِلْعَدْوٰى بَاقٍ عَلٰى عُمُوْمِهٖ وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ لَا يَعْدِىْ شَىْءٌ شَيْئًا وَقَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَارَضَهٗ بِاَنَّ الْبَعِيْرَ الْاَجْرَبَ يَكُوْنُ فِى الْاِبِلِ الصَّحِيْحَةِ فَيُخَالِطُهَا فَتَجْرُبُ حَيْثُ رُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهٖ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ يَعْنِىْ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ اِبْتَدَأَ ذٰلِكَ فِى الثَّانِىْ كَمَا اِبْتَدَأَهٗ فِى الْاَوَّلِ وَاَمَّا الْاَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فَمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ لِئَلَّا يَتَّفِقَ الشَّخْصُ الَّذِىْ يُخَالِطُهٗ شَىْءٌ مِنْ ذٰلِكَ بِتَقْدِيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْتِدَاءً لَا بِالْعَدْوٰى الْمَنْفِيَّةِ فَيَظُنُّ اَنَّ ذٰلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهٖ فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوٰى فَيَقَعُ فِى الْحَرَجِ فَاَمَرَ بِتَجَنُّبِهٖ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : অতঃপর তা কখনো কখনো তার কারণ এড়িয়ে যায়, অন্যান্য কারণের বেলায় যেমন হয়ে থাকে। ইবনুস সালাহ অন্যদের অনুসরণে এ দু হাদীসের মধ্যে এরূপ সমন্বয় সাধন করেছেন। তবে এ দুয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সমন্বয় হতে পারে এভাবে যে, যদি বলা হয়– সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব অস্বীকার সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর বক্তব্য যথাস্থানে বহাল। কেননা, মহানবী ﷺ -এর এ উক্তি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে– لَا يَعْدِىْ شَىْءٌ شَيْئًا অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো কিছুকে সংক্রমিত করে না।

অনৈক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন– একটি খোস-পাঁচড়াযুক্ত উট এক পাল সুস্থ উটের মধ্যে তাদের সংশ্রবে থাকার পরে দেখা যায় যে, সেগুলোরও খোস-পাঁচড়া হয়। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেন– فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ 'তাহলে প্রথমটিতে কিসে সংক্রমন করল?'

অর্থাৎ প্রথমটির মধ্যে যেমন আল্লাহ তা'আলা নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি দ্বিতীয়টির মধ্যেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর কুষ্ঠরোগী থেকে পালানোর আদেশ হলো খারাপ বিশ্বাস সৃষ্টি

হওয়ার কারণসমূহ দূর করার একটি উপায়। যাতে এমন যেন না হয় যে, এক ব্যক্তি একজন কুষ্ঠরোগী বা এমন কোনো রোগীর সংশ্রবে গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার স্বতন্ত্র ফয়সালা অনুসারে তার সে রোগ হলো, যে সংক্রমণের কথা নাকচ করা হয়েছে, তাতে নয়। কিন্তু সে ধারণা করবে যে, উক্ত রোগীর সংশ্রবে যাবার কারণেই তার এ রোগ হয়েছে। এভাবে সে সংক্রমণে বিশ্বাস করবে, ফলে সে সঙ্কটে পড়বে। সে কারণে আল্লাহর নবী তাকে উক্ত রোগীর সংশ্রব পরিহার করতে বলেছেন, যাতে এ খারাপ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذٰلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِىْ غَيْرِهِ مِنَ الْاَسْبَابِ এ বাক্যে দ্বারা সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসুস্থ ব্যক্তির উঠাবসাকে রোগ সংক্রমণের কারণ স্থির করেছেন। অথচ আমরা অনেক সময় দেখি যে, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তি উঠাবসা ও চলাচল করলেও সে ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না, তাহলে উঠাবসাটা কিভাবে কারণ (سَبَبٌ) হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর সম্মানিত লেখক আলোচ্য ইবারতে প্রদান করেছেন। তিনি এর যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা হলো, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসা হলো سَبَبٌ আর রোগ সংক্রমণ হওয়াটা হলো مُسَبَّبٌ আর মূলনীতি আছে, অনেক সময় سَبَبٌ পাওয়া গেলেও مُسَبَّبٌ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ মূলনীতি অনুসারে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে উঠাবসার পরেও যদি সুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত না হয়, তাহলে এতে প্রশ্ন বা আপত্তির কোনো কারণ নেই।

وَقَدْ صَنَّفَ فِىْ هٰذَا النَّوْعِ الْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ كِتَابَ اِخْتِلَافِ الْحَدِيْثِ لٰكِنَّهٗ لَمْ يَقْصُدْ اِسْتِيْعَابَهٗ وَصَنَّفَ فِيْهِ بَعْدَهٗ اِبْنُ قُتَيْبَةَ وَالطَّحَاوِىُّ وَغَيْرُهُمَا ـ

وَاِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فَلَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يُّعْرَفَ التَّارِيْخُ اَوْ لَا فَاِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَاَخِّرُ بِهٖ اَوْ بِاَصْرَحَ مِنْهُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْاٰخَرُ الْمَنْسُوْخُ ، وَالنَّسْخُ رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَاَخِّرٍ عَنْهُ وَالنَّاسِخُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ الْمَذْكُوْرِ وَتَسْمِيَتُهٗ نَاسِخًا مَجَازًا لِاَنَّ النَّاسِخَ فِى الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বিষয়ে ইখতিলাফুল হাদীস নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন কিন্তু এ সংক্রান্ত সকল হাদীস তাতে উল্লেখ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। অতঃপর ইবনে কুতাইবা, ইমাম ত্বাহাবী (র.) প্রমুখ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যদি দু হাদীসের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে সমন্বয় সাধন না করা যায়, তাহলে দু হাদীসের ইতিহাস জানার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাস কিংবা এর চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা যদি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেরটি চিহ্নিত করা যায়, তাহলে সেটিকে নাসিখ বা রহিতকারী ও অপরটিকে মানসূখ বা রহিত বলে নির্ধারণ করতে হবে।

নসখ বলতে বুঝায় অপেক্ষাকৃত পবরর্তীকালীন শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে পূর্ববর্তীকালের শরয়ী হুকুম রহিত করা। যে দলিলের ভিত্তিতে এরূপ রহিত করা হয়, তাকে বলা হয় নাসিখ বা রহিতকারী। বস্তুত উক্ত দলিলকে নাসিখ বলে আখ্যায়িত করা হয় রূপক অর্থে। কেননা, প্রকৃত নাসিখ হলেন আল্লাহ তা'আলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বন্দ্বমুখর ও বিভিন্নমুখী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি কিতাব লেখেছেন। কিতাবটির নাম- كِتَابُ اِخْتِلَافِ الْحَدِيْثِ ; কিন্তু তিনি এ কিতাবে পরস্পর বিরোধী সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেননি। এর পরে এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কুতাইবা تَاوِيْلُ مُخْتَلَفِ الْحَدِيْثِ এবং ইমাম ত্বাহাবী (র.) شَرْحُ مَعَانِى الْاٰثَارِ নামে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব লেখেছেন।

হাদীসে নাসিখ এবং হাদীসে মানসূখ-এর সংজ্ঞা : পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের মধ্যে যদি সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয়, কিন্তু ইতিহাস বা এর চেয়ে সুস্পষ্ট কোনোভাবে দু হাদীসের একটি আগে ও আরেকটি পরের হওয়া জানা যায়, তাহলে আগেরটিকে বলে মানসূখ আর পরেরটিকে বলে নাসিখ। নাসিখের উপর আমল করতে হয় আর মানসূখটি পরিত্যক্ত হয়।

খুলাসা কিতাবে نَاسِخْ ও مَنْسُوْخْ হাদীসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ-

اَلنَّاسِخُ : كُلُّ حَدِيْثٍ دَلَّ عَلٰى رَفْعِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ سَابِقٍ ـ

অর্থাৎ নাসিখ হলো প্রত্যেক ঐ হাদীস যা পূর্ববর্তী শরয়ী হুকুম উঠিয়ে দেয় তথা বাতিল **করাকে বুঝায়।**

وَالْمَنْسُوْخُ : كُلُّ حَدِيْثٍ رُفِعَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.

অর্থাৎ মানসূখ হলো প্রত্যেক ঐ হাদীস যার হুকুম পরবর্তীতে আগত শরয়ী দলিলের **মাধ্যমে উঠিয়ে** দেওয়া হয়।

نَسْخٌ -এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে نَسْخٌ শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. نَسْخٌ অর্থ– মিটিয়ে দেওয়া, উঠিয়ে দেওয়া, অপসারিত করা। যেমন– বলা হয় : **نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ**। অর্থাৎ সূর্য ছায়াকে মিটিয়ে দিয়েছে বা অপসারিত করেছে।

২. نَسْخٌ অর্থ– পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা, অনুলিপি তৈরি করা। যেমন– বলা হয় : **نسخت الكتاب** অর্থাৎ আমি কিতাবের অনুলিপি তৈরি করেছি। এ অর্থ থেকেই কপিকৃত বই বা অনুলিপিকে **'নুসখা'** বলা হয়।

نَسْخٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : نَسْخٌ -এর দু রকম সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যথা–

১. কেউ কেউ বলেন, نَسْخٌ -এর সংজ্ঞা হলো– **هُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ**
অর্থাৎ কোনো শরয়ী হুকুমকে তার পরবর্তীতে আগত শরয়ী দলিলের মাধ্যমে উঠিয়ে দেওয়া।

২. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) نَسْخٌ -এর সংজ্ঞায় বলেন–

رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.

অর্থাৎ পরবর্তীতে আগত শরয়ী দলিলের মাধ্যমে কোনো (আগের) শরয়ী হুকুমের সম্পর্ক (বান্দা **হতে**) উঠিয়ে দেওয়া।

এখানে প্রভেদ হলো, হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এ সংজ্ঞায় تَعَلُّقٌ শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। **আর তার** কারণ হলো, আল্লাহর ন্যায় আল্লাহর হুকুমও কদীম বা চিরন্তন। আর কদীম কখনো উঠে যায় না; চিরন্তনভাবে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য বান্দার সাথে হুকুমের যে সম্পর্ক তা ছিন্ন হতে পারে। এ **কারণে** তিনি تَعَلُّقٌ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন।

যে দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী হুকুমকে উঠিয়ে দেওয়া হয় তথা বাদ দেওয়া হয়, তাকে نَاسِخٌ (রহিতকারী) বলে। কিন্তু দলিলের দিকে نَسْخٌ -এর এ সম্পর্ক রূপকভাবে। কেননা, প্রকৃত রহিতকারী বা نَاسِخٌ কোনো দলিল হয় না; বরং প্রকৃত نَاسِخٌ হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহর এই রহিত করাটা যেহেতু প্রকাশ পায় দলিলের মাধ্যমে, তাই দলিলের দিকে রূপকভাবে نَسْخٌ -এর সম্পর্ক দিয়ে বলা হয় যে, পরবর্তী দলিলটা হলো نَاسِخٌ।

وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُوْرٍ اَصْرَحُهَا مَا وَرَدَ فِى النَّصِّ كَحَدِيْثِ بُرَيْدَةَ فِى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ" وَمِنْهَا مَا يَجْزَمُ الصَّحَابِىُّ بِاَنَّهُ مُتَاَخِّرٌ كَقَوْلِ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، اَخْرَجَهُ اَصْحَابُ السُّنَنِ وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيْخِ وَهُوَ كَثِيْرٌ ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيْهِ الصَّحَابِىُّ الْمُتَاَخِّرُ الْاِسْلَامِ مُعَارِضًا لِلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ لِاِحْتِمَالِ اَنْ يَّكُوْنَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِىٍّ اٰخَرَ اَقْدَمَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ الْمَذْكُوْرِ اَوْ مِثْلَهُ فَاَرْسَلَهُ لٰكِنْ اِنْ وَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِسَمَاعِهٖ لَهُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَيَتَّجِهُ اَنْ يَّكُوْنَ نَاسِخًا بِشَرْطِ اَنْ يَّكُوْنَ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَبْلَ اِسْلَامِهٖ ـ

অনুবাদ : নসখ হওয়াটা জানা যায় কয়েক উপায়ে। সবচেয়ে সুস্পষ্ট হলো, যদি খোদ হাদীসেই সে কথা উল্লেখ থাকে। যেমন– মুসলিম শরীফে হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জেয়ারত করতে পার। কেননা, তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় উপায় হলো, কোনো সাহাবী যদি জোর দিয়ে বলেন যে, এটিই সর্বশেষ বিধান। যেমন– হযরত জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সর্বশেষ রীতি ছিল আগুনে স্পর্শ করা (রান্না করা) বস্তু খাওয়ার পর অজু না করা। নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফে হাদীসটি সংকলিত হয়েছে।

নসখ সাব্যস্ত করার তৃতীয় উপায় হলো ইতিহাস। এর নজির প্রচুর রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী কোনো সাহাবী যদি পূর্ববর্তী কালে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে তা দ্বারা নসখ সাব্যস্ত হয় না। কেননা, হতে পারে যে, পরবর্তীকালের সাহাবী অপর এমন এক সাহাবী থেকে এটি শুনেছেন যিনি আরো প্রবীণ অথবা সমসাময়িক ; কিন্তু তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য যদি তিনি মহানবী ﷺ থেকে শুনেছেন বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন, তাহলে সেটি নাসিখ হবার যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মহানবী ﷺ থেকে কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছেন– এমনটি না হওয়া চাই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নসখ জানার পদ্ধতি : নসখ কয়েকটি পদ্ধতিতে জানা যেতে পারে।

১. সবচেয়ে সুস্পষ্ট পদ্ধতি হলো, নসের মধ্যে নসখের কথা বর্ণিত থাকা অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নিজেই বলে দেবেন যে, কোন হুকুমটি মানসূখ। যেমন– সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.) -এর হাদীস। হাদীসটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا
এখানে নবী করীম ﷺ -এর উক্তি فَزُوْرُوْهَا -এর দ্বারা জানা গেছে যে, কবর জেয়ারতের নিষেধাজ্ঞাটা মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে।

২. সাহাবী কোনো হুকুমের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলবেন যে, এটা সর্বশেষ নির্দেশ। তাহলে এমন বলার দ্বারা পূর্ববর্তী হুকুম মানসূখ হয়ে যাবে। যেমন, হযরত জাবির (রা.)-এর উক্তি–
كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ.
সুতরাং রান্না করা খানা খাওয়ার পরে অজু করার পূর্ববর্তী নির্দেশ হযরত জাবির (রা.) -এর এ উক্তি দ্বারা মানসূখ হয়েছে।

৩. ইতিহাস তথা সন-তারিখের দ্বারা যদি জানা যায় যে, কোন হুকুমটি আগের আর কোন হুকুমটি পরের, তাহলে পরের (শেষের) হুকুমের দ্বারা আগের হুকুমটি মানসূখ হয়ে যাবে। যেমন– শাদ্দাদ ইবনে আওয়াস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে– اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ
অর্থাৎ যে শিঙ্গা লাগায় আর যাকে লাগায় উভয়ের রোজা ভেঙ্গে যায়।
অপর দিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে–
اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।
এ হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসটির মাধ্যমে প্রথম হাদীসটি মানসূখ। কারণ, সন-তারিখ দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম হাদীসটি অষ্টম হিজরির, আর দ্বিতীয় হাদীসটি দশম হিজরির। অতএব প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসটির দ্বারা মানসূখ হবে।

৪. পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস যদি পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর বিরোধী হয়, তাহলে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী যখন স্পষ্ট ভাষায় বলবেন যে, তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস শুনেছেন, তখন তার হাদীসের মাধ্যমে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস মানসূখ হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও শর্ত হলো, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস শুনবেন না।
শুধু ইসলাম গ্রহণের অগ্র-পশ্চাতের কারণে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীসের দ্বারা মানসূখ হবে না। কারণ, হতে পারে, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী এ হাদীসটি এমন সাহাবী থেকে শুনে থাকবেন যিনি পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী অপেক্ষা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী অথবা সমসাময়িক। কিন্তু তিনি তার নাম উল্লেখ না করে মুরসালভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

৫. নসখ জানার উপরিউক্ত চার পদ্ধতি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উল্লেখ করেছেন। এ চার পদ্ধতি ছাড়াও পঞ্চম আরেকটি পদ্ধতিও রয়েছে। তা হলো, পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের মধ্যে উম্মত যদি একটি হাদীসের উপর আমল করে আর অপরটির উপর আমল ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের এ ছাড়াটাই উক্ত হাদীস মানসূখ হওয়ার দলিল।

وَاَمَّا الْاِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ بَلْ يَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيْخُ فَلَا يَخْلُوْ اِمَّا اَنْ يُّمْكِنَ تَرْجِيْحُ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِ التَّرْجِيْحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتَنِ اَوْ بِالْاِسْنَادِ اَوْ لَا فَاِنْ اَمْكَنَ التَّرْجِيْحُ تَعَيَّنَ الْمَصِيْرُ اِلَيْهِ وَاِلَّا فَلَا . فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلٰى هٰذَا التَّرْتِيْبِ الْجَمْعُ اِنْ اَمْكَنَ فَاعْتِبَارُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ فَالتَّرْجِيْحُ اِنْ تَعَيَّنَ ثُمَّ التَّوَقُّفُ عَنِ الْعَمَلِ بِاَحَدِ الْحَدِيْثَيْنِ وَالتَّعْبِيْرُ بِالتَّوَقُّفِ اَوْلٰى مِنَ التَّعْبِيْرِ بِالتَّسَاقُطِ لِاَنَّ خِفَاءَ تَرْجِيْحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ اِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ فِى الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ مَعَ اِحْتِمَالِ اَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِىَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ : ইজমা মৌলিকভাবে নাসিখ হতে পারে না, তবে নাসিখ হয়েছে বলে ইঙ্গিত করতে পারে। আর যদি ইতিহাস জানা না যায়, তাহলে এর থেকে খালি হবে না যে, হয়তো সনদ কিংবা মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী বিষয়াদির মধ্য থেকে কোনো একটির দ্বারা কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার দিকে ফেরাটাই অর্থাৎ প্রাধান্য দেওয়াটাই সুনির্দিষ্ট হবে। আর যদি প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তা সুনির্দিষ্ট হবে না অর্থাৎ প্রাধান্য দেওয়া হবে না।

সুতরাং যে (দুই) হাদীসের বাহ্যিকটা বিরোধপূর্ণ তা এই পর্যায়ক্রমে পতিত হবে। (অর্থাৎ প্রথমে) সম্ভব হলে সমন্বয় সাধন করতে হবে। (এটা সম্ভব না হলে) অতঃপর নাসিখ-মানসূখ (-এর নিয়ম) গ্রহণ করতে হবে। (এটাও সম্ভব না হলে) প্রাধান্য দিতে হবে, যদি তা সুনির্দিষ্ট হয়। (আর যদি প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব না হয়, তাহলে) অতঃপর উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবে।

'পতিত হবে' বলার থেকে 'স্থগিত হবে' কথাটি বেশি উত্তম। কেননা, দুটি হাদীসের মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দানের বিষয় গোপন হওয়াটা বর্তমান অবস্থায় (সনদ) অনুসন্ধানকারীর বিবেচনায় হয়েছে। অথচ এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, যে বিষয়টি তার গোপন রয়েছে তা অন্যের কাছে (কিংবা তারই কাছে পরে) প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইজমা নাসিখ নয় : ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে কোনো হাদীস অথবা কোনো শরয়ী হুকুম মানসূখ হয় না; তবে ইজমা এমন দলিল বিদ্যমান হওয়ার প্রতি প্রমাণ হতে পারে, যে দলিল কোনো হুকুমের জন্য নাসিখ হয়।

ইজমায়ে উম্মত দ্বারা হাদীস বা শরয়ী হুকুম নসখ না হওয়ার কারণ দুটি।

১. **ইজমায়ে** উম্মতের এমন শক্তি নেই যে, তা হাদীস বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের থেকে প্রমাণিত হুকুমকে নসখ করবে।

২. দ্বিতীয়ত কথা হলো, ইজমা সংঘটিত হওয়ার সময়কাল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর। এ দিকে নসখের সম্ভাবনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে বাকি থাকে না। যার ফলে ইজমা নাসিখ হতে পারবে না। অবশ্য ইজমাটা নসখের উপর দলিল হতে পারে। যেমন- চতুর্থ বারের মতো মদপানকারীকে হত্যার বিষয়টি। যদি কোনো মদপানকারী চুতর্থ বারও মদ পান করে, তাহলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীসে তার শাস্তি কতলের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটি মানসূখ। এর দলিল হলো, এ হাদীসের উপর আমল করা তরক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। সুতরাং এখানে ইজমা নাসিখ হলো না; বরং যে দলিল দ্বারা নসখ হয়েছে তার উপর প্রমাণ হলো। আর সে দলিল হলো, হাদীসের উপর আমল তরক করা।

মোটকথা, নস, সাহাবীর জোরালো দাবি, ইতিহাস (সন-তারিখ) এবং শর্ত সাপেক্ষে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস নসখ জানার উপায়। ইজমা এবং যে কোনো পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীর হাদীস নাসিখ নয়।

مَرْجُوْح ও رَاجِح -এর সংজ্ঞা : পরপস্প বিরোধপূর্ণ দুটি হাদীস যদি এমন হয় যে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় না, নাসিখ-মানসূখ করা যায় না, তবে মতন বা সনদ সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য দানকারী বিষয় দ্বারা কোনো একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়, তাহলে যে হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাকে বলে رَاجِح, আর অপর হাদীসকে বলে مَرْجُوْح। উদাহরণস্বরূপ মনে করি একটি হাদীসের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় আর অপর হাদীস দ্বারা হালাল সাব্যস্ত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় 'হারাম হওয়ার' হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। সেটি হবে رَاجِح আর হালাল সাব্যস্তকারী হাদীসটি হবে مَرْجُوْح।

আরবিতে اَلْحَدِيْثُ الرَّاجِحُ -এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ الْمُتَعَارِضُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ رُجِّحَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِ التَّرْجِيْحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتْنِ اَوْ بِالْاِسْنَادِ -

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবূল অপর কোনো হাদীসে মাকবূলের مُتَعَارِضْ, কিন্তু সনদ কিংবা মতনের সাথে সম্পর্কযুক্ত وَجْهُ تَرْجِيْح -এর কোনো وَجْه -এর ভিত্তিতে তাকে تَرْجِيْح দেওয়া হয়, এমন হাদীসকে اَلْحَدِيْثُ الرَّاجِحُ বলে।

আরবিতে اَلْحَدِيْثُ الْمَرْجُوْحُ -এর সংজ্ঞা এভাবে-

هُوَ الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ الْمُتَعَارِضُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يُرَجَّحْهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِ التَّرْجِيْحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتْنِ اَوْ بِالْاِسْنَادِ -

অর্থাৎ যে হাদীসে মাকবূল অপর কোনো হাদীসে মাকবূলের مُتَعَارِضْ এবং তাকে কোনোভাবেই تَرْجِيْح দেওয়া হয়নি।

وُجُوْهُ تَرْجِيْح -এর বিবরণ : وُجُوْهُ تَرْجِيْح দুভাবে হতে পারে। ১. سَنَدًا ২. مَتْنًا । নিম্নে উভয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. মতন সংশ্লিষ্ট وُجُوْهُ تَرْجِيْح : এটা একাধিক হতে পারে। যথা-

ক. একটি হাদীস مُثْبِتْ আর অপর হাদীস مَنْفِىْ, এমতাবস্থায় اَلْمُثْبِتُ اَوْلٰى مِنَ النَّافِىْ মূলনীতি অনুযায়ী مُثْبِتْ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

খ. একটি হাদীস مُحَرِّمْ (হারাম সাব্যস্তকারী) আর অপরটি مُبِيْح (বৈধ সাব্যস্তকারী), তাহলে এমতাবস্থায় مُحَرِّمْ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

২. সনদ সংশ্লিষ্ট وُجُوْهُ تَرْجِيْحٍ : এটাও কয়েকটি হতে পারে। যথা–

ক. একটি হাদীসের সনদ সহীহ (صَحِيْحٌ) আর অপরটি اَصَحُّ , তাহলে اَصَحُّ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে

খ. একটি হাদীস এক সনদে বর্ণিত আর অপর হাদীসটি কয়েক সনদে বর্ণিত, তাহলে কয়েক সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

গ. একটি হাদীসের সনদ দুর্বল (ضَعِيْفٌ) আর অপর হাদীসের সনদ صَحِيْحٌ , তাহলে সহীহ সনদবিশিষ্ট হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

ঘ. একটি হাদীস مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) আর অপরটি غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ , তাহলে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে।

মতন ও সনদ সংশ্লিষ্ট وُجُوْهُ تَرْجِيْحٍ অনেক। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো মাত্র।

مُتَوَقَّفٌ فِيْهِ বা স্থগিত হাদীসের সংজ্ঞা ও হুকুম : যে হাদীসের বিরোধ সমন্বয় সাধন, রহিতকরণ, প্রাধান্য দান– কোনোভাবেই দূর করা সম্ভব হয় না, তাকে বলা হয় مُتَوَقَّفٌ فِيْهِ বা স্থগিত হাদীস। এ হাদীসের হুকুম হলো, বিরোধ দূর না হওয়া পর্যন্ত উভয় হাদীসের উপর আমল স্থগিত থাকবে। তার উপর আমল স্থগিত হয়ে যাবার কারণে তাকে مُتَوَقَّفٌ فِيْهِ বা স্থগিত হাদীস বলে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : وَالتَّعْبِيْرُ بِالتَّوَقُّفِ اَوْلٰى مِنَ التَّعْبِيْرِ بِالتَّسَاقُطِ এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, مُتَوَقَّفٌ فِيْهِ তথা স্থগিত হাদীসের উপর যখন আমল হয় না; বরং তা আমল থেকে বাদ যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে تَوَقُّفٌ (স্থগিত) শব্দ ব্যবহার করার কি অর্থ? এর চেয়ে تَسَاقُطٌ (বাদ যায়) শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হতো না?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, تَسَاقُطٌ শব্দের চেয়ে تَوَقُّفٌ শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। এ উত্তমতার কারণ দুটি। যথা–

১. হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে কোনো মুহাদ্দিস হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ কোনো পন্থায় দূর করে স্থগিত হাদীসের উপর আমল করার সুযোগ করে দিবেন। কেননা, আয়াতে আছে– وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছে। আর তখন হাদীসটি আমল থেকে বাদ পড়বে না; বরং স্থগিতাদেশ উঠে গিয়ে আমলযোগ্য হবে। এজন্য تَسَاقُطٌ বলার চেয়ে تَوَقُّفٌ বলাটাই অধিক কার্যকর। কেননা, تَسَاقُطٌ বললে বুঝা যেত কোনো সময় হাদীস দুটি আর আমলযোগ্য হবে না।

২. হাদীসের ব্যাপারে تَسَاقُطٌ (বাদ যাওয়া) শব্দ ব্যবহার করা একপ্রকার বেআদবিও বটে। এজন্য تَسَاقُطٌ -এর চেয়ে تَوَقُّفٌ শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম।

পরস্পর বিরোধী হাদীসের সারকথা : দুটি হাদীসের মধ্যে দৃশ্যত বিরোধিতা থাকলে প্রথমে সমন্বয় সাধন, অতঃপর নসখ, অতঃপর অগ্রাধিকার প্রদান– এ নিয়মে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ তিনটির কোনোটি না করা গেলে উভয় হাদীসকে মুলতুবি রাখতে হবে।

এটা হলো শাফেয়ী মাযহাবের নীতি। হানাফীদের মতে এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, সর্বপ্রথম নসখ, অতঃপর অগ্রাধিকার প্রদান, অতঃপর সমন্বয় সাধন। এ তিনটির কোনোটি না করা গেলে উভয় হাদীসকে স্থগিত রাখতে হবে।

ثُمَّ الْمَرْدُوْدُ وَمُوْجَبُ الرَّدِّ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِسَقْطٍ مِنْ اِسْنَادٍ اَوْ طَعْنٍ فِىْ رَاوٍ عَلٰى اِخْتِلَافٍ وُجُوْهِ الطَّعْنِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لِاَمْرٍ يَرْجِعُ اِلٰى دِيَانَةِ الرَّاوِىْ اَوْ اِلٰى ضَبْطِهٖ فَالسَّقْطُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ مَبَادِىْ السَّنَدِ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ اَوْ مِنْ اٰخِرِهٖ اَىْ اَلْاِسْنَادِ بَعْدَ التَّابِعِىِّ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ فَالْاَوَّلُ الْمُعَلَّقُ سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا اَمْ اَكْثَرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْضَلِ الْاٰتِىْ ذِكْرُ عُمُوْمٍ وَخُصُوْصٍ مِنْ وَجْهٍ ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيْفِ الْمُعْضَلِ بِاَنَّهٗ سَقَطَ مِنْهُ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ الْمُعَلَّقِ وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيْدِ الْمُعَلَّقِ بِاَنَّهٗ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُصَنِّفِ مِنْ مَبَادِىْ السَّنَدِ يَفْتَرِقُ عَنْهُ اِذْ هُوَ اَعَمُّ مِنْ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : অতঃপর মারদূদ। হাদীস রদ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ হয়তো সেটা হবে সনদ থেকে রাবীর পড়ে যাবার কারণে অথবা অভিযোগের বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে রাবীর ব্যাপারে অভিযোগের কারণে। চাই সে বিভিন্ন কারণ রাবীর দীনদারি সম্পর্কিত হোক কিংবা আয়ত্তশক্তি সম্পর্কিত হোক। রাবী বাদ পড়তে পারে সনদের শুরু থেকে লেখকের পক্ষে অথবা সনদের শেষভাগ থেকে তাবেয়ীর পরে। অথবা অন্যস্থান (মাঝখান) থেকে। প্রথমটি হলো মু'আল্লাক। চাই পতিত রাবী একজন হোক কিংবা একাধিক। মু'আল্লাক এবং মু'যালের (যার বিবরণ সামনে আসবে) মাঝে উমূম খুসূস মিন ওয়াজহিন-এর সম্পর্ক রয়েছে।

যে হাদীসের সনদ থেকে দুজন বা দুয়ের অধিক রাবী বাদ পড়েছে– মু'দালের এ সংজ্ঞার সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মু'আল্লাকের মিল রয়েছে। কিন্তু মু'আল্লাক হতে হলে 'সনদের শুরু থেকে লেখকের পক্ষে বাদ পড়তে হবে'– এ শর্তের দিক দিয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, মু'দাল এ ক্ষেত্রে ব্যাপক। তাতে সনদের শুরু থেকেও হতে পারে, মাঝখান কিংবা শেষভাগ থেকেও হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবীর সিফাতের দিক দিয়ে خَبَرْ وَاحِدْ দু প্রকার ছিল। ১. خَبَرْ مَقْبُوْل ও ২. خَبَرْ مَرْدُوْد । ইতঃপূর্বে خَبَرْ مَقْبُوْل -এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে خَبَرْ مَرْدُوْد -এর আলোচনা শুরু হচ্ছে।

مُوْجِبْ শব্দের বিশ্লেষণ : مُوْجِبْ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা–

১. اَلْاِيْجَابُ তথা بَابُ اِفْعَالٌ হতে اِسْمُ فَاعِلْ -এর সীগাহ। তখন مُوْجِبُ الرَّدِّ -এর অর্থ হবে– রদ সাব্যস্তকারী বিষয়।

২. بَابُ اِفْعَالٌ থেকেই اِسْمُ مَفْعُوْل -এর সীগাহ। مُكْرَمٌ -এর ওযনে। তখন مُوْجَبُ الرَّدِّ -এর অর্থ হবে– যার রদ সাবেত করা হয়েছে।

৩. মাসদারে মীম হিসেবে মীম বর্ণে যবর যোগে। তখন مُوْجَبُ الرَّدِّ -এর অর্থ হবে– ওয়াজিব করা। আর রদ ওয়াজিব করার বিষয় হলো দুটি।

১. سُقُوْطُ رَاوِىْ তথা সনদ থেকে এক বা একাধিক রাবীর পতন হওয়া বা পড়ে যাওয়া।

২. طَعْنُ رَاوِىْ তথা কোনো রাবী দোষী ও অভিযুক্ত হওয়া। চাই এই দোষ তার দীনদারি সংক্রান্ত হোক, চাই আয়ত্তশক্তি সংক্রান্ত হোক, অথবা আয়ত্তশক্তি ও স্মরণশক্তি সংক্রান্ত হোক।

হাদীস মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মর্মার্থ : হাদীস মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হাদীসটি সত্তাগতভাবে পরিত্যাজ্য। কোনো হাদীস একবার হাদীস হিসেবে সাবেত হয়ে গেলে তা রদ

করার অধিকার কারো নেই; বরং তা গ্রহণ করে নেওয়া ওয়াজিব। তবে হাদীস মারদূদ হওয়ার মর্মার্থ **হলো**, অনিবার্য কোনো কারণে হাদীসটি আমল ও দলিলের অযোগ্য হওয়া।

খবরে মারদূদ ও খবরে মাকবূলের غَيْرُ مَعْمُوْل হাদীসের মধ্যে পার্থক্য : আর তা হলো, যে হাদীস মাকবূল কিন্তু غَيْرُ مَعْمُوْل তথা আমলযোগ্য নয় তার মধ্যে এই সন্দেহ থাকে না যে, হাদীসটি সহীহ কিনা; বরং তার সত্য ও সহীহ হওয়াটা নিশ্চিত হয়। অবশ্য অনিবার্য কোনো কারণে তদনুযায়ী আমল করা যায় না। এর বিপরীতে খবরে মারদূদের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। যার কারণে খবরে মারদূদ বিলকুল অগ্রহণযোগ্য এবং দলিল ও আমলের অনুপযুক্ত। আর خَبَرْ مَقْبُوْل غَيْرُ مَعْمُوْل بِهٖ টা আমলের যোগ্য, কিন্তু অনিবার্য কারণে বর্তমানে তার উপর আমল করা হয় না।

রাবীর পতনের দিক দিয়ে خَبَرْ مَرْدُوْد -এর প্রকরণ : خَبَرْ مَرْدُوْد -এর বিভক্তি দুই দিক থেকে হয়। ১. রাবীর পতনের দিক দিয়ে। ২. রাবীর অভিযুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে। রাবীর পতনের দিক দিয়ে খবরে মারদূদ চার প্রকার। ১. مُعَلَّقْ (মু'আল্লাক), ২. مُرْسَلْ (মুরসাল), ৩. مُعْضَلْ (মু'যাল) ও ৪. مُنْقَطِعْ (মুনকাতি')।

রাবীর পতনের দিক দিয়ে খবরে মারদূদ চার প্রকারে সীমিত হওয়ার কারণ : সনদ থেকে রাবীর পড়ে যাওয়াটা হয়তো সনদের শুরু দিক অর্থাৎ লেখকের দিক থেকে লেখকের ইচ্ছায় ঘটবে অথবা সনদের শেষ থেকে তাবেয়ীর পরে হবে অথবা অন্য কোথাও হতে অর্থাৎ মাঝখান হতে হবে। সনদের শুরু থেকে রাবীর পতন হলে তাকে বলে مُعَلَّقْ , আর সনদের শেষ থেকে রাবীর পতন হলে তাকে বলে مُرْسَلْ , আর যদি রাবীর পতনটা সনদের মাঝখান থেকে হয় তা আবার দু প্রকার। হয়তো রাবী মাঝখান থেকে পরপর দুজন পড়বে অথবা পরপর দুজন পড়বে না। যদি রাবী সনদের মাঝখান হতে পরপর দুজন পড়ে, তাহলে তাকে مُعْضَلْ বলে। আর পরপর দুজন না হলে তাকে বলে مُنْقَطِعْ ।

প্রসঙ্গ مُعَلَّقْ (মু'আল্লাক) : مُعَلَّقْ বিষয়ে ৪ টি আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। ১. مُعَلَّقْ -এর অর্থ, ২. مُعَلَّقْ ও مُعْضَلْ -এর মধ্যকার পার্থক্য, ৩. مُعَلَّقْ -এর ধরনসমূহ ও ৪. حَدِيْث مُعَلَّقْ -এর হুকুম। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

مُعَلَّقْ -এর সংজ্ঞা : مُعَلَّقْ ঐ হাদীসকে বলে যার সনদের শুরু থেকে লেখকের ইচ্ছায় এক বা একাধিক রাবী পড়ে যায়। চাই এ পতনটা একই স্থান থেকে হোক কিংবা বিভিন্ন স্থান থেকে। সনদের শুরু থেকে হওয়ার সাথে সাথে মাঝখান বা শেষ থেকেও হোক বা না হোক। সনদের শুরু থেকে লেখকের ইচ্ছায় এক বা একাধিক রাবী পড়ে যাওয়ার নাম তা'লীক (تَعْلِيْق)। এর বহুবচন হলো تَعْلِيْقَاتْ। আরবিতে حَدِيْث مُعَلَّقْ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ سَقَطَ مِنْ مَبْدَأِ سَنَدِهٖ رَاوٍ فَاَكْثَرَ وَلَوْ إِلٰى اٰخِرِ السَّنَدِ۔

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবীকে বাদ দেওয়া হয় সেই হাদীসকে اَلْحَدِيْثُ الْمُعَلَّقْ বলে।

মিশকাত শরীফের হাদীস কি مُعَلَّقْ ? মিশকাত শরীফের হাদীসে শুধুমাত্র সাহাবী বা তাবেয়ীর নাম আছে, বাকি রাবীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু বাহ্যত এটা সনদের শুরু থেকে রাবীর পতন– তাই এটাকে কেউ مُعَلَّقْ-এর সংজ্ঞা অনুসারে مُعَلَّقْ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু বাস্তব কথা হলো, **মিশকাত** শরীফের হাদীসগুলো مُعَلَّقْ নয়; বরং এ হাদীসগুলো যে কুতুবে সিত্তাহ বা হাদীসের অন্যান্য **গ্রন্থ হতে** সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে পুরো সনদ বিদ্যমান আছে। মিশকাত শরীফের লেখক যেহেতু হাদীসগুলোকে সনদ থেকে আলাদা করে বর্ণনা করেছেন, পরিভাষায় যার নাম তাজরীদ, তাই মিশকাত **শরীফের হাদীসকে** مُجَرَّدَاتْ বলা হবে।

وَمِنْ صُوَرِ الْمُعَلَّقِ اَنْ يُّحْذَفَ جَمِيْعُ السَّنَدِ وَيُقَالُ مَثَلًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا اَنْ يُّحْذَفَ اِلَّا الصَّحَابِيَّ اَوْ اِلَّا التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ مَعًا وَمِنْهَا اَنْ يُّحْذَفَ مِنْ حَدَّثَهٗ وَيُضِيْفُهٗ اِلٰى مَنْ فَوْقَهٗ فَاِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهٗ شَيْخًا لِذٰلِكَ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيْهِ هَلْ يُسَمّٰى تَعْلِيْقًا اَوْ لَا وَالصَّحِيْحُ فِىْ هٰذَا التَّفْصِيْلِ فَاِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ اَوِ الْاِسْتِقْرَاءِ اَنَّ فَاعِلَ ذٰلِكَ مُدَلِّسٌ قُضِىَ بِهٖ وَاِلَّا فَتَعْلِيْقٌ۔

অনুবাদ : মু'আল্লাকের অন্যতম ধরন হলো পুরো সনদ উহ্য রাখা এবং এরূপ বলা যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন। দ্বিতীয় প্রকার : সাহাবী কিংবা তাবেয়ী ও সাহাবী ব্যতীত পুরো সনদ উহ্য রাখা। তৃতীয় প্রকার : যিনি লেখকের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার নাম উহ্য রেখে তার উপরের ব্যক্তির সাথে সেটিকে সম্পৃক্ত করা। যদি সেই উপরস্থ ব্যক্তি লেখকের শায়খ বা শিক্ষক হন, তাহলে সেটিকে তা'লীক নামে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ হত হলো, এ বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি বর্ণনা কিংবা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, যিনি এটি করেছেন তিনি একজন মুদাল্লিস, তাহলে সেই ফয়সালা করতে হবে। নইলে সেটি তা'লীক হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَلَّقْ-এর ধরনসমূহ : مُعَلَّقْ-এর সুরত বা ধরন ৫টি। যথা–

১. হাদীসের পুরো সনদ ফেলে দেওয়া। যেমন– এভাবে বলা– ... قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ। তবে এ সুরতে **مُرْسَلْ ، مُعْضَلْ** এবং **مُنْقَطِعْ** ও **مُعَلَّقْ**-এর অধীনে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।
২. সাহাবী ব্যতীত বাকি সব সনদ ফেলে দেওয়া।
৩. সাহাবী এবং তাবেয়ী ছাড়া বাকি সব সনদ ফেলে দেওয়া।
৪. যে রাবী (মুহাদ্দিস) থেকে হাদীস শুনেছে তাকে বাদ দিয়ে তার উপরের রাবীর দিকে ঐ হাদীসের সম্পর্ক দেওয়া। এটিও তা'লীক। অবশ্য উপরের যে রাবীর দিকে সম্পর্ক দিল তিনিও যদি সম্পর্ক দানকারীর ওস্তাদ হন, তাহলে এমতাবস্থায় এটি **تَعْلِيْقْ** হবে কিনা– এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–
   ক. কারো মতে এটা তা'লীক হবে।
   খ. কারো কারো মতে এটা তা'লীক নয়; বরং তাদলীস।
   গ. তবে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এটা নির্বিচারে তা'লীকও হবে না আবার তাদলীসও হবে না; বরং তার হুকুমটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর তা হলো এই যে, যদি আইম্মায়ে হাদীস স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন অথবা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, সম্পর্ক দানকারী রাবী তাদলীসে অভ্যস্ত, তাহলে তখন সেটা তাদলীসই হবে। আর যদি রাবীর ব্যাপারে এমনটি জানা না যায়, তাহলে তা তা'লীক হবে। তবে উপরের রাবী যদি ওস্তাদ না হয়, তাহলে হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে মু'আল্লাক হবে।
৫. **مُعَلَّقْ**-এর আরেকটি সুরত হলো, সনদের শুরু থেকে কয়েকজন রাবী পড়ে যাবে।

وَمِنْ صُوَرِ الْمُعَلَّقِ اَنْ يُّحْذَفَ جَمِيْعُ السَّنَدِ وَيُقَالُ مَثَلًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا اَنْ يُّحْذَفَ اِلَّا الصَّحَابِيَّ اَوْ اِلَّا التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ مَعًا وَمِنْهَا اَنْ يُّحْذَفَ مِنْ حَدَّثَهٗ وَيُضِيْفُهٗ اِلٰى مَنْ فَوْقَهٗ فَاِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهٗ شَيْخًا لِذٰلِكَ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيْهِ هَلْ يُسَمّٰى تَعْلِيْقًا اَوْ لَا وَالصَّحِيْحُ فِىْ هٰذَا التَّفْصِيْلِ فَاِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ اَوِ الْاِسْتِقْرَاءِ اَنَّ فَاعِلَ ذٰلِكَ مُدَلِّسٌ قُضِىَ بِهٖ وَاِلَّا فَتَعْلِيْقٌ ـ

অনুবাদ : মু'আল্লাকের অন্যতম ধরন হলো পুরো সনদ উহ্য রাখা এবং এরূপ **বলা যে, নবী** করীম ﷺ বলেছেন। দ্বিতীয় প্রকার : সাহাবী কিংবা তাবেয়ী ও সাহাবী ব্যতীত পুরো **সনদ উহ্য রাখা।** তৃতীয় প্রকার : যিনি লেখকের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার নাম উহ্য রেখে তার **উপরের** ব্যক্তির সাথে সেটিকে সম্পৃক্ত করা। যদি সেই উপরস্থ ব্যক্তি লেখকের শায়খ বা শিক্ষক হন, **তাহলে** সেটিকে তা'লীক নামে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে **বিশুদ্ধ মত** হলো, এ বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যদি বর্ণনা কিংবা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, যিনি **এটি** করেছেন তিনি একজন মুদাল্লিস, তাহলে সেই ফয়সালা করতে হবে। নইলে সেটি তা'লীক হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَلَّقْ -এর ধরনসমূহ : مُعَلَّقْ -এর সুরত বা ধরন ৫টি। যথা–

১. হাদীসের পুরো সনদ ফেলে দেওয়া। যেমন– এভাবে বলা– ... قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ । তবে এ সুরতে مُعَلَّقْ ও مُنْقَطِعْ এবং مُعْضَلْ ، مُرْسَلْ -এর অধীনে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

২. সাহাবী ব্যতীত বাকি সব সনদ ফেলে দেওয়া।

৩. সাহাবী এবং তাবেয়ী ছাড়া বাকি সব সনদ ফেলে দেওয়া।

৪. যে রাবী (মুহাদ্দিস) থেকে হাদীস শুনেছে তাকে বাদ দিয়ে তার উপরের রাবীর দিকে ঐ হাদীসের সম্পর্ক দেওয়া। এটিও তা'লীক। অবশ্য উপরের যে রাবীর দিকে সম্পর্ক দিল তিনিও যদি সম্পর্ক দানকারীর ওস্তাদ হন, তাহলে এমতাবস্থায় এটি تَعْلِيْق হবে কিনা– এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–

ক. কারো মতে এটা তা'লীক হবে।

খ. কারো কারো মতে এটা তা'লীক নয়; বরং তাদলীস।

গ. তবে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এটা নির্বিচারে তা'লীকও হবে না আবার তাদলীসও হবে না; **বরং** তার হুকুমটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আর তা হলো এই যে, যদি আইম্মায়ে হাদীস স্পষ্টভাবে **বর্ণনা** করেন অথবা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, সম্পর্ক দানকারী রাবী তাদলীসে **অভ্যস্ত,** তাহলে তখন সেটা তাদলীসই হবে। আর যদি রাবীর ব্যাপারে এমনটি জানা না যায়, **তাহলে** তা তা'লীক হবে। তবে উপরের রাবী যদি ওস্তাদ না হয়, তাহলে হাদীস **সর্বসম্মতিক্রমে** মু'আল্লাক হবে।

مُعَلَّقْ -এর আরেকটি সুরত হলো, সনদের শুরু থেকে কয়েকজন রাবী পড়ে যাবে।

وَاِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيْقُ فِى قِسْمِ الْمَرْدُوْدِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوْفِ وَقَدْ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ اِنْ عُرِفَ بِاَنْ يَجِىْءَ مُسَمًّى مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ فَاِنْ قَالَ جَمِيْعُ مَنْ اَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ جَاءَتْ مَسْاَلَةُ التَّعْدِيْلِ عَلَى الْاِبْهَامِ وَعِنْدَ الْجَمْهُوْرِ لَا يُقْبَلُ حَتّٰى يُسَمّٰى لٰكِنْ قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ هُنَا اِنْ وَقَعَ الْحَذْفُ فِى كِتَابٍ اُلْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فَمَا اَتٰى فِيْهِ بِالْجَزْمِ دَلَّ عَلٰى اَنَّهُ ثَبَتَ اِسْنَادُهُ عِنْدَهُ وَاِنَّمَا حَذَفَ لِغَرْضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ وَمَا اَتٰى فِيْهِ بِغَيْرِ الْجَزْمِ فَفِيْهِ مَقَالٌ وَقَدْ اَوْضَحْتُ اَمْثِلَةَ ذٰلِكَ فِى النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ ـ

অনুবাদ : তা'লীককে মারদূদ হাদীসের অন্যতম প্রকার হিসেবে উল্লেখ করার কারণ হলো, উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। আর কোনো রাবীর পরিচয় অজ্ঞাত থাকা হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ক্ষতিকর।

মু'আল্লাক হাদীস যদি অপর কোনো এমন সনদে বর্ণিত পাওয়া যায় যেখানে উহ্য রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তখন সেটিকে সহীহ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

কোনো ব্যক্তি যদি বলেন, "আমি যাদের নাম উহ্য রাখি তারা সবাই নির্ভরযোগ্য", তাহলে সেটি হলো তা'দীলে মুবহাম বা অস্পষ্ট প্রত্যয়ন প্রসঙ্গ। অধিকাংশের মতে উক্ত উহ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত সে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই ইবনুস সালাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "যে কিতাবে একমাত্র সহীহ হাদীস গ্রহণকে বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে পালন করা হয়েছে, যেমন– বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, তাতে যদি কোনো হাদীসের রাবীকে উহ্য রাখা হয়, তাহলে যেটিকে জোরালো ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির সনদ তাঁর নিকট রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। তিনি হয়তো কোনো কারণবশত তা উহ্য রেখেছেন। আর যেটিকে তিনি তেমন জোরালো ভাষায় উল্লেখ করেননি, সেটির ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে।" আমি 'আন-নুকাতু আলা ইবনিস সালাহ' কিতাবে এর উদাহরণসমূহ ব্যাখ্যা করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : وَاِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيْقُ فِى قِسْمِ الْمَرْدُوْدِ – এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর সে প্রশ্নটি হলো, مُعَلَّقٌ -এর সকল প্রকার মারদূদ না হওয়া সত্ত্বেও তাক মারদূদের প্রকারে উল্লেখ করা হলো কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, مُعَلَّقٌ -কে মারদূদের প্রকারে উল্লেখ করার কারণ হলো, مُعَلَّقٌ -এর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ এমনই হয় যে, তার উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। অর্থাৎ এটা জানা যায় না যে, সে আদিল ও আয়ত্তশক্তির অধিকারী কিনা।

حَدِيْثُ مُعَلَّقٍ -এর হুকুম : حَدِيْثُ مُعَلَّقٍ টা مُعَلَّقٌ হওয়ায় তা মূলত মাকবূলই নয়; বরং মারদূদ। **আর তার কারণ** হলো, তার উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। অর্থাৎ এটা জানা যায় না যে, উহ্য রাবী **আদিল** ও আয়ত্তশক্তির অধিকারী কিনা। তবে অন্য কোনো সনদে যদি উহ্য রাবীর নাম প্রকাশ পায়

অথবা حَدِيْث مُعَلَّق টা এমন কোনো কিতাবে বর্ণিত হয়, যার বিশুদ্ধতা **বাধ্যতামূলক** করা হয়েছে, তখন এ বর্ণিত নিদর্শনের সুবাদে حَدِيْث مُعَلَّق টি مَقْبُوْل হবে। আর যদি **এমনটি না হয়**, তাহলে তা মাকবূল হবে না।

تَعْدِيْل مُبْهَم -এর হুকুম : যদি কোনো মুহাদ্দিস দাবি করে বলেন যে, আমি **সনদ থেকে** যতজন রাবীর নাম উহ্য রেখেছি– তাদের সবাই নির্ভরযোগ্য, তাহলে একে বলে تَعْدِيْل مُبْهَم (**অস্পষ্ট**ভাবে উত্তমতা প্রতিপন্ন করা)। এ تَعْدِيْل مُبْهَم -এর হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** জুমহুরের মতে تَعْدِيْل مُبْهَم বা অস্পষ্ট প্রত্যয়নের কোনো ধর্ত**ব্য নেই অর্থাৎ** যতক্ষণ পর্যন্ত উহ্য রাবীর নাম প্রকাশ না করা হবে ততক্ষণ তা মাকবূল হবে না। **সুতরাং** تَعْدِيْل مُبْهَم ভাবে বর্ণিত حَدِيْث مُعَلَّق জুমহুরের মতে মাকবূল হবে না।

২. **ইবনুস সালাহ-এর অভিমত :** রাবীর উহ্য থাকাটা যদি বুখারী-মুসলিমের মতো যে সমস্ত **হাদীসের** কিতাব বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক শর্ত করে তাদের কিতাবে صِيْغَة مَعْرُوْف তথা দৃঢ়তাবাচক **শব্দে** (উদাহরণস্বরূপ এমন আসে– قَالَ فُلَانٌ অথবা ذَكَرَ فُلَانٌ) বর্ণিত হয়, তাহলে এমন تَعْدِيْل مُبْهَم মাকবূল হবে। কারণ, দৃঢ়তাবাচক শব্দই এর উপর প্রমাণবহ যে, লেখকের নিকট হাদীসের **সনদ** সহীহ। তবে সংক্ষিপ্ততা কিংবা অন্য কোনো স্বার্থে তিনি রাবীকে উহ্য রেখেছেন।

পক্ষান্তরে বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতাকারী কিতাবসমূহে যদি تَعْدِيْل مُبْهَم টা দুর্বলতাজ্ঞাপক শব্দ **তথা** صِيْغَة مَجْهُوْل -এর সাথে বর্ণিত হয়, তাহলে এ ধরনের تَعْدِيْل مُبْهَم -এর হুকুম মতভেদপূর্ণ।

আর যে সমস্ত হাদীসের কিতাব বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করেনি যদি তাদের কিতাবে تَعْدِيْل مُبْهَم আসে, তাহলে ইবনুস সালাহ-এর ভাষ্যমতে তা কখনো মাকবূল হবে না।

وَالثَّانِي وَهُوَ مَا سَقَطَ عَنْ اٰخِرِهٖ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيِّ هُوَ الْمُرْسَلُ وَصُوْرَتُهٗ اَنْ يَّقُوْلَ التَّابِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ كَبِيْرًا اَوْ صَغِيْرًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَذَا اَوْ فَعَلَ كَذَا اَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهٖ كَذَا اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ وَاِنَّمَا ذُكِرَ فِيْ قِسْمِ الْمَرْدُوْدِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوْفِ لِاَنَّهٗ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ صَحَابِيًّا وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ تَابِعِيًّا وَعَلَى الثَّانِيْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ ضَعِيْفًا وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ ثِقَةً وَعَلَى الثَّانِيْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ حَمَلَ عَنْ صَحَابِيٍّ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ حَمَلَ عَنْ تَابِعِيٍّ اٰخَرَ وَعَلَى الثَّانِيْ فَيَعُوْدُ الْاِحْتِمَالُ السَّابِقُ وَيَتَعَدَّدُ اِمَّا بِالتَّجْوِيْزِ الْعَقْلِيِّ فَاِلٰى مَا لَا نِهَايَةَ لَهٗ وَاِمَّا بِالْاِسْتِقْرَاءِ فَاِلٰى سِتَّةٍ اَوْ سَبْعَةٍ وَهُوَ اَكْثَرُ مَا وُجِدَ مِنْ رِوَايَةِ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ عَنْ بَعْضٍ ۔

অনুবাদ : মারদূদ হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার হলো, যার শেষভাগ থেকে তাবেয়ীর পরের রাবী বাদ পড়ে গেছে। এর নাম 'মুরসাল'। যেমন– একজন তাবেয়ী তিনি প্রবীণ হোক কিংবা কনিষ্ঠ, বললেন– "নবী করীম ﷺ এরূপ বলেছেন বা এরূপ করেছেন অথবা তাঁর উপস্থিতিতে এরূপ করা হয়েছে।" কোন সাহাবী মারফত এটি জানা গেল তা উল্লেখ করা হলো না। এটিকে মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত শ্রেণির মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো, উহ্য রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সাহাবী হতে পারেন, তাবেয়ীও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বল হতে পারেন, নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি কোনো সাহাবী থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারেন, অন্য কোনো তাবেয়ী থেকেও শিখতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় পূর্ববর্তী সম্ভাবনা ফিরে আসবে। আর এরূপ একাধিকবার হতে পারে। যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করলে এ সম্ভাবনার কোনো শেষসীমা নেই। তবে অনুসন্ধানে দেখা যায়, ছয় বা সাত পর্যন্ত এ সম্ভাবনা চলতে পারে। এক তাবেয়ী থেকে অন্য তাবেয়ীর বর্ণনার এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرْسَلٌ -এর আভিধানিক অর্থ : مُرْسَلٌ শব্দটি তিনটি উৎসারণস্থল হতে উৎপন্ন ও গৃহীত হতে পারে। যথা–

১. نَاقَةٌ رَسْلٌ اَيْ سَرِيْعَةٌ (অর্থাৎ দ্রুতগামী উটনী) থেকে। তখন মর্মার্থ হবে, মুরসিল হাদীসটি বর্ণনায় দ্রুততা ও তাড়াহুড়া করেছে এবং সনদ থেকে রাবী বাদ দিয়েছে, এজন্য তার হাদীসকে مُرْسَلٌ তথা তাড়াহুড়াকৃত করে নাম রাখা হয়েছে।

২. আহলে আরবের উক্তি : جَاءَ الْقَوْمُ اِرْسَالًا اَيْ مُتَفَرِّقِيْنَ (অর্থাৎ লোকেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে এসেছে) থেকে। যেহেতু রাবীকে বাদ দেওয়ার কারণে সনদের একাংশ অপর অংশ হতে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই এমন হাদীসকে مُرْسَلٌ (বিচ্ছিন্ন) বলে।

৩. اِرْسَالٌ بِمَعْنَى الْاِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْمَنْعِ (অর্থাৎ মুক্ত ও শর্তহীন) থেকে। কেমন যেন মুরসিল সনদকে মুতলাক রেখেছে এবং প্রসিদ্ধ রাবীর সাথে শর্তযুক্ত করেনি, এজন্য তাকে مُرْسَلٌ (শর্তহীন) বলে।

مُرْسَلٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : مُرْسَلٌ ঐ হাদীসকে বলে যার সনদের শেষ থেকে তাবেয়ীর পরে কোনো রাবী পড়ে যায়। এভাবে সনদ থেকে রাবী ফেলে দেওয়াকে اِرْسَالٌ বলে।

আরবিতে حَدِيْثُ مُرْسَلٌ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ حُذِفَ مِنْ اَصْلِ سَنَدِهٖ اَيْ بَعْدَ التَّابِعِيِّ كَاَنْ يَقُوْلُ التَّابِعِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا ـ

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদ থেকে সাহাবীর নাম বাদ দেওয়া হয়, তাবেয়ী সরাসরি قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا বলেন, তাকে اَلْحَدِيْثُ الْمُرْسَلُ বলে।

مُرْسَلٌ -এর কয়েকটি ধরন : مُرْسَلٌ -এর ধরন কয়েকটি হতে পারে। যার উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. কোনো প্রবীণ বা কনিষ্ঠ তাবেয়ী বলবেন : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا ـ **অর্থাৎ নবী** করীম ﷺ এমন বলেছেন।

২. কোনো প্রবীণ বা কনিষ্ঠ তাবেয়ী বলবেন : فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا ـ **অর্থাৎ** নবী করীম ﷺ এমন করেছেন।

৩. কোনো প্রবীণ বা কনিষ্ঠ তাবেয়ী বলবেন : فُعِلَ بِحَضْرَتِهٖ كَذَا ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে এমন করা হয়েছে, ইত্যাদি।

তবে مُرْسَلٌ দ্বারা কখনো যে কোনো اِنْقِطَاعٌ তথা বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য হয়, চাই তা مُنْقَطِعٌ ، مُعْضَلٌ ، مُرْسَلٌ ، مُعَلَّقٌ -এর সুরতে হোক না কেন। কুতুবে সিত্তাহ-এ مُرْسَلٌ শব্দ এ অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়েছে।

তাবেয়ী প্রবীণ (كَبِيْر) ও কনিষ্ঠ (صَغِيْر) দ্বারা উদ্দেশ্য : তাবেয়ী প্রবীণ হওয়ার দ্বারা বয়সে প্রবীণ (বড়) এবং তাবেয়ী কনিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা বয়সে কনিষ্ঠ (ছোট) হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং হাদীসের পরিভাষায় কিবারে তাবেয়ী বা প্রবীণ তাবেয়ী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি অনেক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং অনেক রেওয়ায়েত সাহাবীদের থেকেই গ্রহণ করেছেন। যেমন– হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.), হযরত কায়েস ইবনে আবী হাযেম (র.) প্রমুখ।

আর সিগারে তাবেয়ী তথা কনিষ্ঠ তাবেয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যার অল্প রেওয়ায়েত সাহাবী হতে আর অধিক রেওয়ায়েত কিবারে তাবেয়ী হতে। যেমন– হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (র.) প্রমুখ।

একটি দলের দাবি নাকচ : সম্মানিত লেখক سَوَاءٌ كَانَ كَبِيْرًا اَوْ صَغِيْرًا – বাক্যে ঐ দলের দাবি রদ বা নাকচ করেছেন, যারা বলে যে, সিগারে তাবেয়ীনের হাদীস মুরসাল হয় না; বরং مُنْقَطِعٌ হয়। কারণ, তাদের সাক্ষাৎ মাত্র দু-একজন সাহাবীর সাথে হয় এবং তাদের অধিকাংশ রেওয়ায়েত কিবারে তাবেয়ীন থেকে হয়। তাই সাধারণত তাদের রেওয়ায়েতে রাবী উহ্য থাকে দুজন– কিবারে তাবেয়ী ও সাহাবী। তাই لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ নীতি অনুসারে তাদের হাদীস مُنْقَطِعٌ হবে, مُرْسَلٌ নয়।

মুরসাল মারদূদের শ্রেণিভুক্ত হবার কারণ : যে কারণে حَدِيْثُ مُعَلَّقٌ মারদূদের শ্রেণিভুক্ত, ঠিক সে কারণেই مُرْسَلٌও মারদূদের অন্তর্গত হয়েছে। অর্থাৎ مُرْسَلٌ -এর মধ্যে যেহেতু উহ্য রাবীর অবস্থা জানা যায় না, সেজন্য তাকে মারদূদের শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়। কারণ, হতে পারে উহ্য রাবী সাহাবী হবেন অথবা তাবেয়ী। তাবেয়ী হলে তিনি যা'ঈফ হবেন (যার কারণে হাদীস মারদূদ হয়) অথবা ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। ছিকাহ হলে আবার তার মধ্যে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি কোনো সাহাবী হতে হাদীসটি শুনে থাকবেন অথবা অপর কোনো তাবেয়ী হতে। যদি তাবেয়ী হতে শুনেন, তাহলে আবার পূর্ববর্তী সম্ভাবনা ফিরে আসে যে, সেই তাবেয়ী যা'ঈফ হবেন অথবা ছিকাহ। এভাবে পর্যায়ক্রমে সম্ভাবনা হতেই থাকবে। যুক্তির বিচারে এ সম্ভাবনার কোনো শেষসীমা নেই। অবশ্য বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান মারফত এক তাবেয়ী হতে অপর তাবেয়ীর রেওয়ায়েত করার ধারাবাহিকতা ছয় কিংবা সাত স্তর পর্যন্ত চলতে পারে।

মোটকথা, মুরসালের হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও পূর্বোক্ত সম্ভাবনার কারণে তাকে মারদূদের শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْمُحَدِّثِيْنَ إِلَى التَّوَقُّفِ لِبَقَاءِ الْاِحْتِمَالِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ وَثَانِيْهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيِّيْنَ وَالْكُوْفِيِّيْنَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَجِيْئِهِ مِنْ وَجْهٍ أُخَرَ يُبَايِنُ الطَّرِيْقَ الْأُوْلَى مُسْنَدًا كَانَ أَوْ مُرْسَلًا لِيَتَرَجَّحَ احْتِمَالُ كَوْنِ الْمَحْذُوْفِ ثِقَةً فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ وَنَقَلَ أَبُوْ بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو الْوَلِيْدِ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اِتِّفَاقًا ـ

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ السَّقْطِ مِنَ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِيْ فَهُوَ الْمُعْضَلُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ السَّقْطُ اِثْنَيْنِ غَيْرَ مُتَوَالِيَيْنِ فِيْ مَوْضِعَيْنِ مَثَلًا فَهُوَ الْمُنْقَطِعُ وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ أَوْ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ لٰكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّوَالِيْ ـ

অনুবাদ : যদি উক্ত তাবেয়ী সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো নিকট থেকে মুরসাল রেওয়ায়েত করেন না, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীসটিকে মুলতুবি (স্থগিত) রাখার পক্ষপাতী। কেননা, সন্দেহ বহাল থেকে যায়। এটি ইমাম আহমাদ (র.)-এর দুই অভিমতের একটি। দ্বিতীয় মত যা ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও অভিমত, তা হলো– সাধারণভাবে তা গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে– তা শক্তি সঞ্চয় করে অন্য একটি সনদে বর্ণিত হবার কারণে। সে সনদটি মুত্তাসিল হোক কিংবা মুরসাল। কেননা, এতে করে উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বকর রাযী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাযী বর্ণনা করেছেন, কোনো রাবী যদি নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল রেওয়ায়েত করেন, তাহলে সকলে একমত যে, তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ে যাওয়ার তৃতীয় প্রকার হলো, যদি পরস্পর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে, তাহলে তার নাম 'মু'যাল'। আর যদি এরূপ না হয়; বরং দুজন বাদ পড়লেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থেকে হয়, কিংবা মাত্র একজন বাদ পড়ে, অথবা দুয়ের অধিক বাদ পড়লেও এক স্থান থেকে না হয়, তাহলে তার নাম মুনকাতি'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرْسَلْ -এর হুকুম : যে তাবেয়ী إِرْسَالْ করেন, তার অভ্যাস সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, তিনি **নির্ভরযোগ্য**-অনির্ভরযোগ্য সকল রাবীকে حَذْف করেন অর্থাৎ তাদের বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন, **তাহলে** তার হাদীসে মুরসাল আবূ বকর রাযী হানাফী এবং আবুল ওলীদ রাযী মালিকী-এর বর্ণনা মতে **সর্বসম্মতিক্রমে** মারদূদ।

আর যদি এ অভ্যাস সম্পর্কে জানা যায় যে, তাবেয়ী **কেবল** নির্ভরযোগ্য রাবী হতে إِرْسَالْ করেন, তাহলে তার حَدِيْثْ مُرْسَلْ -এর হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. **জুমহুরের* অভিমত ও ইমাম আহমদ (র.) -এর এক উক্তি :** তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত হলো, এমন মুরসাল হাদীসের হুকুম হলো তা স্থগিত থাকবে। **কারণ,** এ **সম্ভাবনা থাকে যে,** তাবেয়ী হয়তো অভ্যাসের বিপরীত অনির্ভরযোগ্য রাবী হতে إِرْسَالْ **করেছেন**। এ **সম্ভাবনাও** উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, উহ্য রাবী তাবেয়ীর মতে নির্ভরযোগ্য হলেও বাস্তবে **তিনি নির্ভরযোগ্য নন**।

২. **মালিকী, আহলে কূফা এবং আহনাফের অভিমত :** তাঁদের **মতে** হাদীসে **মুরসাল** নির্বিচারে মাকবূল। চাই তার সমর্থক পাওয়া যাক বা না যাক। এটা **ইমাম আহমদ (র.) -এর দ্বিতীয়** আরেকটি উক্তি।
কতকের মতে এ প্রকার মুরসাল হাদীস মুসনাদ হাদীস থেকেও শক্তিশালী। **কারণ, যিনি** مُسْنَدًا হাদীস রেওয়ায়েত করেন তিনি সনদের দায়িত্ব অন্যের কাঁধে অর্পণ করেন। **আর যিনি** مُرْسَلًا রেওয়ায়েত করেন, তিনি নিজেই সনদের দায়িত্বশীল হন।

৩. **ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত :** তাঁর মতে মুরসাল হাদীস মারদূদ। তবে যদি এ হাদীসটি ভিন্ন আরেকটি সনদে বর্ণিত হয়, চাই সেটা (দ্বিতীয় হাদীসটি) مَرْدُوْدْ ، مَقْبُوْلْ ، مُسْنَدْ ، مُرْسَلْ হোক না কেন। যেহেতু এ সুরতে উহ্য রাবীর নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবে অধিক মাত্রায় থাকে, তাই হাদীসে মুরসালটি মাকবূল হবে।

উল্লেখ্য যে, مُرْسَلْ -এর উল্লিখিত হুকুম তখনকার, যখন উহ্য রাবী সাহাবী হবেন না। যদি উহ্য রাবী সাহাবী হন, তাহলে সে মুরসাল হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে মাকবূল। কেননা, সকল সাহাবী আদিল। অনুরূপ সাহাবীদের মুরসাল হুজ্জত এবং দলিলযোগ্য। কারণ, তাবেয়ী প্রমুখ থেকে সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত করাটা খুব কমই হয়। আর হলেও তাঁরা তা বলে দেন।

সারকথা হলো, مُرْسَلْ -এর কিছু সুরত সর্বসম্মতিক্রমে মাকবূল, আর কিছু সুরত মতভেদপূর্ণ। তারপরেও সম্মানিত লেখক মুরসালকে মারদূদের শ্রেণিতে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর কাছে তৃতীয় অভিমতটি অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক বর্ণিত অভিমতটি অধিক পছন্দনীয়। আর তিনি যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবালম্বী তাই এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

مُعْضَلْ -এর আভিধানিক অর্থ : مُعْضَلْ শব্দটি بَابُ إِفْعَالْ থেকে إِسْمُ مَفْعُوْلْ -এর সীগাহ। এটা أَعْضَلَهُ أَيْ أَعْيَاهُ থেকে এসেছে। এর অর্থ– যার মাধ্যমে ক্লান্ত করা হয়েছে অথবা যার ব্যাপারে ক্লান্ত করা হয়েছে। যেহেতু পরপর দুই রাবীর নাম উল্লেখ না করায় মানুষ এ হাদীসের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাই مُعْضَلْ (ক্লান্ত) করে নাম রাখা হয়েছে।

مُعْضَلْ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় حَدِيْثْ مُعْضَلْ -এর সংজ্ঞা হলো–
هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ حُذِفَ مِنْ اَثْنَاءِ سَنَدِهٖ رَاوِيَانِ فَاَكْثَرَ مَعَ التَّوَالِىْ ـ
অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে পরপর দুজন রাবীকে حَذْفْ করে (বাদ) দেওয়া হয়, তাকে বলে حَدِيْثْ مُعْضَلْ । (চাই এই রাবীর বাদ পড়াটা সনদের শুরু থেকে হোক, কিংবা মাঝখান থেকে হোক কিংবা শেষ থেকে হোক।)
বস্তুত এ কারণে مُعْضَلْ কখনো مُعَلَّقْ, কখনো مُرْسَلْ এবং কখানো مُنْقَطِعْ -এর সাথে একত্রিত হয়ে যায়।

حَدِيْثْ مُعْضَلْ -এর শর্ত : কোনো হাদীস مُعْضَلْ হওয়ার জন্য শর্ত দুটি।

---

* সম্মানিত লেখক জুমহুরের যে মতামত এখানে উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব ধারণা ও জ্ঞানের আলোকে। নতুবা বাস্তব তথ্য হলো, হাদীসে মুরসাল মাকবূল হওয়াই হলো জুমহুরের মাযহাব।

১. ন্যূনতম (কমপক্ষে) দুজন রাবী বাদ পড়া এবং

২. দু রাবীর বাদ পড়াটা পরপর হওয়া। এ দু শর্তের কোনো একটি অনুপস্থিত হলে সে হাদীস مُنْقَطِعٌ হয়ে যাবে।

مُعْضَلٌ এবং مُعَلَّقٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যথা–

১. সনদের যে কোনো স্থান থেকে পরপর দুজন রাবী পড়ে গেলে তার নাম মু'যাল, তবে مُعَلَّقٌ হওয়ার জন্য সনদের শুরু থেকে রাবীর পড়ে যাওয়া শর্ত।

২. مُعْضَلٌ -এর জন্য দুজন রাবী পড়ে যাওয়া শর্ত; কিন্তু مُعَلَّقٌ এক রাবী পড়ে গেলেই হয়ে যায়। তবে তা সনদের শুরু থেকে হতে হবে।

৩. مُعْضَلٌ -এর মধ্যে দুই রাবীর পতনটা পরপর হতে হবে; مُعَلَّقٌ -এ এই শর্ত নেই।

৪. مُعَلَّقٌ -এর মধ্যে রাবীর পতনটা লেখকের ইচ্ছায় হয়, আর مُعْضَلٌ টা এর তুলনায় عَامٌ। অর্থাৎ তা কখনো লেখকের ইচ্ছায় হয় আবার কখনো লেখকের ইচ্ছা ছাড়াই হয়।

مُعْضَلٌ ও مُعَلَّقٌ -এর মধ্যে সম্পর্ক : উল্লিখিত পার্থক্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, مُعْضَلٌ ও مُعَلَّقٌ -এর মধ্যে عَامٌ وَخَاصٌ مِنْ وَجْهٍ -এর সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, যদি সনদের শুরু থেকে পরপর দুজন রাবী পড়ে যায়, তাহলে সেটা مُعَلَّقٌ এবং مُعْضَلٌ উভয়ই। আর যদি সনদের শুরু থেকে একজন রাবী পড়ে যায় অথবা দুজন কিন্তু পরপর নয়, তাহলে সেটা مُعَلَّقٌ ; مُعْضَلٌ নয়।

مُنْقَطِعٌ -এর আভিধানিক অর্থ : مُنْقَطِعٌ শব্দটি بَابُ اِنْفِعَالٌ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ ; এর অর্থ– যে বিচ্ছিন্ন হয়। যেহেতু এ হাদীস থেকে রাবী পড়ে যাওয়ায় সনদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়, তাই তাকে مُنْقَطِعٌ বলে।

مُنْقَطِعٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : مُنْقَطِعٌ -এর পারিভাষিক অর্থ হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ حُذِفَ مِنْ اَثْنَاءِ سَنَدِهٖ رَاوٍ فَاَكْثَرَ مَعَ عَدَمِ التَّوَالِىْ .

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে এক বা একাধিক রাবীকে বাদ দেওয়া হয়, তবে একাধিক রাবী পরপর হবে না।

مُنْقَطِعٌ এবং مُرْسَلٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : مُنْقَطِعٌ ও مُرْسَلٌ -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** এ ব্যাপারে জুমহুরে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হলো– مُنْقَطِعٌ ও مُرْسَلٌ -এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে এ পার্থক্য কেবল اِسْمٌ -এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ مُنْقَطِعٌ ও مُرْسَلٌ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যেমন– যখন বলা হবে هٰذَا مُرْسَلٌ বা هٰذَا مُنْقَطِعٌ তখন এ পার্থক্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ مُرْسَلٌ -এর অর্থ হবে, যে হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী বাদ পড়েছে। আর مُنْقَطِعٌ হলে তখন অর্থ হবে, সনদ থেকে সাহাবী ব্যতীত অপর কোনো রাবী বাদ পড়েছে।

অবশ্য فِعْلٌ ব্যবহারের সময় কেবল اِرْسَالٌ মাসদার থেকেই فِعْلٌ ব্যবহৃত হয়; اِنْقِطَاعٌ মাসদার থেকে فِعْلٌ ব্যবহৃত হয় না। যেমন বলা হয়– اَرْسَلَهٗ فُلَانٌ। চাই বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল হোক কিংবা মুনকাতি'।

ثُمَّ اَنَّ السِّقْطَ مِنَ الْاِسْنَادِ قَدْ يَكُوْنُ وَاضِحًا يَحْصُلُ الْاِشْتِرَاكُ فِىْ مَعْرِفَتِهٖ لِكَوْنِ الرَّاوِىْ مَثَلًا لَمْ يُعَاصِرْ مَنْ رَوٰى عَنْهُ اَوْ يَكُوْنُ خَفِيًّا فَلَا يُدْرِكُهٗ اِلَّا الْاَئِمَّةُ الْحُذَّاقُ الْمُطَّلِعُوْنَ عَلٰى طُرُقِ الْحَدِيْثِ وَعِلَلِ الْاَسَانِيْدِ فَالْاَوَّلُ وَهُوَ الْوَاضِحُ يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِىْ بَيْنَ الرَّاوِىْ وَشَيْخِهٖ بِكَوْنِهٖ لَمْ يُدْرِكْ عَصْرَهٗ اَوْ اَدْرَكَهٗ لٰكِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَلَيْسَتْ لَهٗ مِنْهُ اِجَازَةٌ وَلَا وِجَادَةٌ وَمِنْ ثَمَّ احْتِيْجَ اِلَى التَّارِيْخِ لِتَضَمُّنِهٖ تَحْرِيْرَ مَوَالِيْدِ الرُّوَاةِ وَ وَفَيَاتِهِمْ وَاَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ وَقَدِ افْتَضَحَ اَقْوَامٌ اِدَّعَوُا الرِّوَايَةَ عَنْ شُيُوْخٍ ظَهَرَ بِالتَّارِيْخِ كِذْبُ دَعْوَاهُمْ.

অনুবাদ : সনদ থেকে রাবীর নাম বাদ পড়ে যাবার বিষয়টি অনেক সময় স্পষ্ট থাকে। যে কেউ তা জানতে ও বুঝতে পারে। রাবী যখন তার পূর্বের ব্যক্তির সমসাময়িক না হয়, তখন এরূপ হয়ে থাকে। আবার কখনো হয় সূক্ষ্ম। হাদীসের সনদসমূহ ও সনদের দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ইমামগণ ব্যতীত অন্যেরা তা জানতে পারে না। প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্পষ্ট ছেদ জানা যায় রাবী ও তার শায়খের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা জানা গেলে। যেমন– কোনো রাবী যদি তার উপরস্থ রাবীর সমসাময়িক না হন অথবা সমসাময়িক হলেও দুজন কখনো একত্রিত না হয়ে থাকেন এবং তার নিকট থেকে ইজাযত (অনুমতি) কিংবা কপি লাভ না করে থাকেন, তাহলে দুজনের মাঝে ছেদের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এ কারণে ইতিহাসের প্রয়োজন, যাতে রাবীদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, শিক্ষাকাল, শিক্ষা সমাপনকাল ইত্যাদি বর্ণিত থাকে।

এমন অনেকেই অপমানিত হয়েছেন যারা বিভিন্ন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনার দাবি করেছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা তাদের দাবির অসত্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سِقْط-এর সংজ্ঞা ও প্রকরণ : হাদীসের সনদ থেকে রাবীর পতনের নাম سِقْط। এটা দু প্রকার।
১. سِقْط وَاضِح অর্থাৎ রাবীর পতন এমনভাবে হওয়া যে, যে কেউ তা বুঝে। চাই সে শাস্ত্রজ্ঞ হোক অথবা না হোক। এর অপর নাম মুরসালে জলী। ২. سِقْط خَفِىّ অর্থাৎ রাবীর পতন এমনভাবে হওয়া যে, সবাই তা বুঝে না; বরং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গই কেবল তা অনুধাবন করতে পারেন। এই سِقْط خَفِىّ দু প্রকার। ১. মুদাল্লাস ও ২. মুরসালে খফী।

مُرْسَل جَلِىّ বা سِقْط وَاضِح-এর সংজ্ঞা : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُرْسَل جَلِىّ হলো–

هُوَ مَا رَوَاهُ رَاوٍ ثَبَتَ عَدَمُ التَّلَاقِىْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَنْ رَوٰى عَنْهُ وَلَيْسَ لَهٗ اِجَازَةٌ مِنْهُ وَلَا وِجَادَةٌ يُوْهِمُ السَّمَاعَ مِنْهُ وَقَدْ سَقَطَ رَاوٍ مِنْ بَيْنِهِمَا مِنَ السَّنَدِ.

অর্থাৎ যে হাদীসের رَاوِىْ (বর্ণনাকারী) এবং مَرْوِىْ عَنْهُ (যার থেকে বর্ণনা করছে) -এর মাঝে জীবনে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি তা প্রমাণিত এবং বর্ণনাকারী তার ওস্তাদ হতে وِجَادَةٌ বা اِجَازَةٌ কোনোটাই পাননি,

কিন্তু রাবী এমন শব্দে (যেমন- عَنْ) হাদীস রেওয়ায়েত করেন যে, মনে হয় তিনি ওস্তাদ (مَرْوِيٌّ عَنْهُ) থেকে হাদীসটি শুনেছেন অথচ বাস্তবে শুনেননি এবং তিনি মাঝখানে একজন রাবী বাদ দিয়েছেন।

سِقْط وَاضِح বা مُرْسَل جَلِيْ জানার পদ্ধতি : এটা তিনভাবে জানা যেতে পারে। যথা–

১. বর্ণনাকারী তার শায়খের জামানা পাননি।

২. জামানা পেয়েছেন, কিন্তু তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত।

৩. বর্ণনাকারী তার শায়খ থেকে إِجَازَةٌও পাননি আবার وِجَادَةٌও পাননি।

এ তিন সুরত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সনদে একজন রাবীর পতন হয়েছে।

ইতিহাস জানার গুরুত্ব : বর্ণনাকারী তার শায়খের যুগ পেয়েছেন কিনা, তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা এটা জানতে হলে রাবীদের জন্ম-মৃত্যু, ইলমার্জন, সফরের স্থান ও সময় ইত্যাদি জানা যেহেতু জরুরি আর এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ইতিহাসশাস্ত্রে, তাই হাদীসশাস্ত্রে ইতিহাসেরও বড় গুরুত্ব রয়েছে এবং এটাকে বিশেষ গুরুত্বও দেওয়া হয়।

যুগে যুগে অনেকে বড় বড় ও নামকরা শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণের দাবি করেছিল এবং তাদের সূত্রে রেওয়ায়েতও করেছিল; কিন্তু ইতিহাসের সুবাদে যখন গিয়ে তাদের দাবি মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়েছে তখন তারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়েছে।

سِقْط خَفِيْ-এর প্রকরণ : سِقْط خَفِيْ অর্থাৎ সনদ থেকে রাবীর পতনটা এমন অপ্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম হওয়া যে, প্রাজ্ঞ ও হাদীসশাস্ত্রবিদ ছাড়া তা ধরতে পারে না। এ سِقْط خَفِيْ দু প্রকার। ১. মুদাল্লাস ও ২. মুরসালে খফী। সামনে এগুলোর আলোচনা আসছে।

দুটি পরিভাষার ব্যাখ্যা : বক্ষ্যমাণ আলোচনায় উসূলুল হাদীসের দুটি পরিভাষা এসেছে। ১. إِجَازَةٌ ও ২. وِجَادَةٌ। কিতাবের শেষ দিকে এদের বিস্তারিত আলোচনা আসবে। তবে এখানে সংক্ষেপে তাদের পরিচয় তুলে ধরছি।

إِجَازَةٌ-এর ব্যাখ্যা : إِجَازَةٌ-এর অর্থ হলো, শায়খ কর্তৃক কাউকে তার সূত্রে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করা। চাই সে সরাসরি শায়খ থেকে হাদীস শুনে থাকুক বা না শুনে থাকুক।

এ অনুমতি কখনো শায়খ মৌখিকভাবে প্রদান করেন, কখনো অনুমতি লিখিত আকারে প্রদান করেন।

وِجَادَةٌ-এর ব্যাখ্যা : ছাত্র যদি কারো কাছ থেকে হাদীসের এমন একটি লিখিত কপি পায় যার লেখক একজন পরিচিত মুহাদ্দিস, তাহলে তাকে وِجَادَةٌ (পাওয়া) বলে।

وَالْقِسْمُ الثَّانِىْ وَهُوَ الْخَفِىُّ اَلْمُدَلَّسُ بِفَتْحِ اللَّامِ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِكَوْنِ الرَّاوِىْ لَمْ يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهٗ وَ اَوْهَمَ سَمَاعَهٗ لِلْحَدِيْثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ وَاشْتِقَاقُهٗ مِنَ الدَّلَسِ بِالتَّحْرِيْكِ وَهُوَ اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِى الْخِفَاءِ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যেখানে রাবী পড়ে যাবার বিষয়টি সূক্ষ্ম হয় তার নাম মুদাল্লাস। এ নামকরণের কারণ, রাবী যার কাছে হাদীসটি শুনেছেন তার নাম উল্লেখ না করে এরূপ শব্দ ব্যবহার করেন যাতে হাদীসটি এমন ব্যক্তি থেকে শুনেছেন বলে মনে হয় যিনি তার কাছে সেটি বর্ণনা করেননি।

আর মুদাল্লাস শব্দটি 'দালাস' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ– অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া। এ নামকরণের কারণ (যুক্তি) হলো, উভয় ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْث مُدَلَّس সংক্রান্ত আলোচনা : এ বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। আর তা হলো– ১. তাদলীসের অর্থ, ২. তাদলীসের প্রকারভেদ, ৩. তাদলীস করার কারণ, ৪. তাদলীস ও তা'লীকের মধ্যে পার্থক্য, ৫. হাদীসে মুদাল্লাসের সংজ্ঞা, ৬. হাদীসে মুদাল্লাসের নামকরণ, ৭. হাদীসে মুদাল্লাসের হুকুম। সম্মানিত লেখক শেষোক্ত তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনার দাবিতে নিম্নে উক্ত সাত প্রকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. তাদলীসের অর্থ : تَدْلِيْس শব্দটি بَابُ تَفْعِيْل-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আভিধানে এর অর্থ– ১. দোষ লুকানো, ২. বিক্রীত-পণ্যের ত্রুটি গোপন করা। পরিভাষায় تَدْلِيْس বলে, রাবী যে ওস্তাদ থেকে হাদীস শুনেছেন তার নাম বাদ দিয়ে হাদীসকে ঐ উপরের রাবীর দিকে নিসবত দেওয়া যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলেও তিনি তার থেকে হাদীস শুনেননি।

অথবা, ওস্তাদের নামের পরিবর্তে তার অপরিচিত কোনো গুণ বা কুনিয়াত উল্লেখ করা।

অথবা, নিজের ওস্তাদের নাম উল্লেখ করলেও হাদীসকে অধিকতর ভালো বানানোর জন্য সনদের উপরের দিক থেকে কোনো যা'ঈফ বা নিম্নমানের রাবীকে বাদ দিয়ে সেখানে এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা শোনার কথা বুঝানোর সম্ভাবনা রাখে। এমন কারবার যে করে তাকে বলে মুদাল্লিস।

২. তাদলীসের প্রকারভেদ : তাদলীসের প্রসিদ্ধ প্রকার তিনটি। যথা–

ক. تَدْلِيْسُ اِسْنَادْ : অর্থাৎ রাবী নিজের ওস্তাদকে বাদ দিয়ে হাদীসের নিসবত উপরের রাবীর দিকে এমন শব্দের মাধ্যমে প্রদান করা, যা শোনার অর্থ বুঝিয়ে থাকে। যেমন– এভাবে বলা : عَنْ فُلَانٍ বা قَالَ فُلَانٌ ইত্যাদি। এমন তাদলীস নাজায়েজ এবং নিন্দনীয়।

খ. تَدْلِيْسُ شُيُوْخ : রাবী ওস্তাদের পরিচিত নাম বাদ দিয়ে তার অপরিচিত নাম, গুণ, কুনিয়াত উল্লেখ করা। যদিও এমন তাদলীস জায়েজ কিন্তু না করাই ভালো।

গ. تَدْلِيْسُ التَّسْوِيَة : অর্থাৎ মুহাদ্দিস তার ওস্তাদকে বাদ দেবে না; বরং হাদীসকে অধিকতর ভালো বানাতে উপরের কোনো যা'ঈফ বা নিম্নমানের রাবীকে বাদ দিয়ে সেখানে এমন শব্দ ব্যবহার করবে, যা শোনার কথা বুঝায়। এমন তাদলীস কঠিন হারাম এবং চরম নিন্দনীয়।

উল্লেখ্য যে, তাদলীস শব্দ মুতলাকভাবে বলা হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় تَدْلِيْسُ اِسْنَادْ-ই। বস্তুত এ কারণেই সামনে মুদাল্লাসের যে সংজ্ঞা ও হুকুম আসছে তা مُدَلَّسُ اِسْنَادْ-এরই।

৩. তাদলীস করার কারণ : তাদলীস মন্দ এবং নিন্দনীয় হলেও তা করা হয় দু কারণে। যথা–

ক. সংক্ষিপ্ততার জন্য। যেমন– এ উদ্দেশ্যে তাদলীস করেছেন ইমাম বুখারী (র.) এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)। এমন তাদলীস নাজায়েজ নয়, তবে না করাই ভালো।

খ. অনেক সময় নিজের ওস্তাদ যা'ঈফ বা নিম্নমানের হয়, তখন নিজের হাদীসকে মাকবূল বানাতে অথবা হাদীসের স্তরকে উন্নত করতে ওস্তাদকে বাদ দিয়ে তাদলীস করে। যেহেতু এটা অসমর্থিত এবং মন্দ কারণ, তাই এমন তাদলীস হারাম এবং নিন্দনীয়।

৪. তাদলীস ও তা'লীকের মধ্যে পার্থক্য : তাদলীস ও তা'লীকের মধ্যে তিন ধরনের পার্থক্য রয়েছে। যথা–

ক. রাবীর পতন বা বাদ পড়াটা **تَعْلِيْق** -এর মধ্যে সুস্পষ্ট হয়; পক্ষান্তরে **تَدْلِيْس** -এর মধ্যে হয় অস্পষ্ট।

খ. রাবীর পতনটা **تَعْلِيْق** -এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে হয়; পক্ষান্তরে **تَدْلِيْس** -এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে হওয়ার পাশাপাশি মন্দ উদ্দেশ্যেও হয়।

গ. রাবীর পতন **تَعْلِيْق** -এর মধ্যে শুধু সনদের শুরু থেকে হয়; পক্ষান্তরে **تَدْلِيْس** -এর মধ্যে সনদের যে কোনো স্থান থেকে হয়।

৫. حَدِيْث مُدَلَّس -এর সংজ্ঞা : **اَلْمُدَلَّسُ** (লাম বর্ণে যবর যোগে) শব্দটি **اَلتَّدْلِيْسُ** মূলধাতু হতে **اِسْم مَفْعُوْل** -এর **وَاحِدْ مُذَكَّرْ** । **اَلتَّدْلِيْسُ** শব্দের অর্থ **كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ** অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যের দোষ গোপন করা। **اَلتَّدْلِيْسُ** শব্দটি **اَلدَّلَسُ** থেকে নির্গত। **اَلدَّلَسُ** অর্থ **اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ** তথা আলোর সাথে অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া।

উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় **اَلْحَدِيْثُ الْمُدَلَّسُ**-এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ مَا رَوَاهُ رَاوٍ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ وَقَدْ عُرِفَ لِقَائُهُ إِيَّاهُ بِلَفْظٍ يُوْهِمُ السَّمَاعَ مِنْهُ وَقَدْ سَقَطَ رَاوٍ مِنْ بَيْنِهِمَا مِنَ السَّنَدِ .

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী এবং তার ওস্তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েছে তা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুবিদিত এবং রাবী এমন শব্দে (যেমন– **عَنْ**) হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন যে, মনে হয় তিনি তা তার ওস্তাদ থেকে শুনেছেন; কিন্তু বাস্তবে তিনি হাদীসটি শুনেননি– মাঝে একজন রাবীকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

সংক্ষেপে সংজ্ঞাটি এভাবেও দেওয়া যায় যে, **حَدِيْث مُدَلَّس** প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার সনদে **سِقْط خَفِي** সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ রাবী তার ওস্তাদকে (যার থেকে সে হাদীস শুনেছে তাকে) বাদ দিয়ে তার উপরের এমন রাবীর প্রতি হাদীসের নিসবত দেয়, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলেও বর্ণিত হাদীসটি তিনি তার থেকে শুনেননি।

৬. মুদাল্লাসের নামকরণ : **اَلتَّدْلِيْسُ** শব্দটির অর্থ দু রকম হয়। যথা–

ক. বিক্রীত-পণ্যের দোষ গোপন করা। এ প্রেক্ষিতে **اَلْمُدَلَّسُ** -কে **اَلْمُدَلَّسُ** বলার কারণ হলো, **لِيْس** -এর মাধ্যমে শ্রোতা থেকে সঠিক বিষয়কে গোপন করা হয়।

খ. **اَلتَّدْلِيْسُ** শব্দটি **اَلدَّلَس** থেকে নির্গত। **اَلدَّلَس** অর্থ **اِخْتِلَاطُ الظَّلَامِ** তথা আলোর সাথে অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া। এ অর্থে **اَلْمُدَلَّسُ** -কে **اَلْمُدَلَّسُ** বলার কারণ হলো, যেহেতু মুদাল্লিস রাবী নিজ ওস্তাদের নাম উল্লেখ করে না; বরং হাদীসকে এমন রাবীর দিকে নিসবত করে যার থেকে সে শুনেনি। যার ফলে হাদীসের অশ্রবণটা (যেটা অন্ধকার) শ্রবণের (যেটা আলো তার) সাথে গুলিয়ে যায়।

وَيَرِدُ الْمُدَلَّسُ بِصِيْغَةٍ مِنْ صِيَغِ الْأَدَاءِ يَحْتَمِلُ وُقُوْعَ اللِّقَاءِ بَيْنَ الْمُدَلِّسِ وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ كَعَنْ وَكَذَا قَالَ وَمَتٰى وَقَعَ بِصِيْغَةٍ صَرِيْحَةٍ كَانَ كِذْبًا وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيْسُ إِذَا كَانَ عَدْلًا اَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيْهِ بِالتَّحْدِيْثِ عَلَى الْأَصَحِّ .

অনুবাদ : মুদাল্লিস ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার সময় এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যাতে **মুদাল্লিস ও তার** বরাত দেওয়া ব্যক্তির মাঝে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন– 'থেকে', **'বলেছেন'** ইত্যাদি। আর যদি সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহলে তো মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে।

যে রাবী সম্পর্কে প্রমাণিত হবে যে, তিনি তাদলীস করেন, তিনি যদি আদিল হন, তাহলে তার বর্ণনা বিশুদ্ধমত অনুসারে কেবলমাত্র সেটি গ্রহণযোগ্য হবে যাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় 'শুনেছেন' বলে ঘোষণা দেবেন। (অস্পষ্ট কিংবা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করলে চলবে না।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৭. حَدِيْثُ مُدَلَّسٌ **-এর হুকুম :** হাদীসে মুদাল্লাস-এর রাবী আদিল হবে না অথবা হবে। প্রত্যেকটি আবার দু দু প্রকার। রাবী সুস্পষ্ট শোনার শব্দে হাদীস বর্ণনা করবে (যেমন– سَمِعْتُ বা رَأَيْتُ ইত্যাদি) অথবা অস্পষ্টতাবাচক শব্দে বর্ণনা করবে (যেমন– قَالَ فُلَانٌ كَذَا ,عَنْ فُلَانٍ كَذَا ইত্যাদি)। এই মোট চার প্রকার হলো। এর হুকুম নিম্নরূপ–

প্রথম প্রকারের হুকুম : অর্থাৎ রাবী যদি আদিল না হয় এবং এমন শব্দ দ্বারা হাদীসে মুদাল্লাস বর্ণনা করে যা রাবী ও তার ওস্তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে– নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় না, যেমন– এভাবে বলে عَنْ فُلَانٍ كَذَا বা قَالَ فُلَانٌ كَذَا তাহলে এমন রাবীর হাদীসে মুদাল্লাস মারদূদ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম : আদিল নয় এমন রাবী যদি এমন শব্দ দ্বারা রেওয়ায়েত করে যা রাবীর সাথে তার ওস্তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানায়, যেমন– এভাবে বলে سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُوْلُ كَذَا বা رَأَيْتُ فُلَانًا يَفْعَلُ كَذَا ইত্যাদি তাহলে এমন রাবী ডাহা মিথ্যাবাদী হবে এবং তার হাদীস অবশ্যই মারদূদ হবে।

তৃতীয় প্রকারের হুকুম : তাদলীসটা যদি আদিল রাবী কর্তৃক এমন শব্দ দ্বারা হয়, যা রাবীর তার ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা বুঝায় কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে না, তাহলে তার হাদীসও মাকবূল হবে না।

চতুর্থ প্রকারের হুকুম : আর যদি আদিল রাবী এমন সুস্পষ্ট শব্দে তাদলীস করে, যা তার ওস্তাদ থেকে শ্রবণের ফায়দা দেয়, যেমন– এভাবে বলে حَدَّثَنَا ,سَمِعْتُ ,أَخْبَرَنَا ইত্যাদি, তাহলে এমন রাবীর হাদীস কারো কারো মতে মাকবূল না হলেও বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য উক্তি মতে তা মাকবূল হবে।

وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ إِذَا صَدَرَ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَلَّسِ وَالْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ دَقِيقٌ يَحْصُلُ تَحْرِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ هٰهُنَا وَهُوَ أَنَّ التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوٰى عَمَّنْ عُرِفَ لِقَائُهُ إِيَّاهُ فَأَمَّا إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِىْ تَعْرِيْفِ التَّدْلِيْسِ الْمُعَاصَرَةَ وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِيٍّ لَزِمَهُ دُخُوْلُ الْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ فِىْ تَعْرِيْفِهِ وَالصَّوَابُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا وَيَدُلُّ عَلٰى أَنَّ اعْتِبَارَ اللِّقٰى فِى التَّدْلِيْسِ دُوْنَ الْمُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لَابُدَّ مِنْهُ إِطْبَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى أَنَّ رِوَايَةَ الْمُخَضْرَمِيْنَ كَأَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَقَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ مِنْ قُبَيْلِ الْإِرْسَالِ لَا مِنْ قُبَيْلِ التَّدْلِيْسِ وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْمُعَاصَرَةِ يَكْتَفِىْ بِهٖ فِى التَّدْلِيْسِ لَكَانَ هٰؤُلَاءِ مُدَلِّسِيْنَ لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قَطْعًا وَلٰكِنْ لَمْ يُعْرَفْ هَلْ لَقُوْهُ أَمْ لَا وَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِى التَّدْلِيْسِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ الْبَزَّارِ وَكَلَامُ الْخَطِيْبِ فِى الْكِفَايَةِ يَقْتَضِيْهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ـ

অনুবাদ : মুরসালে খফীর ক্ষেত্রে একই হুকুম যদি তা এমন সমসাময়িক রাবী থেকে সংঘটিত হয় যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি; বরং দুজনের মাঝখানে মাধ্যম রয়েছে। মুদাল্লাস ও মুরসালে খফীর মধ্যকার পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম, আমার এখানকার আলোচনা দ্বারা তা উদ্ঘাটিত হয়। তা হলো, তাদলীস শুধু তার ব্যাপারে প্রযোজ্য যিনি এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা যায়। আর যদি তিনি সমসাময়িক হলেও তার সাথে সাক্ষাৎ হবার কথা জানা না যায়, তাহলে তার নাম হয় মুরসালে খফী। যারা তাদলীসের সংজ্ঞায় 'সাক্ষাৎ লাভ প্রমাণিত না হলেও সমসাময়িক হতে হবে' বলে শর্ত যোগ করেছেন, তাদের সংজ্ঞা অনুসারে মুরসালে খফীও এর সাথে শামিল হয়ে যাবে। কিন্তু সঠিক মত হলো, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা। তাদলীসের জন্য শুধুমাত্র সমসাময়িকতা যথেষ্ট নয়; বরং সাক্ষাৎ লাভও যে জরুরি তার দলিল হলো, আবূ ওছমান নাহদী, কায়েস ইবনে আবী হাযিম প্রমুখ মুখাযরাম ব্যক্তিরা নবী করীম ﷺ থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের ঐকমত্য হলো সেগুলোকে মুরসাল শ্রেণির অন্তর্গত করা, তাদলীসের নয়। তাদলীসের জন্য যদি শুধুমাত্র সমসাময়িকতা যথেষ্ট হতো, তাহলে এরা সবাই মুদাল্লিস বলে গণ্য হতেন। কেননা, তারা তো নবী করীম ﷺ -এর যুগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

তাদলীসের জন্য যারা সাক্ষাৎ লাভের শর্ত আরোপ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন **ইমাম** শাফেয়ী (র.), আবূ বকর বায্যার (র.) প্রমুখ। কিফায়া গ্রন্থে খতীবে বাগদাদীর বক্তব্যেরও এটি চাহিদা। আর এ মতই নির্ভরযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِرْسَالٌ-এর মশহুর অর্থ হলো, সনদের শেষ থেকে তাবেয়ীর পরে রাবীকে বাদ দেওয়া। **কিন্তু** কখনো কখনো সনদের যে কোনো স্থান থেকে রাবী ফেলে দেওয়াকে إِرْسَالٌ বলা হয়। (যেটা إِنْقِطَاعٌ-এর অর্থ।) আর যে হাদীসের মধ্যে রাবীর এমন পতন ঘটে, তাকে বলে مُرْسَلٌ। বক্ষ্যমাণ **স্থলে** مُرْسَلٌ-এর এ অর্থটিই উদ্দেশ্য। এই মুরসাল হলো দু প্রকার।

سِقْطٌ خَفِيٌّ-এর দু প্রকারের (১. مُدَلَّسٌ ২. مُرْسَلٌ خَفِيٌّ) একপ্রকার।

مُرْسَلٌ جَلِيٌّ যার অপর নাম سِقْطٌ وَاضِحٌ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো مُرْسَلٌ خَفِيٌّ, যা

مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর সংজ্ঞা : আরবিতে مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ مَا رَوَاهُ رَاوٍ ثَبَتَ الْمُعَاصَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ أَمْ لَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وِجَادَةٌ بِلَفْظٍ يُوهِمُ السَّمَاعَ مِنْهُ وَقَدْ سَقَطَ رَاوٍ مِنْ بَيْنِهِمَا مِنَ السَّنَدِ.

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী ও যার থেকে সে বর্ণনা করছে একই যুগের, কিন্তু উভয়ের মাঝে জীবনে **কখনো** সাক্ষাৎ হয়েছে কি হয়নি– তা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুবিদিত নয় এবং রাবী مَرْوِيٌّ عَنْهُ থেকে إِجَازَةٌ **বা** وِجَادَةٌ কোনোটাই লাভ করেননি; কিন্তু এমন শব্দে رَاوِيْ রেওয়ায়েত করে যে, মনে হয় তিনি مَرْوِيٌّ عَنْهُ থেকে হাদীসটি শুনেছেন অথচ বাস্তবে শুনেননি; মাঝে একজন رَاوِيْ-কে ফেলে দিয়েছেন।

এ সংজ্ঞাটি সংক্ষেপে এভাবেও দেওয়া যে, مُرْسَلٌ خَفِيٌّ প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার রাবী **এমন** সমসাময়িক থেকে রেওয়ায়েত করেন, যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি; বরং রাবী ও مَرْوِيٌّ عَنْهُ-এর **মধ্যে** মাধ্যম রয়েছে।

مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর উদাহরণ : ইবনে মাজাহ শরীফে عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর উদাহরণ– رَحِمَ اللّٰهُ حَارِسَ الْحَرَسِ -কারণ হলো, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) -এর সাক্ষাৎ উকবা ইবনে আমিরের সাথে হয়নি। (كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ)

مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর হুকুম : مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর হুকুম مُدَلَّسٌ-এর মতো। অর্থাৎ مُدَلَّسٌ যেমন অগ্রহণযোগ্য তেমনি مُرْسَلٌ خَفِيٌّও অগ্রহণযোগ্য।

مُدَلَّسٌ এবং مُرْسَلٌ خَفِيٌّ-এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যথা নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. **ইমাম শাফেয়ী, আবূ বকর বায্যার ও খতীবে বাগদাদীর অভিমত :** এ ব্যাপারে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত হলো, রাবীর مَرْوِيٌّ عَنْهُ-এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা যদি প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু রাবী مَرْوِيٌّ عَنْهُ থেকে হাদীস না শুনে থাকেন, তাহলে সেটা তাদলীস।

পক্ষান্তরে রাবী যদি مَرْوِيٌّ عَنْهُ-এর কেবল সমসাময়িক হন এবং তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ না হয়, তাহলে তা مُرْسَلٌ خَفِيٌّ। এ ব্যাখ্যার সুবাদে তাদের মধ্যে نِسْبَتْ تَبَايُنْ-এর সম্পর্ক।

২. **খুলাসা প্রণেতা, ইমাম নববী ইরাকীর অভিমত :** তাঁদের মতে তাদলীসের জন্য لِقَاءٌ তথা সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই; বরং রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ সমসাময়িক হওয়াটাই যথেষ্ট, চাই সাক্ষাৎ হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে مُرْسَلْ خَفِىْ -এর জন্য সাক্ষাৎ জরুরি। এ ব্যাখ্যার সুবাদে مُدَلَّسْ ও مُرْسَلْ خَفِىْ -এর মধ্যে عَامْ خَاصْ مُطْلَقْ -এর সম্পর্ক।

সঠিক মাযহাব ও তার দলিল : উপরিউক্ত দু অভিমতের মধ্যে প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। এর বড় দলিল হলো, مُخَضْرِمِيْنَ -এর রেওয়ায়েতকে সর্বসম্মতিক্রমে مُرْسَلْ خَفِىْ -এর অন্তর্গত করা, مُدَلَّسْ -এর অন্তর্গত নয়।

এর ব্যাখ্যা হলো, যে সকল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ পেয়েছেন কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি তাদেরকে পরিভাষায় মুখাযরামীন বলে। (مُخَضْرِمِيْنَ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।) এদের মধ্যে আবূ ওছমান নাহদী, কায়েস ইবনে আবী হাযিম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের রেওয়ায়েতকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে مُرْسَلْ خَفِىْ বলে অভিহিত করেন, مُدَلَّسْ -এর অন্তর্গত করেন না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি তাদলীসের ক্ষেত্রে 'সাক্ষাৎ'-এর শর্ত না হতো; বরং শুধু সমসাময়িক হওয়াই যথেষ্ট হতো, তাহলে মুখাযরামীনদের রেওয়ায়েত অবশ্যই মুদাল্লাস-এর অন্তর্গত হতো, মুরসালে খফীর নয় এবং মুখাযরামীনরা মুদাল্লিস হতেন। অথচ কেউ তাদেরকে মুদাল্লিস বলেননি। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাদলীসের জন্য সাক্ষাৎ জরুরি; কেবল সমসাময়িক হওয়াই যথেষ্ট নয়।

مُرْسَلْ جَلِىْ ، مُرْسَلْ خَفِىْ এবং مُدَلَّسْ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ–

১. مُرْسَلْ جَلِىْ -এর রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ সমসাময়িক হন না অথবা সমসাময়িক হন; কিন্তু উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত হয় এবং রাবী مَرْوِىْ عَنْهُ থেকে إِجَازَةٌ বা وِجَادَةٌ কোনোটাই পান না।

২. مُرْسَلْ خَفِىْ -এর রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ একই যুগের হন; কিন্তু তাদের মাঝের সাক্ষাৎ হওয়াটাও প্রমাণিত হয় না আবার না হওয়াটাও জানা যায় না।

৩. مُدَلَّسْ -এর রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ -এর মাঝে সাক্ষাৎ হওয়াটা সুবিদিত হয়, কিন্তু বর্ণিত হাদীসটি রাবী مَرْوِىْ عَنْهُ থেকে শুনেন না।

وَيُعْرَفُ عَدَمُ الْمُلَاقَاتِ بِاَخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذٰلِكَ اَوْ بِجَزْمِ اِمَامٍ مُطَّلِعٍ وَلَا يَكْفِىْ اَنْ يَقَعَ فِىْ بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةُ رَاوٍ اَوْ اَكْثَرَ بَيْنَهُمَا لِاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمَزِيْدِ وَلَا يُحْكَمُ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ بِحُكْمٍ كُلِّىٍّ لِتَعَارُضِ اِحْتِمَالِ الْاِتِّصَالِ وَالْاِنْقِطَاعِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ الْخَطِيْبُ كِتَابَ التَّفْصِيْلِ لِمُبْهَمِ الْمَرَاسِيْلِ وَكِتَابَ الْمَزِيْدِ فِىْ مُتَّصِلِ الْاَسَانِيْدِ وَانْتَهَتْ هٰهُنَا اَقْسَامُ حُكْمِ السَّاقِطِ مِنَ الْاِسْنَادِ .

অনুবাদ : সাক্ষাৎ না হবার কথা জানা যায় রাবীর নিজ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার দ্বারা অথবা কোনো পণ্ডিত ইমামের জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে। রাবী ও তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির মাঝখানে কোনো কোনো সনদে অধিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কেননা, এটি অতিরিক্ত বা সংযোজিত হতে পারে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদলীস বলে সাধারণ নীতি ঘোষণা করা যাবে না। কেননা, এখানে মুত্তাসিল ও মুনকাতি' যে কোনোটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। খতীবে বাগদাদী এ সম্পর্কে লেখেছেন 'আত-তাফসীল লিমুবহামিল মারাসীল' ও 'আল-মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ'।
সনদ থেকে রাবী বাদ পড়ার প্রকারভেদ ও হুকুমের আলোচনা এখানে শেষ হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাক্ষাৎ না হওয়া জানার উপায় : سِقْط وَاضِح -এর মধ্যে রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ -এর মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াটা খুব সহজেই জানা যায়। কিন্তু سِقْط خَفِى অর্থাৎ مُدَلَّس ও مُرْسَل خَفِى -এর মধ্যে রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ -এর মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়াটা খুব সহজে জানা যায় না; বরং তা কেবল জানা যায় দু উপায়ে।

১. রাবী নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, আমার সাক্ষাৎ مَرْوِىْ عَنْهُ -এর সাথে হয়নি। যেমন– আলী ইবনে খাশরাম ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে ছিলাম। তিনি عَنِ الزُّهْرِىْ বলে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইমাম যুহরী আপনাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি এ প্রশ্নে চুপ করে যান। পুনরায় قَالَ الزُّهْرِىْ বলে হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে আবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি ইমাম যুহরী থেকে শুনেছেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি এ হাদীসটি ইমাম যুহরী থেকে শুনিনি এবং তার থেকেও শুনিনি; যিনি ইমাম যুহরী থেকে শুনেছেন; বরং حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ অর্থাৎ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক, তাকে বর্ণনা করেছেন মা'মার, তাকে বর্ণনা করেছেন ইমাম যুহরী।

২. হাদীসের কোনো ইমাম দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার সংবাদ দেবেন। যেমন– আওয়াম ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَالَ بِلَالٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ نَهَضَ وَكَبَّرَ .

কারণ হলো, হযরত ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের বেলায় বলেন যে, আওয়াম ইবনে হাওশাব আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফাকে পাননি। অর্থাৎ তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, আওয়াম ও আব্দুল্লাহ-এর মাঝখানে একজন রাবীর পতন হয়েছে।

রাবী বৃদ্ধি পাওয়াটা সাক্ষাৎ না হওয়ার দলিল নয় : যদি অপর কোনো সনদে রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ -এর মাঝে এক বা একাধিক রাবী বেড়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা রাবী ও مَرْوِىْ عَنْهُ -এর মাঝে সাক্ষাৎ না হওয়াটা প্রমাণিত হবে না। কারণ, হতে পারে এ সনদে রাবী বেড়ে গেছে যা প্রথম সনদে নেই। যাকে পরিভাষায় اَلْمَزِيْدُ فِىْ مُتَّصِلِ الْاَسَانِيْدِ বলে। আর তা বলা হয়, রাবী সনদে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে

ثُمَّ الطَّعْنُ يَكُوْنُ بِعَشَرَةِ اَشْيَاءَ بَعْضُهَا اَشَدُّ فِى الْقَدْحِ مِنْ بَعْضٍ خَمْسَةٌ مِنْهَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَدَالَةِ وَخَمْسَةٌ يَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ وَلَمْ يَحْصُلِ الْاِعْتِنَاءُ بِتَمْيِيْزِ اَحَدِ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْاٰخَرِ لِمَصْلَحَةٍ اِقْتَضَتْ ذٰلِكَ وَهِىَ تَرْتِيْبُهَا عَلَى الْاَشَدِّ فَالْاَشَدُّ فِىْ مُوْجَبِ الرَّدِّ عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَلِّىْ ـ

অনুবাদ : অভিযোগ হয় দশটি কারণে, দূষণীয়তার দিক দিয়ে যার কোনোটি অপেক্ষা কোনোটি অধিক গুরুতর। এর মধ্যে পাঁচটি হলো আদালাত বা দীনদারি সম্পর্কিত আর পাঁচটি আয়ত্তশক্তি সম্পর্কিত। এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিকে পৃথক করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি একটি কল্যাণ চিন্তায় যা এরূপ দাবি করেছে। আর তা হলো, প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে গুরুতর হবার দিক দিয়ে নিম্ন ক্রমানুসারে সাজানো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَعْن -এর অর্থ : হাদীস মারদূদ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ طَعْن । এর আভিধানিক অর্থ– বর্শা মারা, দোষ লাগানো। পরিভাষায় طَعْن বলা হয়, সুনির্দিষ্ট কতক কারণে রাবী দোষী ও অভিযুক্ত হওয়া। যে হাদীসের রাবীর মধ্যে দোষগুলো পাওয়া যায় সে হাদীসকে حَدِيْث مَطْعُوْن বা অভিযুক্ত হাদীস বলে।

اَسْبَاب طَعْن -এর সংখ্যা : اَسْبَاب طَعْن বা দোষের কারণগুলো মোট দশটি। অর্থাৎ রাবী সাধারণত দশটি কারণে দোষী ও অভিযুক্ত হয়। এর মধ্য হতে কতক অপর কতক হতে গুরুতর। আর সে দশটি কারণ নিম্নরূপ :

১. اَلْكِذْبُ فِىْ حَدِيْثِ النَّبِوِىِّ : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর নামে অন্তত একটি হাদীস জাল করা।
২. اَلتُّهْمَةُ بِالْكِذْبِ : অর্থাৎ মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলা অথবা একক রাবীর বর্ণিত হাদীস শরিয়তের قَوَاعِد مَعْلُوْمَة অথবা سُنَّة مُتَوَاتِرَة কিংবা বিশুদ্ধ قِيَاس -এর খেলাপ হওয়া।
৩. اَلْفِسْقُ : অর্থাৎ রাবীর কবীরা গুনাহ করা অথবা সগীরা গুনাহ বারবার করা।
৪. اَلْبِدْعَةُ : অর্থাৎ রাবী বিদআতি হওয়া।
৫. اَلْجَهَالَةُ : অর্থাৎ রাবী مَجْهُوْل বা অজ্ঞাত হওয়া।
৬. فُحْشُ الْغَلَطِ : অর্থাৎ রাবীর রেওয়ায়েতে প্রচুর ভুল হওয়া।
৭. كَثْرَةُ الْغَفْلَةِ : অর্থাৎ রাবীর উদাসীনতা বেশি হওয়া।
৮. اَلْوَهْمُ : অর্থাৎ রাবীর সংশয় ও দোদুল্যমানতার সাথে বর্ণনা করা।
৯. مُخَالَفَةُ الثِّقَاةِ : অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীর খেলাপ করা।
১০. سُوْءُ الْحِفْظِ : অর্থাৎ স্মরণশক্তি এত দুর্বল হওয়া যে, ভুলের চেয়ে সঠিকের সংখ্যা কম হয়।

এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি আদালাত তথা দীনদারি সম্পর্কিত আর শেষ পাঁচটি হলো ضَبْط তথা আয়ত্তশক্তি সম্পর্কিত।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : সম্মানিত লেখক ...وَلَمْ يَحْصُلِ الْاِعْتِنَاءُ বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক আদালাত সংক্রান্ত اسباب طعن এবং ضَبْط সংক্রান্ত اَسْبَاب طَعْن পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ না করে এক প্রকারকে আরেক প্রকারের সাথে মিলিয়ে কেন উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হিসেবে লেখক যা বলেছেন তার সারকথা হলো, اَسْبَاب طَعْن উল্লেখের ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য হলো দশটি কারণের মধ্যে যেটি অভিযোগ বা দোষ হিসেবে অধিক গুরুতর সেটিকে প্রথমে উল্লেখ করা, এরপর যেটা অধিক দোষের সেটি উল্লেখ করা– এভাবে দোষের ক্রমানুপাতে একটির পরে একটি উল্লেখ করা। যেহেতু এক এক শ্রেণিকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করতে গেলে এ লক্ষ্য ঠিক থাকে না, তাই শ্রেণিগতভাবে উল্লেখ করা হলো না। আর তা ঠিক না থাকার কারণ হলো, এক নম্বরে যেটি বেশি গুরুতর সেটি হয়তো আদালাত সংক্রান্ত; কিন্তু দ্বিতীয় নম্বরে যেটি বেশি গুরতর সেটি হয়তো ضَبْط সংক্রান্ত– এভাবে অন্যগুলো দু প্রকারের মধ্যে মিশ্রিত আকারে রয়েছে।

لِاَنَّ الطَّعْنَ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ لِكِذْبِ الرَّاوِىْ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ بِاَنْ يَرْوِىَ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّدًا لِذٰلِكَ اَوْ تُهْمَتِهٖ بِذٰلِكَ بِاَنْ لَا يَرْوِىَ ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ اِلَّا مِنْ جِهَتِهٖ وَيَكُوْنَ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُوْمَةِ وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكِذْبِ فِىْ كَلَامِهٖ وَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوْعُ ذٰلِكَ فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ وَهٰذَا دُوْنَ الْاَوَّلِ اَوْ فُحْشِ غَلَطِهٖ اَىْ كَثْرَتِهٖ اَوْ غَفْلَتِهٖ عَنِ الْاِتْقَانِ اَوْ فِسْقِهٖ بِالْفِعْلِ اَوِ الْقَوْلِ مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ الْكُفْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَوَّلِ عُمُوْمٌ وَاِنَّمَا اُفْرِدَ الْاَوَّلُ لِكَوْنِ الْقَدْحِ بِهٖ اَشَدَّ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ وَاَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ فَسَيَاْتِىْ بَيَانُهُ اَوْ وَهْمِهٖ بِاَنْ يَرْوِىَ عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَهُّمِ اَوْ مُخَالِفَتِهٖ اَىْ لِلثِّقَاتِ اَوْ جَهَالَتِهٖ بِاَنْ لَا يُعْرَفَ فِيْهِ تَعْدِيْلٌ وَلَا تَجْرِيْحٌ مُعَيَّنٌ اَوْ بِدْعَتِهٖ وَهِىَ اِعْتِقَادُ مَا اُحْدِثَ عَلٰى خِلَافِ الْمَعْرُوْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ لَا بِمُعَانَدَةٍ بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ اَوْ سُوْءِ حِفْظِهٖ وَهِىَ عِبَارَةٌ اَنْ لَا يَكُوْنَ غَلَطُهُ اَقَلَّ مِنْ اِصَابَتِهٖ ـ

অনুবাদ : কেননা, হয়তো অভিযোগটি হবে হাদীসে নববীর ব্যাপারে রাবীর মিথ্যাচারিতার কারণে। আর তা এভাবে যে, রাবী নবী করীম ﷺ থেকে ইচ্ছাপূর্বক এমন কথা রেওয়ায়েত করবে, যা তিনি বলেননি। অথবা (অভিযোগটা হবে) মিথ্যাবাদিতার সাথে তা অভিযুক্ত হওয়ার কারণে। আর তা এভাবে যে, সে একাই কোনো হাদীস বর্ণনা করবে, অথচ হাদীসটি (শরিয়তের) সর্বজনবিদিত মূলনীতির পরিপন্থি হবে। যেমনি কোনো ব্যক্তি যদি এরূপ হয় যে, হাদীস বর্ণনায় তো তার মিথ্যাচারের প্রমাণ নেই, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলে থাকে বলে জানা যায়। এটি (দ্বিতীয় সুরতটি অর্থাৎ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা) প্রথমটি (সর্বজনবিদিত মূলনীতির পরিপন্থি হওয়া) অপেক্ষা কম গুরুতর। অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর অধিক ভুলের কারণে। অথবা সংরক্ষণে উদাসীনতার কারণে। অথবা কুফরির পর্যায়ে পৌঁছে না– এমন কাজে বা কথায় ফাসেকী করার কারণে। ফিসক এবং প্রথমটার (মিথ্যাবাদিতার) মধ্যে আম-খাস মুতলাকের সম্পর্ক। (ফিসক আম আর মিথ্যাচারিতা খাস।) হাদীসশাস্ত্রে প্রথম অভিযোগটি সবচেয়ে মারাত্মক ও দূষণীয় হওয়ায় তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আকিদাগত ফিসকের আলোচনা অচিরেই সামনে আসবে। অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর সংশয়ের কারণে। অর্থাৎ সে হাদীস সংশয় ও দোদুল্যমানতার সাথে বর্ণনা করে। অথবা (অভিযোগটা হবে) ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা করার কারণে। অথবা তার অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। অর্থাৎ তার সম্পর্কে সত্যায়ন (তা'দীল) কিংবা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ (জরাহ) কোনো কিছু জানা যায় না। অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর বিদআতি হবার কারণে। আর বিদআত হলো, নবী করীম ﷺ থেকে যা জানা গেছে তার বিপরীত উদ্ভাবিত বিষয়ের ব্যাপারে (শরিয়ত হওয়ার) বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে তা বৈরিতা কিংবা হটকারিতার সাথে নয়; বরং একপ্রকার সন্দেহের মাধ্যমে (যা ভ্রান্ত দলিল হতে সৃষ্ট হয়েছে)। অথবা (অভিযোগটা হবে) রাবীর স্মৃতিবিভ্রাটের কারণে। অর্থাৎ আর স্মৃতিবিভ্রাট হলো, তার ভুলটা সঠিকতার চেয়ে কম না হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كِذْبُ رَاوِيْ -এর মর্মার্থ : كِذْبُ رَاوِيْ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– রাবীর মিথ্যা বলা। তবে এখানে যে কোনো মিথ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে এমন কথা রেওয়ায়েত করা, যা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেননি। চাই এটা যে কোনো একটি হাদীসের বেলায় হোক না কেন।

اَلتُّهْمَةُ بِالْكِذْبِ -এর মর্মার্থ : এ সুরতে রাবী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন না; বরং তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সন্দেহ করা হয়। আর তা দু কারণে। যথা–

১. এমন হাদীস রেওয়ায়েত করে, যা কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য মূলনীতির পরিপন্থি হয় এবং হাদীসটি কেবল সেই বর্ণনা করে।

২. হাদীসে নববীর বর্ণনায় মিথ্যা বলাটা প্রকাশ না পেলেও সাধারণ কথাবার্তায় সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। এ দু সুরতের মধ্যে প্রথমটি অভিযোগ হিসেবে দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিক মারাত্মক।

فُحْشُ غَلَطٍ -এর মর্মার্থ : এর অর্থ হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করা। আর তা এভাবে যে, সঠিক হওয়ার চেয়ে ভুল হওয়াটাই বেশি হয় অথবা বরাবর হয়।

فِسْقُ رَاوِيْ -এর মর্মার্থ : فِسْقُ رَاوِيْ অর্থ– রাবীর গুনাহগার হওয়া। এটা দুভাবে হতে পারে।

১. কাজে-কর্মে। যেমন– রাবী মদ পান করে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ইত্যাদি।

২. কথায়। যেমন– গিবত-শেকায়েত করা ইত্যাদি। তবে এ গুনাহের কথা বা কাজ এমন পর্যায়ের না হওয়া চাই, যা কুফর পর্যন্ত পৌছে দেয়। যদি তা কুফর পর্যন্ত পৌছে দেয়, তাহলে তার হাদীস অনিবার্যভাবে মারদূদ হবে।

كِذْبُ رَاوِيْ -কে পৃথকভাবে উল্লেখের কারণ : فِسْقُ رَاوِيْ টা كِذْبُ رَاوِيْ হতে عَام বা ব্যাপক। কারণ, كِذْبُ رَاوِيْ এটা কথার সাথে সীমিত। আর فِسْقٌ টা কথায়, কাজে, বিশ্বাসে হতে পারে। এ ব্যাখ্যা হিসেবে যদিও كِذْبُ رَاوِيْ টা فِسْقُ رَاوِيْ -এর মধ্যে শামিল রয়েছে তথাপিও كِذْبُ رَاوِيْ -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, দোষের দিক দিয়ে মিথ্যাচারিতাটা فِسْقٌ হতে অধিক মারাত্মক। এমনকি اَسْبَابُ طَعْنٍ -এর মধ্যে এটিই সবচেয়ে জঘন্য। অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যাচারীকে কাফিরও বলেছেন। মোটকথা, যেহেতু দোষ হিসেবে كِذْبُ رَاوِيْ সবচেয়ে জঘন্য এবং গুরুতর, এজন্য তার গুরুত্ব বুঝাতে তাকে স্বতন্ত্র শিরোনামে ও এক নম্বর দোষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَهْمُ رَاوِيْ -এর মর্মার্থ : وَهْمٌ অর্থ– ধারণা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, রাবী ধারণার পন্থায় রেওয়ায়েত করেন। যেমন– কখনো حَدِيْثُ مَوْقُوْف -কে مَرْفُوْع মনে করে রেওয়ায়েত করেন ইত্যাদি।

جَهَالَتُ رَاوِيْ -এর মর্মার্থ : جَهَالَتْ অর্থ– রাবী مَجْهُوْل তথা অজ্ঞাত হওয়া। আর এটা হয় তখন, যখন রাবীর আদালাত (আদিল হওয়া) সম্পর্কে জানা যায় না এবং তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দোষও মেলে না।

سُوْءُ حِفْظٍ -এর মর্মার্থ : سُوْءُ حِفْظٍ তথা স্মৃতিবিভ্রাট বলে, রাবীর সঠিক থেকে ভুল কম না হওয়া। চাই ভুলটা সঠিকের বরাবর হোক কিংবা তার চেয়ে বেশি। কারো ভুলটা সঠিকতা হতে কম হলে তার হাদীস মাকবূল হয়।

فَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ وَهُوَ الطَّعْنُ بِكَذِبِ الرَّاوِى فِى الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ هُوَ الْمَوْضُوْعُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ اِنَّمَا هُوَ بِطَرِيْقِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَا بِالْقَطْعِ اِذْ قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُوْبُ لٰكِنْ لِاَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ يُمَيِّزُوْنَ بِهَا ذٰلِكَ وَاِنَّمَا يَقُوْمُ بِذٰلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِطِّلَاعُهٗ تَامًّا وَ ذِهْنُهٗ ثَاقِبًا وَفَهْمُهٗ قَوِيًّا وَمَعْرِفَتُهٗ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلٰى ذٰلِكَ مُتَمَكِّنَةٌ وَقَدْ يُعْرَفُ الْوَضْعُ بِاِقْرَارِ وَاضِعِهٖ قَالَ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ لٰكِنْ لَا يُقْطَعُ بِذٰلِكَ لِاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ كِذْبٌ فِىْ ذٰلِكَ الْاِقْرَارِ اِنْتَهٰى وَفُهِمَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ اَنَّهٗ لَا يُعْمَلُ بِذٰلِكَ الْاِقْرَارِ اَصْلًا لِكَوْنِهٖ كَاذِبًا وَلَيْسَ ذٰلِكَ مُرَادُهٗ ، وَاِنَّمَا نَفَى الْقَطْعَ بِذٰلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْقَطْعِ نَفْىُ الْحُكْمِ لِاَنَّ الْحُكْمَ يَقَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ وَهُوَ هُنَا كَذٰلِكَ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَتْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا لِاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَا كَاذِبَيْنِ فِيْمَا اعْتَرَفَا بِهٖ -

অনুবাদ : প্রথম প্রকারের অভিযোগ তথা হাদীসে নববীর মধ্যে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ থাকলে এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে বলে মাওযূ' তথা বানোয়াট বা জাল হাদীস। এ হাদীসকে মাওযূ' বলে সাব্যস্ত করা হয় প্রবলতর ধারণার ভিত্তিতে, নিশ্চয়তার সাথে নয়। কেননা, মিথ্যাবাদীও অনেক সময় সত্য কথা বলে। অবশ্য হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ এমন দৃঢ়বিচক্ষণতার অধিকারী হন যে, তারা তা পার্থক্য করতে পারেন।

কোনো হাদীসকে একমাত্র তিনিই মাওযূ' সাব্যস্ত করতে পারেন, যিনি পূর্ণরূপে অবগতি রাখেন, যার মেধা স্বচ্ছ, বোধশক্তি সুদৃঢ় এবং এ বিষয়ে নির্দেশক আলামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন।

কখনো কখনো কোনো হাদীস মাওযূ' বলে জানা যায় বানোয়াটকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, 'তবে এতে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কেননা, সে এ স্বীকারোক্তিতেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।' তাঁর এ বক্তব্য হতে অনেকেই বুঝেছেন যে, সে মিথ্যাবাদী হবার কারণে এ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, কিন্তু এটি তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি নাকচ করেছেন নিশ্চয়তাকে। আর নিশ্চয়তা নাকচ করার দ্বারা হুকুম বাতিল হয়ে যায় না। কেননা, প্রবলতার ধারণার ভিত্তিতেও হুকুম অবধারিত হয়। এখানেও তদ্রূপ। যদি তা না হতো, তাহলে হত্যা স্বীকারকারীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া কিংবা জেনা স্বীকারকারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করার অবকাশ থাকত না। কেননা, তাদের স্বীকারোক্তিতে মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসঙ্গ মাওযূ‘ হাদীস : أَسْبَاب طَعْن -এর প্রথম প্রকারের নাম حَدِيْث مَوْضُوْع। মাওযূ‘ হাদীস প্রসঙ্গে **৬টি** আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। যথা–

১. হাদীসে মাওযূ‘-এর সংজ্ঞা, ২. মাওযূ‘ চেনার পদ্ধতি ও আলামত, ৩. মাওযূ‘ বা জালকারীদের প্রকারভেদ, ৪. হাদীস জাল করার কারণ, ৫. হাদীস জাল করার হুকুম ও ৬. মাওযূ‘ হাদীস বর্ণনা করার **হুকুম**। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এ ৬টি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

১. হাদীসে মাওযূ‘-এর সংজ্ঞা : নিজের থেকে কোনো সনদ বানানো অথবা নিজে কোনো কথা বানিয়ে হাদীস বলে প্রচার করার নাম 'হাদীস তৈরি'। যে হাদীসের সনদ বা মতন এভাবে জাল করে তৈরি করা হয়, তাকে حَدِيْث مَوْضُوْع বা জাল হাদীস বলে। যে এরূপ জাল হাদীস তৈরি করে, তাকে বলে وَاضِع حَدِيْث বা হাদীস জালকারী। وَضْع -এর আভিধানিক অর্থ– উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা।

حَدِيْث مَوْضُوْع -এর উপরিউক্ত সংজ্ঞা হতে সহজেই অনুমিত হয় যে, মাওযূ‘ দু প্রকার। ১. নিজের পক্ষ হতে সনদ বানালে তাকে বলে مَوْضُوْعُ الْإِسْنَادِ বা জাল সনদ, আর ২. নিজের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে হাদীস বলে প্রচার করলে তাকে বলে مَوْضُوْعُ الْمَتْنِ বা জাল মতন (হাদীস)। কখনো একটি হাদীসের পুরো মতন তথা কথাই জাল হয় আবার কখনো অংশবিশেষ জাল হয়। এই জাল অংশটুকু হাদীসের শুরু, শেষ কিংবা মধ্যখান সব স্থানেই হতে পারে। সর্বপ্রথম হাদীস জাল করে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। (লিসানুল মীযান)

আরবিতে اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ -এর সংজ্ঞা হলো :

هُوَ الْحَدِيْثُ الْمُخْتَلَقُ الْمَكْذُوْبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যা করে রচনা করা হয়, তাকে الحديث الموضوع বলে।

২. মাওযূ‘ চেনার পদ্ধতি ও আলামত : কোনো হাদীসের উপর 'জাল' হুকুম আরোপ করাটা নিশ্চয়তার সাথে হয় না; বরং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হয়। কারণ হলো, সত্যবাদী যেমন মিথ্যা বলতে পারে, তেমনি মিথ্যাবাদীও কখনো সত্য কথা বলে। তাই সম্ভব আছে, রাবী কোনো এক হাদীসের বেলায় মিথ্যার কারসাজি করলেও এ হাদীসে সে সত্যবাদী।

হাদীস মাওযূ‘ তথা জাল কি জাল না– তা চেনার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা–

١- لِأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيْثِ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ يُمَيِّزُوْنَ بِهَا ذٰلِكَ .

১. অর্থাৎ 'হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এমন দৃঢ়বিচক্ষণতার অধিকারী হন যে, তারা জাল হাদীসকে আসল হাদীস থেকে পৃথক করতে পারেন।' তবে এ পার্থক্য সবাই করতে পারে না; বরং যিনি হাদীস সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি রাখেন, যার মেধা স্বচ্ছ, বোধশক্তি সুদৃঢ় এবং এ বিষয়ে নির্দেশক আলামত সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান রাখেন; তিনিই কেবল এ পার্থক্য করতে পারেন, মাওযূ‘ হলে তা ধরতে পারেন।

ইমাম দারাকুতনী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাগদাদবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আপনারা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হন যে, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, কেউ নবী করীম ﷺ -এর নামে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে পার পাবে না; আমার কাছে তা ধরা পড়বেই।

অনুরূপভাবে রবী ইবনে হায়ছাম বলেন, দিনের মতো হাদীসের একটি নূর আছে, যা আমি ভালোভাবেই চিনি। এমনিভাবে রাতের মতো জাল হাদীসের একটি অন্ধকার আছে, যা সহজেই আমার চোখে ধরা পড়ে। অর্থাৎ হাদীস মাত্রই নূর যা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে। পক্ষান্তরে হাদীসের সাথে অন্য কিছু মিশ্রণ ঘটলে তা অন্ধকারের ন্যায় চোখে ধরা পড়ে।

٢- وَقَدْ يُعْرَفُ الْوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ.

২. 'জাল' চেনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, জালকারীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি। যেমন– নূহ ইবনে আবী মারয়াম মারওযী নিজে স্বীকার করেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কুরআনের ফজিলতের ব্যাপারে আপনি হযরত ইকরিমার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন, অথচ হযরত ইকরিমার অন্যান্য ছাত্ররা তো এ হাদীস রেওয়ায়েত করে না। জবাবে তিনি বলেন, যখন আমি দেখলাম মানুষ ফিক্হে আবী হানীফা এবং মাগাযীয়ে ইসহাক চর্চায় অধিক লিপ্ত, তখন আমি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে এ হাদীস জাল করি।

একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন : জালকারীর স্বীকারোক্তির ব্যাপারে ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, জালকারীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হাদীসের উপর 'জাল'-এর হুকুম দেওয়াটা একিনী (নিশ্চিতভাবে) নয়। কেননা, হতে পারে সে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিচ্ছে।

ইবনে দাকীকুল ঈদের কথা হতে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) এটা বুঝেছেন যে, জালকারীর স্বীকারোক্তির কোনো ধর্তব্য নেই এবং এ স্বীকারের ভিত্তিতে হাদীসকে 'জাল' বলা হবে না। কিন্তু বাস্তব তথ্য হলো, ইবনে জাওযী (র.) -এর এ ধারণা ও বুঝাটা সঠিক নয়। কারণ, ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.) 'জাল'-এর قَطْعِیْ তথা অকাট্য হওয়াকে নাকচ করেছেন মূল 'জাল' হওয়াকে নাকচ করেননি; বরং তা ظَنّ غَالِبْ -এর দ্বারা জাল হিসেবেই সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর 'জাল'-এর হুকুম আরোপিত হবে। যেমনিভাবে জালকারী ছাড়া অন্য কেউ 'জাল' হিসেবে সনাক্ত করলে সেটিও ظَنّ غَالِبْ -এর ভিত্তিতে হয়, অকাট্যভাবে নয়।

শরিয়তের হুকুম অধিকাংশ ظَنّ غَالِبْ -এর ভিত্তিতে হয়। কারণ, যদি ظَنّ غَالِبْ -এর ধর্তব্য না হতো, তাহলে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যার কথা স্বীকার করে তাকে কিসাসের হুকুম দেওয়া জায়েজ হতো না। অনুরূপ যে ব্যক্তি নিজে জেনার কথা স্বীকার করে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা জায়েজ হতো না। কারণ, এখানে এ সম্ভাবনা থাকে যে, তারা নিজ স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ মিথ্যাভাবে নিজেকে খুনী ও ব্যভিচারী বলছে। সুতরাং এখানে তাদের নিজস্ব স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও যখন কিসাস এবং রজমের হুকুম দেওয়া হয়, তেমনি যে নিজে 'জাল' করেছে বলে স্বীকার করবে, তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ঐ হাদীসটিকে 'জাল' হিসেবে হুকুম দেওয়া হবে।

وَمِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِى يُدْرَكُ بِهَا الْوَضْعُ مَا يُوْجَدُ مِنْ حَالِ الرَّاوِىْ كَمَا وَقَعَ
لِمَامُوْنِ بْنِ اَحْمَدَ اَنَّهُ ذُكِرَ بِحَضْرَتِهِ الْخِلَافُ فِىْ كَوْنِ الْحَسَنِ سَمِعَ عَنْ
اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَوْ لَا ، فَسَاقَ فِى الْحَالِ اِسْنَادًا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَمَا
وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ
فَسَاقَ فِى الْحَالِ اِسْنَادًا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا سَبَقَ اِلَّا فِىْ نَصْلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ جَنَاحٍ فَزَادَ فِى
الْحَدِيْثِ اَوْ جَنَاحٍ فَعَرَفَ الْمَهْدِيُّ اَنَّهُ كَذَبَ لِاَجْلِهِ فَاَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ
وَمِنْهَا مَا يُوْجَدُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ كَاَنْ يَكُوْنَ مُنَاقِضًا لِنَصِّ الْقُرْاٰنِ اَوِ
السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ اَوِ الْاِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ اَوْ صَرِيْحِ الْعَقْلِ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ شَيْءٌ
مِنْ ذٰلِكَ التَّاوِيْلِ ، ثُمَّ الْمَرْوِيُّ تَارَةً يَخْتَرِعُهُ الْوَاضِعُ وَتَارَةً يَاْخُذُ مِنْ كَلَامِ
غَيْرِهِ كَبَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ اَوْ قُدَمَاءِ الْحُكَمَاءِ اَوِ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ اَوْ
يَاْخُذُ حَدِيْثًا ضَعِيْفَ الْاِسْنَادِ فَيُرَكِّبُ لَهُ اِسْنَادًا صَحِيْحًا لِيُرَوِّجَ .

অনুবাদ : আরো যেসব আলামত দ্বারা মাওযূ' হাদীস চেনা যায় তার মধ্যে একটি হলো, রাবীর অবস্থা। মামূন ইবনে আহমাদ-এর বেলায় যেমন হয়েছিল। তার সামনে একদিন আলোচনা চলছিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হযরত হাসান বসরী (র.) হাদীস শুনেছেন কিনা তা নিয়ে। তৎক্ষণাৎ সে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত একটি সনদ উল্লেখ করে বসল। যাতে তিনি ﷺ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাসান বসরী শুনেছেন।

এমনিভাবে গিয়াছ ইবনে ইবরাহীমের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত একটি সনদ সহকারে বর্ণনা করল– "নবী করীম ﷺ পর্যন্ত বলেছেন, প্রতিযোগিতায় বাজি ধরা বৈধ নয়– শুধুমাত্র তীরন্দাজি, উট চালনা, ঘোড়া চালনা ও কবুতর উড়ানো ব্যতীত।" হাদীসের মধ্যে সে (খলীফার তোষামোদ করতে গিয়ে) 'কবুতর উড়ানোর' কথাটি বাড়িয়ে বলেছে। মাহদী বুঝে ফেললেন যে, তাঁরই কারণে সে মিথ্যা বলেছে। তাই তিনি কবুতরটি জবাই করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

মাওযূ' হাদীসের আরেকটি আলামত হলো, খোদ হাদীসের অবস্থা। তা যদি কুরআন মাজীদের বর্ণনা, মুতাওয়াতির হাদীস, অকাট্য ইজমা কিংবা সুস্পষ্ট জ্ঞানের এমন বিরোধী হয় যে, কোনো প্রকারেই ব্যাখ্যা মেনে নেয় না, তাহলে সে হাদীসও মাওযূ' বলে গণ্য হতে বাধ্য।

মাওযূ' হাদীস কখনো কখনো ব্যক্তি নিজেই তৈরি করে, আবার কখনো অন্যের কথা থেকে গ্রহণ করে। যেমন– পূর্ববর্তী মনীষীগণ বা কোনো প্রাচীন দার্শনিক কিংবা ইসরাঈলীদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিকে মহানবী ﷺ -এর হাদীস বলে চালিয়ে দিল। আবার কখনো বা এমন হয় যে, একটি হাদীস বলল যার সনদ দুর্বল। তারপর সেটিকে চালু করার জন্য তার জন্য একটি শক্তিশালী সনদ উদ্ভাবন করল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাওযূ' হাদীস চেনার তৃতীয় পদ্ধতি হলো- ٣- يُدْرَكُ بِهَا الْوَضْعُ مَا يُوْجَدُ مِنْ حَالِ الرَّاوِيْ

৩. রাবীর অবস্থা দেখে জানা যায়। অর্থাৎ রাবীর অবস্থাই বলে দেয় যে, তার বর্ণিত হাদীসটি বানোয়াট ও জাল। এর দুটি ঘটনা নিম্নরূপ-

১. **মামূন ইবনে আহমাদের ঘটনা :** হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীস শুনেছেন কিনা তা নিয়ে একবার মামূন ইবনে আহমাদের সামনে লোকদের মতান্তর ঘটে। তিনি মতভেদ নিরসনার্থে তৎক্ষণাৎ একাট হাদীস তৈরি করেন, যার মধ্যে এ কথা বর্ণিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাসান বসরী আবূ হুরায়রা হতে হাদীস শুনেছেন।

২. **খলীফা মাহদীর দরবারে গিয়াছ ইবনে ইবরাহীমের ঘটনা :** জগদ্বিখ্যাত খলীফা হারুনুর রশীদের পিতা মাহদীর দরবারে একবার গিয়াছ ইবনে ইবরাহীম নখয়ী এসে দেখেন খলীফা কবুতর নিয়ে খেলছেন। গিয়াছ তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا سَبَقَ اِلَّا فِىْ نَصْلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ اَوْ جَنَاحٍ

গিয়াছ হাদীসটি বর্ণনায় খলীফাকে খুশি করতে হাদীসের শেষে او جناح শব্দটুকু নিজের পক্ষ থেকে জুড়ে দেন, যা মূলত হাদীসের অংশ নয়। কিন্তু খলীফা বিষয়টি বুঝতে পারেন যে, সে তাকে খুশি ও তোষামোদ করতে এ অংশ হাদীসে যোগ করেছে। ফলে তিনি গিয়াছের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং কবুতর জবাই করার নির্দেশ দেন, যাতে আর কখনো কবুতর হাদীস জাল করার কারণ না হয়।

আলোচ্য দু ঘটনায় রাবীরা তাদের হাদীস জাল করেছে। তবে প্রথম ঘটনায় বর্ণিত পুরো হাদীসটি জাল বা বানোয়াট আর দ্বিতীয় ঘটনায় শেষ অংশটুকু জাল মাত্র। আর এগুলোর জাল হওয়া জানা গেছে রাবীর অবস্থা দ্বারা।

হাদীস জাল চেনার চতুর্থ পদ্ধতি হলো- ٤- مَا يُوْجَدُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِىْ

৪. অর্থাৎ জাল চেনা যায় খোদ হাদীসের অবস্থা দেখে। অর্থাৎ হাদীসটি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও বিবেকের বিরোধী হয় যে, কোনো প্রকারেই ব্যাখ্যা মেনে নেয় না।

এর উদাহরণ হিসেবে হাফিজ যাহাবী (র.) মীযানে عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ সূত্রে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন- اِنَّ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) -এর নৌকা কা'বা শরীফ তওয়াফ করেছে এবং মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে দু রাকআত নামাজ পড়েছে।

যেহেতু নৌকা হয়ে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা ও মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়া অসম্ভব, তাই খোদ হাদীসটিই প্রমাণ করে যে, সেটি জাল।

মোটকথা, সম্মানিত লেখক এখানে মাওযূ' বা জাল হাদীস চেনার ৪টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১. মুহাদ্দিসীনে কেরামের যোগ্যতা, ২. জালকারীর স্বীকারোক্তি, ৩. রাবীর অবস্থা এবং ৪. খোদ হাদীস। তবে অন্যান্য কিতাবে এ ৪টি ছাড়াও আরও অনেক নিদর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা মাওযূ' হাদীস চেনা যায়।

৩. **মাওযূ' বা জালকারীদের প্রকারভেদ :** মাওযূ' বা হাদীস জালকারী তিন প্রকারের হয়। যথা-

১. কখনো নিজেই হাদীসটি তৈরি করে।

২. কখনো অন্যের কথাকে যেমন পূর্ববর্তী কোনো মনীষীর উক্তি, দার্শনিকের উক্তি, ইসরাঈলী রেওয়ায়েতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি উল্লেখ করে।

৩. কেউ কেউ যা'ঈফ হাদীসের সাথে সহীহ সনদ যোগ করে, যাতে হাদীসটি সনদের শক্তিতে সমাজে চালু হয়ে যায় এবং সবাই কবুল করে নেয়।

وَالْحَامِلُ لِلْوَاضِعِ عَلَى الْوَضْعِ إِمَّا عَدَمُ الدِّيْنِ كَالزَّنَادِقَةِ أَوْ غَلَبَةُ الْجَهْلِ كَبَعْضِ الْمُتَعَبِّدِيْنَ أَوْ فَرْطُ الْعَصَبِيَّةِ كَبَعْضِ الْمُقَلِّدِيْنَ أَوْ اِتِّبَاعُ هَوٰى بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ أَوِ الْإِغْرَابُ لِقَصْدِ الْإِشْتِهَارِ .

অনুবাদ : জালকারীকে হাদীস জাল করতে উদ্বুদ্ধ করে হয়তো দীনদারি না থাকাটা, যেমন– যিন্দীকরা অথবা অজ্ঞতা প্রবল হওয়া, যেমন– কতিপয় আবেদরা অথবা অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব, যেমন– কোনো কোনো মুকাল্লিদ অথবা কোনো শাসকের মনোবৃত্তি অনুসরণ অথবা খ্যাতি লাভ ও প্রসিদ্ধ হওয়ার ইচ্ছায় অভিনব হাদীস পেশ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৪. হাদীস জাল করার কারণ : কয়েকটি কারণে মানুষ হাদীস জাল করে। যথা–

১. দীনহীনতা অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে বেদীনি দাখেল করে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা। যেমনটি যিন্দীক তথা বেদীন ও নাস্তিকরা করে থাকে।

হাম্মাদ ইবনে যায়েদের বর্ণনামতে যিন্দীকরা চৌদ্দ হাজার হাদীস জাল করেছে। আব্দুল করীম আওয়া নিজেই স্বীকার করে যে, আমি চার হাজার হাদীস জাল করেছি। এর মধ্যে অনেক হালাল বস্তুকে হারাম এবং অনেক হারাম বস্তুকে হালাল করেছি। মোটকথা, এরূপভাবে অনেকে হাদীস জাল করেছে কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এ সকল জাল হাদীস চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অনেকে স্বতন্ত্র কিতাবও লেখেছেন।

২. অজ্ঞতা প্রাধান্য পাওয়া। যেমন– অজ্ঞ সূফী-দরবেশ এবং মূর্খ আবেদরা তারগীব (আশামূলক) ও তারহীব (ভীতিমূলক) বিষয়ে হাদীস বানায়। যেমন– লাইলাতুল বরাত (শবে বরাত) সহ অন্যান্য বিশেষ রাতের নামাজ সম্পর্কীয় হাদীস।

হাদীস রচনাকারীদের মধ্যে অজ্ঞ সূফীরাই দীন ও তাদের নিজেদের জন্য বেশি ক্ষতিকর। কারণ, তারা হাদীস জাল করাকে দীনদারি মনে করে। তারা এতে ছওয়াবেরও আশা রাখে। ফলে তাদের পক্ষে জাল হাদীস পরিহার করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মানুষ যেহেতু তাদেরকে দীনদার ও ধর্মপ্রাণ মনে করে তাদেরকে মান্য করে থাকে, তাই অতি সহজে মানুষ তাদের জাল হাদীস চক্রান্তের কবলে পড়ে যায়।

৩. অন্ধ পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ স্বীয় মাযহাবের প্রতি অধিক দুর্বলতা ও পক্ষপাতহেতু নিজের মাযহাবের সমর্থন, প্রাধান্যদান কিংবা নিজের ইমামের মর্যাদা বর্ণনায় কখনো জাল হাদীস তৈরি করে। যেমন– মাযহাবলম্বীরা করে থাকে। মাযহাবের টানে হাদীস জালকারীদের মধ্যে একজন হলেন মামূন ইবনে আহমাদ হারুবী। তার রচিত হাদীসের মধ্য হতে একটি হলো নিম্নরূপ–

يَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ يَكُوْنُ اَضَرَّ عَلٰى اُمَّتِيْ مِنْ اِبْلِيْسَ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে আমার উম্মতের জন্য ইবলিস অপেক্ষা অধিক ক্ষতির কারণ হবে।

মাযহাবী টানে জালকৃত আকেকটি হাদীসের নমুনা হলো– اَبُوْ حَنِيْفَةَ سُرُجُ اُمَّتِى
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আবূ হানীফা আমার উম্মতের সূর্য।

৪. শাসকের সন্তুষ্টি কামনা। অর্থাৎ শাসকের নৈকট্যার্জন বা তার প্রিয়পাত্র হতে তার **কাজ** বা অভিমতের স্বপক্ষে হাদীস বানানো। যেমনটি গিয়াছ ইবনে ইবরাহীম খলীফা মাহদীর **জন্য জাল** হাদীস বানিয়েছিল।

৫. অভিনব হাদীস বর্ণনা করা। অর্থাৎ বড় মুহাদ্দিস, বড় আলিম বলে খ্যাতি লাভ এবং সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের আশায় বানিয়ে বানিয়ে অভিনব হাদীস বয়ান করা।

সম্মানিত লেখক হাদীস জাল করার এ পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন। তবে এ ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

৬. টাকা-পয়সা লাভ। অর্থাৎ হাদীস শুনিয়ে পুরস্কার লাভের আশায় হাদীস জাল করে। যেমনটি আবূ সাঈদ মাদায়েনী করেছিল।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ ত্বয়ালিসী ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন মসজিদে রিসাফাতে নামাজ পড়েন। তাঁদের সামনে এক ব্যক্তি এসে এভাবে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করে যে,

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ

লোকটির হাদীস বর্ণনা করার মাঝে ইমাম আহমদ (র.) ইবনে মাঈনের দিকে তাকান অনুরূপ ইবনে মাঈনও ইমাম আহমদ (র.) -এর দিকে তাকান। ইমাম আহমদ (র.) ইবনে মাঈনকে বলেন, আপনি হাদীসটি তাকে বর্ণনা করেছেন? ইবনে মাঈন জবাবে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি হাদীসটি এইমাত্র তার মুখ থেকে শুনছি। লোকটি হাদীস বর্ণনা করা পর্যন্ত উভয় নীরব থাকেন। হাদীস বর্ণনা শেষ হলে ইবনে মাঈন তাকে কাছে আসতে বলেন। লোকটি পুরস্কার পাবার আশায় এগিয়ে যায়। ইবনে মাঈন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে হাদীসটি কে শুনিয়েছে? সে বলে, আহমদ ইবলে হাম্বল এবং ইবনে মাঈন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, আমি হলাম ইয়াহইয়া আর ইনি হলেন আহমদ ইবনে হাম্বল। আমরা তো এমন হাদীস কখনো শুনিনি। যদি তোমার মিথ্যা বলার একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে আমাদের ছাড়া অন্যদের কাছে বলতে। লোকটি বলে, আমি এতদিন শুনে আসছিলাম যে, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বোকা। আজ বাস্তবে তার প্রমাণ পেলাম। ইবনে মাঈন জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে আমি বোকা হলাম? জবাবে সে বলে, পৃথিবীতে আপনারা ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আহমদ ইবনে হাম্বল আর কেউ নেই? আমি আরও ১৭ আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে হাদীস লেখেছি। তার এ প্রলাপ শুনে ইমাম আহমদ (র.) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.)-কে বলেন, তাকে ছেড়ে দাও; চলে যাক। অতঃপর লোকটি তাঁদেরকে ব্যঙ্গ করতে করতে চলে যায়।

৭. স্বীয় অভিমত সমর্থন। অর্থাৎ নিজের রায় ও দাবির সমর্থন হিসেবেও হাদীস বানিয়ে থাকে। যেমন– বিতর্কের সময় বিতর্ককারীরা অনেক সময় করে।

وَكُلُّ ذٰلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يَعْتَدُّ بِهٖ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْكَرَّامِيَّةِ وَبَعْضَ الْمُتَصَوِّفَةِ نُقِلَ عَنْهُمْ إِبَاحَةُ الْوَضْعِ فِى التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ فَاعِلِهٖ نَشَأَ عَنْ جَهْلٍ لِأَنَّ التَّرْغِيْبَ وَالتَّرْهِيْبَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاتَّفَقُوْا عَلٰى أَنَّ تَعَمُّدَ الْكِذْبِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَبَالَغَ أَبُوْ مُحَمَّدِ الْجُوَيْنِيُّ فَكَفَّرَ مَنْ تَعَمَّدَ الْكِذْبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ : নির্ভরযোগ্য সকলেই এর প্রত্যেকটি হারাম হবার ব্যাপারে একমত। তবে কিছু সংখ্যক কাররামিয়্যা ও তথাকথিত সূফী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা উৎসাহব্যঞ্জক ও সতর্কীকরণ বিষয়ে হাদীস বানোয়াট করা জায়েজ মনে করে। এটি নিতান্তই ভুল। তাদের এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে মূর্খতা থেকে। কেননা, দীনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আজাব থেকে সতর্কীকরণ শরয়ী আহকামেরই অন্তর্গত। উম্মতে মুহাম্মাদীয় অধিকাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা কবীরা গুনাহ। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ জুওয়াইনী আরো কঠিন মন্তব্য করেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করে তিনি তাকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৫. হাদীস জাল করার হুকুম : হাদীস জাল করার হুকুম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ :

১. **নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত :** তাঁদের সুচিন্তিত বাস্তব অভিমত হলো, যে কোনো উদ্দেশ্যে হাদীস বানানো হারাম এবং বড় বড় কবীরা গুনাহের অন্যতম।

২. **আবূ মুহাম্মাদ জুয়াইনী-এর অভিমত :** হাদীস বানানোর ব্যাপারে তাঁর অভিমত আরো কঠোর। স্বেচ্ছায় যারা হাদীস বানানোর মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে তিনি কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাবে শরয়ী হুকুমের দৃষ্টিতে তাঁর এ ফতোয়া ও অবস্থান সঠিক নয়। এমনকি তাঁর পুত্র ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী তাঁর পিতার এ ফতোয়া ও অবস্থানকে সঠিকতা বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেছেন।

৩. **কতিপয় কাররামিয়াদের অভিমত :** কতিপয় কাররামিয়া ও কতক সূফীর অভিমত হলো, তারগীব-তারহীব তথা শরয়ী ব্যাপারে উৎসাহিত ও ভীতি প্রদর্শন সম্বলিত হাদীস বানানো জায়েজ; বরং এটা ছওয়াবেরও কাজ বটে।

কিন্তু তাদের এ মতামত সঠিক নয়; বরং ভুল। শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু তাদের থেকে এ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, তারা তারগীব-তারহীবকে শরয়ী আহকামের বাইরের বিষয় বলে মনে করেছে। অথচ বাস্তব কথা হলো, এগুলো শরয়ী আহকামেরই অন্তর্গত বিষয়। সুতরাং যেরূপভাবে শরিয়তের অন্যান্য আহকামের ব্যাপারে হাদীস বানানো জায়েজ নয়, তেমনি তারগীব-তারহীব বিষয়েও হাদীস বানানো বৈধ নয়। মোটকথা, হাদীস বানানোর ব্যাপারে তিন ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। ১. জায়েজ, ২. কুফর ও ৩. কবীরা গুনাহ। এর মধ্যে জায়েজ ও কুফর-এর উক্তি সঠিক নয়। এর বিপরীতে হারাম ও কবীরা গুনাহ– এই উক্তিটিই শরয়ী হুকুম হিসেবে সর্বোচ্চ সঠিক ও যথার্থ। আর এটিই হলো হাদীস জাল করার ব্যাপারে জুমহুরের অভিমত।

وَاتَّفَقُوْا عَلٰى تَحْرِيْمِ رِوَايَةِ الْمَوْضُوْعِ اِلَّا مَقْرُوْنًا بِبَيَانِهٖ لِقَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَالْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنْ اَقْسَامِ الْمَرْدُوْدِ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ بِسَبَبِ تُهْمَةِ الرَّاوِىْ بِالْكِذْبِ هُوَ الْمَتْرُوْكُ ، وَالثَّالِثُ الْمُنْكَرُ عَلٰى رَاْىِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِى الْمُنْكَرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ ، وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهٗ اَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهٗ اَوْ ظَهَرَ فِسْقُهٗ فَحَدِيْثُهٗ مُنْكَرٌ۔

অনুবাদ : ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মাওযূ' হাদীস বর্ণনা করাও হারাম। তবে যদি সাথে সাথে বলে দেওয়া হয় যে, এটি মাওযূ' হাদীস, তাহলে বর্ণনা করা যাবে। (হারাম হওয়ার দলিল) কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ۔

যে ব্যক্তি আমার বরাত দিয়ে এমন কোনো কথা বর্ণনা করবে যে সম্পর্কে তার ধারণা হলো, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে অন্যতম মিথ্যাবাদী। (মুসলিম শরীফ)

প্রত্যাখ্যাত হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রাবীর মিথ্যাচারে অভিযুক্ত (সন্দেহভাজন) হবার করণে যা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাকে বলে মাতরূক। তৃতীয়টিকে বলে মুনকার। তবে তাদের মতে, যারা মুনকার হাদীসের সংজ্ঞায় বিরোধিতার শর্ত যোগ করেন না। তেমনি চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকারের নামও মুনকার। সুতরাং যার অধিক ভুল হবে কিংবা অধিক উদাসীনতা কিংবা যার দ্বারা ফাসেকী প্রকাশ পাবে, তার হাদীসকে বলা হবে মুনকার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৬. **মাওযূ' হাদীস বর্ণনা করার হুকুম :** হাদীস বানানোর মতো বানানো হাদীস মানুষের মাঝে বর্ণনা করাও হারাম এবং মারাত্মক কবীরা গুনাহ। দলিল হলো মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি– مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

অবশ্য জাল হাদীস বর্ণনা করে সাথে সাথে যদি এ কথা বলে দেওয়া হয় যে, হাদীসটি কিন্তু জাল ও বানোয়াট তাহলে তখন এমন হাদীস বলা জায়েজ হবে এবং এভাবে সাথে সাথে জাল বলে দেওয়াটা ছওয়াবের কারণ হবে।

اَقْسَامِ طَعْن -এর দ্বিতীয় প্রকার হাদীসের নাম মাতরূক। এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ।

اَلْمَتْرُوْكُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمَتْرُوْكُ শব্দটি اَلتَّرْكُ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّر। আভিধানে اَلتَّرْكُ অর্থ– ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা। এ হিসেবে اَلْمَتْرُوْكُ অর্থ দাঁড়ায়– পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত।

اَلْمَتْرُوْكُ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَلْحَدِيْثُ الْمَتْرُوْكُ হলো,

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ فِىْ اِسْنَادِهٖ رَاوٍ مُتَّهَمٌ بِالْكِذْبِ ـ

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত কোনো রাবী থাকে, তাকে اَلْحَدِيْثُ الْمَتْرُوْكُ বলে।

مُتَّهَمٌ بِالْكِذْبِ বলা হয়– ১. এমন রাবীকে যিনি মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেন অথবা ২. যে একক রাবীর বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ অথবা শরিয়তের সুবিদিত নীতির পরিপন্থি হয়।

اَقْسَام طَعْن -এর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার হাদীসের নাম মুনকার।

اَلْمُنْكَرُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُنْكَرُ শব্দটি اَلْاِنْكَارُ ক্রিয়ামূল হতে اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ। অভিধানে اَلْمُنْكَرُ অর্থ– অপরিচিত, অপছন্দনীয় ইত্যাদি।

اَلْمُنْكَرُ -এর পারিভাষিক অর্থ : সম্মানিত লেখক اَلْمُنْكَرُ -এর সংজ্ঞা দুভাবে প্রদান করেছেন। এক স্থানে তিনি اَلْمُنْكَرُ -এর জন্য নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেছেন আর অপর স্থানে (আলোচ্যস্থলে) এ শর্ত করেননি।

যে স্থানে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেছেন সেখানে اَلْمُنْكَرُ -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে– هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ رَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ

অর্থাৎ ছিকাহ রাবীর খেলাপ যা'ঈফ রাবীর রেওয়ায়েতকে اَلْمُنْكَرُ বলে।

আর যে স্থানে (যেমন– আলোচ্যস্থলে) রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেননি সে স্থানে প্রদত্ত সংজ্ঞার সারকথা হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ فِىْ اِسْنَادِهٖ رَاوٍ فَحُشَ غَلَطُهٗ اَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهٗ اَوْ ظَهَرَ فِسْقُهٗ مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ الْكُفْرَ ـ

অর্থাৎ যে হাদীসের সনদে এমন কোনো রাবী থাকে যার মাঝে فُحْش غَلَط অথবা كَثْرَت غَفْلَتْ -এর দোষ থাকে অথবা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোনো قَوْلِىْ অথবা عَمَلِىْ ফিসক প্রকাশ পায়, তাকে اَلْحَدِيْثُ الْمُنْكَرُ বলে।

এ থেকে বুঝা যায় مُنْكَرْ -এর সংজ্ঞায় মতভেদ আছে। কেউ তাতে ছিকাহ রাবীর বিরোধিতাকে শর্ত করেন কেউ করেন না।

ثُمَّ الْوَهْمُ وَهُوَ الْقِسْمُ السَّادِسُ وَاِنَّمَا اُفْصِحَ بِهٖ لِطُوْلِ الْفَصْلِ اِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ اَىْ عَلَى الْوَهْمِ بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَهْمِ رَاوِيْهِ مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ اَوْ مُنْقَطِعٍ اَوْ اِدْخَالِ حَدِيْثٍ فِىْ حَدِيْثٍ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ مِنَ الْاَشْيَاءِ الْقَادِحَةِ وَيَحْصُلُ مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ وَجَمْعِ الطُّرُقِ فَهٰذَا هُوَ الْمُعَلَّلُ وَهُوَ مِنْ اَغْمَضِ اَنْوَاعِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَاَدَقِّهَا وَلَا يَقُوْمُ بِهٖ اِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَهْمًا ثَاقِبًا وَحِفْظًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ وَمَلَكَةً قَوِيَّةً بِالْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُوْنِ وَلِهٰذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ اِلَّا قَلِيْلٌ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الشَّانِ كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِىْ وَاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْبُخَارِيِّ وَيَعْقُوْبَ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبِىْ حَاتِمٍ وَاَبِىْ زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِىْ ، وَقَدْ يَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ عَنْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلٰى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيِّ فِىْ نَقْدِ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ ـ

অনুবাদ : অভিযোগের ষষ্ঠ কারণ হলো 'অহম' বা সংশয়। যদি নিদর্শন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, রাবী সংশয়ের সাথে মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হাদীসকে মুত্তাসিল করে বর্ণনা করেছে, অথবা এক হাদীসের সাথে অন্য হাদীসে যোগ করেছে, অথবা এরূপ কোনো দূষণীয় কাজ করেছে, তাহলে সে হাদীসকে বলে মু'আল্লাল। এটি চেনা যায় অধিক অনুসন্ধান ও সনদসমূহ একত্রিতকরণের মাধ্যমে।

মু'আল্লাল ইলমে হাদীসের একটি সূক্ষ্মতম বিষয়। তাই তা সনাক্ত করতে পারেন কেবলমাত্র তিনি, যাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন স্বচ্ছ বোধশক্তি, ব্যাপক স্মৃতিশক্তি, রাবীদের স্তরসমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য। সে জন্যই এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন এ শাস্ত্রের কয়েকজন মনীষী মাত্র। যেমন– আলী ইবনুল মাদানী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াকূব ইবনে আবূ শায়বা, আবূ হাতেম রাযী, আবূ যুরআ, দারাকুতনী প্রমুখ। কখনো কখনো মু'আল্লাল সনাক্তকারীর ভাষা তার দাবির পক্ষে দলিল পেশ করতে অক্ষম থেকে যায়– দিনার-দিরহাম পরীক্ষকের যেমন হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : وَاِنَّمَا اُفْصِحَ بِهٖ لِطُوْلِ الْفَصْلِ – এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক طَعْن -এর অন্যান্য প্রকারের আলোচনায় প্রথম প্রকার, দ্বিতীয় প্রকার– এভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু وَهْم -এর বর্ণনায় প্রকারের কথা উল্লেখ না করে সুস্পষ্টভাবে নাম উচ্চারণ করলেন কেন?

লেখক এ প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেছেন তার সারকথা হলো, وَهْم -এর আলোচান দীর্ঘ, যা وَهْم -এর উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে হওয়ার দাবি করে। বস্তুত এ কারণে তিনি এখানে 'ওয়াও' বাদ দিয়ে ثُمَّ হরফে আতফের মাধ্যমে পূর্বের বাক্যের উপর আতফ করেছেন, যা বিলম্বতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

مُعَلَّلْ : اَسْبَاب طَعْن -এর ৬ষ্ঠ প্রকারের নাম وَهْم । এ দোষে দোষী হাদীসকে বলে مُعَلَّلْ । নিম্নে مُعَلَّلْ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

مُعَلَّلْ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُعَلَّلُ শব্দটি اَلتَّعْلِيْلُ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ । এর শাব্দিক অর্থ– مَا فِيْهِ عِلَّةٌ অর্থাৎ যার মধ্যে দোষ আছে।

مُعَلَّلْ-এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْحَدِيْثُ الْمُعَلَّلُ হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ يُرْوٰى عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَهُّمِ بِرَفْعِ مَوْقُوْفٍ اَوْ وَصْلِ مُنْقَطِعٍ اَوْ اِدْخَالِ حَدِيْثٍ فِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ.

অর্থাৎ যে হাদীস বর্ণনায় রাবীর وَهْم হয় যে, রাবী مَوْقُوْف হাদীসকে مَرْفُوْع হিসেবে, مُنْقَطِعْ হাদীসকে مُتَّصِلْ হিসেবে অথবা এক মতন-এর স্থলে অন্য মতন রেওয়ায়েত করেন কিংবা এক মতন-এর মাঝে অন্য মতন প্রবিষ্ট করেন।

مُعَلَّلْ-এর প্রকারভেদ ও উদাহরণ : مُعَلَّلْ দু প্রকার। ১. مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ এবং ২. مُعَلَّلٌ فِى الْمَتْنِ। নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. **مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ-এর অর্থ :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُرْسَلْ বা مُنْقَطِعْ-কে مُتَّصِلْ হিসেবে রেওয়ায়েত করা। অথবা এক রাবীর স্থলে অন্য রাবীর নাম উল্লেখ করা।

مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ-এর উদাহরণ : এর দুটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এক. নিম্নের হাদীসটি مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ-এর উদাহরণ–

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ الخ

এ হাদীসটি যদিও আদিল রাবী আদিল রাবী হতে রেওয়ায়েত করেছেন তথাপি এ সনদে عِلَّة তথা সূক্ষ্ম দোষ রয়েছে। কেননা, এ হাদীসের রাবী আমর ইবনে দীনার নয়; বরং আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। কিন্তু রাবী ইয়া'লা ইবনে উবাইদ وَهْمًا তথা সংশয় হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের স্থলে আমর ইবনে দীনারের নাম উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ হলো, সুফিয়ানের অন্যান্য ছাত্ররা এ হাদীসটি عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন।

এ হাদীসের সনদ مَعْلُوْل হলেও মতন সহীহ এবং মাকবূল।

দুই. مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ-এর দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ নিম্নের হাদীসটি।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

এ হাদীসটি যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ রেওয়ায়েত করেছেন। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) বলেন, এ হাদীসটি তিন কারণে مَعْلُوْل। যথা–

১. ওসমান হলেন আবূ সুলাইমান; ইবনে সুলাইমান নন।

২. ওসমান এ হাদীসটি نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন, আবূ সুলাইমান তথা সুলাইমানের পিতা থেকে নয়।

৩. আবূ সুলাইমান রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেনওনি আবার তাঁর থেকে হাদীসও শুনেননি।

مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ-এর হুকুম : যে হাদীসের মধ্যে مُعَلَّلٌ فِى السَّنَدِ হয় তার সনদ مَعْلُوْل হলেও মতন সহীহ ও মাকবূল হয়।

২. **مُعَلَّلٌ فِى الْمَتْنِ-এর অর্থ :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এক মতনের স্থলে অন্য মতন রেওয়ায়েত করা কিংবা এক মতনের মাঝে অন্য মতন প্রবিষ্ট করা।

اَلْمُعَلَّلُ فِى الْمَتْنِ-এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি اَلْمُعَلَّلُ فِى الْمَتْنِ-এর উদাহরণ।

لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا.

আবূ সাঈদ ইবনে আবী মারইয়াম এ হাদীসটি عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ সূত্রে মারফূ'ভাবে রেওয়ায়েত করেন। এ হাদীসটি مُعَلَّلٌ فِى الْمَتْنِ হওয়ার কারণ হলো, হাদীসোক্ত لَا تَنَافَسُوا অংশটুকু মূলত আরেকটি হাদীসের অংশ, যা عَنْ مَالِكٍ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ সূত্রে মারফূ'ভাবে বর্ণিত। পুরো হাদীসটি এরূপ–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا ـ

কিন্তু রাবী আবূ সাঈদ এ হাদীসের ইবারতকে পূর্বের হাদীসের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। আর একেই বলে عِلَّتْ فِى الْمَتْنِ ।

عِلَّتْ বা দোষ জানার উপায় : عِلَّتْ ইলমে হাদীসের একটি সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয়। মাত্র তিন উপায়ে এটা জানা যেতে পারে। যথা–

১. তা সনাক্ত করতে পারে কেবলমাত্র তিনি, যাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন স্বচ্ছ বোধশক্তি, ব্যাপক স্মৃতিশক্তি, রাবীদের স্তরসমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য।

বস্তুত এ কারণেই عِلَّتْ সম্পর্কে হাতে-গোনা কয়েকজন মুহাদ্দিস ছাড়া এ ব্যাপারে কেউ মুখ খোলেননি। عِلَّتْ জানা যে একটি ইলহামী ব্যাপার নিম্নের ঘটনাটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এক ব্যক্তি মুহাদ্দিস আবূ যুরআকে বলে, আপনারা যে হাদীসকে مُعَلَّلٌ বলেন এর স্বপক্ষে আপনাদের দলিল কি? জবাবে তিনি বলেন, এর দলিল এটাই যে, তুমি আমার সামনে এমন কোনো হাদীস পেশ কর, যার মধ্যে কোনো عِلَّتْ আছে, তাহলে আমি ঐ عِلَّتْ সম্পর্কে তোমাকে বলে দেবো। অতঃপর তুমি এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম-এর কাছে উল্লেখ করে তার থেকে عِلَّتْ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে তোমাকে عِلَّتْ সম্পর্কে জানিয়ে দেবে। এরপর তুমি হাদীসটি পেশ করবে আবূ হাতিমের কাছে। তাকে عِلَّتْ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি আমাদের তিনজনের জবাব ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে বুঝবে আমাদের কথা ঠিক নয়। আর যদি আমাদের কথা এক রকম হয় অর্থাৎ সবাই একই عِلَّتْ সম্পর্কে জানায়, তবে বুঝবে এটি বাস্তব ব্যাপার। সকলের পক্ষে যা সম্ভব নয়। অতঃপর লোকটি তাই করে। দেখা গেল তিনজনের কথার মধ্যে মিল রয়েছে অর্থাৎ সকলে একই عِلَّتْ সনাক্ত করেছেন। তখন গিয়ে লোকটি বলে اَشْهَدُ اَنَّ هٰذَا الْعِلْمَ اِلْهَامٌ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই (عِلَّتْ) জ্ঞানটি সম্পূর্ণ কুদরতী ও ইলহামী জ্ঞান।

২. কখনো দীর্ঘ অনুসন্ধান এবং সমস্ত সনদ তন্ন তন্ন করে খোঁজ করার মাধ্যমে এ عِلَّتْ সম্পর্কে জানা যায়।

৩. কখনো রাবীর এক হওয়া এবং নির্ভরযোগ্য রাবীদের খেলাপ করা থেকেও জানা যায়। তবে শর্ত হলো তার সাথে নিদর্শন যুক্ত থাকতে হবে।

وَقَدْ يَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ : এ বাক্যে সম্মানিত লেখক একটি তথ্য জানাতে চেয়েছেন। আর তা হলো, مُعَلِّلٌ হাদীসের দোষ সম্পর্কে অবহিত করলেও অনেক সময় তিনি নিজের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারেন না। তাঁকে যদি বলা হয়, আপনি যে عِلَّتْ-এর কথা বললেন, তার দলিল কি? তখন তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল বলতে ব্যর্থ হন। কিন্তু তার এই দলিল বলতে না পারাটা হাদীসটি مُعَلَّلٌ হওয়ার বিরোধী হয় না। হাদীসটি ঠিকই مُعَلَّلٌ তথা দোষযুক্ত থাকে। مُعَلِّلٌ-কে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে صَيْرَفِىٌّ তথা স্বর্ণ-রৌপ্য যাচাইকারীর সাথে। صَيْرَفِىٌّ কোন স্বর্ণ-রৌপ্য খাঁটি আর কোনটি ভেজাল তা স্বর্ণ-রৌপ্য হাতে নিয়েই বলতে পারে। কিন্তু তার কাছে তার দাবির স্বপক্ষে দলিল চাইলে অনেক সময় সে দেখাতে পারে না। ঠিক তেমনি مُعَلِّلٌ – عِلَّةٌ যুক্ত হাদীসের عِلَّةٌ বা দোষ ঠিকই ধরে দিতে পারেন; কিন্তু অনেক সময় তার উপর দলিল দিতে পারেন না।

ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ وَهُوَ الْقِسْمُ السَّابِعُ اِنْ كَانَتْ وَاقِعَةً بِسَبَبِ تَغْيِيْرِ السِّيَاقِ اَىْ سِيَاقِ الْاِسْنَادِ فَالْوَاقِعُ فِيْهِ ذٰلِكَ التَّغَيُّرُ مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ وَهُوَ اَقْسَامٌ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَرْوِىَ جَمَاعَةُ الْحَدِيْثَ بِاَسَانِيْدَ مُخْتَلِفَةٍ فَيَرْوِيْهِ عَنْهُمْ رَاوٍ فَيَجْمَعُ الْكُلَّ عَلٰى اِسْنَادٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْاَسَانِيْدِ وَلَا يُبَيِّنُ الْاِخْتِلَافَ اَلثَّانِىْ اَنْ يَكُوْنَ الْمَتْنُ عِنْدَ رَاوٍ اِلَّا طَرَفًا مِنْهُ فَاِنَّهُ عِنْدَهُ بِاِسْنَادٍ اٰخَرَ فَيَرْوِيْهِ عَنْهُ رَاوٍ تَامًّا بِالْاِسْنَادِ الْاَوَّلِ وَمِنْهُ اَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيْثَ مِنْ شَيْخِهٖ اِلَّا طَرَفًا مِنْهُ فَيَسْمَعُهُ عَنْ شَيْخِهٖ بِوَاسِطَةٍ فَيَرْوِيْهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًّا بِحَذْفِ الْوَاسِطَةِ وَالثَّالِثُ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ الرَّاوِىْ مَتْنَانِ مُخْتَلِفَانِ بِاِسْنَادَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيَرْوِيْهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُقْتَصِرًا عَلٰى اَحَدِ الْاِسْنَادَيْنِ اَوْ يَرْوِىَ اَحَدَ الْحَدِيْثَيْنِ بِاِسْنَادِهِ الْخَاصِّ بِهٖ لٰكِنْ يَزِيْدُ فِيْهِ مِنَ الْمَتْنِ الْاٰخَرِ مَا لَيْسَ فِى الْاَوَّلِ اَلرَّابِعُ اَنْ يَسُوْقَ الْاِسْنَادَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ عَارِضٌ فَيَقُوْلُ كَلَامًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهٖ فَيَظُنُّ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ اَنَّ ذٰلِكَ الْكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذٰلِكَ الْاِسْنَادِ فَيَرْوِيْهِ عَنْهُ كَذٰلِكَ هٰذِهٖ اَقْسَامُ مُدْرَجِ الْاِسْنَادِ.

অনুবাদ : সপ্তম অভিযোগ হলো নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা। এটি যদি সনদের পরিক্রমায় পরিবর্তন সাধনের কারণে হয়, তাহলে যাতে এ পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে বলে মুদরাজুল ইসনাদ। এটি কয়েক প্রকার। যথা–

১. একদল রাবী হাদীসটিকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাদের বরাত দিয়ে উক্ত অভিযুক্ত রাবী যখন সেটি বর্ণনা করেন, তখন তিনি সবগুলোকে একটি মাত্র সনদে একত্রিত করে দেন– বিভিন্ন সনদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা বলেন না।

২. হাদীসের মতনটি একজন রাবীর নিকটে ছিল। কিন্তু এর একটি অংশ তার নিকট ছিল অন্য সনদে। তিনি উক্ত মতনটি পূর্ণরূপে প্রথম সনদেই বর্ণনা করলেন।

এ শ্রেণির আরেকটি ধরন হলো, কোনো রাবী নিজ শায়খ থেকে একটি হাদীস শুনলেন। কিন্তু তার একটি অংশ উক্ত শায়খ থেকে জানতে পারলেন অন্যের মাধ্যমে। তিনি নিজ শায়খের বরাত দিয়ে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, মাধ্যমটি উহ্য রেখে।

৩. একজন রাবীর নিকট দুটি ভিন্ন ভিন্ন মতন ছিল ভিন্ন ভিন্ন দুটি সনদে। অতঃপর তার নিকট থেকে একজন রাবী মতন দুটিকে একটি মাত্র সনদে বর্ণনা করলেন। অথবা একটি হাদীসই সংশ্লিষ্ট সনদে বর্ণনা করলেন; কিন্তু তাতে অপর মতন থেকে এমন একটি অংশ সংযোজন করে দিলেন যা প্রথমটির অংশ নয়।

৪. রাবী সনদ বর্ণনা করছিলেন; কিন্তু মাঝখানে একটি অবস্থার সম্মুখীন হলেন, তাই নিজের পক্ষ থেকে একটি কথা বললেন। তখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মনে করল, উক্ত কথাই হচ্ছে এ সনদের মতন। সুতরাং তার বরাত দিয়ে সেরূপ বর্ণনা করলেন। এগুলো হচ্ছে মুদরাজুল ইসনাদের প্রকারসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَقْسَامِ طَعْن -এর সপ্তম প্রকারের নাম মুখালাফাত। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করা। এ মুখালাফাত বা বিরোধিতা দুভাবে হয়।

১. রাবীর দিক দিয়ে। এটা আবার ৪ প্রকার। ১. زِيَادَةٌ فِى السَّنَدِ ২. زِيَادَةٌ فِى الْمَتْنِ ৩. نَقْصٌ فِى السَّنَدِ ৪. نَقْصٌ فِى الْمَتْنِ। এর বিস্তারিত আলোচনা 'রাবীর বৃদ্ধি' পর্বে চলে গেছে।

২. কারণের দিক দিয়ে। এটা কয়েক প্রকার। যথা–

১. বিরোধিতা হবে শব্দের মধ্যে পরিবর্তনের কারণে। ২. অথবা, আগে-পিছের কারণে। ৩. অথবা, সনদের মাঝে রাবীর বৃদ্ধির কারণে। ৪. অথবা, রাবীর পরিবর্তন করার কারণে। ৫. অথবা, এক অক্ষর কিংবা বিভিন্ন অক্ষরের মাঝে নুকতা পরিবর্তন করার কারণে। ৬. অথবা, আকৃতি পরিবর্তনের কারণে। মোটকথা, বিরোধিতা যদি কারণগত হয়, তাহলে তা মোট ৬ প্রকার হয়। ১. مُدْرَجٌ ২. مَقْلُوْبٌ ৩. مَزِيْدٌ فِى مُتَّصِلِ الْاَسَانِيْدِ ৪. مُضْطَرَبٌ ৫. مُصَحَّفٌ ও ৬. مُحَرَّفٌ। নিম্নে প্রত্যেকটি প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

مُدْرَجٌ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُدْرَجُ (আল-মুদরাজ) শব্দটি اَلْاِدْرَاجُ মাসদার হতে اِسْمِ مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ। এর অর্থ– প্রবিষ্ট করা, অন্তর্ভুক্ত করা। এ হিসেবে اَلْمُدْرَجُ অর্থ– প্রবিষ্ট, অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি।

مُدْرَجٌ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় مُدْرَجٌ বলে প্রত্যেক ঐ হাদীসকে যার সনদ অথবা মতনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যার কারণে রেওয়ায়েতটি নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধী হয়।

مُدْرَجٌ -এর নামকরণ : مُدْرَجٌ অর্থ– প্রবিষ্ট। حَدِيْثُ مُدْرَجٌ -এ যেহেতু এক সনদ অপর সনদের মধ্যে অথবা এক মতন অপর মতনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তাই তাকে مُدْرَجٌ (প্রবিষ্ট) বলে।

مُدْرَجٌ -এর হুকুম : সনদ অথবা মতনে ইচ্ছাপূর্বক اِدْرَاجٌ করা হারাম এবং মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

مُدْرَجٌ -এর প্রকারভেদ : مُدْرَجٌ দু প্রকার। ১. مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ ২. مُدْرَجُ الْمَتْنِ। নিম্নে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ - এর সংজ্ঞা : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الثَّابِتُ فِيْهِ مُخَالَفَةُ الرَّاوِى لِلثِّقَاتِ اَوِ الْاَوْثَقِ بِسَبَبِ تَغْيِيْرِ سِيَاقِ الْاِسْنَادِ -

অর্থাৎ সনদ বর্ণনায় পরিবর্তন করার কারণে যে হাদীসের রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীগণের খেলাপ করেন, সেই হাদীসকে مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ বলে।

مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ -এর প্রকারভেদ : مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ মোট ৪ প্রকার। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের উল্লেখ করা হলো।

১. কোনো রাবী একাধিক শায়খ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে একটি হাদীস শুনেছেন; কিন্তু তিনি হাদীসটি রেওয়ায়েত করার সময় এক সনদেই সকলকে উল্লেখ করেন এবং শায়খদের সনদের পাস্পরিক ভিন্নতাকে উল্লেখ করেন না।

এর উদাহরণ হলো নিম্নরূপ–

حَدِيْثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ بَنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَاصِلٍ وَمَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ ؟

এ হাদীসের মধ্যে রাবী হলেন সুফিয়ান ছাওরী। আর তার শায়খ হলেন তিনজন– ১. وَاصِلْ ২. مَنْصُوْر ও ৩. اَعْمَشْ এ তিন শায়খের সনদ ভিন্ন ভিন্ন দুটি। এর মধ্যে وَاصِلْ-এর সনদ হলো–

عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ.

পক্ষান্তরে مَنْصُوْر ও اَعْمَشْ -এর সনদ হলো–

عَنْ مَنْصُوْرٍ وَاَعْمَشٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ.

কিন্তু রাবী অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী হাদীসটি রেওয়ায়েত করার সময় এক সনদেই তার তিন শায়খকে **উল্লেখ** করেন এবং তিরমিযী শরীফে যেভাবে রেওয়ায়াতটি এসেছে সেভাবে বর্ণনা করেন। তিন শায়খের ভিন্ন ভিন্ন দুই সনদের কথা সনদে عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلٍ নেই। পক্ষান্তান্তরে مَنْصُوْر ও اَعْمَشْ -এর সনদে আছেন। মোটকথা রাবী এটা বর্ণনা করেন না যে, তার শায়খদের সনদ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন; বরং এক সনদেই সকল শায়খকে উল্লেখ করেন।

২. এর দুটি সুরত হতে পারে। যথা–

ক. রাবী দুই সনদে একটি হাদীস শুনেছেন। ১ম সনদে হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ নয়; একাংশ কম। কিন্তু ২য় সনদে হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। এখন রাবী রেওয়ায়েত করার সময় ১ম সনদে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।

খ. রাবী একটি হাদীস তার শায়খ থেকে নিজে শুনেছেন। ঐ হাদীসটিই পরে তিনি তার শায়খ থেকে একটি وَاسِطَه -এর মাধ্যমে শুনেন। নিজে শুনা হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ নয়– একাংশ কম; কিন্তু وَاسِطَه -এর মাধ্যমে শুনা হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। এখন রাবী হাদীসটি রেওয়ায়েত করার সময় وَاسِطَه-কে বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি নিজে শুনেছেন এমনভাবে রেওয়ায়েত করেন।

৩. এরও দুটি সুরত হতে পারে। যথা–

ক. রাবী ভিন্ন ভিন্ন দুটি সনদে উভয় হাদীস শুনেছেন; কিন্তু তিনি রেওয়ায়েত করার সময় এক সনদে উভয় হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

খ. দু হাদীসের একটিকে রাবী তার নিজস্ব সনদেই রেওয়ায়েত করেন; কিন্তু তাতে অপর সনদের কিছু মতন বৃদ্ধি করেন, যে মতন এ সনদের নয়।

৪. মুহাদ্দিস অথবা শায়খ ছাত্রদের সামনে হাদীস রেওয়ায়েত করছেন। রেওয়ায়েতের মাঝখানে হঠাৎ করে কোনো কারণে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হাদীসের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো শব্দ বা বাক্য বলেছেন; কিন্তু ছাত্রদের কেউ এটাকে ঐ সনদের মতনের অংশ মনে করেছেন এবং সেভাবে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন।

বি. দ্র. مُدْرَجُ الْاِسْنَادِ -এর প্রথম তিন প্রকারের মধ্যে সনদের অভ্যন্তরে পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আর চতুর্থ প্রকারে পরিবর্তনের বিষয়টি সূক্ষ্ম। আর তা এভাবে হয়েছে যে, সনদ উল্লেখের চাওয়া বা দাবি হলো এর পরেই মতন আসা এবং মতনের পূর্বে ভিন্ন কোনো কথা না বলা। কিন্তু রাবী মাঝখানে ভিন্ন কথা বলে সনদের দাবিকে বাতিল করেছে। সুতরাং কেমন যেন তিনি এভাবে সনদকেই পরিবর্তন করে দিলেন।

وَاَمَّا مُدْرَجُ الْمَتَنِ فَهُوَ اَنْ يَقَعَ فِى الْمَتَنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ فَتَارَةً يَكُوْنُ فِى اَوَّلِهِ وَتَارَةً فِىْ اَثْنَائِهِ وَتَارَةً فِىْ اٰخِرِهِ وَهُوَ الْاَكْثَرُ لِاَنَّهُ يَقَعُ بِعَطْفِ جُمْلَةٍ عَلٰى جُمْلَةٍ اَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوْفٍ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ اَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ بِمَرْفُوْعٍ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَهٰذَا هُوَ مُدْرَجُ الْمَتْنِ ، وَيُدْرَكُ الْاِدْرَاجُ بِوُرُوْدِ رِوَايَةٍ مُفَصِّلَةٍ لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا اُدْرِجَ فِيْهِ اَوْ بِالتَّنْصِيْصِ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الرَّاوِىْ اَوْ مِنْ بَعْضِ الْاَئِمَّةِ الْمُطَّلِعِيْنَ اَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيْبُ فِى الْمُدْرَجِ كِتَابًا وَلَخَّصْتُهُ وَ زِدْتُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

অনুবাদ : মুদরাজুল মতন হলো এই যে, মতনের মধ্যে এমন কিছু সংযোজিত হওয়া যা তার অংশ নয়। এটি কখনো মতনের শুরুতে, কখনো মাঝখানে আবার কখনো শেষপ্রান্তে হয়। তবে শেষপ্রান্তেই বেশি হয়ে থাকে। কেননা, এটি সংঘটিত হয় এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের সংযোগ স্থাপন অথবা মারফূ' হাদীসের সাথে মাওকূফ বা মাকতূ' হাদীসকে গুলিয়ে ফেলার কারণে। একে বলা হয় মুদরাজুল মতন।

ইদরাজ জানা যায় এমন রেওয়ায়েত বর্ণিত হওয়ার দ্বারা, যা মুদরাজ হাদীস থেকে মুদরাজ পরিমাণকে পৃথক করে দেয় অথবা রাবী নিজে সেটা বলে দিলে অথবা কোনো হাদীস বিশারদ তা সনাক্ত করলে অথবা নবী করীম ﷺ -এর পক্ষে সেরূপ কথা বলা অসম্ভব হলে।

মুদরাজ সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। (ইবনে হাজার (র.) বলেন,) আমি তার সারসংক্ষেপ করেছি এবং তার সাথে আরো অনেক বিষয় সংযোজন করেছি যার পরিমাণ মূল গ্রন্থের দ্বিগুণ বা তারও বেশি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُدْرَجُ الْمَتْنِ -এর সংজ্ঞা : مُدْرَجُ الْمَتْنِ -এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ يَقَعُ فِىْ مَتْنِهِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ فَتَارَةً يَكُوْنُ فِىْ اَوَّلِهِ وَتَارَةً فِىْ اَثْنَائِهِ وَتَارَةً فِىْ اٰخِرِهِ ـ

অর্থাৎ যে হাদীসের মতনের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্যের كَلَامٌ পতিত হয়, তাকে مُدْرَجُ الْمَتْنِ বলে। চাই অন্যের كَلَامٌ -এর সংযোগটা মতনের শুরু, মধ্যখান, শেষ যেখানেই হোক না কেন।

مُدْرَجُ الْمَتْنِ -এর প্রকারভেদ : এটি দু প্রকার। যথা–

১. হাদীসের মতনে এমন কথা প্রবিষ্ট হওয়া, যা মতনের অংশ নয়। এই প্রবিষ্ট হওয়ার তিন সুরত। যথা–

ক. মতনের শুরুতে প্রবিষ্ট হবে। খ. মতনের মাঝখানে প্রবিষ্ট হবে। গ. মতনের শেষে প্রবিষ্ট হবে।

হাদীসের ক্ষেত্রে এই শেষ সুরতটিই বেশির ভাগ ঘটে থাকে বলে লেখক সহ অনেকের অভিমত। তবে কতকের অভিমত হলো প্রথম সুরতটি বেশির ভাগ ঘটে।

২. হাদীসে মাওকূফ বা মাকতূ'কে হাদীসে মারফূ'-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেওয়া। অথবা মাওকূফ ও মাকতূ'কে পার্থক্য না করে মারফূ'-এর সাথে গুলিয়ে ফেলা।

إِدْرَاجْ জানার উপায় : إِدْرَاجْ কয়েকভাবে জানা যায়। যথা–

ক. إِدْرَاجْ বিশিষ্ট হাদীস অন্য সনদে إِدْرَاجْ বিহীন অবস্থায় বর্ণিত হওয়া। এর উদাহরণ– أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ হাদীসটি। এ হাদীসটি খতীব (র.) عَنْ أَبِىْ قُطْنٍ وَشَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ অংশটি আবূ হুরায়রা (রা.) -এর উক্তি হতে প্রবিষ্ট (إِدْرَاجْ)। কেননা, ইমাম বুখারী (র.) হাদীসটি أَدَمُ بْنُ أَبِىْ أَيَاسٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

খ. রাবী নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, হাদীসের এ অংশটুকু مُدْرَجْ বা প্রবিষ্ট।

এর উদাহরণ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ جَعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শরিক স্থির করবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য শরিক স্থির না করে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে।

রাবী ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের শেষ অংশটুকু অর্থাৎ ... وَمَنْ مَاتَ থেকে শেষ পর্যন্ত আমি নবী করীম ﷺ থেকে বলতে শুনিনি। অতএব এটা مُدْرَجْ হবে।

গ. হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, হাদীসের এ অংশটুকু مُدْرَجْ।

এর উদাহরণ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীস রেওয়ায়েত করে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেছেন, ... وَمَا مِنَّا হতে শেষ পর্যন্ত– এটি হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) -এর উক্তি। ইমাম বুখারী (র.) একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। অতএব তাঁর এই إِدْرَاجْ বর্ণনা করার দ্বারা হাদীসটি مُدْرَجْ হবে।

ঘ. হাদীস নিজেই বলে দেবে যে, তা مُدْرَجْ। আর তা এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য এমন কথা বলা অসম্ভব হবে।

এর উদাহরণ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ أَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَبِرُّ أُمِّىْ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মালিকানাভুক্ত দাসের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব। আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি গোলাম হয়ে ইন্তেকাল করাকে শ্রেয় জ্ঞান করতাম।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন। এর মধ্যে وَالَّذِىْ نَفْسِىْ হতে শেষ পর্যন্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি হতে পারে না। কারণ, এ হাদীস বলার সময় পর্যন্ত তাঁর মাতা জীবিতই ছিলেন না; বরং এটুকু হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর উক্তি। যার প্রমাণ হলো, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনায় হাদীসটি এসেছে- وَالَّذِىْ نَفْسِىْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهٖ।

খতীবের কিতাব : مُدْرَجْ-এর উপর খতীবে বাগদাদী (র.) একটি কিতাব লেখেছেন। কিতাবটির নাম : اَلْفَصْلُ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِى النَّقْلِ। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ কিতাবের সারসংক্ষেপ লেখেছেন এবং এর সাথে কিছু বিষয় নিজে বৃদ্ধিও করেছেন। তিনি কিতাবের নাম রেখেছেন- تَقْرِيْبُ الْمَنْهَجِ بِتَرْتِيْبِ لِلْمُدْرَجِ

اِدْرَاجْ করার কারণ : হাদীসের মধ্যে اِدْرَاجْ তথা বাইরে থেকে অন্যের কালাম প্রবিষ্ট করার একাধিক কারণ হতে পারে। যথা-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো হুকুম বের করা।

২. কোনো শরয়ী হুকুমকে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করা।

৩. হাদীসের দুর্লভ ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করা। যেমনটি ইমাম জুহরী প্রমুখ করেছেন।

اِدْرَاجْ -এর এই তিন কারণের মধ্যে শেষোক্ত কারণে কেবল اِدْرَاجْ করা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কারণে اِدْرَاجْ করা হারাম। (اَطْيَبُ الْمَنْهَجِ فِىْ عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ)

أَوْ إِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِتَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ اَىْ فِى الْاَسْمَاءِ كَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ لِاَنَّ اِسْمَ اَحَدِهِمَا اِسْمُ اَبِى الْاٰخَرِ فَهٰذَا هُوَ الْمَقْلُوْبُ وَلِلْخَطِيْبِ فِيْهِ كِتَابٌ رَافِعُ الْاِرْتِيَابِ وَقَدْ يَقَعُ الْقَلْبُ فِى الْمَتْنِ اَيْضًا كَحَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِى السَّبْعَةِ الَّذِيْنَ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّ عَرْشِهٖ فَفِيْهِ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ يَمِيْنُهٗ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهٗ فَهٰذَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلٰى اَحَدِ الرُّوَاةِ وَاِنَّمَا هُوَ حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ كَمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ ـ

অনুবাদ : (নির্ভরযোগ্য রাবীর) বিরোধিতা যদি নামের মধ্যে আগপিছ করার দিক দিয়ে হয়, যেমন– মুররা ইবনে কা'ব-কে কা'ব ইবনে মুররা বলা, তাহলে তাকে মাকলূব বলে। খতীবে বাগদাদীর এ সম্পর্কিত কিতাবের নাম 'রাফিউল ইরতিয়াব'।

ওলট-পালট কখনো মতনেও হয়। যেমন– মুসলিম শরীফে এক স্থানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়ায় যে সাত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে একজন হলেন, "যে ব্যক্তি এমন গোপনীয়ভাবে সদকা করে যে, বাম হাতে কি সদকা করল ডান হাত তা জানে না।" হাদীসটি কোনো এক রাবী পাল্টে ফেলেছেন। আসলে ছিল "ডান হাতে কি সদকা করল বাম তা জানে না।" বুখারী শরীফের সকল সনদে এবং মুসলিম শরীফের কোনো কোনো স্থানে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَقْلُوْبُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمَقْلُوْبُ শব্দটি اَلْقَلْبُ মাসদার হতে اِسْم مَفْعُوْل-এর وَاحِد مُذَكَّر। اَلْقَلْبُ-এর অর্থ– উল্টানো, ঘুরানো, দিক পরিবর্তন করা ইত্যাদি। এ হিসেবে اَلْمَقْلُوْبُ অর্থ– যার মধ্যে ওলট-পালট করা হয়েছে।

اَلْمَقْلُوْبُ-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَلْمَقْلُوْبُ বলা হয়–

هُوَ الْحَدِيْثُ الثَّابِتُ فِيْهِ مُخَالَفَةُ الرَّاوِىْ لِلثِّقَاتِ اَوِ الْاَوْثَقِ بِتَقْدِيْمٍ اَوْ تَاخِيْرٍ فِى الْاَسْمَاءِ مِنَ السَّنَدِ اَوْ فِى الْمَتْنِ ـ

অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী সনদের শায়খদের নামের মাঝে অথবা মতনের মাঝে আগপিছ করার মাধ্যমে اَوْثَق রাবী অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতের খেলাপ করেন, তাকে اَلْحَدِيْثُ الْمَقْلُوْبُ বলে।

اَلْمَقْلُوْبُ-এর প্রকারভেদ : সনদ অথবা মতনে এ ধরনের আগপিছ করাকে قَلْب বলে। قَلْب মোট দু প্রকার। ১. قَلْبٌ فِى السَّنَدِ ও ২. قَلْبٌ فِى الْمَتْنِ । নিম্নে প্রত্যেকটার সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো।

قَلْبٌ فِى السَّنَدِ-এর সংজ্ঞা : قَلْب তথা ওলট-পালট যদি সনদের নামের মাঝে হয়, তাহলে তাকে قَلْبٌ فِى السَّنَدِ বলে। এ ধরনের قَلْب বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

قَلْبٌ فِى السَّنَدِ-এর উদাহরণ : সনদে নাম আছে মুররা ইবনে কা'ব, যা **নির্ভরযোগ্য রাবীগণ কর্তৃক** বর্ণিত। কিন্তু রাবী তাতে পরিবর্তন করে বলেন কা'ব ইবনে মুররা।

এ ধরনের **قَلْب** সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী (র.) **رَافِعُ الْاِرْتِيَابِ فِى الْمَقْلُوْبِ مِنَ الْاَسْمَاءِ وَالْاَنْسَابِ** নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন।

قَلْبٌ فِى الْمَتْنِ-এর সংজ্ঞা : قَلْب তথা ওলট-পালট যদি খোদ মতনে হয়, তাহলে তাকে **قَلْبٌ فِى الْمَتْنِ** বলে।

قَلْبٌ فِى الْمَتْنِ-এর উদাহরণ : সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ।

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ يَمِيْنُهٗ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهٗ.

অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দান করবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. যে যুবক তার যৌবনকাল ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। ৩. যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে জুড়ে থাকে। সে মসজিদ থেকে বের হলে আবার ফিরার উদ্দেশ্যেই বের হয়। ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসায় একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫. যে ব্যক্তি নিরিবিলি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ৬. বংশীয় ও সুন্দরী নারী যে ব্যক্তিকে (জেনার প্রতি) আহ্বান করলে, সে জানায় আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. যে ব্যক্তি এমন গোপনভাবে দান-সদকা করে যে, তার ডান হাতও জানতে পারে না যে, বাম হাত কি খরচ করল।

এ হাদীসে **وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ يَمِيْنُهٗ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهٗ** অংশটুকুতে **قَلْب** তথা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ, এটা আসলে হবে এমন–

وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ.

আর এভাবে বুখারীর রেওয়ায়েতে এমনকি খোদ মুসলিমের অপর রেওয়য়েতে আছে।

أَوْ إِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِزِيَادَةِ رَاوٍ فِى أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ وَمَنْ لَمْ يَزِدْهَا أَتْقَنَ مِمَّنْ زَادَهَا فَهٰذَا هُوَ الْمَزِيْدُ فِى مُتَّصِلِ الْأَسَانِيْدِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيْحُ بِالسَّمَاعِ فِى مَوْضَعِ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَمَتٰى كَانَ مُعَنْعَنًا مَثَلًا تُرُجِّحَتِ الزِّيَادَةُ ـ

অনুবাদ : সনদের মাঝে রাবী বৃদ্ধি পাবার দরুন যদি বিরোধিতা হয়, আর যিনি বৃদ্ধি করেছেন তার চেয়ে যিনি বৃদ্ধি করেননি তিনি অধিক নির্ভরযোগ্য হন, তাহলে তাকে বলে 'আল-মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ'। এটি যথার্থ সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত হলো, অতিরিক্ত রাবীর স্থানে শোনার কথাটি স্পষ্টভাবে বলতে হবে। যদি তা না হয়; বরং 'মুআনআন' হয়, তাহলে যেটিতে অতিরিক্ত আছে সেটিই প্রাধান্য পাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল-মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ -এর সংজ্ঞা : পরিভাষায় তার সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ ثَبَتَ فِيْهِ مُخَالَفَةُ الرَّاوِىْ لِلثِّقَاتِ أَوِ الْأَوْثَقِ بِزِيَادَةِ رَاوٍ فِىْ أَثْنَاءِ سَنَدِهٖ ظَاهِرُهُ الْإِتِّصَالُ ـ

দৃশ্যত মুত্তাসিল হাদীসের সনদের মাঝে কোনো রাবী বৃদ্ধি করার মাধ্যমে যে রাবী أَوْثَقْ অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর রেওয়ায়েতের খেলাপ রেওয়ায়েত করেন সেই রাবীর হাদীসকে اَلْمَزِيْدُ فِىْ مُتَّصِلِ الْأَسَانِيْدِ বলে।

আল-মযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ-

لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا ـ

অর্থাৎ তোমরা কবরের উপর গিয়ে বসবে না এবং সেখানে নামাজ পড়বে না।

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) ও ইমাম তিরমিযী (র.)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِىْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىْ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِىْ مُرْشِدِ الْغَنَوِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

-সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, এ হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) একজন রাবীকে বৃদ্ধি করেছেন। আর তিনি হলেন আবূ ইদ্রীস খাওলানী (র.)।

আল-মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ -এর শর্ত : এটি যথার্থ সাব্যস্ত করার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা-

১. বৃদ্ধির স্থলে বৃদ্ধি যিনি করেননি তার থেকে শোনার কথাটি স্পষ্টভাবে থাকতে হবে। যদি সুস্পষ্ট শোনার কথা না থাকে; বরং মুআনআন (عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ) অথবা এমন শব্দে বর্ণিত হয় যা মুত্তাসিল না হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাহলে এ সময় বৃদ্ধি সম্বলিত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। আর যিনি বৃদ্ধি করেননি তার হাদীস مُنْقَطِعْ বলে গণ্য হবে।
২. বৃদ্ধিকারী রাবীর তুলনায় যিনি বৃদ্ধি করেননি তিনি অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য হবেন।
৩. এমন নিদর্শন সেখানে থাকতে হবে, যা প্রমাণ করে যে, রাবী ভুল বা ধারণাবশত সনদে বৃদ্ধি করেছেন। যদি এমন নিদর্শন না থাকে, তাহলে এ বৃদ্ধিটা আল-মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ হবে না; বরং উভয় সনদ সহীহ বলে বিবেচ্য হবে।

أَوْ إِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِإِبْدَالِهِ أَيِ الرَّاوِيْ وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فَهٰذَا هُوَ الْمُضْطَرِبُ وَهُوَ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ غَالِبًا وَقَدْ يَقَعُ فِي الْمَتْنِ لٰكِنْ قَلَّ أَنْ يُحْكِمَ الْمُحَدِّثُ عَلَى الْحَدِيْثِ بِالْإِضْطِرَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِخْتِلَافِ فِي الْمَتْنِ دُوْنَ الْإِسْنَادِ .

অনুবাদ : যদি এক রাবীর স্থানে অন্য রাবীর নাম আসার কারণে বিরোধিতা সৃষ্টি হয় এবং দুটি বর্ণনার কোনো একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার যুক্তি না থাকে, তাহলে তাকে বলে 'মুযতারিব'। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদেই হয়ে থাকে। কখনো কখনো মতনেও হয়। তবে সনদ ব্যতীত মতনের গড়মিলের কারণে কোনো হাদীসকে খুব কমই 'মুযতারিব' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُضْطَرِبُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُضْطَرِبُ শব্দটি اَلْإِضْطِرَابُ মূলধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ– অস্থিরতা, অশান্তি, গণ্ডগোল. বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি। এ হিসেবে اَلْمُضْطَرِبُ অর্থ– অস্থির, অশান্ত।

اَلْمُضْطَرِبُ-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَلْمُضْطَرِبُ হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ وَقَعَتْ فِيْهِ الْمُخَالَفَةُ بِإِبْدَالِ الرَّاوِيْ أَوْ بِإِبْدَالِ الْمَتْنِ أَوْ بِإِبْدَالِهِمَا وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى .

অর্থাৎ যে হাদীসের মাঝে রাবীর পরিবর্তন নিয়ে (অর্থাৎ সনদের এ স্তরে প্রকৃত রাবী কে তা নিয়ে) অথবা মতন নিয়ে (যে, প্রকৃত মতন কোনটি) অথবা রাবী ও মতন উভয়ের পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ হয় এবং এ ব্যাপারে কোনো একটিকে অপরটার উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না– এমন হাদীসকে اَلْمُضْطَرِبُ বলে।

যদি কোনো একটিকে অপরটির উপর تَرْجِيْح-এর কোনো পন্থার আলোকে تَرْجِيْح দেওয়া হয়, তবে আর اِضْطِرَابْ থাকবে না; বরং যাকে تَرْجِيْح দেওয়া হবে তাকে اَلرَّاجِحُ আর অপরটিকে اَلْمَرْجُوْحُ বলে গণ্য করা হবে।

اَلْمُضْطَرِبُ-এর প্রকারভেদ : হাদীসের সনদ ও মতনে এভাবে পরিবর্তন নিয়ে মতভেদ হওয়াকে اِضْطِرَابْ বলে। اِضْطِرَابْ মোট তিন প্রকার। যথা–

১. اِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ ২. اِضْطِرَابٌ فِي الْمَتْنِ ৩. اِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ وَالْمَتْنِ।

নিম্নে এ তিন প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. **اِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ-এর সংজ্ঞা :** اِضْطِرَابْ যদি মতনে না হয়ে সনদে হয়, তাহলে তাকে اِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ বলে। এই اِضْطِرَابْ-ই সাধারণত বেশি হয়।

اِضْطِرَابٌ فِي السَّنَدِ-এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ–

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ شَيْئًا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ .

অর্থাৎ আবূ দাউদ (র.) ও ইবনে মাজাহ (র.) এক দীর্ঘসূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে নবী করীম ﷺ-এর এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ নামাজ পড়লে সে যেন তার সামনে কোনো কিছু (সুতরা হিসেবে) স্থাপন করে।

এ হাদীসের সনদে মারাত্মক اِضْطِرَابْ রয়েছে। আর তা হলো–

ক. সুফিয়ান ছাওরী (র.) এ হাদীস রেওয়ায়েত করেন নিম্নোক্ত সূত্রে–

عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ –

খ. উহাইব ও আব্দুল ওয়ারেস (র.) রিওয়ায়াত করেন–

عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهٖ حُرَيْثٍ ـ

গ. ইবনে জুরাইজ (র.) রেওয়ায়েত করেন–

عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ـ

২. اِضْطِرَابٌ فِى الْمَتْنِ -এর সংজ্ঞা : اِضْطِرَابْ যদি সনদে না হয়ে মতনে হয়, তাহলে তাকে اِضْطِرَابٌ فِى الْمَتْنِ বলে।

اِضْطِرَابٌ فِى الْمَتْنِ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীস এর উদাহরণ–

رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكٰوةِ فَقَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ ـ

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী (র.) দীর্ঘসূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাকাত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও আরো হক রয়েছে।

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ نَفْسِ الطَّرِيْقِ : لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ ـ

অর্থাৎ আর ইবনে মাজাহ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়া আর কোনো হক নেই।

হাফিজ ইরাকী (র.) বলেন, উপরের দু হাদীসের মতনে اِضْطِرَابْ রয়েছে। এদের মাঝে ব্যাখ্যা বা সমন্বয় সাধনের অবকাশ নেই।

৩. اِضْطِرَابٌ فِى السَّنَدِ وَالْمَتْنِ -এর সংজ্ঞা : اِضْطِرَابْ যদি সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই হয়, তাহলে তাকে اِضْطِرَابٌ فِى السَّنَدِ وَالْمَتْنِ বলে।

اِضْطِرَابٌ فِى السَّنَدِ وَالْمَتْنِ -এর উদাহরণ : সনদ ও মতনে একসাথে اِضْطِرَابْ হওয়ার উদাহরণ নিম্নের হাদীসটি–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে সে নাপাক বহন করতে পারে না।

এ হাদীসের সনদে اِضْطِرَابْ এভাবে রয়েছে যে, এ হাদীসের সনদের মূল স্থান (مَدَارْ) হলো রাবী ওলীদ ইবনে কাছীর। তিনি কখনো হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে যুবাইর থেকে, আবার কখনো মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর থেকে, আবার কখনো উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে, আবার কখনো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে।

আর মতনে اِضْطِرَابْ এভাবে যে, কোনো রেওয়ায়েত এসেছে قُلَّتَيْنِ, কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে قُلَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا, কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً।

اِضْطِرَابْ যথার্থভাবে হওয়ার শর্ত : اِضْطِرَابْ যথার্থভাবে হওয়ার শর্ত দুটি।

১. দুই রিওয়ায়াত মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হওয়া।

২. একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হওয়া।

اِضْطِرَابْ-এর হুকুম : اِضْطِرَابْ-কে যদি দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে তা দূর হওয়ার পরে حَدِيْث مُضْطَرَبْ টা সহীহ হয়ে যায়। আর اِضْطِرَابْ যদি দূর না করা যায়, তাহলে হাদীসটি যা'ঈফ এবং দলিলের অযোগ্য হয়ে যায়।

اِضْطِرَابْ দূর করার উপায় : اِضْطِرَابْ দুভাবে দূর করা যায়। যথা–

১. দু রেওয়ায়েতের মধ্যে সম্ভব হলে সমন্বয় সাধন করা।

২. নতুবা প্রাধান্য দানকারী বিষয়ের দ্বারা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাদরীবুর রাবী গ্রন্থে اِضْطِرَابْ দূর করার আরেকটি পদ্ধতি সম্পর্কে লেখেছেন যে, যে দুই হাদীসের মধ্যে اِضْطِرَابْ হয়েছে, যদি তাদের এক রেওয়ায়েতের রাবী اَحْفَظْ হয় কিংবা শায়খের সাথে তার দীর্ঘ সোহবত থাকে, তাহলে তার ভিত্তিতেও প্রাধান্য দেওয়া গেলে اِضْطِرَابْ দূর হওয়া সম্ভব। এ সময় رَاجِحْ হাদীসটি আমলযোগ্য হবে আর مَرْجُوْحْ টি বর্জিত হবে।

وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا لِمَنْ يُرَادُ اِخْتِبَارُ حِفْظِهِ اِمْتِحَانًا مِنْ فَاعِلِهِ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَشَرْطُهُ اَنْ لَا يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ فَلَوْ وَقَعَ الْاِبْدَالُ عَمْدًا لَا لِمَصْلَحَةٍ بَلْ لِلْاِغْرَابِ مَثَلًا فَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْمَوْضُوْعِ وَلَوْ وَقَعَ غَلَطًا فَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوْبِ اَوِ الْمُعَلَّلِ ، اَوْ اِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِتَغْيِيْرِ حَرْفٍ اَوْ حُرُوْفٍ مَعَ بَقَاءِ صُوْرَةِ الْخَطِّ فِي السِّيَاقِ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ بِالنِّسْبَةِ اِلَى النُّقَطِ فَالْمُصَحَّفُ وَاِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الشَّكْلِ فَالْمُحَرَّفُ وَمَعْرِفَةُ هٰذَا النَّوْعِ مُهِمَّةٌ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ الْعَسْكَرِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيْ وَغَيْرُهُمَا وَاَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي الْمُتُوْنِ وَقَدْ يَقَعُ فِي الْاَسْمَاءِ الَّتِيْ فِي الْاَسَانِيْدِ .

অনুবাদ : কখনো কখনো কারো মেধা যাচাই করার জন্য পরীক্ষামূলক ইচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন সাধন করা হয়। যেমনটি ইমাম বুখারী ও ইমাম উকাইলীর ক্ষেত্রে হয়েছিল।

কোনো কল্যাণ চিন্তা ব্যতীত নিছক চমক সৃষ্টি করার জন্য হাদীসকে বিকৃত করা হলে তা মাওযূ' শ্রেণির অন্তর্গত হবে। আর যদি ভুলক্রমে এরূপ ঘটে যায়, তাহলে তাকে বলা হবে মাকলূব কিংবা মু'আল্লাল। অথবা বিরোধিতা যদি সংঘটিত হয় লিপির আকৃতি ঠিক রেখে এক বা একাধিক অক্ষর পরিবর্তনের কারণে, তাহলে নুকতার দিক দিয়ে এ পরিবর্তন হলে তাকে বলে 'মুসাহহাফ', আর আকৃতির দিক দিয়ে হলে তার নাম 'মুহাররফ'। এ শ্রেণির সাথে পরিচয় লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আসকারী, দারাকুতনী (র.) প্রমুখ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা বেশি হয়ে থাকে মতনের ক্ষেত্রে। তবে কখনো কখনো সনদের মধ্যকার নামের বেলাও হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সনদ বা মতনে পরিবর্তনের হুকুম : সনদ বা মতনে পরিবর্তন সাধন বৈধ কিনা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর তা হলো, পরিবর্তন শরয়ী প্রয়োজন ও স্বার্থে হবে অথবা এমনটি হবে না। যদি পরিবর্তন শরয়ী প্রয়োজনের স্বার্থে না হয়, তাহলে তা আবার দু প্রকার। ১. ইচ্ছাপূর্বক হবে, অথবা ২. ভুলক্রমে হবে। যদি ইচ্ছাপূর্বক হয়, তাহলে হাদীস মাওযূ' -এর অন্তর্গত হবে। আর যদি ভুলক্রমে হয়, তাহলে মাকলূব বা মু'আল্লাল -এর শ্রেণিভুক্ত হবে। আর যদি পরিবর্তনটা শরয়ী প্রয়োজনের স্বার্থে হয়– যেমন কোনো মুহাদ্দিসের স্মৃতিশক্তি ও মেধা যাচাই করার জন্য, তাহলে এমন পরিবর্তনের অনুমতি রয়েছে। তবে এটা সাময়িকের জন্য মাত্র। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই সনদ ও মতন সহীহ অবস্থায় এনে দিতে হবে। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম উকাইলী (র.) -এর ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষার ঘটনা ঘটেছিল। নিম্নে তাঁদের ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

ইমাম বুখারী (র.)-এর পরীক্ষার ঘটনা : ইমাম বুখারী (র.) বাগদাদে সফরে এলে এখানকার হাদীসবেত্তাগণ তাঁর মেধা ও যোগ্যতা পরীক্ষা করতে চাইলেন। কেননা, পূর্ব থেকেই তারা ইমাম বুখারী (র.) -এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও যোগ্যতার কথা শুনেছিলেন। তাই তারা একশটি হাদীস বাছাই

করলেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ ও মতন পাল্টে ফেললেন। এক সনদের সাথে অন্য মতন জুড়ে দিলেন; এক মতনের পূর্বে অন্য সনদ যোগ করলেন। দশজন লোককে নিযুক্ত করা হলো। প্রত্যেককে দশটি বিকৃত হাদীস মুখস্থ করানো হলো। মজলিস শুরু হলো। বাগদাদের স্থানীয় আলিম এবং খোরাসান ও অন্যান্য স্থানের আলিমগণ সমবেত হলেন। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে নির্বাচিত দশজনের একজন এগিয়ে গেলেন এবং এক এক করে দশটি হাদীস তাঁকে শুনিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি এটি জানেন কিনা। প্রতিবারেই তিনি জবাব দিচ্ছিলেন, আমি জানি না। অতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এভাবে দশজন ব্যক্তি হাদীস শুনালেন। তিনি প্রতিবার শুধু বলছিলেন, আমি জানি না। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অনেকে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আবার অনেকেই না বুঝে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ল। ইমাম বুখারী যখন অবস্থা থেকে বুঝলেন যে, তাদের প্রশ্ন শেষ হয়েছে, তখন তিনি প্রথম ব্যক্তির দিকে ফিরলেন এবং বললেন, আপনি তো এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। আসলে ওটি হবে এরূপ। এভাবে পুরো একশটি হাদীস তিনি বলে দিলেন। প্রত্যেকটি হাদীস প্রথমে তার নিকটে যেভাবে পেশ করা হয়েছিল, তিনি হুবহু সেভাবে বিবৃত করলেন। অতঃপর শুদ্ধটি বলে দিলেন। তখন সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও হাদীস জ্ঞানে অনন্যতার কথা স্বীকার করে নিল।

ইমাম উকাইলী (র.) -এর পরীক্ষার ঘটনা : সালামা ইবনে কাসেম বর্ণনা করেন, ইমাম উকাইলী (র.) সবসময় মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁর মূল কপিটি বের করতেন না। এক সময়ে আমরা বলাবলি করলাম, ইনি হয়তো অত্যন্ত মেধাবী নতুবা ডাহা মিথ্যাবাদী। তাই আমরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর ইতঃপূর্বে বর্ণিত কিছু হাদীস বিকৃত করে লেখলাম। অতঃপর তাঁর নিকট গিয়ে হাদীসগুলো তাঁর মুখে পুনরায় শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন, তুমি পাঠ কর। আমি পাঠ করতে করতে যেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে সেখানে পৌঁছলে তিনি আমার কাছ থেকে খাতাটি চেয়ে নিলেন এবং যেখানে যা সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছিল তা সংশোধন করে দিলেন। এ থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম যে, সত্যিই তিনি অসাধারণ মেধাবী।

اَلْمُصَحَّفُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُصَحَّفُ শব্দটি اَلتَّصْحِيْفُ মূলধাতু হতে اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ। اَلتَّصْحِيْفُ -এর অর্থ– লেখা কিংবা পড়ায় বিকৃতি করা, উচ্চারণ বিকৃতি করা ইত্যাদি। এ হিসেবে اَلْمُصَحَّفُ অর্থ– বিকৃত।

اَلْمُصَحَّفُ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَلْمُصَحَّفُ হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ ثَبَتَ فِيْهِ مُخَالَفَةُ الرَّاوِيْ لِلثِّقَاتِ اَوِ الْاَوْثَقِ بِتَغْيِيْرِ حَرْفٍ اَوْ حُرُوْفٍ فِى السِّيَاقِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى النُّقَطِ مَعَ بَقَاءِ صُوْرَةِ الْخَطِّ وَيَقَعُ فِى السَّنَدِ وَالْمَتْنِ.

অর্থাৎ মুসাহহাফ প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে, যার সনদ এবং মতন বহাল তবিয়তে বাকি থাকে; কিন্তু এক বা একাধিক অক্ষরের নুকতা পরিবর্তিত হয়ে যায়। (চাই নুকতার সাথে ই'রাবেও পরিবর্তন হোক বা না হোক।) নুকতার মধ্যে এভাবে পরিবর্তন করাকে তাসহীফ বলে। এ তাসহীফ সনদ এবং মতন উভয় স্থানেই হয়। তবে মতনে বেশি এবং সনদ কম হয়।

اَلتَّصْحِيْفُ فِى السَّنَدِ -এর সংজ্ঞা : রেওয়ায়েতে নুকতার পরিবর্তন যদি সনদের মধ্যে কোথাও হয়, তাহলে তাকে اَلتَّصْحِيْفُ فِى السَّنَدِ বলে।

اَلتَّصْحِيْفُ فِى السَّنَدِ -এর উদাহরণ : নিম্নোক্ত হাদীসটি এর উদাহরণ–

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مَرَاجِمَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا.

অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা পাওনাদারদের **হক আদায় করবে।**

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) আলোচ্য হাদীসটিকে اَلْمُصَحَّفُ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি সনদের اَلْعَوَامُ بْنُ مُرَاجِمٍ -এর স্থলে اَلْعَوَّامُ بْنُ مُزَاحِمٍ রেওয়ায়েত করেছেন।

اَلتَّصْحِيْفُ فِى الْمَتْنِ -এর সংজ্ঞা : রেওয়ায়েতে নুকতার পরিবর্তন যদি মতনের মধ্যে হয়, তাহলে তাকে اَلتَّصْحِيْفُ فِى الْمَتْنِ বলে।

اَلتَّصْحِيْفُ فِى الْمَتْنِ -এর উদাহরণ : নিম্নের হাদীসটি এর উদাহরণ–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখার পরে শাওয়াল মাসে ৬টি রোজা রাখে, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।

আবূ বকর আসসূলী (র.) এ হাদীসটি اَلْمُصَحَّفُ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। কেননা, তিনি سِتًّا مِنْ شَوَّالَ -এর স্থলে شَيْئًا مِنْ شَوَّالَ বলেছেন।

اَلْمُحَرَّفُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُحَرَّفُ শব্দটি اَلتَّحْرِيْفُ মাসদার হতে নির্গত اِسْمِ مَفْعُوْلٍ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ। اَلتَّحْرِيْفُ অর্থ– বিকৃত করা, পরিবর্তন করা ইত্যাদি। এ হিসেবে اَلْمُحَرَّفُ অর্থ– পরিবর্তিত, বিকৃত।

اَلْمُحَرَّفُ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় اَلْمُحَرَّفُ হলো–

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ وَقَعَتْ فِيْهِ مُخَالَفَةُ الرَّاوِىْ لِلثِّقَاتِ بِتَغْيِيْرِ حَرْفٍ اَوْ حُرُوْفٍ فِى السِّيَاقِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الشَّكْلِ مَعَ بَقَاءِ صُوْرَةِ الْخَطِّ.

অর্থাৎ 'مُحَرَّفٌ ঐ হাদীসকে বলে যার মধ্যে লেখার রূপ বহাল রেখে এক বা একাধিক অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করার মাধ্যমে রাবী নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করেন। এভাবে অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তন করাকে তাহরীফ বলে।' এই তাহরীফ অধিকাংশ মতনে হয়, তবে কখনো সনদের নামের মধ্যেও হয়।

اَلتَّحْرِيْفُ فِى السَّنَدِ -এর উদাহরণ : সনদের মধ্যে عَقِيْل (আইন বর্ণে যবর এবং ক্বাফ বর্ণে যের) -কে عُقَيْل (আইন বর্ণে পেশ ও ক্বাফ বর্ণে যবর) -এ পরিবর্তন করে ফেলা ইত্যাদি।

اَلتَّحْرِيْفُ فِى الْمَتْنِ -এর উদাহরণ : এর উদাহরণ হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি– ... رُمِىَ اَبِىْ يَوْمَ الْاَحْزَابِ فِىْ اَكْحَلِهِ

রাবী গুন্দুর এ হাদীসে তাহরীফ করে اُبَىٌّ-কে اَبِىْ বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ তা ভুল। কেননা, হযরত জাবির (রা.) -এর পিতা খন্দক যুদ্ধের পূর্বেই উহুদে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। হাদীসোক্ত اُبَىٌّ শব্দ মূলত اُبَىٌّ (উবাই); اَبِىْ (আবী) নয়।

وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ صُورَةِ الْمَتْنِ مُطْلَقًا وَلَا الْاِخْتِصَارُ مِنْهُ بِالنَّقْصِ وَلَا اِبْدَالُ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ بِاللَّفْظِ الْمُرَادِفِ لَهُ اِلَّا لِعَالِمٍ بِمَدْلُوْلَاتِ الْاَلْفَاظِ وَبِمَا يُحِيْلُ الْمَعَانِىْ عَلَى الصَّحِيْحِ فِى الْمَسْئَلَتَيْنِ اَمَّا اِخْتِصَارُ الْحَدِيْثِ فَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى جَوَازِهٖ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الَّذِىْ يَخْتَصِرُهٗ عَالِمًا لِاَنَّ الْعَالِمَ لَا يَنْقُصُ مِنَ الْحَدِيْثِ اِلَّا مَا لَاتَعَلُّقَ لَهٗ بِمَا يَبْقِيْهِ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ وَلَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ حَتّٰى يَكُوْنَ الْمَذْكُوْرُ وَالْمَحْذُوْفُ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ اَوْ يَدُلُّ مَا ذَكَرَهٗ عَلٰى مَا حَذَفَهٗ بِخِلَافِ الْجَاهِلِ فَاِنَّهٗ قَدْ يَنْقُصُ مَالَهٗ تَعَلُّقٌ كَتَرْكِ الْاِسْتِثْنَاءِ ـ

অনুবাদ : হাদীসের মতনে শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন বা তা থেকে কমিয়ে সংক্ষেপ করা কিংবা একটি শব্দের পরিবর্তে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা কেবলমাত্র তার জন্য জায়েজ, যিনি শব্দাবলির অর্থসমূহ ও অর্থ পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে অবগত। উভয় ক্ষেত্রে এটিই সঠিক অভিমত।

হাদীস সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম জায়েজ হবার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে শর্ত থাকে যে, যিনি সংক্ষেপ করবেন, তাকে প্রকৃত আলিম হতে হবে। কেননা, আলিম ব্যক্তিই হাদীস থেকে এমন অংশ কমাবেন, অবশিষ্ট অংশের সাথে যার সম্পর্ক নেই। তাহলে অর্থের যেমন কোনো বিকৃতি ঘটবে না, তেমনি বর্ণনাধারাও ব্যাহত হবে না। ফলে উল্লিখিত ও উহ্য অংশ দুটি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে বিবেচিত হবে। অথবা উল্লিখিত অংশই উহ্য অংশকে নির্দেশ করবে। পক্ষান্তরে যিনি আলিম নন, তিনি এরূপ করতে পারবেন না; বরং অনেক সময় তিনি এমন অংশ বাদ দেবেন যা উল্লিখিত অংশের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– 'ইসতিছনা'। (এটা বাদ দিলে অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মতনে পরিবর্তন সাধন : মতনে ইচ্ছাপূর্বক পরিবর্তন করা চাই তা একক শব্দে হোক কিংবা যৌগিক শব্দে– তা মোটেও জায়েজ নেই।

اِخْتِصَار حَدِيْث -এর সংজ্ঞা : হাদীসের একাংশ উল্লেখ না করে আরেক অংশ উল্লেখ করাকে اِخْتِصَار حَدِيْث বা হাদীস সংক্ষেপকরণ বলে।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ও হাদীস সংকলক একটি দীর্ঘ হাদীসের ঐ অংশ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, تَرْجَمَةُ الْبَابِ -এর সাথে যেই অংশটুকুর সংশ্লিষ্টতা আছে– একেও اِخْتِصَار حَدِيْث বলে।

اِخْتِصَار حَدِيْث -এর কারণ : মানুষের হৃদয়ে সব সময় আনন্দ-উৎফুল্লতা থাকে না। হাদীস প্রচার ও প্রসারের যুগে মুহাদ্দিসগণের কাজই ছিল হাদীস সংগ্রহ করা ও শিক্ষা দেওয়া। সাধারণত হাদীস রেওয়ায়েত করার সময় মুহাদ্দিস ও রাবীর মনে আনন্দ-উৎফুল্লতা থাকত। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে এমনকি তার হাদীস শ্রবণের অবস্থাসহ উল্লেখ করতেন। অনেক সময় এমনও হতো যে, রাবীর মনে আনন্দ-উৎফুল্লতা নেই কিংবা স্থান-কাল-পাত্র অনুকূল নয় কিংবা হাদীস হতে শরয়ী মাসআলা বের করার স্বার্থে তিনি হাদীসটিকে সংক্ষেপ করেন অর্থাৎ বর্তমানে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করে বাকি অংশ অনুল্লেখ রেখে রেওয়ায়েত করতেন।

اِخْتِصَار حَدِيْث -এর হুকুম : মুহাদ্দিসগণের মাঝে اِخْتِصَار حَدِيْث -এর হুকুম নিয়ে মতবিরোধ আছে। এ ব্যাপারে চারটি মতামত প্রণিধাণযোগ্য। যথা–

১. اَلْمَنْعُ مُطْلَقًا অর্থাৎ কোনোভাবেই জায়েজ নেই।

২. اَلْجَوَازُ مُطْلَقًا অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য জায়েজ। চাই তিনি মুহাদ্দিস হন অথবা মুহাদ্দিস না হন। রাবী পূর্ণ হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করুক অথবা না করুক।

৩. যে রাবী হাদীস اِخْتِصَارْ করেছেন তিনি অথবা অন্য আরেকজন রাবী যদি অন্তত একবার পূর্ণ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন, তবে اِخْتِصَارُ الْحَدِيْثِ জায়েজ। নতুবা জায়েজ নেই।

৪. এটি জমহুর মুহাদ্দিসীনের অভিমত। আর এ অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। আল্লামা ইবনুস সালাহ ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ অভিমত অবলম্বন করেছেন। আর তা হলো নিম্নরূপ–

اِخْتِصَار حَدِيْث ঐ আলিম ও মুহাদ্দিসের জন্য জায়েজ যিনি হাদীসের مَفْهُوْم ও مَعَانِىْ ভালোভাবে বুঝেন। কারণ, তিনি যখন اِخْتِصَار করবেন, বুঝে-শুনেই করবেন। যে অংশ তিনি উল্লেখ করবেন না তার সাথে উল্লেখ করা অংশের সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। ফলে হাদীসের মূল বক্তব্য ও ভাব বিকৃত হবে না। যদি কোনো জাহিল বা অজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ করে, তবে সে তা না বুঝেই করবে। এতে হাদীসের মূল বক্তব্য ও ভাব বিকৃত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস–

لَا تُبَاعُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

অর্থাৎ তোমরা সমান সমান ছাড়া স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ বিক্রয় করো না।

এখানে যদি اِخْتِصَار করতে গিয়ে سَوَاءً بِسَوَاءٍ -কে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে হাদীসের মূল বক্তব্য ও ভাব সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। যেখানে সমান সমান হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রিকে জায়েজ বলা হয়েছে সেখানে অর্থ পাল্টে হয়ে যাবে– কোনো অবস্থাতেই স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই।

অনুরূপভাবে যদি غَايَة -কে বাদ দেওয়া হয়, তাহলেও অর্থ পাল্টে যাবে। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস– لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تَزْهٰى

অর্থাৎ তোমরা ফল না পাকা পর্যন্ত বিক্রয় করবে না।

এ হাদীসে اِخْتِصَارْ তথা সংক্ষেপ করতে গিয়ে যদি حَتّٰى تَزْهٰى -কে বাদ দেওয়া হয়, তবে যেখানে হাদীসের মূল বক্তব্য ছিল– 'পরিপক্ক হলে ফল বিক্রি জায়েজ' তা পাল্টে হয়ে যাবে– 'কোনো অবস্থাতেই ফল বিক্রি জায়েজ নেই।'

তাই জুমহুর মুহাদ্দিসগণ اِخْتِصَار حَدِيْث জায়েজ হবার জন্য রাবীর আলিম-মুহাদ্দিস হওয়ার শর্ত করেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, শুধু আলিম-মুহাদ্দিস হলে হবে না; বরং এমন আলিম-মুহাদ্দিস হতে হবে, যিনি تُهْمَة (সন্দেহভাজন)-এর ঊর্ধ্বে হবেন। যদি এমন হয় যে, একবার রাবী পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি রেওয়ায়েত করার পর দ্বিতীয়বার যদি اِخْتِصَار করেন, তাহলে তার উপর قِلَّة ضَبْط (কম আয়ত্তশক্তি), غَفْلَة (উদাসীনতা), نِسْيَان (ভুল) অথবা زِيَادَة (বৃদ্ধি) -এর তোহমত উঠে, তাহলে এমন আলিম-মুহাদ্দিসের জন্য اِخْتِصَار حَدِيْث জায়েজ নেই।

হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে বর্ণনা করার হুকুম : হাদীসের আলোকে মাসআলা ইস্তিম্বাত ও আহরণের জন্য হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে রেওয়ায়েত করা জায়েজ কিনা– এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **ইমাম নববী ও হাফিজ সুয়ূতীর অভিমত :** তাঁদের মতে মাসআলা আহরণের জন্য হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে বর্ণনা করা জায়েজ।

২. **ইবনুস সালাহ -এর অভিমত :** তাঁর মতে এটাও কারাহাতমুক্ত নয়। অর্থাৎ এমনটি করা মাকরূহ হবে।

তবে এ ব্যাপারে ইমাম নববী ও হাফিজ সুয়ূতী (র.) -এর অভিমত সর্বোচ্চ সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা, জুমহুর মুহাদ্দিগণের অভিমত হলো, যদি কোনো হাদীস-সংকলক মুহাদ্দিস একটি দীর্ঘ হাদীসকে খণ্ড খণ্ড করে একাধিক بَابْ -এর অধীনে تَرْجَمَةُ الْبَابِ (অধ্যায়ের শিরোনাম) প্রমাণের জন্য আনেন, তবে তা জায়েজ আছে। ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাঊদ সহ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে এমনটি অনেক করেছেন।

وَاَمَّا الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنٰى فَالْخِلَافُ فِيْهِ شَهِيْرٌ وَالْاَكْثَرُ عَلَى الْجَوَازِ اَيْضًا وَمِنْ اَقْوٰى حُجَجِهِمُ الْاِجْمَاعُ عَلٰى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيْعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ لِلْعَارِفِ بِهٖ فَاِذَا جَازَ الْاِبْدَالُ بِلُغَةٍ اُخْرٰى فَجَوَازُهٗ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ اَوْلٰى ، وَقِيْلَ اِنَّمَا يَجُوْزُ فِى الْمُفْرَدَاتِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ ، وَقِيْلَ اِنَّمَا يَجُوْزُ لِمَنْ يَسْتَحْضِرُ اللَّفْظَ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ وَقِيْلَ اِنَّمَا يَجُوْزُ لِمَنْ كَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيْثَ فَنَسِىَ لَفْظَهٗ وَبَقِىَ مَعْنَاهُ مُرْتَسِمًا فِىْ ذِهْنِهٖ فَلَهٗ اَنْ يَرْوِيَهٗ بِالْمَعْنٰى لِمَصْلَحَةِ تَحْصِيْلِ الْحُكْمِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لِلَفْظِهٖ، وَجَمِيْعُ مَا تَقَدَّمَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهٖ ، وَلَاشَكَّ اَنَّ الْاَوْلٰى اِيْرَادُ الْحَدِيْثِ بِاَلْفَاظِهٖ دُوْنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ قَالَ الْقَاضِىْ عِيَاضٌ يَنْبَغِىْ سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنٰى لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ اَنَّهٗ يُحْسِنُ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ ـ

অনুবাদ : অর্থ ঠিক রেখে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন করা সম্পর্কে মতপার্থক্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এক্ষেত্রেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস বৈধতার পক্ষপাতী। তাদের একটি মজবুত দলিল হলো, অনারবদের নিকট তাদেরই ভাষায় শরিয়তের বিধান ব্যাখ্যা করা 'বিষয় ও উভয় ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ' ব্যক্তির জন্য বৈধ। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং পুরো ভাষা যেখানে পরিবর্তন করা জায়েজ, সেখানে আরবি ভাষায় পরিবর্তন করা জায়েজ হবে অতি উত্তমভাবে।

অনেকের মতে, এ পরিবর্তন শুধুমাত্র শব্দের ক্ষেত্রে জায়েজ, বাক্যের ক্ষেত্রে নয়। আবার কারো কারো মতে, যিনি হাদীসের মূল শব্দসমূহ মনে রেখেছেন তার জন্য জায়েজ। কেননা, মূলশব্দ মনে থাকলেই তিনি তাতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন অনেকে। তারা বলেন, যিনি হাদীসটি মনে রেখেছেন কিন্তু হুবহু শব্দ ভুলে গেছেন আর অর্থটি তার মনে গাঁথা আছে, তার জন্য প্রতিশব্দে হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ।

এ মতপার্থক্য হলো জায়েজ কিনা তা নিয়ে। কিন্তু হুবহু শব্দে হাদীস বর্ণনা উত্তম হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কাজি ইয়ায (র.) বলেন, হাদীসের অর্থগত বর্ণনার দ্বার বন্ধ রাখা উচিত, যাতে করে যে ব্যক্তি আসলেই ভালোভাবে জানে না অর্থাৎ ভালো আলিম না অথচ মনে করে আমি ভালো জানি (আলিম), সে যেন এমনটি করার দুঃসাহস না করতে পারে। যেমনটি প্রাচীন ও আধুনিককালের অনেক রাবী করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রেওয়ায়েতের দু পন্থা : হাদীস রেওয়ায়েত করার পন্থা দুটি। ১. رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ তথা শব্দগত রেওয়ায়েত ও ২. رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى তথা অর্থগত রেওয়ায়েত। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ -এর সংজ্ঞা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়েছে হুবহু ঐ শব্দে হাদীস রেওয়ায়েত করার নাম رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ।

رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ -এর হুকুম : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সহ সকলের অভিমত হলো, রেওয়ায়েতের দু পন্থার মধ্যে رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ -ই আসল ও সর্বোচ্চ সঠিক পন্থা। তাই সর্বসম্মতিভাবে এভাবে রেওয়ায়েত করা জায়েজ।

২. **رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى -এর সংজ্ঞা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস বর্ণনায় যে اَلْفَاظ বলেছেন সে اَلْفَاظ না বলে তার مَعْنٰى তথা মূলভাবকে مُرَادِف তথা প্রতিশব্দে রেওয়ায়েত করাকে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى বলে।

رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى -এর হুকুম : رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى তথা অর্থগত বর্ণনা জায়েজ কি জায়েজ নয়– তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** চার ইমাম, অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং উসূলীনদের অভিমত হলো, رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى শর্তের সাথে জায়েজ। আর সে শর্ত হলো, যিনি رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى করবেন তাকে আলিম-মুহাদ্দিস হতে হবে। (সাধারণ ও মূর্খলোকদের জন্য এটা জায়েজ নেই।) তাঁদের অভিমতের স্বপক্ষে সবচে বড় দলিল হলো, অনারবদের কাছে তাদের ভাষায় ইসলাম ও শরিয়ত সম্পর্কে তুলে ধরা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। অতএব যখন অনারবদের ভাষায় হাদীসের ভাষান্তর জায়েজ, তখন আরবি ভাষায় প্রতিশব্দ দ্বারা হাদীসের মূলভাব রেওয়ায়েত করা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জায়েজ হবে।

আর এটার অনুমতির স্বপক্ষে একটি হাদীসও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে যেভাবে (যে শব্দে) হাদীস শুনি সেভাবে (সে শব্দে) অন্যের কাছে রেওয়ায়েত করতে পারি না– শব্দের কমবেশি করে ফেলি। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি তুমি হাদীসের মূলভাব ঠিক রাখ এবং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম না কর, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

ওলামায়ে কেরামের মতে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى তথা অর্থগত রেওয়ায়েত জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে এ হাদীস অন্যতম প্রমাণ।

২. **কারো কারো অভিমত :** رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى শব্দের মধ্যে জায়েজ; বাক্যের মধ্যে জায়েজ নয়। যেমন– হাদীসে আগত لَيْث শব্দের স্থানে اَسَد বলা ইত্যাদি।

৩. **কতিপয়ের অভিমত :** رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى কেবল সেই ব্যক্তির জন্য জায়েজ, হাদীসের শব্দ যার মুখস্থ থাকে। যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে হাদীসের হুবহু শব্দ বলতে পারে।

৪. **অনেকের অভিমত :** যে ব্যক্তি হাদীসের শব্দ মুখস্থ করেছিল কিন্তু পরে শব্দ ভুলে গিয়েছে এবং অর্থ ভালোভাবে মনে আছে, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى জায়েজ। শুধু অর্থ যে জানে তার জন্য জায়েজ নেই।

৫. **আল্লামা কাজি ইয়ায (র.) -এর অভিমত :** তাঁর মতে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى -এর দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় যে কারো জন্য এর অনুমতি না থাকা উচিত। যাতে করে আলিমদের দেখাদেখি যারা আলিম নয় কিন্তু নিজেদের আলিম বলে ভাবে, তারা যেন এর সুযোগ নিয়ে رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى করার দুঃসাহস না করে। কেননা, অতীতে এবং পরে অনেকে এমনটি করেছে।

رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ - ই সর্বোত্তম : বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ওলামায়ে কেরাম رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى জায়েজ হওয়ার পক্ষপাতী হলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত এবং কোনো সন্দেহ নেই যে, رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ তথা রাসূলের হুবহু শব্দে হাদীস রেওয়ায়েত করাই সর্বোত্তম। একটি হাদীস থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে। হাদীসটি হলো– نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার থেকে কোনো হাদীস শুনেছে অতঃপর তা যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অপরের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنٰى بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِقِلَّةٍ أُحْتِيْجَ إِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِيْ شَرْحِ الْغَرِيْبِ كَكِتَابِ أَبِيْ عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ وَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى الْحُرُوْفِ وَأَجْمَعُ مِنْهُ كِتَابُ أَبِيْ عُبَيْدِ الْهَرَوِيْ وَقَدِ اعْتَنٰى بِهِ الْحَافِظُ أَبُوْ مُوْسَى الْمَدِيْنِيْ فَتَعَقَّبَ عَلَيْهِ وَاسْتَدْرَكَ وَلِلزَّمَخْشَرِيِّ كِتَابٌ اِسْمُهُ الْفَائِقُ حَسَنُ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ جَمَعَ الْجَمِيْعَ ابْنُ الْأَثِيْرِ فِي النِّهَايَةِ وَكِتَابُهُ أَسْهَلُ الْكُتُبِ تَنَاوُلًا مَعَ اَعْوَازٍ قَلِيْلٍ فِيْهِ۔

অনুবাদ : হাদীসের অর্থ যদি অস্পষ্ট হয়, যেমন কোনো শব্দ অপ্রচলিত হবার কারণে হয়ে থাকে; তাহলে প্রয়োজন পড়বে 'শরহুল গরীব' বা অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবের। এ বিষয়ে আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সালামের একখানা গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু তা সুবিন্যস্ত নয়। পরবর্তীকালে শায়খ মুওফফাকুদ্দীন ইবনে কাদামা এটিকে বর্ণ-ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। তবে এর চেয়ে অধিক তথ্যসমৃদ্ধ হলো আবূ উবাইদ হারভীর কিতাব। হাফিজ আবূ মূসা মাদীনী এর উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থের কোথাও কোথাও সমালোচনা করেছেন, আবার কোথাও নতুন বিষয় সংযোজন করে দিয়েছেন। আল্লামা যামাখশারীর এ বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রয়েছে যার নাম 'আল-ফায়িক'। এটি সুবিন্যস্ত। আর এগুলোকে একত্রিত করেছেন ইবনুল আছীর তাঁর 'নিহায়া' গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থটিই সবচেয়ে সহজবোধ্য। অবশ্য সামান্য কয়েক জায়গায় কিছুটা জড়তা আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنٰى : এখান থেকে সম্মানিত লেখক যে আলোচনাটি করেছেন তা উদ্দেশ্যগত নয়; বরং প্রাসঙ্গিক। পূর্বের সাথে দূর-সম্পর্ক থাকায় এ আলোচনার অবতারণা করেছেন।

حَدِيْث غَرِيْب -এর সংজ্ঞা : কোনো শব্দের ব্যবহার যদি কম হয়, তাহলে সে শব্দকে বলে غَرِيْب। এই غَرِيْب শব্দ যে হাদীসে আসে সে হাদীসকে বলে حَدِيْث غَرِيْب।

আরবিতে হাদীসে গরীবের সংজ্ঞা এরূপ–

هُوَ مَا جَاءَ فِي الْمَتْنِ مِنْ لَفْظٍ غَامِضٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْفَهْمِ لِقِلَّةِ اِسْتِعْمَالِهِ۔

অর্থাৎ যার মতনে দুর্বোধ্য কোনো শব্দ থাকে, কম ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যার অর্থ সহজে বুঝা যায় না।

وَاِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِكَثْرَةٍ لٰكِنْ فِىْ مَدْلُوْلِهٖ دِقَّةٌ اُحْتِيْجَ اِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِىْ شَرْحِ مَعَانِى الْاَخْبَارِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ مِنْهَا وَقَدْ اَكْثَرَ الْاَئِمَّةُ مِنَ التَّصَانِيْفِ فِىْ ذٰلِكَ كَالطَّحَاوِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِمْ ـ

অনুবাদ : আর যদি খোদ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও সংশ্লিষ্ট হাদীসে তার নির্দেশিত অর্থ সূক্ষ্ম হয়, তাহলে প্রয়োজন পড়বে 'শরহু মা'আনিল আখবার' বা হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণ ও জটিল হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবের। এ বিষয়ে ইমামগণের প্রচুর রচনা রয়েছে। যেমন– ইমাম ত্বাহাবী, খাত্তাবী, ইবনে আব্দিল বার প্রমুখ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْث مُشْكِل-এর সংজ্ঞা : যে শব্দের ব্যবহার বেশি কিন্তু তার অর্থ ও মর্ম হয় সূক্ষ্ম, তাহলে সে শব্দকে বলে مُشْكِل। যে হাদীসের মধ্যে এই مُشْكِل শব্দ থাকে সে হাদীসকে বলা হয় حَدِيْث مُشْكِل।

আরবিতে مُشْكِلُ الْحَدِيْثِ-এর সংজ্ঞা :

هُوَ مَا جَاءَ فِى الْمَتْنِ مِنْ لَفْظٍ مُسْتَعْمَلَةٍ بِكَثْرَةٍ لٰكِنْ فِىْ مَدْلُوْلِهٖ دِقَّةٌ ـ

অর্থাৎ مُشْكِلُ الْحَدِيْثِ বলা হয় ঐ হাদীসকে যার মতনে এমন কোনো শব্দ থাকে যা প্রচুর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইবারতের মাঝে তা এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তার মতলব ও মূল বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

হাদীসের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার কারণ : দু কারণে হাদীসের অর্থ অস্পষ্ট হয়। যথা–

১. হাদীসে غَرِيْب শব্দ ব্যবহার হওয়ার কারণে। অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহার হওয়ার কারণে যার ব্যবহার হয় কম।

২. হাদীসের শব্দের ব্যবহার বেশি হলেও তার অর্থ সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে।

হাদীসে 'গরীব' শব্দ আসলে করণীয় : হাদীসে যদি 'গরীব' শব্দ আসে এবং সে কারণে হাদীসের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন হাদীসের অর্থ বুঝতে এবং পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে গরীব শব্দের ব্যাখ্যায় যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তা অধ্যয়ন করতে হবে।

হাদীসে 'মুশকিল' শব্দ আসলে করণীয় : হাদীসের অর্থ যদি অস্পষ্ট হয় তাতে 'মুশকিল' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যার ব্যবহার বেশি হলেও তার অর্থ ও মর্ম সূক্ষ্ম হয়, তাহলে এমতাবস্থায় হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে ঐ সমস্ত কিতাবের শরণাপন্ন হতে হবে য' মুশকিলুল হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে।

ثُمَّ الْجَهَالَةُ بِالرَّاوِيْ وَهِيَ السَّبَبُ الثَّامِنُ فِي الطَّعْنِ وَسَبَبُهَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ مِنْ اِسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ نَسَبٍ فَيَشْتَهِرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ فَيُظَنُّ أَنَّهُ آخَرُ فَيَحْصُلُ الْجَهْلُ بِحَالِهِ وَصَنَّفُوْا فِيْهِ أَيْ فِيْ هٰذَا النَّوْعِ الْمُوْضِحَ لِأَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقِ أَجَادَ فِيْهِ الْخَطِيْبُ وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ عَبْدُ الْغَنِيِّ ثُمَّ الصُّوْرِيُّ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بِشْرٍ الْكَلْبِيُّ نَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلٰى جَدِّهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ حَمَّادَ بْنَ السَّائِبِ وَكَنَّاهُ بَعْضُهُمْ أَبَا النَّضْرِ وَبَعْضُهُمْ أَبَا سَعِيْدٍ وَبَعْضُهُمْ أَبَا هِشَامٍ فَصَارَ يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيْقَةَ الْأَمْرِ فِيْهِ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ۔

অনুবাদ : অতঃপর রাবীর অজ্ঞাত হওয়া। এটি রাবী সংক্রান্ত অষ্টম অভিযোগ। এরূপ হয় দু কারণে। একটি হলো, কোনো রাবীর অনেক পরিচয় থাকে। যেমন– নাম, উপনাম, উপাধি, পেশা, দক্ষতা, বংশ ইত্যাদি। তিনি হয়তো কোনো একদিক দিয়ে পরিচিত। কিন্তু কোথাও কারণবশত তাকে উল্লেখ করা হলো এমন এক পরিচয়ে যাতে তিনি প্রসিদ্ধ নন। ফলে ধারণা হতে পারে যে, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। এভাবে তিনি অপরিচিত হয়ে যাবেন। এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদির নাম 'আল-মূযিহু লিআওহামিল জাময়ি ওয়াত তাফরীক'। খতীবে বাগদাদী এ সম্পর্কে সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তার পূর্বে আব্দুল গনী ও আসসূরী এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এর উদাহরণ মুহাম্মদ ইবনুস সায়েব ইবনে বিশর কালবী। অনেকে তাকে উল্লেখ করেন দাদার সাথে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মদ ইবনে বিশর নামে। কেউ বলেছেন তার নাম হাম্মাদ ইবনে সায়েব। তার কুনিয়াত বা উপনাম কেউ বলেছেন আবূ নযর, আবার কেউ বলেন আবূ সাঈদ, আবার কেউ বলেন আবূ হিশাম। ফলে ধারণা জন্মায় যে এরা একদল লোক। অথচ তিনি একজনই। যিনি প্রকৃত ঘটনা জানেন না তিনি কিছুই বুঝতে পারবেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَهَالَةُ الرَّاوِيْ -এর সংজ্ঞা : কোনো রাবীর ذَاتْ কিংবা صِفَتْ অজ্ঞাত থাকাকে جَهَالَةُ الرَّاوِيْ বলা হয়।

جَهَالَةُ ذَاتْ -এর অর্থ হলো, তিনি কে? সুস্পষ্টভাবে তা চিহ্নিত ও সনাক্ত করা যায় না।

جَهَالَةُ صِفَتْ -এর অর্থ হলো, তিনি কোন ধরনের রাবী, ছিকাহ– না যা'ঈফ? তা নির্দিষ্ট করা যায় না

جَهَالَةُ الرَّاوِيْ -এর কারণ : جَهَالَةُ الرَّاوِيْ তথা রাবী অজ্ঞাত হয় দুটি কারণে। ১. রাবীর পরিচয়সূত্র অনেক হওয়া ও ২. রাবীর হাদীস ও ছাত্র কম হওয়া। নিম্নে উভয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ : রাবীর অজ্ঞাত হওয়ার দুটি কারণের মধ্যে প্রথমটি হলো, রাবীর পরিচয়সূত্র অনেক হওয়া। যেমন– নাম, উপনাম, উপাধি, বংশ, আঞ্চলিক সম্বন্ধ, পেশা ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে একটিতে তিনি প্রসিদ্ধ হন আর বাকিগুলো অপ্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী তার অপ্রসিদ্ধ কোনো বিশেষণ বা পরিচয় উল্লেখ করে, যার দরুন তার প্রকৃত পরিচিতি জানা যায় না; বরং ধারণা হয় তিনি অন্য কোনো ব্যক্তি হবেন। সুতরাং এভাবে একজন পরিচিত রাবী অনেক সময় مَجْهُوْل বা অজ্ঞাত-অপরিচিত হয়ে যায়।

পরিচয়সূত্র অনেক হওয়ার ভিত্তিতে রাবী অজ্ঞাত হওয়ার উদাহরণ : মুহাম্মদ ইবনুস সায়েব ইবনে বিশর কালবী একজন রাবী। তার নাম মুহাম্মদ, উপাধি হাম্মাদ, উপনাম আবূ নযর, আবূ সাঈদ এবং আবূ হিশাম। এখন কেউ তাকে দাদার দিকে সম্বন্ধ করে মুহাম্মদ ইবনে বিশর, কেউ তাকে হাম্মাদ ইবনুস সায়েব, কেউ তাকে কুনিয়াত হিসেবে আবূ নযর, কেউ আবূ সাঈদ আবার কেউ আবূ হিশাম পরিচয়ে উল্লেখ করে। যার কারণে আসল ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায় না ; বরং ধারণা হয় যে, তারা এক রাবী– না একাধিক রাবী। অথচ বাস্তবে তিনি একজনই।

এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলি : পরিচয়সূত্র একাধিক হওয়ার কারণে যে সমস্ত রাবীর ক্ষেত্রে অজ্ঞাত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ যে সমস্ত রাবী مَجْهُوْل হয়েছেন তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে মুহাদ্দিসগণ অনেক কিতাব লেখেছেন। তাদের মধ্যে প্রথমে যার নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন শায়খ আব্দুল গনী (র.), এরপরে রয়েছেন শায়খ আসসূরী (র.)। খতীবে বাগদাদী (র.)ও এ বিষয়ে কিতাব লেখেছেন। এর মধ্যে খতীবে বাগদাদী (র.) লিখিত কিতাবটিই সবচেয়ে ভালো। যদি এ সকল কিতাবের সাহায্যে অজ্ঞাত রাবীর পরিচয় জানা যায় অর্থাৎ তাকে সনাক্ত করা যায়, তাহলে এবার দেখতে হবে তিনি নির্ভরযোগ্য কিনা। নির্ভরযোগ্য হলে তার হাদীস মাকবূল হবে; আর নির্ভরযোগ্য না হলে তার হাদীস মাকবূল হবে না। আর যদি এ সকল কিতাবের সাহায্যেও অজ্ঞাত রাবীকে সনাক্ত করা না যায়, তাহলে তার হাদীসও মাকবূল হবে না। কারণ, হতে পারে তিনি যা'ঈফ তথা নির্ভরযোগ্য নন।

وَالْاَمْرُ الثَّانِيْ اَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَكُوْنُ مُقِلًّا مِنَ الْحَدِيْثِ فَلَا يَكْثُرُ الْاَخْذُ عَنْهُ وَقَدْ صَنَّفُوْا فِيْهِ الْوُحْدَانَ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ اِلَّا وَاحِدٌ وَلَوْ سُمِّيَ وَمِمَّنْ جَمَعَهُ مُسْلِمٌ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَغَيْرُهُمَا اَوْ لَا يُسَمَّى الرَّاوِيْ اِخْتِصَارًا مِنَ الرَّاوِيْ عَنْهُ كَقَوْلِهٖ اَخْبَرَنِيْ فُلَانٌ اَوْ شَيْخٌ اَوْ رَجُلٌ اَوْ بَعْضُهُمْ اَوْ اِبْنُ فُلَانٍ وَيُسْتَدَلُّ عَلٰى مَعْرِفَةِ اِسْمِ الْمُبْهَمِ بِوُرُوْدِهٖ مِنْ طَرِيْقٍ اُخْرٰى مُسَمًّى وَصَنَّفُوْا فِيْهِ الْمُبْهَمَاتِ .

অনুবাদ : অপরিচিতির (অজ্ঞাত হওয়ার) দ্বিতীয় কারণ হলো, রাবী হয়তো **খুব স্বল্প সংখ্যক** হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তার নিকট থেকে তেমন বেশি কেউ তা শিক্ষা করেনি। **এ ধরনের** ব্যক্তিদের পরিচয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ রচনা করেছেন 'উহদান' কিতাব। এর অর্থ হলো, **যার থেকে** মাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার নাম উল্লেখ করা হলেও তিনি অপরিচিতই থেকে যান। **ইমাম** মুসলিম, হাসান ইবনে সুফিয়ান প্রমুখ এরূপ রাবীদের নাম সংকলন করেছেন।

কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে রাবী তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন না। যেমন– তিনি বলেন, আমাকে জানিয়েছেন জনৈক শায়খ বা জনৈক ব্যক্তি বা অমুকের পুত্র। এতেও সে ব্যক্তি অপরিচিত থেকে যান। এই অস্পষ্ট রাবীর নাম যদি অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়, তাহলে তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। এ বিষয়ে লিখিত কিতাবের নাম 'মুবহামাত'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ : রাবী অজ্ঞাত বা অপরিচিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, রাবী قَلِيْلُ الْحَدِيْثِ তথা রাবীর ছাত্র ও বর্ণিত হাদীস কম হওয়া। এটা আবার দু প্রকার। যথা–

১. রাবী থেকে রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা কম; মাত্র একজন। ঐ একজন যখন রেওয়ায়েত করেন তাকে তার নামেই উল্লেখ করেন। কিন্তু তার সূত্রে রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা কম হেতু তিনি মুহাদ্দিসগণের মাঝে পরিচিত নন। ফলে তার حَالٌ অজ্ঞাত থেকে যায়। তিনি নির্ভরযোগ্য, নাকি নির্ভরযোগ্য নয় এটা অজ্ঞাত থেকে যায়।

   এমন অজ্ঞাত রাবীদের পরিচিতি তুলে ধরতে ইমাম মুসলিম (র.), হাসান ইবনে সুফিয়ান (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ 'উহদান' (যার ছাত্র একজন বা যার বর্ণিত হাদীস মাত্র একটি) নামে কিতাব রচনা করেছেন। এ সকল কিতাবে যাদের ছাত্র একজন কিংবা বর্ণিত হাদীস একটি তাদের একত্রিত করা হয়েছে। এমন مَجْهُوْلُ رَاوِيْ (অজ্ঞাত রাবী) আবার দু প্রকার। ১. مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ ও ২. مَجْهُوْلُ الْحَالِ। পরে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

২. রাবী থেকে রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা কম; মাত্র একজন। আবার সংক্ষেপার্থে ঐ একজন রাবীর নামও উল্লেখ করেননি; বরং মুবহামভাবে বলেছেন। যেমন– اَخْبَرَنِيْ فُلَانٌ তথা আমাকে অমুক সংবাদ দিয়েছে, اَخْبَرَنِيْ شَيْخٌ তথা আমাকে শায়খ সংবাদ দিয়েছেন, اَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ তথা এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিয়েছে, اَخْبَرَنِيْ بَعْضُهُمْ তথা এক লোক আমাকে সংবাদ দিয়েছে, اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ فُلَانٍ তথা অমুকের পুত্র আমাকে সংবাদ দিয়েছে ইত্যাদি। ফলে তিনি অজ্ঞাত হয়ে গিয়েছেন। কেননা, এভাবে বর্ণনা করার দ্বারা রাবী প্রকৃত কে ? তার অবস্থা কি ? তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। অবশ্য যদি অন্য সনদে তার নাম উল্লেখ হয়, তাহলে তার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, রাবী কে? তিনি নির্ভরযোগ্য কিনা। এজন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'মুবহামাত' নামে কিতাব লেখেছেন। যার মধ্যে এমন অজ্ঞাত রাবীদের জমা করা হয়েছে।

وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الْمُبْهَمِ مَا لَمْ يُسَمَّ لِاَنَّ شَرْطَ قَبُوْلِ الْخَبَرِ عَدَالَةُ رَاوِيْهِ وَمَنْ اُبْهِمَ اِسْمُهُ لَا تُعْرَفُ عَيْنُهُ فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ وَكَذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ لَوْ اُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيْلِ كَاَنْ يَقُوْلَ الرَّاوِىْ عَنْهُ اَخْبَرَنِى الثِّقَةُ لِاَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوْحًا عِنْدَ غَيْرِهِ وَهٰذَا عَلَى الْاَصَحِّ فِى الْمَسْئَلَةِ وَلِهٰذِهِ النُّكْتَةِ لَمْ يُقْبَلِ الْمُرْسَلُ وَلَوْ اَرْسَلَهُ الْعَدْلُ جَازِمًا بِهِ لِهٰذَا الْاِحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ وَقِيْلَ يُقْبَلُ تَمَسُّكًا بِالظَّاهِرِ اِذِ الْجَرْحُ عَلٰى خِلَافِ الْاَصْلِ وَقِيْلَ اِنْ كَانَ الْقَائِلُ عَالِمًا اَجْزَأَ ذٰلِكَ فِىْ حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِىْ مَذْهَبِهِ وَهٰذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ ، فَاِنْ سُمِّىَ الرَّاوِىْ وَانْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِدٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ كَالْمُبْهَمِ اِلَّا اَنْ يُوَثِّقَهُ غَيْرُ مَنْ اَنْفَرَدَ عَنْهُ عَلَى الْاَصَحِّ وَكَذَا مَنِ انْفَرَدَ عَنْهُ اِذَا كَانَ مُتَاَهِّلًا لِذٰلِكَ اَوْ اِنْ رَوٰى عَنْهُ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُوَثَّقْ فَهُوَ مَجْهُوْلُ الْحَالِ وَهُوَ الْمَسْتُوْرُ وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بِغَيْرِ قَيْدٍ وَ رَدَّهَا الْجُمْهُوْرُ، وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّ رِوَايَةَ الْمَسْتُوْرِ وَنَحْوِهِ عَمَّا فِيْهِ الْاِحْتِمَالُ لَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُوْلِهَا بَلْ هِىَ مَوْقُوْفَةٌ اِلٰى اِسْتِبَانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ اِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ اِبْنِ الصَّلَاحِ فِيْمَنْ جُرِحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ۔

অনুবাদ : অপরিচিত রাবীর নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হওয়া পর্যন্ত তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য হবার জন্য শর্ত হলো, রাবীর আদিল হওয়া। যার নামই অস্পষ্ট তাকে তো চেনা যায় না। সুতরাং তাকে কিভাবে আদিল সাব্যস্ত করা যাবে?

যদি অস্পষ্টভাবে কাউকে আদিল বলা হয়ে থাকে, যেমন– বলা হলো, আমাকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জানিয়েছেন, তবুও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হতে পারে তিনি তার নিকট নির্ভরযোগ্য কিন্তু অন্যের মতে অভিযুক্ত। এটি বিশুদ্ধতর মত। এই রহস্যের কারণেই মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো আদিল ব্যক্তি জোরালো ভাষায় মুরসাল হাদীস বর্ণনা করলেও ঠিক এই সম্ভাবনা থেকে যাবার কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকের মতে তা গ্রহণযোগ্য। তারা জাহেরী দিকটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। কেননা, অভিযোগ হলো ব্যতিক্রম। আর আদিল হওয়াই আসল অবস্থা। আবার অনেকের মতে উক্ত ব্যক্তি যদি আলিম হন, তাহলে তার মাযহাবের অনুসারীর জন্য তা চলবে। অবশ্য (তখন) এটি ইলমে হাদীসের কোনো বিষয় হবে না।

রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু-তার নিকট থেকে মাত্র একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন– ইনিও অস্পষ্ট ব্যক্তির মতোই অপরিচিত। তবে হ্যাঁ, এরূপ যার নিকট থেকে মাত্র একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেননি; বরং একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন,

তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। তেমনি কারো থেকে **মাত্র একজন রাবী হাদীস** বর্ণনা করলেও তিনি যদি যোগ্য ব্যক্তি হন, তাহলেও চলবে।

হয়তো তার নিকট থেকে **দুই** বা ততোধিক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন; **কিন্তু কেউ তাকে** নির্ভরযোগ্য বলে বর্ণনা করেননি। এরূপ ব্যক্তির সত্তা পরিচিত হলেও অবস্থা অপরিচিত। **এর নাম "মাসতূর"**। এক দল মুহাদ্দিস এরূপ ব্যক্তির হাদীস অবাধে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ তা **প্রত্যাখ্যান করেছেন**। বস্তুত মাসতূর এবং এ জাতীয় যাদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তাদের হাদীস **গ্রহণ কিংবা বর্জন** কোনোটিই অবাধে হবার কথা বলা সঙ্গত নয়; বরং তার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার **উপর নির্ভর** করতে হবে। ইমামুল হারামাইন বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। কারো **উপর অভিযোগ** আনা হলেও তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয়, তাহলে সে ব্যক্তির ব্যাপারেও ইবনুস সালাহ -এর অভিমত এ **রকমই**।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُبْهَم رَاوِى -এর সংজ্ঞা : রাবী যদি তার পূর্বের রাবীর নাম উল্লেখ না করে এবং পূর্ব রাবীর ছাত্র **মাত্র** একজন কিংবা তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা একটি হয়, তাহলে তাকে (পূর্ববর্তী রাবীকে) مُبْهَم رَاوِى বলে।

مُبْهَم رَاوِى -এর হাদীসের হুকুম : যতক্ষণ অন্য সনদে মুবহাম রাবীর নাম উল্লিখিত না হবে ততক্ষণ তার হাদীস মাকবূল হবে না। কেননা, হাদীস মাকবূল হওয়ার জন্য রাবী আদিল হওয়া শর্ত। সুতরাং মুবহাম রাবীর নাম-ই যদি না জানা যায়, তাহলে কিভাবে জানা যাবে যে, তিনি আদিল ছিলেন কিনা ? হ্যাঁ যদি অন্য সনদে তার নাম আসে এবং এভাবে তার সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি আদিল ছিলেন, তাহলে তার হাদীস মাকবূল হবে নতুবা মাকবূল হবে না।

تَعْدِيْل مُبْهَم -এর সংজ্ঞা : تَعْدِيْل مُبْهَم বা পরোক্ষ তা'দীল বলা হয় রাবীর নাম উল্লেখ না করে তার আদালাত বা ন্যায়পরায়ণতা বর্ণনা করা অথবা নামের স্থানে এমন শব্দ উল্লেখ করা যাতে বুঝা যায় যে, রাবী আদিল ছিলেন। যেমন– এভাবে হাদীস বর্ণনা করা যে, أَخْبَرَنِى الثِّقَةُ অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী আমাকে জানিয়েছে।

تَعْدِيْل مُبْهَم -এর হুকুম : تَعْدِيْل مُبْهَم -এর হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে। যথা–

১. অনুল্লেখ রাবীর নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত এমন পরোক্ষ তা'দীল গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন রাবীর হাদীস মাকবূলও নয়। কারণ, হতে পারে রাবী তার (যিনি মুবহাম করেছেন) দৃষ্টিতে আদিল হলেও প্রকৃত বিচারে তিনি আদিল নন। অবশ্য ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক প্রমুখ হাদীসের ইমাম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস যদি تَعْدِيْل إِبْهَام করেন, তাহলে তাঁদের তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে রেওয়ায়েতও মাকবূল হবে। যেমন– تَعْلِيْقَات بُخَارِى -কে সবাই কবুল করে নিয়েছেন।

২. কারো কারো অভিমত হলো, تَعْدِيْل إِبْهَام গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মানুষের ক্ষেত্রে আসল হলো 'আদালাত'। আর জরাহ তথা অভিযোগ হলো আসলের বিপরীত। অতএব, যতক্ষণ আসলের বিপরীত অবস্থাটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ আসল অবস্থাটাই সাব্যস্ত হবে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, تَعْدِيْل إِبْهَام কারী যদি আলিম হন, তাহলে তার তা'দীল কেবলমাত্র সে গ্রহণ করতে পারে যে তার অনুসারী। এ উক্তিটি মূলত তাকলীদের অন্তর্গত এবং ইলমে হাদীসের আলোচনা বহির্ভূত।

قَلِيْلُ الْحَدِيْثِ তথা যে রাবীর থেকে রেওয়ায়েত কম সেই রাবীর নাম যদি উল্লেখ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা আবার দু প্রকার। ১. مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ ও ২. مَجْهُوْلُ الْحَالِ আর তা দু প্রকার হওয়ার **কারণ**

হলো, قَلِيْلُ الْحَدِيْثِ হতে রেওয়ায়েতকারী একজন হবে বা একাধিক হবে। যদি একজন হয়, তাহলে সেটি হলো مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ। আর যদি একাধিক হয়, তাহলে সেটি হলো مَجْهُوْلُ الْحَالِ। এর অপর নাম مَجْهُوْلُ الْوَصْفِ। তবে এরই প্রসিদ্ধ নাম হলো মাসতূর।

مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ -এর সংজ্ঞা : পরিভাষায় مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ বলা হয়– هُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ অর্থাৎ ঐ রাবীকে مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ বলে যার সূত্রে রেওয়ায়েতকারী মাত্র একজন।

প্রকাশ থাকে যে, مَجْهُوْل অর্থ– অজ্ঞাত আর اَلْعَيْنُ অর্থ– সত্তা। যেহেতু এরূপ রাবী হতে মাত্র একজন রেওয়ায়েত করার ব্যক্তি হিসেবে সে অজ্ঞাত থেকে যায়, তাই তাকে مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ বলা হয়।

مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ -এর হুকুম : مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ রাবীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তাকে কোনো ইমামে হাদীস যদি تَوْثِيْق করেন, (রাবীকে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেন) তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। তার সূত্রে রেওয়ায়েতকারী যদি ইমামে হাদীস হন, তবে তার تَوْثِيْق-ও গ্রহণযোগ্য।

مَجْهُوْلُ الْحَالِ -এর সংজ্ঞা : পরিভাষায় مَجْهُوْلُ الْحَالِ বলা হয়–

هُوَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيْقٍ -

অর্থাৎ যে রাবী থেকে রেওয়ায়েতকারী একাধিক কিন্তু কোনো ইমামে হাদীসের পক্ষ থেকে তাকে تَوْثِيْق করা হয়নি।।

مَجْهُوْلُ الْحَالِ -এর হুকুম : যে রাবী مَجْهُوْلُ الْحَالِ তার রেওয়ায়েতের হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ একদল মুহাদ্দিসের অভিমত হলো, مَجْهُوْلُ الْحَالِ রাবীর হাদীস নির্বিচারে মাকবূল।

২. জুমহুরের অভিমত হলো, তা নির্বিচারে মারদুদ (অগ্রহণযোগ্য)।

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, বিশুদ্ধ কথা হলো, اَلْمَسْتُوْرُ এবং অনুরূপ রাবী (যেমন– مُبْهَمْ রাবী) যাদের নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য উভয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়– এ কথা যেমন ঠিক নয়, তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য– তেমনি এ কথাও ঠিক নয়; বরং আসল কথা হলো, তাদের হাদীস তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত মওকুফ (স্থগিত) থাকবে। যদি কোনোভাবে তাদের অবস্থা জানা যায়, তবে তদনুযায়ী তাদের হাদীসের হুকুম হবে। যদি তাদের মাঝে مَقْبُوْل হাদীসের সিফাত পাওয়া যায়, তাহলে মাকবূল হবে। যদি মারদূদ -এর সিফাত পাওয়া যায়, তাহলে মারদূদ হবে।

মোটকথা, তাহলে جَهَالَتْ বা অজ্ঞতা-অপরিচিতির কারণ মোট ৪টি হলো। ১. পরিচয়সূত্র অনেক হওয়া, ২. রাবীর হাদীস কম হওয়া, ৩. রাবীর নাম উল্লেখ না করা ও ৪. রাবী মাসতূর হওয়া।

ثُمَّ الْبِدْعَةُ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ اَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِيْ وَهِيَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ بِمُكَفِّرٍ كَانَ يَعْتَقِدُ مَا يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ اَوْ بِمُفَسِّقٍ فَالْاَوَّلُ لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُوْرُ وَقِيْلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَقِيْلَ اِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حِلَّ الْكِذْبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِلَ وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفِّرٍ بِبِدْعَةٍ لِاَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِيْ اَنَّ مُخَالِفِيْهَا مُبْتَدِعَةٌ وَقَدْ تُبَالِغُ فَتُكَفِّرُ مُخَالِفِيْهَا فَلَوْ اُخِذَ ذٰلِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ لَاسْتُلْزِمَ تَكْفِيْرُ جَمِيْعِ الطَّائِفِ فَالْمُعْتَمَدُ اَنَّ الَّذِيْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ مَنْ اَنْكَرَ اَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُوْمًا مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ وَكَذَا مَنْ اِعْتَقَدَ عَكْسَهُ فَاَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ وَانْضَمَّ اِلٰى ذٰلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَرْوِيْهِ مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُوْلِهِ .

অনুবাদ : রাবীর উপর অভিযোগের নবম কারণ তার বিদআতী হওয়া। বিদআত দু প্রকার। যথা– ১. তিনি এমন আকিদা পোষণ করেন যাতে কুফরি অবধারিত হয়। ২. যাতে তাকে ফাসিক সাব্যস্ত করা যায়। প্রথম প্রকারের বিদআতি রাবীর হাদীস অধিকাংশই গ্রহণ করেন না। আবার অনেকে বলেন, নির্বিচারেই গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু অনেকে বলেন, উক্ত রাবী যদি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে মিথ্যা কথা বলা হালাল বলে বিশ্বাস না করেন, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিদআতের কারণে কাফির সাব্যস্তকৃত প্রত্যেক রাবীরই হাদীস প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা, প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তাদের বিপক্ষ দল বিদআতি। কখনো কখনো এক্ষেত্রে অতিরিত করে বিরোধী পক্ষকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়। তাই এটি যদি নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সকল দলকেই কাফির সাব্যস্ত করতে হবে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মত হলো, কেবলমাত্র এমন বিদআতি রাবীর হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে, যিনি শরিয়তের কোনো 'মুতাওয়াতির' ও দীনের অবধারিতরূপে সুবিদিত কোনো বিষয় অস্বীকার করেন, তেমনি যিনি এর বিপরীতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু যিনি এরূপ নন, সাথে সাথে তিনি যা বর্ণনা করছেন, তাতে তার আয়ত্তশক্তি এবং জীবনাচারে তাকওয়া ও সাবধানতা পরিলক্ষিত হয়– এমন রাবীর হাদীস গ্রহণ করায় কোনো বাধা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَسْبَاب طَعْن -এর নবম প্রকারের নাম বিদআত। খাইরুল কুরূন তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যুগে যে সকল বিষয় দীন হিসেবে স্বীকৃত ছিল না তাকে দীন মনে করাই বিদআত। নিম্নে বিদআতের সংজ্ঞা, প্রকরণ ও হুকুম নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

بِدْعَة -এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে اَلْبِدْعَةُ শব্দের অর্থ– ১. اَلْاِخْتِرَاعُ উদ্ভাবন করা ২. اَلْاِيْجَادُ আবিষ্কার করা ৩. اَلْحَدَثُ فِي الدِّيْنِ ধর্মে নতুনত্ব সৃষ্টি করা।

بِدْعَة -এর পারিভাষিক অর্থ : ওলামায়ে কেরাম বিদআতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে সংজ্ঞাগুলোর মর্মার্থ কাছাকাছি এবং প্রায় এক ও অভিন্ন।

১. কামূসের ভাষ্য : কামূসে লেখা হয়েছে, اَلْبِدْعَةُ হলো– مَا اُحْدِثَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ অর্থাৎ পূর্বের নমুনা ছাড়া নতুন কিছু আবিষ্কার করা।

২. ইমাম নববী (র.) : তিনি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন নিম্নরূপ– اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

অর্থাৎ বিদআত প্রত্যেক ঐ নতুন জিনিস যা নমুনা ছাড়া তৈরি করা হয়।

৩. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) : তিনি বিদআতের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন–

لَلْبِدْعَةُ مَا اُحْدِثَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اَصْلٌ فِى الشَّرْعِ

অর্থাৎ বিদআত হলো, যা নতুন শুরু করা হয়েছে এবং শরিয়তে যার কোনো اَصْل (দলিল) নেই।

৪. ইমাম শাফেয়ী (র.) : তিনি বিদআতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

مَا اُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا اَوْ سُنَّةً اَوْ اَثَرًا اَوْ اِجْمَاعًا .

অর্থাৎ যে নবসৃষ্ট জিনিস কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল, আছারে সাহাবা এবং ইজমায়ে উম্মতের খেলাপ, তাই বিদআত।

بِدْعَة -এর প্রকরণ : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বিদআত দু প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। ১. بِدْعَة مُكَفِّرَة অর্থাৎ কাফিরকারী বিদআত। ২. بِدْعَة مُفَسِّقَة অর্থাৎ ফাসিককারী বিদআত। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

১. بِدْعَة مُكَفِّرَة -এর সংজ্ঞা : যে বিদআত করার কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়, তাকে بِدْعَة مُكَفِّرَة বলে। যেমন– খাত্তাবিয়াপন্থিরা হযরত আলী (রা.) -কে ইলাহে আকবর (বড় খোদা) এবং হযরত জা'ফর সাদিক (র.) -কে ইলাহে আসগর (ছোট খোদা) বলে কাফির হয়েছে।

আবুল খাত্তাব এক ব্যক্তির নাম। তার বাড়ি ছিল কূফা। সে এই আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করত যে, হযরত আলী (রা.) ইলাহে আকবর আর হযরত জা'ফর সাদিক (র.) ইলাহে আসগার। আবুল খাত্তাবের অনুসারীদের বলা হয় খাত্তাবিয়া।

بِدْعَة مُكَفِّرَة -এর হুকুম : যদি বিদআতি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়, যেমন খাত্তাবিয়া সম্প্রদায়, তাহলে তার হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)।

আর যদি বিদআতি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির না হয়, যেমন– কুরআন মাখলুক হওয়ার প্রবক্তরা, তাহলে এ ধরনের বিদআতির হাদীস مَقْبُوْل না مَرْدُوْد তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ–

১. জুমহুরের অভিমত : জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে নির্বিচারে মারদূদ।

২. কারো কারো অভিমত : তাদের মতে নির্বিচারে মাকবূল। চাই সে মিথ্যা বলাকে হালাল মনে করুক বা না করুক।

৩. ইমাম রাযী (র) -এর অভিমত : তাঁর মতে বিদআতি যদি তার মতবাদের সমর্থনে মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে, তবে মাকবূল। আর যদি হালাল মনে করে, তাহলে মারদূদ।

৪. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে বিদআতির হাদীস নির্বিচারে মারদূদ হবে না। কারণ, প্রত্যেক দল তার প্রতিপক্ষ দলকে বিদআতি মনে করে; বরং অনেক সময় কুফরেরও ফতোয়া দেয়। সুতরাং যদি সকল দলের দাবি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো কারো হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই বিশুদ্ধ মাযহাব হলো, যে বিদআতি শরিয়তের অংশরূপে মুতাওয়াতিরভাবে স্বীকৃত এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যেমন– রোজা, নামাজ ইত্যাদিকে অস্বীকার করে অথবা মুতাওয়াতিরভাবে স্বীকৃত গায়রে দীন, যেমন– মূর্তির সিজদা দেওয়াকে দীনের কাজ বলে মনে করে, তাহলে তার হাদীস মারদূদ হবে।

যে বিদআতি এরূপ নয় এবং তার মাঝে تَقْوٰى, عَدَالَة এবং ضَبْط মওজুদ থাকে, তাহলে তার হাদীস مَقْبُوْل হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

وَالثَّانِىْ وَهُوَ مَنْ لَا يَقْتَضِىْ بِدْعَتُهُ التَّكْفِيْرَ اَصْلًا وَقَدِ اخْتَلَفَ اَيْضًا فِىْ قَبُوْلِهٖ وَ رَدِّهٖ فَقِيْلَ يُرَدُّ مُطْلَقًا وَهُوَ بَعِيْدٌ وَاَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهٖ اَنَّ فِى الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيْجًا لِاَمْرِهٖ وَتَنْوِيْهًا بِذِكْرِهٖ وَعَلٰى هٰذَا فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يُرْوٰى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْئًا يُشَارِكُهٗ فِيْهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ وَقِيْلَ يُقْبَلُ مُطْلَقًا اِلَّا اِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الْكِذْبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقِيْلَ يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً اِلٰى بِدْعَتِهٖ لِاَنَّ تَزْيِيْنَ بِدْعَتِهٖ قَدْ يَحْمِلُهٗ عَلٰى تَحْرِيْفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْوِيَتِهَا عَلٰى مَا يَقْتَضِيْهِ مَذْهَبُهٗ وَهٰذَا فِى الْاَصَحِّ وَاَغْرَبَ اِبْنُ حِبَّانٍ فَادَّعَى الْاِتِّفَاقَ عَلٰى قَبُوْلِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ نَعَمْ اَلْاَكْثَرُ عَلٰى قَبُوْلِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ اِلَّا اِنْ رَوٰى مَا يُقَوِّىْ بِدْعَتَهٗ فَيُرَدُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ وَبِهٖ صَرَّحَ الْحَافِظُ اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِىْ شَيْخُ اَبِىْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىِّ فِىْ كِتَابِهٖ مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ فَقَالَ فِىْ وَصْفِ الرُّوَاةِ وَمِنْهُمْ زَائِغٌ عَنِ الْحَقِّ اَىْ اَنَّ السُّنَّةَ صَادِقُ اللَّهْجَةِ فَلَيْسَ فِيْهِ حِيْلَةٌ اِلَّا اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيْثِهٖ مَا لَا يَكُوْنُ مُنْكَرًا اِذَا لَمْ يَقْوِ بِهٖ بِدْعَتَهٗ اِنْتَهٰى وَمَا قَالَهٗ مُتَّجِهٌ لِاَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِىْ بِهَا يُرَدُّ حَدِيْثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ فِيْمَا اِذَا كَانَ ظَاهِرُ الْمَرْوِىِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُبْتَدِعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থাৎ যিনি এমন বিদআতি নন যাতে আদৌ তাকে কাফির সাব্যস্ত করা যায়, তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা না করার ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, একেবারেই পরিত্যাজ্য। এ অভিমতটি কোনো যুক্তিরই আওতায় পড়ে না। তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় তার মতটি প্রসার পাবে এবং তার সম্মান বাড়বে। যদি এ যুক্তি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো এমন কোনো বিদআতির হাদীসও গ্রহণ করা উচিত হবে না যার বর্ণনায় একজন অবিদআতী ব্যক্তিও জড়িত রয়েছেন।

আবার অনেকের মতে, এরূপ বিদআতপন্থি রাবীর হাদীস অবাধে গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য তিনি যদি মিথ্যাবাদিতা হালাল বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে ভিন্ন কথা, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে।

অনেকের মতে এমন ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে যিনি নিজ বিদআত আকিদার প্রতি আহ্বানকারী নন। কেননা, তার বিদআত আকিদাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনার তাগিদ তাকে হাদীসসমূহ বিকৃত করতে ও নিজ মাযহাবের চাহিদা মোতাবেক করতে কখনো কখনো উৎসাহিত করে থাকে। শেষোক্ত মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইবনে হিব্বান এ ব্যাপারে এক অভিনব উক্তি করেছেন। তিনি দাবি করেছেন নিজ মতের পক্ষে আহ্বানকারী নন– এরূপ বিদআতি রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে– এ ব্যাপারে কোনো বিশ্লেষণ নেই।

হ্যাঁ অধিকাংশই অনাহ্বানকারী বিদআতির বর্ণনা গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তবে এ ব্যক্তি যদি এমন হাদীস বর্ণনা করেন, যাতে তার বিদআত আকিদায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহলে নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী সে বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে। এ অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবূ দাউদের ওস্তাদ হাফিজ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব জাওজাযানী ও ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর 'মা'রিফাতুর রিজাল' গ্রন্থে। রাবীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "অনেকেই রয়েছেন সত্য অর্থাৎ সুন্নত থেকে বিচ্যুত কিন্তু সত্যবাদী। তার যে হাদীসটি মুনকার নয়– তা গ্রহণ না করার কোনো উপায় নেই, যদি তা দ্বারা তার বিদআতে শক্তি সঞ্চারিত না হয়।"

ইমাম নাসায়ী (র.) -এর বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, নিজ মতের প্রতি আহ্বানকারীর বর্ণনা যে কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়, তা সেক্ষেত্রেও বর্তমান যখন বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ বিদআতির মতের অনুকূলে হবে, যদিও তিনি নিজ মতের প্রতি আহ্বানকারী নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِدْعَة مُفَسِّقَة -এর সংজ্ঞা : যে বিদআতের দ্বারা বিদআতী কাফির হয় না; বরং ফাসিক হয়, তাকে بِدْعَة مُفَسِّقَة বলে। যেমন– রাফেযী, খারেজী এবং মু'তাযিলাদের বিদআত।

بِدْعَة مُفَسِّقَة -এর হুকুম : যে বিদআতের কারণে বিদআতি কাফির হয় না বরং ফাসিক হয় এমন বিদআতির হাদীস মাকবূল না মারদূদ– এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে তা সবিস্তারে পেশ করা হলো।

১. **ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত :** ইমাম মালিক (র.) সহ অন্য অনেকের মতে এমন বিদআতির হাদীস অবাধে মারদূদ। চাই সে دَاعِيْ إِلَى الْبِدْعَةِ তথা বিদআতের প্রতি আহ্বায়ক হোক বা না হোক। মিথ্যা বলা হালাল মনে করুক বা না করুক।
   হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ অভিমত بَعِيْدٌ عَنِ الْحَقِّ তথা সত্য হতে দূরবর্তী। কারণ, এ মতামতের পক্ষে দলিল হিসেবে বলা হয়, এমন বিদআতির হাদীসকে কবুল করা হলে তাকে সম্মান দেওয়া হবে এবং তার বিদআতের প্রচার-প্রসার করা হবে।
   হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ যুক্তিকে সঠিক মেনে নেওয়া হলে বিদআতির ঐ সকল হাদীসও মারদূদ হয়ে যায় যা বিদআতি নয়– এমন ব্যক্তি থেকেও বর্ণিত হয়। অথচ তা মারদূদ।

২. **কারো কারো অভিমত :** কেউ কেউ বলেছেন, বিদআতি যদি নিজ মাযহাবের সমর্থনে মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে তবে তার হাদীস মাকবূল, তা না হলে মারদূদ।

৩. **কিছু লোকের অভিমত :** কেউ কেউ বলেছেন, বিদআতি যদি প্রকাশ্যভাবে তার বিদআতের দিকে লোকদের দাওয়াত না দেয় (অর্থাৎ বিদআতের প্রতি আহ্বায়ক না হয়) এবং দলিল দ্বারা তা প্রমাণ না করে, তবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। যদি সে বিদআতের প্রতি আহ্বায়ক হয়, তাহলে বিদআতকে আকর্ষণীয় করার মানসে যেহেতু তার হাদীস জাল করার সম্ভাবনা থাকে, তাই তার হাদীস মাকবূল নয়।
   জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে এ মতামতটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

৪. **ইবনে হিব্বান (র.) -এর অভিমত :** তিনি বিদআতের দিকে আহ্বায়ক নয়– এমন যে কোনো বিদআতির হাদীস অবাধে মাকবূল– এর উপর ইজমা (ঐকমত্য) দাবি করেছেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা দাবি করা ঠিক নয়; বরং তা সিংহভাগ মুহাদ্দিসের অভিমত। তবে শর্ত হলো, তার হাদীস তার বিদআতের সমর্থনকারী না হতে হবে। যদি তার বর্ণিত হাদীস তার বিদআতের সমর্থনকারী হয়, তবে তা মারদূদ হবে।
   ইমাম আবূ দাউদ (র.) -এর ওস্তাদ হাফিজ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াকূব জাওজাযানী (র.) এবং ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ গ্রন্থে এ মতামতকেই জোরালোভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ثُمَّ سُوْءُ الْحِفْظِ وَهُوَ السَّبَبُ الْعَاشِرُ مِنْ اَسْبَابِ الطَّعْنِ وَالْمُرَادُ بِهٖ مَنْ لَمْ يُرَجَّحْ جَانِبُ اِصَابَتِهٖ عَلٰى جَانِبِ خَطَائِهٖ وَهُوَ عَلٰى قِسْمَيْنِ اِنْ كَانَ لَازِمًا لِلرَّاوِيْ فِيْ جَمِيْعِ حَالَاتِهٖ فَهُوَ الشَّاذُّ عَلٰى رَأْيِ بَعْضِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ اَوْ اِنْ كَانَ سُوْءُ الْحِفْظِ طَارِيًا عَلَى الرَّاوِيْ اِمَّا لِكِبَرِهٖ اَوْ لِذَهَابِ بَصَرِهٖ اَوْ لِاِحْتِرَاقِ كُتُبِهٖ اَوْ عَدَمِهَا بِاَنْ كَانَ يَعْتَمِدُهَا فَرَجَعَ اِلٰى حِفْظِهٖ فَسَاءَ فَهٰذَا هُوَ الْمُخْتَلَطُ وَالْحُكْمُ فِيْهِ اَنَّ مَا حَدَّثَ بِهٖ قَبْلَ الْاِخْتِلَاطِ اِذَا تَمَيَّزَ قُبِلَ وَاِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فِيْهِ وَكَذَا مَنِ اشْتَبَهَ الْاَمْرُ فِيْهِ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ ذٰلِكَ بِاِعْتِبَارِ الْاٰخِذِيْنَ عَنْهُ.

অনুবাদ : অভিযোগের দশম কারণ রাবীর স্মৃতিদুর্বলতা। এখানে উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তি যার শুদ্ধতার দিকটি ভুলের দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। এটি দু প্রকার। যথা- ১. যদি এ দুর্বলতা উক্ত রাবীর গোটা জীবন তথা সর্বাবস্থায় থাকে, তাহলে কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে তার বর্ণিত হাদীসকে বলে শায। ২. যদি রাবীর স্মৃতিবিভ্রাট আপতিত হয় বাধ্যর্ক্য, দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়া, খাতাপত্র পুড়ে কিংবা অন্যকোনোভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে। তিনি হয়তো খাতার উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করতেন; কিন্তু তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে স্মৃতির উপর নির্ভর করতে লাগলেন। এতে ভুল হতে লাগল। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুখতালিত'। এক্ষেত্রে হুকুম হলো, তার বিভ্রাটের পূর্বে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা যদি পার্থক্য করা যায়, তাহলে গ্রহণ করা যাবে। আর যদি পার্থক্য করা না যায়, তাহলে বিরত থাকতে হবে। তেমনি যার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, তিনি মুখতালিত কিনা, তার হাদীসও গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীদের বিচারেই তা নির্ণয় করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَيِّءُ الْحِفْظِ-এর সংজ্ঞা : سَيِّءُ الْحِفْظِ শব্দের অর্থ- স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা। سَيِّءُ الْحِفْظِ এমন রাবীর ক্ষেত্রে বলা হয় যার রেওয়ায়েত শুদ্ধের চেয়ে ভুলের সংখ্যা বেশি; কমপক্ষে সমান সমান।

سَيِّءُ الْحِفْظِ-এর প্রকারভেদ : سَيِّءُ الْحِفْظِ তথা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা দু প্রকার- ১. لَازِمْ তথা জন্মগত ও ২. طَارِئْ তথা পরবর্তীতে আপতিত। নিম্নে প্রত্যেকটার বিবরণ পেশ করা হলো।

১. **لَازِمْ-এর বিবরণ :** যে রাবীর জন্ম থেকেই স্মৃতিশক্তি দুর্বল, ধীশক্তি কম এবং তা সর্বাবস্থায় এক রকম। এরূপ রাবীর হাদীসকে কেউ কেউ শায বলেছেন।

২. **طَارِئْ-এর বিবরণ :** যে রাবীর স্মৃতিশক্তি ঠিকমতোই ছিল; কিন্তু নিম্নলিখিত কোনো একটি বিষয়ের ফলে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, ফলে তার রেওয়ায়েতে তিনি ভুল করেন। বিষয়গুলো হলো :

ক. বার্ধক্য তথা বয়স বেশি হওয়া।

খ. দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া। দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার কারণে রাবী তার হাদীসের খাতা না দেখেই কিংবা দেখে হাদীস রেওয়ায়েত করেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ার দরুন ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না, ফলে তিনি রেওয়ায়েত ভুল করেন।

গ. হাদীসের খাতা আগুনে পুড়ে যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া। ঘরে আগুন লেগেছে, এতে তার খাতাও পুড়ে গেছে অথবা কোনোভাবে হারিয়ে গেছে। তাই রাবী নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ফলে তিনি রেওয়ায়েতে ভুল করেন। রাবীর এরূপ অবস্থাকে اِخْتِلَاطْ বলা হয়। তার বর্ণিত হাদীসকে মুখতালাত বলা হয়। যে রাবীর এরূপ হয়, তাকে মুখতালিত বলা হয়।

مُخْتَلَطْ -এর হাদীসের হুকুম : مُخْتَلَطْ -এর হাদীস চার প্রকার হতে পারে।

১. শুধু اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বে তিনি রেওয়ায়েত করবেন। এ সময় তার হাদীস মাকবূল হবে।

২. শুধু اِخْتِلَاطْ -এর পরে তিনি রেওয়ায়েত করবেন। এ সময় তার হাদীস মারদূদ হবে।

৩. اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায় রেওয়ায়েত করবেন, তবে কোনগুলো اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বের আর কোনগুলো اِخْتِلَاطْ -এর পরের তা জানা বা নির্ণয় করা যায়। এমতাবস্থায় اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বের হাদীসগুলো মাকবূল হবে, আর اِخْتِلَاطْ -এর পরের হাদীসগুলো মারদূদ হবে। আর যদি এমন নির্ণয় বা পৃথক করা না যায়, তাহলে নির্ণয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার সকল হাদীস মওকুফ থাকবে।

৪. যদি রেওয়ায়েত করার সময়ের কথা মনে না থাকে কিংবা এ সন্দেহ হয় যে, তিনি اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বে রেওয়ায়েত করেছেন নাকি اِخْتِلَاطْ -এর পরে, তাহলে এমতাবস্থায় তার হাদীস মওকুফ থাকবে।

মুখতালিত -এর রেওয়ায়েতটি اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বের না পরের তা জানা যায় মুখতালিত রাবী হতে হাদীস গ্রহণকারীর মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ আতা (عَطَاء) একজন রাবীর নাম। শেষ বয়সে এসে তার اِخْتِلَاطْ বা স্মৃতিভ্রম হয়। اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বে তার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন শো'বা ও সুফিয়ান ছাওরী। اِخْتِلَاطْ -এর পরে রেওয়ায়েত করেছেন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ। আর উভয় অবস্থায় তার থেকে হাদীস শুনেছেন আবূ আওয়ানা। সুতরাং اِخْتِلَاطْ -এর হুকুম অনুযায়ী তার থেকে শো'বা ও সুফিয়ান ছাওরী যা রেওয়ায়েত করেন তা মাকবূল, জারীর যা রেওয়ায়েত করেন তা মারদূদ আর আবূ আওয়ানা -এর হাদীসের মধ্যে اِخْتِلَاطْ -এর পূর্বেকার কোনগুলো– তা যদি নির্ণয় করা যায়, তাহলে সেগুলো মাকবূল হবে। আর এরূপ নির্ণয় না করা গেলে তা মারদূদ হবে।

شَاذّ ও مُخْتَلَطْ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য : شَاذّ -এর সংজ্ঞা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে এখানকার বর্ণনানুযায়ী কতিপয়ের মতে شَاذّ প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার রাবীর মধ্যে জন্মগতভাবে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা থাকে।

পক্ষান্তরে মুখতালাত প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার রাবীর মধ্যে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা পরবর্তী কোনো কারণে হয়েছে।

وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ كَانَ يَكُونُ فَوْقَهُ اَوْ مِثْلَهُ لَا دُونَهُ وَكَذَا الْمُخْتَلِطُ الَّذِيْ لَا يَتَمَيَّزُ وَالْمَسْتُورُ وَالْاِسْنَادُ الْمُرْسَلُ وَكَذَا الْمُدَلَّسُ اِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَحْذُوْفُ مِنْهُ صَارَ حَدِيْثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهٖ بَلْ وَصْفِهٖ بِذٰلِكَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوْعِ مِنَ الْمُتَابِعِ وَالْمُتَابَعِ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاحْتِمَالِ كَوْنِ رِوَايَتِهٖ صَوَابًا اَوْ غَيْرَ صَوَابٍ عَلٰى حَدٍّ سَوَاءٍ فَاِذَا جَاءَتْ مِنَ الْمُعْتَبِرِيْنَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِاَحَدِهِمْ رُجِّحَ اَحَدُ الْجَانِبَيْنِ مِنَ الْاِحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ وَ دَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الْحَدِيْثَ مَحْفُوْظٌ فَارْتَقٰى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ اِلٰى دَرَجَةِ الْقَبُوْلِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَمَعَ اِرْتِقَائِهٖ اِلٰى دَرَجَةِ الْقَبُوْلِ فَهُوَ مُنْحَطٌّ عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهٖ وَ رُبَّمَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ اِطْلَاقِ اِسْمِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ وَقَدْ اِنْقَضٰى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِّ ـ

অনুবাদ : স্মৃতিবিভ্রাটপূর্ণ রাবীর বর্ণিত হাদীসের, তেমনি যে মুখতালিতের বর্ণনাকে পার্থক্য করা যায় না, মাসতূর ব্যক্তির, মুরসাল সনদের, তেমনি যে মুদাল্লাস সনদের উহ্য ব্যক্তি চেনা যায় না– এসবের যদি এমন মুতাবি' পাওয়া যায় যা তার চেয়ে উঁচু বা সমান স্তরের– নিম্নস্তরের নয়, তাহলে তাদের হাদীসটি হাসান লিগায়রিহী বলে বিবেচিত হবে। এই বিশেষণ মুতাবি' ও মুতাবা' উভয়ের সমষ্টি বিচারে প্রযোজ্য হবে। কেননা, এদের প্রত্যেকেই তার হাদীস শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হবার সম্ভাবনার দিক দিয়ে সমান পর্যায়ের। অনুসন্ধানকারীদের পক্ষ থেকে তাদের যে কোনো একজনের অনুকূলে কোনো বর্ণনা পাওয়া গেলে দু সম্ভাবনার একটি দিক প্রাধান্য পাবে এবং প্রমাণিত হবে যে, হাদীসটি শায নয়, মাহফূয। ফলে তা বিরতির পর্যায় থেকে গ্রহণীয়তার স্তরে উন্নীত হবে। অবশ্য গ্রহণীয়তার স্তরে উন্নীত হলেও সেটি হাসান লিযাতিহী -এর স্তর অপেক্ষা নিচে থাকবে। অনেকে এরূপ হাদীসের ক্ষেত্রে 'হাসান' শব্দটি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন।

গ্রহণ ও বর্জনের দিক দিয়ে মতনের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা এখানে এসে শেষ হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُوْءِ حِفْظ তথা শায, মুখতালিত, মাসতূর, মুদাল্লাস অথবা সাহেবে মুরসাল -এর এমন কোনো গ্রহণযোগ্য মুতাবি' পাওয়া যায় যা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কিংবা বরাবর, তাহলে তাদের হাদীসকে হাসান বলা হয়। তবে তা লিযাতিহী নয়; লিগায়রিহী তথা মুতাবি' পাওয়া যাওয়ার কারণে। কারণ, মুতাবি' পাওয়া যাওয়ার পূর্বে তাদের হাদীস সঠিক-ভুল উভয়ের সম্ভাবনা ছিল। এরপর যখন গ্রহণযোগ্য মুতাবি' পাওয়া গেছে তখন তার সঠিক হওয়ার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। যার ফলে হাদীস মওকুফের স্তর থেকে কবুলের স্তরে উন্নীত হয়েছে। অবশ্য অনেকে মুতাবি' পাওয়া যাওয়ার পরেও এমন হাদীসের উপর হাসান শব্দ ব্যবহার হতে বিরত থাকার পক্ষপাতী।

হাসান লিগায়রিহী হাদীসের হুকুম হলো, তার মর্যাদা ও স্তর হাসান লিযাতিহী হতে নিম্নপর্যায়ের। তারপরেও জুমহুরের মতে তা মাকবূল।

এ আলোচনা হতে জানা যায় যে, মোট চার প্রকার হাদীসকে হাসান লিগায়রিহী বলে। আর তা হলো–

১. যে হাদীসের কোনো রাবী سَيِّئُ الْحِفْظِ হয়।
২. যে হাদীসের কোনো রাবী مَسْتُوْر হয়।
৩. যে হাদীসের সনদ মুরসাল হয়।
৪. যে হাদীসের সনদে তাদলীস পতিত হয়।

যখন এ চার প্রকার হাদীসের মুতাবা'আত গ্রহণযোগ্য রাবী কর্তৃক পাওয়া যাবে, তখন তা হাসান লিগায়রিহী হবে।

ثُمَّ الْاِسْنَادُ وَهُوَ الطَّرِيْقُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَتْنِ وَالْمَتْنُ هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِيْ اِلَيْهِ الْاِسْنَادُ مِنَ الْكَلَامِ وَهُوَ اِمَّا اَنْ يَنْتَهِيَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَيَقْتَضِيْ تَلَفُّظُهُ اِمَّا تَصْرِيْحًا اَوْ حُكْمًا اَنَّ الْمَنْقُوْلَ بِذٰلِكَ الْاِسْنَادِ مِنْ قَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَوْ مِنْ فِعْلِهٖ اَوْ مِنْ تَقْرِيْرِهٖ مِثَالُ الْمَرْفُوْعِ مِنَ الْقَوْلِ تَصْرِيْحًا اَنْ يَقُوْلَ الصَّحَابِيُّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَذَا اَوْ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِكَذَا اَوْ يَقُوْلُ هُوَ اَوْ غَيْرُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَذَا اَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ كَذَا اَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ وَمِثَالُ الْمَرْفُوْعِ مِنَ الْفِعْلِ تَصْرِيْحًا اَنْ يَقُوْلَ الصَّحَابِيُّ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا اَوْ يَقُوْلُ هُوَ اَوْ غَيْرُهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا وَمِثَالُ الْمَرْفُوْعِ مِنَ التَّقْرِيْرِ تَصْرِيْحًا اَنْ يَقُوْلَ الصَّحَابِيُّ فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَذَا اَوْ يَقُوْلُ هُوَ اَوْ غَيْرُهُ فَعَلَ فُلَانٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَذَا وَلَا يَذْكُرُ اِنْكَارَهُ لِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : মতন পর্যন্ত পৌছানোর পথকে বলা হয় ইসনাদ। আর সনদ শেষে যা আসে অর্থাৎ বক্তব্যকে বলা হয় মতন।

সনদ যদি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, সে সনদ মুত্তাসিল হোক বা না হোক এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় কিংবা আইনত (হুকমীভাবে) সাব্যস্ত হয় যে, এ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টি হযরত নবী করীম ﷺ -এর উক্তি (قَوْل), কর্ম (فِعْل) কিংবা তাঁর অনুমোদন (تَقْرِيْر), তাহলে তাকে বলে মারফূ' হাদীস।

সুস্পষ্ট উক্তিগত মারফূ' (مَرْفُوْع قَوْلِيْ تَصْرِيْحِيْ) হাদীসের উদাহরণ– কোনো সাহাবী বললেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি। অথবা তিনি কিংবা অন্য কেউ বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ বলেছেন ইত্যাদি।

সুস্পষ্ট কর্মগত মারফূ' (مَرْفُوْع فِعْلِيْ تَصْرِيْحِيْ) হাদীসের উদাহরণ– কোনো সাহাবী বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। অথবা তিনি কিংবা অন্য কেউ বললেন, হযরত নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন বা করেছেন।

সুস্পষ্ট অনুমোদনীয় মারফূ‘ (مَرْفُوْع تَقْرِيْرِيْ تَصْرِيْحِيْ) হাদীসের উদাহরণ– কোনো সাহাবী বললেন, আমি মহানবী ﷺ -এর সামনে এরূপ করেছি। অথবা তিনি কিংবা অন্য কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে এরূপ করেছিল। তিনি এরূপ উল্লেখ করলেন না যে, নবী করীম ﷺ এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মতন সংশ্লিষ্ট আলোচনা থেকে ফারেগ হয়ে সম্মানিত লেখক ثم الاسناد বলে সনদ সংশ্লিষ্ট আলোচনা শুরু করছেন। মতন ও সনদের মধ্যে সনদের স্থান আগে হলেও যেহেতু মতন-ই মূল লক্ষ্য আর সনদটা হলো ঐ মতন পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম, তাই সম্মানিত লেখক মতন সংশ্লিষ্ট আলোচনা পূর্বে করেছেন।

সনদের শেষপ্রান্ত বিচারে হাদীসের শ্রেণিবিভাগ : হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর দিক তথা সনদের রাবীর সংখ্যার কমবেশির দিক দিয়ে হাদীস মোট চার প্রকার। ১. মুতাওয়াতির, ২. মাশহুর, ৩. আযীয, ৪. গরীব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবের শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে।

সনদের শেষপ্রান্তের বিচারে হাদীস আবার তিন প্রকার। ১. মারফূ‘, ২. মাওকূফ ও ৩. মাকতূ‘। হাদীস এ তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, সনদের শেষপ্রান্ত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে অথবা কোনো সাহাবী পর্যন্ত অথবা এর পরের স্তরের কোনো লোক তথা তাবেয়ী, তাবয়ে-তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। অর্থাৎ উক্তি (قَوْل), কর্ম (فِعْل) এবং অনুমোদন (تَقْرِيْر) হয়তো সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হবে অথবা কোনো সাহাবীর হবে অথবা সাহাবীর স্তরের পরের কোনো লোকের হবে। قَوْل, فِعْل, تَقْرِيْر রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হলে তাকে হাদীসে মারফূ‘ বলে, সাহাবীর হলে তাকে হাদীসে মাওকূফ বলে, সাহাবীর পরের তথা তাবেয়ী বা তাবয়ে-তাবেয়ীর হলে তাকে হাদীসে মাকতূ‘ বলে।

اَلْمَرْفُوْعُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمَرْفُوْعُ শব্দটি اَلرَّفْعُ মূলধাতু হতে নির্গত। اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّر। اَلرَّفْعُ শব্দের অর্থ– তোলা, উর্ধ্বে উঠানো, উত্তোলন করা ইত্যাদি। এ হিসেবে اَلْمَرْفُوْعُ অর্থ হলো, যাকে উপরে তোলা হয়েছে, উন্নীত ইত্যাদি।

اَلْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ مَا اُضِيْفَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ صَرِيْحًا اَوْ حُكْمًا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর قول (কথা), فعل (কাজ) ও تقرير (মৌন অনুমোদন) -কে اَلْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ বলা হয়।

এ সংজ্ঞা হতে জানা যায় যে, হাদীসে মারফূ‘ প্রথমত দু প্রকার। যথা–

১. صَرِيْح : صَرِيْح মানে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন।

২. حُكْمِيْ : حُكْمِيْ মানে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন নয়; বরং সাহাবীর উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন। কিন্তু তা কিয়াসী না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে করতে দেখে তিনি এরূপ বলেছেন বা এরূপ করেছেন এটাই প্রবল ধারণা।

ই صَرِيْح ও حُكْمِيْ প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার। ১. قَوْلِيْ ২. فِعْلِيْ ৩. تَقْرِيْرِيْ ; সুতরাং হাদীসে মারফূ‘ মোট ছয় প্রকারে গিয়ে দাঁড়াল। আর তা হলো–

১. اَلْمَرْفُوْعُ الْقَوْلِيُّ صَرِيْحًا (মারফূ‘ কাওলী সরীহ)

২. اَلْمَرْفُوْعُ الْفِعْلِيُّ صَرِيْحًا (মারফূ‘ ফে‘লী সরীহ)

٣. اَلْمَرْفُوْعُ التَّقْرِيْرِيُّ صَرِيْحًا (মারফূ' তাকরীরী সরীহ)

٤. اَلْمَرْفُوْعُ الْقَوْلِيُّ حُكْمًا (মারফূ' কাওলী হুকমী)

٥. اَلْمَرْفُوْعُ الْفِعْلِيُّ حُكْمًا (মারফূ' ফে'লী হুকমী)

٦. اَلْمَرْفُوْعُ التَّقْرِيْرِيُّ حُكْمًا (মারফূ' তাকরীরী হুকমী)

নিম্নে উল্লিখিত ৬ প্রকারের اَلْمَرْفُوْعُ -এর সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

১. اَلْمَرْفُوْعُ الْقَوْلِيُّ صَرِيْحًا **-এর সংজ্ঞা :** মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে اَلْمَرْفُوْعُ الْقَوْلِيُّ صَرِيْحًا হলো, সাহাবীর এ কথা বলা যে, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَذَا ـ

অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ -কে এমন বলতে শুনেছি।

অথবা, এভাবে বলা যে, حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ বলেছেন।

অথবা, সাহাবী বা পরবর্তীদের কারো এ কথা বলা যে, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন।

অথবা, এ কথা বলা যে, عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا ـ

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এমনটি বলেছেন।

২. اَلْمَرْفُوْعُ الْفِعْلِيُّ صَرِيْحًا **-এর সংজ্ঞা :** মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে اَلْمَرْفُوْعُ الْفِعْلِيُّ صَرِيْحًا হলো, সাহাবীর এ কথা বলা যে, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا ـ

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

অথবা, সাহাবী বা পরবর্তীদের কারো এ কথা বলা যে, كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।

৩. اَلْمَرْفُوْعُ التَّقْرِيْرِيُّ صَرِيْحًا **-এর সংজ্ঞা :** মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে اَلْمَرْفُوْعُ التَّقْرِيْرِيُّ صَرِيْحًا হলো, সাহাবীর এ কথা বলা যে, فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا ـ

অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছি।

অথবা, সাহাবী বা পরবর্তী কারো এ কথা বলা যে,

فَعَلَ فُلَانٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ اِنْكَارَهُ لِذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছে আর তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অস্বীকারের কথা উল্লেখ করেননি।

উল্লেখ্য যে, تَقْرِيْر -এর অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে সাহাবী কোনো কাজ করেছেন অথবা অনুপস্থিতিতে করেছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনেছেন অথচ তিনি তা নিষেধ করেননি। এটা প্রমাণ করে যে, সাহাবীর ঐ কাজ বৈধ। কেননা, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমোদন রয়েছে।

وَمِثَالُ الْمَرْفُوْعِ مِنَ الْقَوْلِ حُكْمًا لَا تَصْرِيْحًا مَا يَقُوْلُ الصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الْإِسْرَائِيْلِيَّاتِ مَا لَا مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ وَلَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيْبٍ كَالْإِخْبَارِ عَنِ الْأُمُوْرِ الْمَاضِيَةِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ وَإِخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْآتِيَةِ كَالْمَلَاحِمِ وَالْفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذَا الْإِخْبَارُ عَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ مَخْصُوْصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوْصٌ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوْعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذٰلِكَ يَقْتَضِيْ مُخْبِرًا لَهُ وَمَا لَا مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ يَقْتَضِيْ مُوْقِفًا لِلْقَائِلِ بِهِ وَلَا مُوْقِفَ لِلصَّحَابَةِ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضُ مَنْ يُخْبِرُ عَنِ الْكُتُبِ الْقَدِيْمَةِ فَلِهٰذَا وَقَعَ الْاِحْتِرَازُ عَنِ الْقِسْمِ الثَّانِيْ وَإِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَرْفُوْعٌ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ وَمِثَالُ الْمَرْفُوْعِ مِنَ الْفِعْلِ حُكْمًا أَنْ يَفْعَلَ الصَّحَابِيُّ مَا لَا مَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ فَيُنْزَلُ عَلٰى أَنَّ ذٰلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) فِيْ صَلٰوةِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فِي الْكُسُوْفِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوْعَيْنِ ـ

অনুবাদ : আইনত উক্তিগত মারফূ' (مَرْفُوْع قَوْلِىْ حُكْمِىْ) হাদীসের উদাহরণ যে সাহাবী ইসরাঈলী গ্রন্থসমূহ থেকে কোনো কিছু শিক্ষা করেননি, তিনি এমন কথা বললেন যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার কোনো অবকাশ নেই, তেমনি ভাষাগত বিবরণ কিংবা জটিল শব্দের ব্যাখ্যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন– সৃষ্টির সূচনা, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম ইত্যাদি অতীতকালের ঘটনাবলি অথবা যুদ্ধবিগ্রহ, বিপর্যয়, কিয়ামতের দিনের অবস্থা ইত্যাদি ভবিষ্যৎকালীন ঘটনাবলি। তেমনি কোনো কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছওয়াব কিংবা আজাব হওয়ার কথা বর্ণনা করা। এগুলো আইনত মারফূ' বলে সাব্যস্ত করার কারণ হলো– বিষয়টি যিনি বর্ণনা করেন, তাকে অবশ্যই কেউ জানিয়ে থাকবে। যে বিষয়ে গবেষণার কোনো অবকাশ নেই, বর্ণনাকারীর জন্য তার একজন অবহিতকারী চাই-ই। আর সাহাবায়ে কেরামকে অবহিতকারী হতে পারেন একমাত্র হযরত নবী করীম ﷺ অথবা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি। এ কারণে আগেই বলা হয়েছে, যে সাহাবী পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের থেকে জ্ঞান লাভ করেননি।

সুতরাং উপরিউক্তরূপ বর্ণিত হলে সেটি সম্বন্ধে আইনত মেনে নিতে হবে যে, হযরত নবী করীম ﷺ -ই বলেছেন। এটি মারফূ' বলে গণ্য হবে। নবী করীম ﷺ থেকে সরাসরি কিংবা কারো মাধ্যমে শুনলে যেমনটি হয়ে থাকে।

আইনত কর্মগত মারফূ' (مَرْفُوْعٌ فِعْلِىٌّ حُكْمِىٌّ) হাদীসের উদাহরণ– কোনো সাহাবী এমন এক আমল করলেন যে বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। মনে করতে হবে যে, উক্ত সাহাবী নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ থেকে এটি শিক্ষালাভ করেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাজের প্রতি রাকাতে হযরত আলী (রা.) -এর দুইয়ের অধিক রুকু করা সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) যেমন বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَرْفُوْعُ الْقَوْلِىُّ حُكْمًا -এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ مَا يَقُوْلُ الصَّحَابِىُّ غَيْرُ الْمَعْرُوْفِ بِالْاَخْذِ عَنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَوْلًا لَا مَجَالَ لِلرَّأْىِ وَالْاِجْتِهَادِ فِيْهِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِبَيَانِ غَرِيْبٍ اَوْ شَرْحِ مُشْكِلٍ .

অর্থাৎ সাহাবী যিনি আহলে কিতাবদের সূত্রে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের কোনো ভাষ্য শ্রবণ ও রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নন তার এমন উক্তিকে اَلْمَرْفُوْعُ الْقَوْلِىُّ حُكْمًا বলা হয় যা ইজতিহাদ বা গবেষণা করে বলার অবকাশ রাখে না এবং যার সাথে হাদীসের কোনো غَرِيْب বা مُشْكِل শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সম্পর্ক নেই। যেমন–

ক. সৃষ্টির সূচনা বা অনুরূপ বিষয়ের বর্ণনা।

খ. অথবা ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ের যেমন মুসলিম উম্মাহর উপর আগত ফিতনা ও বিপদ-মসিবত এবং কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনা।

গ. কোনো আমলের নির্দিষ্ট ফাযায়েলের বর্ণনা।

ঘ. কোনো কাজের নির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা।

এ ধরনের সকল বিবরণ مَرْفُوْعٌ حُكْمِىٌّ। কেননা, সাহাবীর এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কারো থেকে শুনেই বলেছেন। কারণ, কোন আমলের কি ছওয়াব, কোন কাজের কি শাস্তি, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কি কি ঘটবে– এগুলো এমন বিষয় যে, এগুলো নিজ থেকে বলা যায় না। সাহাবী এমন কারো কাছ থেকে শুনেছেন যিনি এসব বিষয়ে অবহিত। আর ওহীর মাধ্যমে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই তা অবহিত হতে পারেন।

জানার একটি সূত্র হলো, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ। এজন্যই শর্ত হলো, সাহাবী সেসব গ্রন্থের কোনো ভাষ্য নিজে কিংবা কোনো কিতাবীর মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন এবং তা রেওয়ায়েত করেছেন এমন না হতে হবে।

اَلْمَرْفُوْعُ الْفِعْلِىُّ حُكْمًا -এর সংজ্ঞা : এটা হলো সাহাবীর ঐ فِعْل যাতে ইজতিহাদ চলে না। তিনি ইজতিহাদ করে ঐ فِعْل করেছেন এমন সম্ভাবনা যেখানে থাকে না সেক্ষেত্রে এটাই সম্ভব যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছেন। যেমন– হযরত আলী (রা.) সালাতুল কুসূফ -এর প্রতি রাকাতে দুয়ের অধিক রুকু করেছেন। নামাজের প্রতি রাকাতে কতটি রুকু হবে এটা ইজতিহাদ করে বলার কোনো অবকাশ নেই।

وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ حُكْمًا اَنْ يُخْبِرَ الصَّحَابِيُّ اَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَذَا فَاِنَّهٗ يَكُونُ لَهٗ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ مِنْ جِهَةِ اَنَّ الظَّاهِرَ اِطِّلَاعُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ عَلٰى ذٰلِكَ لِتَوَفُّرِ دَوَاعِيْهِمْ عَلٰى سُؤَالِهٖ عَنْ اُمُورِ دِيْنِهِمْ وَلِاَنَّ ذٰلِكَ الزَّمَانَ زَمَانُ نُزُولِ الْوَحْيِ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ اِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ الْفِعْلِ وَقَدْ اِسْتَدَلَّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَلٰى جَوَازِ الْعَزْلِ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهٗ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهٰى عَنْهُ لَنَهٰى عَنْهُ الْقُرْاٰنُ ـ

অনুবাদ : আইনত অনুমোদনীয় মারফূ' (مَرْفُوعْ تَقْرِيرِىْ حُكْمِىْ) হাদীসের উদাহরণ– কোনো সাহাবী বর্ণনা করলেন যে, তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর সময়ে এরূপ করতেন। এটি আইনত মারফূ' বলে গণ্য হবার কারণ দৃশ্যত হযরত নবী করীম ﷺ -এর অবগতি। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের দীনি ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -কে প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ ছিল। সময়টি ছিল ওহী নাজিলের সময়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা কেবলমাত্র এমন কাজই সংঘটিত হতে পারে এবং তা তাঁরা অব্যাহত রাখতে পারেন যা নিষিদ্ধ নয়। হযরত জাবির (রা.) ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) যেমন আযলের বৈধতা সম্পর্কে দলিল দিতে গিয়ে বলেছিলেন, কুরআন যখন নাজিল হচ্ছিল তখন আমরা এরূপ করেছি। এটি যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কুরআন অবশ্যই নিষেধ করত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَرْفُوعُ التَّقْرِيرِىُّ حُكْمًا -এর সংজ্ঞা : এর সংজ্ঞা হলো, সাহাবীর এ ধরনের খবর দেওয়া যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এরূপ করতেন অথচ তাদেরকে তা করতে বারণ করা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কৃত সাহাবীদের فِعْل টা مَرْفُوعْ -এর হুকুম রাখে। কারণ–

এক. তখন ছিল ওহী অবতীর্ণের সময়। সাহাবীগণ কোনো নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ فِعْل করবেন আর আল্লাহ তা নিষিদ্ধ করবেন না, আল্লাহর রাসূলকে তা অবগত করাবেন না এটা হতে পারে না। তাই তো হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) عَزْل -এর পক্ষে এভাবে দলিল পেশ করেছিলেন– كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণের কালে আমরা আযল করতাম। সুতরাং আযল নিষিদ্ধ হলে ওহীর মাধ্যমে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সতর্ক করা হতো।

দুই. সাহাবীগণ দীনি সকল বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তাদের فِعْل (তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মতিদানের প্রেক্ষিতেই হয়েছিল এটাই স্বাভাবিক।

وَيَلْتَحِقُ بِقَوْلِي حُكْمًا مَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الْكِنَايَةِ فِي مَوْضِعِ الصِّيَغِ الصَّرِيحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اَوْ يَرْوِيْهِ اَوْ يُنْمِيْهِ اَوْ رِوَايَةً اَوْ يَبْلُغُ بِهٖ اَوْ رَوَاهُ وَقَدْ يَقْتَصِرُوْنَ عَلَى الْقَوْلِ مَعَ حَذْفِ الْقَائِلِ وَيُرِيْدُوْنَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا الْحَدِيْثَ وَفِيْ كَلَامِ الْخَطِيْبِ اَنَّهُ اِصْطِلَاحٌ خَاصٌّ بِاَهْلِ الْبَصْرَةِ ـ

অনুবাদ : নবী করীম ﷺ -এর বরাত দিতে গিয়ে যেখানে সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করার কথা, সেখানে যদি ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটিও আইনত (حُكْمِيْ) শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন- সাহাবীর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করার সময় তাবেয়ী যদি বলেন-

يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اَوْ يَرْوِيْهِ اَوْ يُنْمِيْهِ اَوْ رِوَايَةً اَوْ يَبْلُغُ بِهٖ اَوْ رَوَاهُ ـ

কখনো কখনো তারা 'বলেছেন' বলেই ক্ষান্ত হন, 'কে' বলেছেন তা উল্লেখ করেন না। অথচ তাদের উদ্দেশ্য থাকে নবী করীম ﷺ। যেমন হযরত ইবনে সিরীন (র.) বর্ণনা করেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে- তিনি বলেন, তোমরা ছোট চোখবিশিষ্ট এক সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করবে ....। খতীবে বাগদাদীর কথা থেকে অনুমিত হয় যে, এটি বসরীদের বিশেষ পরিভাষা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَاظ مَرْفُوْع -এর প্রকার : مَرْفُوْع -এর শব্দ দু প্রকার। ১. প্রকাশ্য বা ইঙ্গিতমূলক ও ২. নিশ্চিত বা সম্ভাবনামূলক।

صَرِيْح বা প্রকাশ্য শব্দের বিবরণ : রাবী কখনো এমন শব্দ উল্লেখ করেন, যার নিসবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি প্রকাশ্যভাবে হয়। যেমন- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا অথবা فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا ইত্যাদি। এগুলো হলো প্রকাশ্য শব্দ।

كِنَايَة বা ইঙ্গিতমূলক শব্দের বিবরণ : কখনো রাবী প্রকাশ্য শব্দের পরিবর্তে এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিতমূলক নিসবত হয়। এগুলো হয় ইঙ্গিতমূলক শব্দ। যেমন- সাহাবী থেকে নকল করে তাবেয়ী বলেন, يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ, يَرْوِيْهِ, يُنْمِيْهِ, قَالَهُ رِوَايَةً, يَبْلُغُ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ, رَوَاهُ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দও হাদীসে মারফূ'-এর হুকুমে। অর্থাৎ এ সমস্ত ইঙ্গিতবাচক শব্দে যে হাদীস বর্ণিত হবে তাও حَدِيْث مَرْفُوْع হবে।

ইঙ্গিতমূলক শব্দে বর্ণিত হাদীসের উদাহরণ : এর উদাহরণ **নিম্নরূপ–**

১. يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ বা رَفْعُ الْحَدِيْثِ -এর উদাহরণ : হযরত ইবনে **আব্বাস (রা.) সূত্রে** হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইরের হাদীস–

اَلشِّفَاءُ فِىْ ثَلَاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مَحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ رَفْعُ الْحَدِيْثِ .

২. يُنْمِيْهِ -এর উদাহরণ :

حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ لَا اَعْلَمُ اِلَّا اَنَّهُ يُنْمِىْ ذٰلِكَ .

৩. رِوَايَةً -এর উদাহরণ :

حَدِيْثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ .

৪. يَبْلُغُ بِهِ -এর উদাহরণ :

حَدِيْثُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ .

উক্তিকারককে বিলোপ করে উক্তি বর্ণনা : কখনো কখনো এমনও হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম উক্তিকারকের কথা উল্লেখ না করে শুধু উক্তি উল্লেখ করেন। তবে এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি। যেমন– ইবনে সিরীন (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন–

تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ اَلْحَدِيْثَ .

অর্থাৎ তোমরা ছোট চোখবিশিষ্ট এক সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করবে....।

সুতরাং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর এ হাদীস মারফূ'। অবশ্য খতীবের উক্তি হতে জানা যায় যে, বিলোপের এ পরিভাষা বসরীদের বিশেষ পরিভাষা। অর্থাৎ তারাই কেবল উক্তিকারককে বিলোপ করে উক্তিটুকু উল্লেখ করেন।

وَمِنَ الصِّيَغِ الْمُحْتَمِلَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا فَالْاَكْثَرُ عَلٰى اَنَّ ذٰلِكَ مَرْفُوْعٌ وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيْهِ الْاِتِّفَاقَ قَالَ وَاِذَا قَالَهَا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ فَكَذٰلِكَ مَا لَمْ يُضِفْهَا اِلٰى صَاحِبِهَا كَسُنَّةِ الْعُمَرَيْنِ وَفِىْ نَقْلِ الْاِتِّفَاقِ نَظَرٌ فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ قَوْلَانِ وَ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّهٗ غَيْرُ مَرْفُوْعٍ اَبُوْ بَكْرِ الصَّيْرَفِىُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَاَبُوْ بَكْرِ الرَّازِىُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ اَهْلِ الظَّاهِرِ وَاحْتَجُّوْا بِاَنَّ السُّنَّةَ تَرَدَّدُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ غَيْرِهٖ وَاُجِيْبُوْا بِاَنَّ اِحْتِمَالَ اِرَادَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بَعِيْدٌ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ فِىْ صَحِيْحِهٖ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ فِىْ قِصَّتِهٖ مَعَ الْحَجَّاجِ حِيْنَ قَالَ لَهٗ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلٰوةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ اَفَعَلَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ يَعْنُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا سُنَّتَهٗ فَنَقَلَ سَالِمٌ وَهُوَ اَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ اَحَدُ الْحُفَّاظِ مِنَ التَّابِعِيْنَ عَنِ الصَّحَابَةِ اَنَّهُمْ اِذَا اَطْلَقُوا السُّنَّةَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ۔

অনুবাদ : ইঙ্গিতমূলক একটি শব্দ হলো– কোনো সাহাবীর এরূপ বলা যে, এটি সুন্নত। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে এটি মারফূ'। ইবনে আব্দুল বার এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাহাবী ব্যতীত অন্য কেউ বললেও এমনটিই হবে। অবশ্য অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করলে ভিন্ন কথা। যেমন কেউ বলল, হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর সুন্নত। ঐকমত্য থাকার বিষয়টি পর্যালোচনার যোগ্য। কেননা, মূল বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দু ধরনের উক্তি রয়েছে। তা ছাড়া এটি মারফূ' নয় বলে যারা মত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন শাফেয়ী মাযহাবের আবূ বকর সয়রফী (র.), হানাফী মাযহাবের আবূ বকর রাযী (র.), জাহেরী মাযহাবের ইবনে হাযম (র.) প্রমুখ। তারা এ মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, সুন্নত শব্দটি যেমন নবী করীম ﷺ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তেমনি অন্যের ক্ষেত্রেও। তাঁদের কথার জবাবে বলা হয়, নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ উদ্দেশ্য হওয়া অযৌক্তিক। বিশেষত কোনো লক্ষণ না থাকলে। ইমাম বুখারী (র.) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর ঘটনা সম্পর্কিত ইবনে শিহাবের হাদীস সংকলন করেছেন যা সালিম থেকে বর্ণিত। তাতে রয়েছে, সালিম (র.) হাজ্জাজকে বললেন, তুমি যদি সুন্নত অনুসরণ করতে চাও তাহলে সময় হলেই নামাজ আদায় করো। ইবনে শিহাব বলেন, আমি সালিমকে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম ﷺ কি এরূপ করতেন। জবাবে সালিম বললেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সুন্নত বলতে নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কারো কথা উদ্দেশ্য করতেন কি ?

সালিম ছিলেন মদীনার বিশিষ্ট সাতজন ফকীহের অন্যতম এবং হাফিজুল হাদীস। তিনি সাহাবায়ে কেরামের রীতি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা যখন সুন্নত শব্দটির সাধারণভাবে ব্যবহার করতেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য নবী করীম ﷺ -এর সুন্নত ব্যতীত অন্য কিছু থাকত না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرْفُوْع -এর قَطْعِىْ শব্দ : কিছু শব্দ এমন আছে যার مَرْفُوْع **হওয়াটা قَطْعِىْ এবং নিশ্চিত।** আর তার مَرْفُوْع হওয়ার মধ্যে কারো কোনো মতভেদ নেই। যেমন– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا **অথবা** فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَا ইত্যাদি।

مَرْفُوْع -এর اِحْتِمَالِىْ শব্দ : আর কিছু শব্দ এমন রয়েছে যার مَرْفُوْع **হওয়াটা اِحْتِمَالِىْ তথা** সম্ভাবনামূলক। এ ধরনের শব্দ চার প্রকার। যথা–

১. সাহাবীর উক্তি : مِنَ السُّنَّةِ كَذَا। যেমন– নিম্নের হাদীসে হযরত আলী (রা.) **বলেন,**

١. مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

٢. قَوْلُ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا.

مِنَ السُّنَّةِ كَذَا শব্দ مَرْفُوْع -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? مِنَ السُّنَّةِ كَذَا শব্দাবলি যোগে **বর্ণিত হাদীসটি** مَرْفُوْع -এর অন্তর্গত হবে কিনা– এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। **আর তা নিম্নরূপ–**

১. **ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পুরাতন অভিমত **হলো, সাহাবী বা** তাবেয়ী হতে مِنَ السُّنَّةِ كَذَا প্রকাশ পেলে তা মারফূ' হবে। তবে এ ব্যাপারে তাঁর **নতুন অভিমত** হলো, তা মারফূ' হবে না।

২. **প্রমুখের অভিমত :** ইমাম আবূ বকর সয়রাফী শাফেয়ী, ইমাম আবূ বকর রাযী হানাফী **এবং ইবনে** হাযম জাহেরী (র.) -এর মতে সাহাবী বা তাবেয়ী مِنَ السُّنَّةِ كَذَا বললে তা মারফূ' হবে না। কারণ, সুন্নত অর্থ আদর্শ, পথ। সুন্নত বলতে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত বুঝায়, তেমনি খোলাফায়ে রাশেদীন প্রমুখের আদর্শকেও সুন্নত বলা হয়। যেমন, এক হাদীস এসেছে–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ.

অর্থাৎ তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ আঁকড়ে ধরবে।

সুতরাং مِنَ السُّنَّةِ كَذَا মুতলাকভাবে বলা হলে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তিনি ব্যতীত অন্যের সুন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই مِنَ السُّنَّةِ كَذَا বললে তা مَرْفُوْع হবে না।

৩. **জুমহুরে মুহাদ্দিসীনের অভিমত :** সাহাবায়ে কেরাম مِنَ السُّنَّةِ كَذَا বললে তা مَرْفُوْع হবে। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) -এর উপর ইজমা দাবি করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, সাহাবী ব্যতীতও যদি مِنَ السُّنَّةِ كَذَا বলে এবং সুন্নতকে কোনো কিছুর দিকে নিসবত না করে অর্থাৎ سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ (আবূ বকর ও ওমরের সুন্নত), سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ (খলিফাদের সুন্নত), سُنَّةُ الصَّحَابَةِ (সাহাবীদের সুন্নত) না বলেন, তাহলে এটাও হুকমীভাবে মারফূ' হবে।

ইবনে আব্দুল বার (র.) যে ইজমার দাবি করেছেন তা বাস্তবতার বিপরীত। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নতুন অভিমত এবং অন্যান্য আলিমগণের মতে مِنَ السُّنَّةِ كَذَا টা مَرْفُوْع নয়। তাহলে তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি مَرْفُوْع হওয়ার উপর ইজমা (ঐকমত্য) দাবি করলেন?

সর্বাধিক সঠিক অভিমত নির্ণয় : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ ব্যাপারে সর্বশেষ উক্তি তথা জুমহুরের অভিমত সর্বোচ্চ সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং এটিকেই رَاجِحْ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি দলিল হিসেবে হযরত সালিম (র.) -এর নিম্নোক্ত قَوْل উল্লেখ করেছেন।

اَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ فِىْ كِتَابِهٖ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ فِيْهِ ... قَالَ (اَىْ سَالِمٌ) لَهٗ (اَىْ لِلْحَجَّاجِ) اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرِ الصَّلٰوةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ اَفَعَلَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ يَعْنُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا سُنَّتَهٗ.

উপরিউক্ত ভাষ্যে হযরত সালিম (র.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম اَلسُّنَّةُ বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ **-এর** সুন্নতকেই বুঝতেন।

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنْ كَانَ مَرْفُوْعًا فَلِمَ لَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَجَوَابُهٗ اَنَّهُمْ تَرَكُوا الْجَزْمَ بِذٰلِكَ تَوَرُّعًا وَاحْتِيَاطًا وَمِنْ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ (رض) مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا اَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ اَنَسًا رَفَعَهٗ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَىْ لَوْ قُلْتُ لَمْ اَكْذِبْ لِاَنَّ قَوْلَهٗ مِنَ السُّنَّةِ هٰذَا مَعْنَاهُ لٰكِنَّ إِيْرَادَهٗ بِالصِّيْغَةِ الَّتِىْ ذَكَرَهَا الصَّحَابِىُّ اَوْلٰى ـ

অনুবাদ : কেউ কেউ এ মর্মে প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি তা মারফূ' হয়ে থাকে তাহলে তারা এরূপ কেন বললেন না যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ? এর জবাব হলো, তারা এটি জোর দিয়ে বলা থেকে বিরত থেকেছেন সাবধানতা ও সংযমের কারণে। উদাহরণস্বরূপ তাবেয়ী আবূ কিলাবার উক্তি উল্লেখযোগ্য। হযরত আনাস (রা.) থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, সুন্নত হলো একজন ছায়্যিবা স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে কোনো কুমারী বিবাহ করলে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করা। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। আবূ কিলাবা বলেন, আমি চাইলে বলতে পারি, হযরত আনাস (রা.) এটি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আমি যদি এরূপ বলি তাহলে তা মিথ্যা হবে না। কেননা, 'সুন্নত হলো' কথার এ-ই মর্ম। তথাপি স্বয়ং সাহাবী যে শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুবহু সেভাবে উপস্থাপন করা উত্তম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ দ্বারা লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নের সারকথা হলো, مِنَ السُّنَّةِ كَذَا শব্দ দ্বারা যখন উদ্দেশ্য হাদীসে মারফূ', তখন তাবেয়ীগণ এটা না বলে সরাসরি কেন বলেন না قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বলেছেন ?

এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা হলো, তাবেয়ীগণ এরূপ করে থাকেন দু কারণে। যথা–

১. সতর্কতা ও সংযম হিসেবে তারা এমনটি সরাসরি বলেন না যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

২. তাবেয়ীগণ নিজেদের পক্ষ হতে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ না বলে হুবহু সাহাবায়ে কেরামের শব্দে হাদীস বর্ণনা করাকে ভালো মনে করেন। এর প্রমাণ আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস–

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ـ

এ হাদীস হযরত আনাস (রা.) থেকে তিনি বর্ণনা করে বলেন, হযরত আনাস (রা.) এটি মারফূ' **হিসেবে বর্ণনা** করেছেন, তাহলে আমি মিথ্যুক হবো না। কেননা, مِنَ السُّنَّةِ দ্বারা مَرْفُوْع -ই উদ্দেশ্য **হয়। কিন্তু হযরত** আনাস (রা.) যেহেতু এ হাদীস আমাদের কাছে مِنَ السُّنَّةِ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন, **তাই আমি হুবহু** সেভাবে বর্ণনা করেছি।

وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ اُمِرْنَا بِكَذَا اَوْ نُهِيْنَا عَنْ كَذَا فَالْخِلَافُ فِيْهِ
كَالْخِلَافِ فِى الَّذِىْ قَبْلَهُ لِاَنَّ مُطْلَقَ ذٰلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهٖ اِلٰى مَنْ لَهُ
الْاَمْرُ وَالنَّهْىُ وَهُوَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ
وَخَالَفَ فِىْ ذٰلِكَ طَائِفَةٌ وَتَمَسَّكُوْا بِاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ غَيْرَهٗ كَاَمْرِ
الْقُرْاٰنِ اَوِ الْاِجْمَاعِ اَوْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ اَوِ الْاِسْتِنْبَاطِ وَاُجِيْبُوْا بِاَنَّ الْاَصْلَ هُوَ
الْاَوَّلُ وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمَلٌ لٰكِنَّهٗ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِ مَرْجُوْحٌ وَاَيْضًا فَمَنْ كَانَ فِىْ
طَاعَةِ رَئِيْسٍ اِذَا قَالَ اُمِرْتُ لَا يُفْهَمُ عَنْهُ اَنَّ اٰمِرَهٗ اِلَّا رَئِيْسُهٗ وَاَمَّا قَوْلُ مَنْ
قَالَ يَحْتَمِلُ اَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِاَمْرٍ اَمْرًا فَلَا اِخْتِصَاصَ لَهٗ بِهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ
بَلْ هُوَ مَذْكُوْرٌ فِيْمَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ الصَّحَابِىَّ عَدْلٌ
عَارِفٌ بِاللِّسَانِ فَلَا يُطْلِقُ ذٰلِكَ اِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيْقِ وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهٗ كُنَّا
نَفْعَلُ كَذَا فَلَهٗ حُكْمُ الرَّفْعِ اَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ ذٰلِكَ اَنْ يَحْكُمَ
الصَّحَابِىُّ عَلٰى فِعْلٍ مِنَ الْاَفْعَالِ بِاَنَّهٗ طَاعَةٌ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَعْصِيَةٌ
كَقَوْلِ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهٗ حُكْمُ الرَّفْعِ اَيْضًا لِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ ذٰلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ
عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ـ

অনুবাদ : আইনত মারফূ' (مَرْفُوْع حُكْمِىْ) -এর একটি ধরন হলো, কোনো সাহাবীর এরূপ বলা যে, আমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিংবা এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। পরবর্তীটির মতোই এতে মতপার্থক্য রয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে বলা হলে এর মর্ম দাঁড়াবে– যার আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তিনি হলেন নবী করীম ﷺ।

একদল আলিম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের যুক্তি হলো, এখানে তো অন্যটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন– কুরআনের নির্দেশ, কিংবা ইজমা-এর, কিংবা কোনো খলিফার, কিংবা ইজতিহাদের। তাদের জবাবে বলা হয়, প্রথমটিই (নবী করীম ﷺ) আসল– অন্যসব সম্ভাব্য। প্রথমটির তুলনায় অন্যগুলো গৌণ। তা ছাড়া কেউ যখন কোনো নেতার অধীনে থাকে, তখন সে যদি **বলে–** আমাকে আদেশ করা হয়েছে, তাহলে তার আদেশকারী হিসেবে উক্ত নেতা ব্যতীত আর **কাউকে বুঝা** যায় না।

যদি কেউ বলেন– যেটি আসলে কোনো আদেশ ছিল না উক্ত সাহাবী সেটি আদেশ বলে ভাবার সম্ভাবনা রয়েছে। জবাবে বলতে হবে, এটি শুধুমাত্র এক্ষেত্রেই নয়; বরং যদি স্পষ্ট শব্দে বলেন যে, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে এরূপ আদেশ করেছেন, তাহলেও তো এরূপ সম্ভাবনা থেকে যাবে। আর এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম হলেন নির্ভরযোগ্য, ভাষাও তাদের জানা। সুতরাং আদেশ শব্দটি তাঁরা যাচাই না করে ব্যবহার করেননি।

আইনত মারফূ' -এর আরেকটি প্রকার হলো, কোনো সাহাবীর বলা যে, আমরা এরূপ করতাম। এটিও আইনত মারফূ' বলে গণ্য। কেননা, দৃশ্যত তিনি নবী করীম ﷺ -এর সময়কার কথা বলছেন। তেমনি কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে সাহাবী যদি বলেন যে, এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাধ্যাচরণ কিংবা এটি তাদের অবাধ্যচরণ, তাহলেও সেটি আইনত মারফূ' বলে গণ্য। যেমন– হযরত আম্মার (রা.) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (শাবান মাসের ত্রিশ তারিখে রমজান হবার আশঙ্কায়) রোজা রাখল, সে মহানবী ﷺ -এর অবাধ্যাচরণ করল। এটি আইনত মারফূ' বলে গণ্য হবার কারণ– দৃশ্যত তিনি নবী করীম ﷺ থেকে এটি জানতে পেরেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. **সাহাবীর উক্তি :** أُمِرْنَا بِكَذَا। অর্থাৎ আমাদের এভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে অথবা نُهِيْنَا عَنْ كَذَا। অর্থাৎ আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

أُمِرْنَا بِكَذَا। اَوْ نُهِيْنَا عَنْ كَذَا। এটা مَرْفُوْع -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? এটা مَرْفُوْع -এর অন্তর্গত কিনা– ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** এ ব্যাপারে জুমহুরের অভিমত হলো, এটা حُكْمًا مَرْفُوْع।

২. **ইসমাঈল প্রমুখের অভিমত :** তাদের মতে এটা مَرْفُوْع নয়। কারণ, হতে পারে এ اَمْر ও نَهِيْ টা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়; বরং কুরআন, ইজমা কিংবা কোনো খলিফার اَمْر ও نَهِيْ হবে। অতএব এটা مَرْفُوْع হবে না।

সঠিক অভিমত ও প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তর : আলোচ্য বিষয়ে জুমহুরের অভিমতই হলো সর্বোচ্চ সঠিক অভিমত। জুমহুরের পক্ষ হতে ইসমাঈল প্রমুখদের দলিলের জবাব দুভাবে দেওয়া হয়।

১. اَمْر ও نَهِيْ টা মুতলাকভাবে বলা হলে তার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর اَمْر – نَهِيْ হওয়াটা অগ্রগণ্য। এর বিপরীতে অন্যের اَمْر – نَهِيْ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা অগ্রগণ্য নয় বিধায় তার কোনো ধর্তব্য নেই।

২. যারা কোনো নেতার অধীনে থাকে, তারা যখন اُمِرْتُ, اُمِرْنَا, نُهِيْتُ, نُهِيْنَا বলে, তখন সামাজিকভাবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, এটা ঐ নেতার নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা। এ হিসেবে সাহাবীর উক্তি : اُمِرْنَا، نُهِيْنَا-এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই اَمْر – نَهِيْ উদ্দেশ্য হবে। কেননা, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধীনে ছিলেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : وَاَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ يَحْتَمِلُ ... বাক্যটি সম্মানিত লেখক একটি প্রশ্নের জবাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না যে, সাহাবী যে نَهِيْ

اَمْر - -কে اُمِرْنَا ও نُهِيْنَا দ্বারা ব্যক্ত করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে اَمْر ও نَهْى নয়; বরং তিনি নিজের ধারণা অনুসারে اُمِرْنَا ও نُهِيْنَا বলেছেন। সুতরাং এটা مَرْفُوْع حُكْمِىْ কিভাবে হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, এ সম্ভাবনা কেবল اُمِرْنَا بِكَذَا কিংবা نُهِيْنَا عَنْ كَذَا -এর মধ্যে সীমিত নয়: বরং তা اُمِرْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ..... এবং نَهَانَا عَنْ كَذَا এর মধ্যেও এ সম্ভাবনা বিদ্যমান। আর সাহাবী যেহেতু আদিল, আকিল এবং ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন, তাই এ ধরনের সম্ভাবনা **নিতান্তই ক্ষীণ**। অতএব, প্রবল ধারণা এটাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ اَمْر বা نَهْى করলেই কেবল সাহাবী اُمِرْنَا বা نُهِيْنَا বলে থাকেন।

৩. **সাহাবীর উক্তি :** كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا অর্থাৎ আমরা এরূপ করতাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ওহী নাজিল হওয়ার সময়কালে সাহাবায়ে কেরাম কোনো নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ **কাজ** করবেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -সে বিষয়ে অনবহিত থাকবেন– এটা হতে পারে না।

كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا এটা مَرْفُوْع حُكْمِىْ -এর **অন্তর্গত কিনা?** এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **হাকিম ও ফখরুদ্দীন রাযী -এর অভিমত :** তাঁদের মতে সাহাবী كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا বললে তা مَرْفُوْع حُكْمِىْ হবে।

২. **জুমহুরের অভিমত :** জুমহুরে মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং উসূলীনদের অভিমত হলো, সাহাবী كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا বললে তা مَرْفُوْع হবে না; বরং مَوْقُوْف হবে। ইবনুস সালাহ এবং খতীবে বাগদাদীরও মত তাই।

৪. **সাহাবীর উক্তি :** اِنَّهُ طَاعَةُ اللّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ অর্থাৎ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যমূলক কাজ। অথবা اِنَّهُ مَعْصِيَةُ اللّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ অর্থাৎ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবাধ্যতা। কেননা, এটাই স্বাভাবিক যে, বিশেষ কাজ আনুগত্য কিংবা নাফরমানি হওয়ার হুকুম প্রদানটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই সংগৃহীত। আর যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গৃহীত হয় তা مَرْفُوْع -ই হয়। যেমন– হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) -এর উক্তি–

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোজা রাখবে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল।

أَوْ يَنْتَهِى غَايَةُ الْإِسْنَادِ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِىْ كَوْنِ اللَّفْظِ يَقْتَضِى التَّصْرِيْحَ بِاَنَّ الْمَنْقُوْلَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ اَوْ مِنْ فِعْلِهٖ اَوْ مِنْ تَقْرِيْرِهٖ وَلَا يَجِيْئُ فِيْهِ جَمِيْعُ مَا تَقَدَّمَ بَلْ مُعْظَمُهٗ وَالتَّشْبِيْهُ لَا يَشْتَرِطُ فِيْهِ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَلَمَّا كَانَ هٰذَا الْمُخْتَصَرُ شَامِلًا لِجَمِيْعِ اَنْوَاعِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ اِسْتَطْرَدْتُهٗ اِلٰى تَعْرِيْفِ الصَّحَابِيِّ مَنْ هُوَ ، فَقُلْتُ وَهُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِى الْاَصَحِّ وَالْمُرَادُ بِاللِّقَاءِ مَا هُوَ اَعَمُّ مِنَ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُمَاشَاةِ وَ وُصُوْلِ اَحَدِهِمَا اِلَى الْاٰخَرِ وَاِنْ لَمْ يُكَالِمْهُ وَيَدْخُلُ فِيْهِ رُؤْيَةُ اَحَدِهِمَا الْاٰخَرَ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ بِنَفْسِهٖ اَوْ بِغَيْرِهٖ وَالتَّعْبِيْرُ بِاللِّقَاءِ اَوْلٰى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ اَلصَّحَابِىُّ مَنْ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ لِاَنَّهٗ يَخْرُجُ حِيْنَئِذٍ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَنَحْوُهٗ مِنَ الْعُمْيَانِ وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلَا تَرَدُّدٍ ـ

অনুবাদ : যে হাদীসের শেষপ্রান্ত সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তাকে বলে মাওকূফ হাদীস। মারফূ' হাদীসের ন্যায় এখানেও সাহাবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে পারে, আবার কোথাও কোথাও আইনত (হুকমীভাবে) মেনে নিতে হয় যে, উক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসটি সাহাবীর উক্তি, কর্ম কিংবা অনুমোদন। মারফূ' হাদীসের সকল শ্রেণি ও বিভাগ মাওকূফ হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। তবে অধিকাংশই হয়ে থাকে।

যেহেতু এ গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে উলূমুল হাদীসের সকল বিভাগ আলোচিত হয়েছে, তাই প্রসঙ্গক্রমে সাহাবীর সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

(আমি বলছি,) যিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন, তিনিই সাহাবী। আল্লাহ না করুন তিনি মাঝখানে যদি মুরতাদও হয়ে যান, তবু পরবর্তীকালে আবার ইসলাম গ্রহণ করে সে অবস্থায় ইন্তেকাল করলে তাকে সাহাবীই গণ্য করা হবে। এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত। সাক্ষাতের বিষয়টি ব্যাপক। একসাথে উঠাবসা, চলাফেরা, একের নিকট অন্যের গমন সবই উদ্দেশ্য। এমনকি কথাবার্তা না হলেও চলবে। একজনকে অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে দেখলেও সাক্ষাৎ বলেই গণ্য হবে। অনেকেই এ মর্মে সংজ্ঞা দিয়েছেন– যিনি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছেন, তিনি সাহাবী। 'দেখা' শব্দের তুলনায় 'সাক্ষাৎ' শব্দ ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) এবং আরো যেসব অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা তো নবী করীম ﷺ -কে দেখেননি। অথচ তাদের সাহাবী হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। (কিন্তু দেখা শব্দ ব্যবহার করলে তাঁরা বাদ পড়ে যান।)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্মানিত লেখক مَوْقُوْف -এর আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ের **অবতারণা করেছেন। আর তা হলো–** ১. মাওকূফ -এর সংজ্ঞা, ২. মাওকূফ -এর প্রকারভেদ, ৩. সাহাবীর **সংজ্ঞা, ৪.** فَوَائِد قُيُوْد **ও ৫. দুটি** বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১. مَوْقُوْف **-এর সংজ্ঞা :** মুহাদ্দিসীনে কেরাম اَلْحَدِيْثُ الْمَوْقُوْفُ -**এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান** করেছেন– هُوَ مَا اُضِيْفَ اِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ

অর্থাৎ সাহাবীর قَوْل, فِعْل ও تَقْرِيْر -কে اَلْحَدِيْثُ الْمَوْقُوْفُ বলে।

এ সংজ্ঞা অন্য ভাষায় এভাবে প্রদান করা যায় যে, যে হাদীসের সনদ কোনো **সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে** শেষ হয়ে যায় এবং ঐ সনদের মাধ্যমে যেটা বর্ণিত হয় তা কোনো সাহাবীর **উক্তি, কর্ম ও** অনুমোদন হয়, তাহলে তাকে হাদীসে মাওকূফ বলে।

২. مَوْقُوْف **-এর প্রকারভেদ :** مَوْقُوْف মোট তিন প্রকার। ১. قَوْلِىْ ২. فِعْلِىْ ও ৩. تَقْرِيْرِىْ।

তাবেয়ীর যে উক্তি, কর্ম ও অনুমোদন কিয়াসী এবং যা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত নয় তা مَرْفُوع حُكْمِى -এর অন্তর্গত ; مَوْقُوْف নয়। এ কারণে حُكْمِى -এর তিন প্রকার حَدِيْث مَوْقُوْف -এর মধ্যে সাব্যস্ত হয় না; কেবল صَرِيْح -এর তিন প্রকার সাব্যস্ত হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : ... وَالتَّشْبِيْهُ لَايَشْتَرِطُ বাক্যটিতে সম্মানিত লেখক একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। উহ্য প্রশ্নটি হলো, كَذٰلِكَ اِلَى الصَّحَابِيِّ বাক্যে كَذٰلِكَ শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় যে, حَدِيْث مَرْفُوع যেমন ছয় প্রকারে বিভক্ত হয় তেমনি حَدِيْث مَوْقُوْف -ও ছয় প্রকার হবে। অথচ বাস্তবে مَوْقُوْف হলো তিন প্রকার, তাহলে كَذٰلِكَ বলার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক বলেন, كَذٰلِكَ শব্দের মাধ্যমে موقوف কে مَرْفُوْع -এর সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হলেও এর দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, مَوْقُوْف টা সমস্ত দিক দিয়ে مَرْفُوْع -এর মত হবে; বরং সাদৃশ্যের জন্য একটু মিল হলেই যথেষ্ট।

... وَلَمَّا كَانَ هٰذَا الْمُخْتَصَرُ : এ বাক্যটি সম্মানিত লেখক আগত আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। একটু পরেই যেহেতু সাহাবীর সংজ্ঞা বর্ণিত হবে, তাই এখানে তার দুটি কারণ তুলে ধরেছেন। যথা–

১. এ গ্রন্থটির উলূমুল হাদীসের সমস্ত বিষয় সম্বলিত হওয়া।

২. حَدِيْث مَوْقُوْف -এর প্রাণ ও ভিত্তি সাহাবায়ে কেরাম হওয়া। বস্তুত এ দু কারণকে সামনে রেখে লেখক এবার সাহাবীর সংজ্ঞা তুলে ধরছেন।

৩. সাহাবী -এর সংজ্ঞা : অভিধানে صَحَابِىْ শব্দটি وَاحِدْ। এর جَمْع বা বহুবচন হলো اَصْحَابٌ। অর্থ– সাথি, সঙ্গী ইত্যাদি।

পরিভাষায় সাহাবীর সংজ্ঞা নির্ণয়ে মতভেদ হয়েছে। আর তা হলো–

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস 'সাহাবী'র সংজ্ঞা বলেছেন–

مَنْ رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন এবং ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন তিনি সাহাবী।

তবে এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ নয়। কেননা, এখানে رَاٰى তথা দেখা -এর শর্তারোপ করায় সাহাবীর সংজ্ঞা হতে ঐ সমস্ত লোক বাদ পড়েছেন যারা অন্ধ হওয়ায় নবী করীম ﷺ -কে দেখতে পারেননি। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) প্রমুখ। অথচ সন্দেহাতীতভাবে তাঁরা সাহাবী।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে সাহাবীর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ ـ

অর্থাৎ যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন; রাসূলের সাক্ষাৎ ও ইন্তেকালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকলেও। সম্মানিত লেখক হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞাটি সমর্থন করেছেন এবং তাঁর এ কিতাবে এ সংজ্ঞাটিই উল্লেখ করে তার বিশ্লেষণও করেছেন।

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত : তাঁদের মতে সাহাবী তিনি, যিনি ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। ঈমান আনার পরে মুরতাদ হয়ে গেলে তার সাহাবিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর আবার সাক্ষাৎ করা সাহাবিয়্যাতের জন্য শর্ত। আবার সাক্ষাৎ না হলে তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَاللُّقِى فِى هٰذَا التَّعْرِيْفِ كَالْجِنْسِ وَقَوْلِى مُؤْمِنًا كَالْفَصْلِ يَخْرُجُ مَنْ حَصَلَ لَهُ اللِّقَاءُ الْمَذْكُوْرُ لٰكِنْ فِى حَالِ كَوْنِهٖ كَافِرًا وَقَوْلِى بِهٖ فَصْلٌ ثَانٍ يَخْرُجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا لٰكِنْ بِغَيْرِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ لٰكِنْ هَلْ يَخْرُجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِاَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكِ الْبِعْثَةَ وَفِيْهِ نَظَرٌ وَقَوْلِى وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَصْلٌ ثَالِثٌ يَخْرُجُ مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَ اَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ وَابْنِ خَطَلٍ وَقَوْلِى وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ اَىْ بَيْنَ لُقِيِّهٖ لَهُ مُؤْمِنًا بِهٖ وَبَيْنَ مَوْتِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاِنَّ اِسْمَ الصُّحْبَةِ بَاقٍ لَهُ سَوَاءٌ رَجَعَ اِلَى الْاِسْلَامِ فِى حَيٰوتِهٖ اَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ لَقِيَهُ ثَانِيًا اَمْ لَا وَقَوْلِى فِى الْاَصَحِّ اِشَارَةٌ اِلَى الْخِلَافِ فِى الْمَسْئَلَةِ وَيَدُلُّ عَلٰى رُجْحَانِ الْاَوَّلِ قِصَّةُ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَاِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ وَاُتِىَ بِهٖ اِلَى اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ (رض) اَسِيْرًا فَعَادَ اِلَى الْاِسْلَامِ فَقَبِلَ مِنْهُ ذٰلِكَ وَ زَوَّجَهُ اُخْتَهُ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ اَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهٖ فِى الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِهٖ فِى الْمَسَانِيْدِ وَغَيْرِهَا ـ

অনুবাদ : এ সংজ্ঞায় لُقِى তথা সাক্ষাৎ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। مُؤْمِنًا তথা 'ঈমান অবস্থায়' একটি বিভাজন। এটা দ্বারা সেসব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবে, যারা কাফির অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করে মহানবী ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে মুসলমান হয়েছে। بِهٖ তথা তার প্রতি আরেকটি বিভাজন। তাই কেউ যদি অন্য নবীর প্রতি ঈমান রেখে শেষ নবী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তিনিও সাহাবী নন। অবশ্য যিনি নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তখন এ মর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ইনি অবশ্যই নবী হবেন অথচ তাঁর নবুয়তকাল পাননি, তিনি সাহাবী হবেন কিনা? তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। 'মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করা' আরেকটি বিভাজন। সুতরাং কেউ যদি ঈমান সহকারে মহানবী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পরে মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকে এবং মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাকে আর সাহাবী বলা যাবে না। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও ইবনে খাতাল।

(ঈমানের সাথে নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ ও মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকালে এতদুভয় অবস্থার) মাঝখানে যদি মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি সাহাবী বলেই গণ্য হবেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশাতেই ফিরে আসুন কিংবা তাঁর ইন্তেকালের পরে এবং দ্বিতীয়বার মহানবী ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করুন বা না করুন। এটিই বিশুদ্ধতর মত। এ ব্যাপারে ভিন্নমতও রয়েছে। আশআছ ইবনে কায়স -এর ঘটনা প্রথম মতটিকে সমর্থন করে। তিনি মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট তাঁকে বন্দি করে আনা হলে তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণকে মেনে নেন এবং তাঁর সাথে নিজ বোনের বিয়ে দেন। ঐতিহাসিকদের কেউই তাঁকে সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেননি। তাঁর হাদীস মুসনাদ কিতাবসমূহে উল্লেখ করা থেকেও কেউ ক্ষান্ত হননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৪. **فَوَائِد قُيُوْد বা সংজ্ঞার বিশ্লেষণ :** হাফিজ ইবনে হাজার (র.) সাহাবীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়–

اَلصَّحَابِيُّ : هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهٖ وَمَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ.

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

مَنْ لَقِيَ : যিনি (রাসূলের) সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি সাহাবী। কেউ কেউ বলেছেন– **مَنْ رَأَى النَّبِيَّ** **অর্থাৎ** যিনি রাসূলুল্লাহকে দেখেছেন তিনি সাহাবী। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে **মাকতূম** (রা.) ও তাঁর মতো অন্ধ সাহাবী যারা দেখতে পেতেন না তাঁরা সাহাবীর সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যান। তাই مَنْ رَأَى -এর পরিবর্তে مَنْ لَقِيَ হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : যিনি রাসূলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সুতরাং কেউ অন্য কোনো নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি– তিনি সাহাবী নন।

مُؤْمِنًا : মু'মিন অবস্থায়। সুতরাং যারা কাফির অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করে মহানবী ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে মুসলমান হয়েছে তারা সাহাবী হবে না।

بِهٖ : তাঁর প্রতি। সুতরাং কেউ যদি অন্য নবীর প্রতি ঈমান রেখে শেষনবী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তিনিও সাহাবী নন।

অবশ্য যিনি নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তখন তার এ মর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ইনি অবশ্যই নবী হবেন অথচ তাঁর নবুয়তকাল পাননি, তিনি সাহাবী হবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে।

مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ : ঈমান অবস্থায় সাক্ষাৎ পেয়েছেন, ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবী। সুতরাং মুরতাদ অবস্থায় যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবী নন। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রমুখ।

وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ : এ প্রসঙ্গে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। যথা–

১. **ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত :** ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এরপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন তিনিও সাহাবী।

   হাফিজ ইবনে হাজার (র.) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী তাই তিনি এ মতামতকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

   শাফেয়ীদের দলিল : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) হযরত আশআছ ইবনে কায়েস (রা.)-এর ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হযরত আশআছ ইবনে কায়েস (রা.) সাহাবী ছিলেন। তিনি মুরতাদ হয়ে যান। হযরত আবূ বকর (রা.) -এর শাসনামলে তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর সম্মুখে আনা হলে তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর ইসলাম কবুল করে নেন এবং তাঁর সাথে নিজের বোনের বিবাহ দেন। পরে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁকে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করেছেন এবং তাদের মাসানিদে তাঁর সূত্রে হাদীস এনেছেন। সুতরাং হাফিজ ইবনে হাজার (র.) সহ শাফেয়ীদের মত হলো, মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় ঈমানের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ সাহাবিয়্যাতের জন্য শর্ত নয়।

২. **ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.) -এর অভিমত :** ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) -এর মত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভের পর মুরতাদ হয়ে গেলে তার সাহাবিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় সাক্ষাৎ লাভ সাহাবিয়্যাতের জন্য শর্ত। তা না হলে তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

শাফেয়ীদের দলিলের জবাব : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর দলিল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, যে সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম হযরত আশআছকে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করেছেন সম্ভবত তাঁর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে পৌঁছেনি।

আর যারা আশআছ থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তারা ১. সম্ভবত তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ২. অথবা, তারা আশআছ থেকে ঐ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন যা তিনি কোনো সাহাবী থেকে শুনেছেন। ৩. অথবা, তারা তাদের মাযহাবের ভিত্তিতে রেওয়ায়েত করেছেন, যারা কুফর অবস্থায় হাদীস শুনে সে হাদীস ঈমান অবস্থায় বর্ণনা করাকে জায়েজ মনে করেন।

تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا لَا خَفَاءَ فِي رُجْحَانِ رُتْبَةِ مَنْ لَازَمَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَقَاتَلَ مَعَهُ أَوْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَتِهٖ عَلٰى مَنْ لَمْ يُلَازِمْهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُ مَشْهَدًا أَوْ عَلٰى مَنْ كَلَّمَهُ يَسِيْرًا أَوْ مَاشَاهُ قَلِيْلًا أَوْ رَاٰهُ عَلٰى بُعْدٍ أَوْ فِي حَالِ الطُّفُوْلِيَّةِ وَإِنْ كَانَ شَرَفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلًا لِلْجَمِيْعِ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ سَمَاعٌ مِنْهُ فَحَدِيْثُهُ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ وَهُمْ مَعَ ذٰلِكَ مَعْدُوْدُوْنَ فِي الصَّحَابَةِ لِمَا نَالُوْهُ مِنْ شَرَفِ الرُّؤْيَةِ.

ثَانِيْهُمَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا بِالتَّوَاتُرِ أَوِ الْاِسْتِفَاضَةِ أَوِ الشُّهْرَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَوْ بَعْضِ ثِقَاتِ التَّابِعِيْنَ أَوْ بِإِخْبَارِهٖ عَنْ نَفْسِهٖ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ إِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ ذٰلِكَ تَدْخُلُ تَحْتَ الْإِمْكَانِ وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ هٰذَا الْأَخِيْرَ جَمَاعَةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ دَعْوَاهُ ذٰلِكَ نَظِيْرُ دَعْوٰى مَنْ قَالَ أَنَا عَدْلٌ وَيَحْتَاجُ إِلٰى تَأَمُّلٍ.

অনুবাদ : বিশেষ দ্রষ্টব্য– ১ : যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন, তাঁর সাথে জিহাদে শরিক হয়েছেন কিংবা তাঁর পতাকার নিচে থেকে জিহাদ করেছেন, এমন ব্যক্তির মর্যাদা যিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে বেশি দিন কাটাননি, তাঁর সাথে কোনো জিহাদেও শরিক হননি, অথবা তাঁর সাথে অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন মাত্র, অথবা অল্প কিছু দূর একসাথে পথ চলেছেন, অথবা দূর থেকে তাঁকে দেখেছেন, কিংবা শৈশবকালে দেখেছেন– এমন ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য সবাইকে সাহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেননি, বর্ণনার দিক দিয়ে তার হাদীস মুরসাল বলে গণ্য হবে। এতদসত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে সাহাবী বলা হয়। কেননা, তাঁরা মহানবী ﷺ -কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য– ২ : কোনো ব্যক্তিকে সাহাবী সাব্যস্ত করা যায় মুতাওয়াতির, মুস্তাফীয, মাশহুর কিংবা কোনো সাহাবীর বর্ণনা, কোনো নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর বর্ণনা কিংবা সে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে এ মর্মে বর্ণনার ভিত্তিতে যে, তিনি সাহাবী। অবশ্য তার দাবির সম্ভাব্যতা বিবেচনা করতে হবে। সর্বশেষ ভিত্তি সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা, এ হলো তেমন যে, কোনো ব্যক্তি এরূপ দাবি করে যে, আমি নির্ভরযোগ্য। বিষয়টি চিন্তার অবকাশ রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাহাবিয়্যাতের প্রশ্নে সকল সাহাবী বরাবর ও সমান হলেও তাদের মধ্যে মর্যাদাগত স্তরভেদ রয়েছে। সুতরাং যিনি দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্নিধ্যে রয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জিহাদ শরিক হয়েছেন অথবা তাঁর নেতৃত্বাধীন জিহাদে শহীদ হয়েছেন তার মর্যাদা ঐ সাহাবী হতে অনেক ঊর্ধ্বে যার মাঝে এ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই।

শুধু তাই নয়, এমন সাহাবীর মর্যাদা তাঁর থেকেও বেশি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কম কথা বলেছেন, একসাথে কম হাঁটা চলা করেছেন অথবা দূর থেকে কিংবা শৈশবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছেন।

যে সাহাবীর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস শ্রবণ সাবেত নেই, তিনি যদি মাধ্যমকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস রেওয়ায়েত করেন, তাহলে তার হাদীস বর্ণনাগত দিক দিয়ে মুরসাল হলেও হুকুমগত দিক দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে মাকবূল। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সোহবত লাভে ধন্য হওয়ার কারণে তিনিও একজন গর্বিত সাহাবী।

সাহাবী হওয়া জানার উপায় : কে সাহাবী তা জানার উপায় ছয়টি। যথা–

১. اَلْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ তথা খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) প্রমুখ আশারায়ে মোবাশশরাহ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। এর মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাহাবিয়্যাত অস্বীকারকারী কাফির হবে। কারণ, তাঁর সাহাবী হওয়া কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا .

অর্থাৎ স্মরণ করুন, যখন তিনি তাঁর সাথি (আবূ বকর)-কে বলেছিলেন– আপনি ঘাবড়াবেন না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদের সাহাবিয়্যাতকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হবে না।

২. اَلْخَبَرُ الْمُسْتَفِيْضُ তথা খবরে মুস্তাফীযের মাধ্যমে।

৩. اَلْخَبَرُ الْمَشْهُوْرُ তথা খবরে মাশহূরের মাধ্যমে।

৪. এক সাহাবীর অপর সাহাবির ব্যাপারে সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে।

৫. নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর জানানোর মাধ্যমে।

৬. সাহাবীর নিজের দাবির মাধ্যমে যে, তিনি সাহাবী, যদি তার দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোনো সাহাবীর নিজের ব্যাপারে সাহাবী হওয়ার দাবি ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সাধারণ ও শরয়ী দৃষ্টিতে সম্ভাব্য হবে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের একশ বছর পর সাহাবী হওয়ার দাবি করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম ﷺ জীবনের শেষ দিকে এসে বলেন, আজ যারা পৃথিবীতে জীবিত আছে একশ বছর পরে তাদের কেউ আর জীবিত থাকবে না।

সাহাবী হওয়ার দাবি করলে তার হুকুম : কেউ নিজেকে সাহাবী হওয়ার দাবি করলে সে দাবি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **কতিপয়ের অভিমত :** কতিপয়ের মত হলো, এমন ব্যক্তি সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হবেন না। কেননা, কেউ নিজেকে আদিল বলে দাবি করলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয় না। তেমনিভাবে কেউ নিজেকে সাহাবী বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. **জুমহুরের অভিমত :** তাঁদের মতে এমন ব্যক্তি সাহাবী হবেন। কারণ, আদিল ব্যক্তির খবর তার রেওয়ায়েতের ব্যাপারে গৃহীত হয়। এমনিভাবে তার এই মর্মে খবর প্রদান করা যে, 'রাসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে'– এটিও গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রথম দলের দলিলের জবাব : মোল্লা আলী কারী (র.) প্রথম দলের দলিলের জবাবে বলেন যে, নিজেকে আদিলের দাবিদার যদি مَجْهُوْلُ الْحَالِ হয়, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয়। আর যদি তিনি ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ তথা তার আদিল হওয়াটা যদি মাশহুর হয়, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে আদিল বলে দাবি করে তার সাথে নিজেকে সাহাবী দাবিকারী ব্যক্তিকে কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, আদিল ব্যক্তির আদালাত যদি মাশহুর হয়, তাহলে তার আদিল হওয়ার সংবাদ প্রদানটা গ্রহণযোগ্য হয়। তেমনি কোনো ব্যক্তি নিজেকে সাহাবী বলে সংবাদ দিলে যদি সেটা সম্ভাব্য হয়, তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে।

أَوْ يَنْتَهِيْ غَايَةُ الْإِسْنَادِ إِلَى التَّابِعِيِّ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذٰلِكَ وَهٰذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقِيِّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ إِلَّا قَيْدَ الْإِيْمَانِ بِهٖ وَ ذٰلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَهٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ خِلَافًا لِمَنِ اشْتَرَطَ فِي التَّابِعِيِّ طُوْلَ الْمُلَازَمَةِ أَوْ صِحَّةَ السَّمَاعِ أَوِ التَّمْيِيْزِ -

অনুবাদ : যে হাদীসের শেষপ্রান্ত কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে তার নাম মাকতূ' হাদীস। তাবেয়ী হলেন– যিনি কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। সাহাবীর সংজ্ঞায় যেসব শর্ত ছিল এখানেও তা রয়েছে। তবে সাহাবী হবার জন্য মহানবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান থাকা শর্ত ছিল, তাবেয়ীর ব্যাপারে তা নেই। ঈমানের ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট। এখানে তাবেয়ীর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, সেটিই আমার মতে পছন্দনীয় মত। কেউ কেউ অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা তাবেয়ীর জন্য শর্ত করেছেন– কোনো সাহাবীর সাথে দীর্ঘকাল অবস্থানকে, কেউ শর্ত করেছেন– সাহাবী থেকে কোনো হাদীস শোনার, আবার কেউ বলেছেন– কমপক্ষে এতটুকু বয়স হওয়া চাই যখন সে সাবালক না হলেও ভালো-মন্দ বুঝতে সক্ষম হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْث مَقْطُوْع -এর আলোচনায় তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ১. مَقْطُوْع -এর সংজ্ঞা, ২. তাবেয়ী -এর সংজ্ঞা ও ৩. মুখাযরামীন -এর সংজ্ঞা। নিম্নে এ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১. اَلْحَدِيْثُ الْمَقْطُوْعُ -এর সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُوْنَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

অর্থাৎ তাবেয়ী বা তাদের পরের স্তরের সলফদের উক্তি এবং কর্মকে اَلْحَدِيْثُ الْمَقْطُوْعُ বলে।

২. তাবেয়ী -এর সংজ্ঞা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী তাবেয়ী -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ–

اَلتَّابِعِيُّ : هُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ.

অর্থাৎ তাবেয়ী তিনি যিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমানের অবস্থায় কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ঈমানের অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন– মধ্যবর্তী সময়ে মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকলেও।

মুরতাদ হওয়ার পর সাহাবিয়্যাতের জন্য পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ শর্ত কিনা– এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে যে মতভেদ সাহাবীর সংজ্ঞায় উল্লিখিত হয়েছে অনুরূপ মতভেদ তাবেয়ী -এর সংজ্ঞাতেও রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাছে পুনরায় সাক্ষাৎ শর্ত না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাবেয়ী হওয়ার জন্য মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া শর্ত।

খতীবে বাগদাদী (র.) তাবেয়ী হওয়ার জন্য সাহাবীর সংস্পর্শে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার শর্ত করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে হিব্বান (র.) তাবেয়ী হওয়ার জন্য তার এমন বয়সী হওয়া শর্ত করেছেন, যে বয়সে একজন মানুষ হাদীস শুনে মুখস্থ রাখতে পারে। অর্থাৎ তিনি صِحَّت سَمَاع -এর শর্ত করেছেন। আরেক রেওয়ায়েত মতে ইবনে হিব্বান (র.) تَمْيِيْز -এর শর্ত করেছেন। অর্থাৎ তাবেয়ী -এর এমন বয়সে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, যে বয়সে তিনি ভালো-মন্দ বুঝতে পারেন। আর তা হলো চার কিংবা পাঁচ বছর বয়স। তবে নির্ভরযোগ্য কথা হলো, তাবেয়ী হওয়ার জন্য এ সমস্ত শর্ত জরুরি নয়; বরং এমন শর্ত না হওয়াটাই চাই। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেহেতু হযরত আনাস (রা.) -কে দেখেছেন তাই তিনি তাবেয়ী; যদিও তিনি দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে থাকেননি।

وَبَقِىَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ طَبَقَةٌ اُخْتُلِفَ فِى اِلْحَاقِهِمْ بِاَيِّ الْقِسْمَيْنِ وَهُمُ الْمُخَضْرَمُوْنَ الَّذِيْنَ اَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَالْاِسْلَامَ وَلَمْ يَرَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فَعَدَّهُمْ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِى الصَّحَابَةِ وَ ادَّعٰى عِيَاضٌ وَغَيْرُهٗ اَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ يَقُوْلُ اِنَّهُمْ صَحَابَةٌ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّهٗ اَفْصَحَ فِىْ خُطْبَةِ كِتَابِهٖ بِاَنَّهٗ اِنَّمَا اَوْرَدَهُمْ لِيَكُوْنَ كِتَابُهٗ جَامِعًا مُسْتَوْعِبًا لِاَهْلِ الْقَرْنِ الْاَوَّلِ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُمْ مَعْدُوْدُوْنَ فِىْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ سَوَاءٌ عُرِفَ اَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ مُسْلِمًا فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ كَالنَّجَاشِيِّ اَوْ لَا لٰكِنْ اِنْ ثَبَتَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ كُشِفَ لَهٗ عَنْ جَمِيْعِ مَنْ فِى الْاَرْضِ فَرَاٰهُمْ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُعَدَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِهٖ فِىْ حَيَاتِهٖ اِذْ ذَاكَ وَاِنْ لَمْ يُلَاقِهٖ فِى الصَّحَابَةِ لِحُصُوْلِ الرُّؤْيَةِ مِنْ جَانِبِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ـ

অনুবাদ : সাহাবী ও তাবেয়ী– এ দু শ্রেণির মাঝখানে এমন একদল ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে কোন দলভুক্ত করা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এরা হচ্ছেন মুখাযরাম। অর্থাৎ যারা জাহেলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন; কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। ইবনে আব্দুল বার তাদেরকে সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। কাজি ইয়ায দাবি করেছেন যে, ইবনে আব্দুল বার তাদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা, তিনি তার কিতাবের ভূমিকায় পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেছেন প্রথম যুগের সকল ব্যক্তির নাম একত্রিত করার উদ্দেশ্য।

বিশুদ্ধ মত হলো, এ শ্রেণির ব্যক্তিরা প্রবীণ তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য। তাদের কেউ নবী করীম ﷺ -এর **জীবদ্দশায়** মুসলমান ছিলেন বলে জানা যাক বা না যাক। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী সম্পর্কে জানা **যায়** যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

এ মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মি'রাজ রজনীতে নবী করীম ﷺ -এর সামনে তৎকালীন পৃথিবীর **সকল** মুসলমানকে পেশ করা হয়েছিল। যদি এ বর্ণনা শুদ্ধ হয়, তাহলে তারা নবী করীম ﷺ -এর **সাক্ষাৎ** লাভ না করলেও যেহেতু তিনি তাদেরকে দেখেছিলেন, তাই তাঁর জীবদ্দশায় যারা তাঁর প্রতি **ঈমান রাখত** তাদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُخَضْرَمُ -এর সংজ্ঞা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে اَلْمُخَضْرَمُ হলো–

هُمُ الَّذِيْنَ اَدْرَكُوا الْجَاهِلِيَّةَ وَالْاِسْلَامَ وَلَمْ يَرَوا النَّبِيَّ ﷺ سَوَاءٌ اَسْلَمُوْا فِىْ زَمَنِهٖ اَوْ بَعْدَهٗ ـ

অর্থাৎ মুখাযরাম তারা যারা জাহিলিয়া যুগও পেয়েছিলেন, **রাসূলুল্লাহ** ﷺ -এর যুগও পেয়েছিলেন; কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি। চাই তারা **রাসূলুল্লাহ** ﷺ -এর **জীবদ্দশায়** ইসলাম **গ্রহণ করে থাকুন কিংবা পরে ইসলাম গ্রহণ করুন।**

اَلْمُخَضْرَمُ -এর নামকরণ : اَلْمُخَضْرَمُ শব্দটি خَضْرَمٌ মাসদার হতে اِسْمِ مَفْعُوْل-**এর সীগাহ।** خَضْرَمٌ অর্থ– কর্তন করা, বাদ দেওয়া ইত্যাদি। যেহেতু তাদেরকে সাহাবায়ে **কেরামের স্তর হতে বাদ দিয়ে** পৃথক নামে উল্লেখ করা হয়, তাই তাদেরকে মুখাযরাম বলে।

মুখাযরাম-এর সংখ্যা ও উদাহরণ : ইমাম মুসলিম (র.) এদের সংখ্যা বিশ **উল্লেখ করেছেন। ইমাম** নববী (র.) বলেন, এদের সংখ্যা আরো বেশি। নিম্নে কয়েকজন মুখাযরামের নাম **উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ** করা হলো–

১. আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশী।
২. আহনাফ ইবনে কায়েস।
৩. আবূ মুসলিম খাওলানী।
৪. আবূ রজা আতারিদী।
৫. আবূ ওসমান আন-নাহদী।
৬. যুবাইর ইবনে নুফাইর।
৭. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব।
৮. কায়েস ইবনে আবূ হাযিম।
৯. আবূ আব্দুল্লাহ সনাবিহী।
১০. সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ।

মুখাযরামদের হুকুম : মুখাযরামরা সাহাবী না তাবেয়ী– তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা ইবনুল বার যেহেতু মুখাযরামদেরকে সাহাবীদের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু আল্লামা কাজি ইয়ায প্রমুখ দাবি করেছেন যে, ইবনুল বারের মতে মুখাযরামরা সাহাবী; কিন্তু এ দাবি যথার্থ নয়। কেননা, ইবনুল বার তার কিতাবের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমি তাদেরকে সাহাবীদের সাথে উল্লেখ করেছি তাদের সাহাবী হওয়ার কারণে নয়; বরং প্রথম যুগের লোকদেরকে একসাথে উল্লেখ করার জন্য। চাই তারা সাহাবী হন বা না হন।

২. জুমহুরের মতে মুখাযরামরা كِبَارِ تَابِعِيْن -এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মুসলমান হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মশহুর হোক অথবা না হোক।

অবশ্য যদি এ হাদীস সহীহ হয় যে, মি'রাজের রাত্রে সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে হাজির করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে দেখেছেন, তাহলে এ সময় যে মুখাযরামরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের সাহাবী হওয়াটা নিশ্চিত। কেননা, যদিও তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেননি; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তো তাঁদের দেখেছেন। আর সাহাবিয়্যাতের জন্য যে কোনো এক পক্ষ হতে দর্শনই যথেষ্ট।

৩. মুখাযরামদের স্তর যেহেতু সাহাবী হতে নিম্ন এবং তাবেয়ী হতে উর্ধ্বে, তাই তাঁদেরকে সাহাবী বা তাবেয়ী -এর অন্তর্ভুক্ত না করে; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 'মুখাযরাম' স্তর নির্ধারণ করে তাঁদেরকে সেই স্তরেই গণ্য করা উচিত।

فَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْاَقْسَامِ الثَّلٰثَةِ وَهُوَ مَا يَنْتَهِىْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ غَايَةَ الْاِسْنَادِ وَهُوَ الْمَرْفُوْعُ سَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ الْاِنْتِهَاءُ بِاِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ اَمْ لَا وَالثَّانِى الْمَوْقُوْفُ وَهُوَ مَا يَنْتَهِىْ اِلَى الصَّحَابِيِّ وَالثَّالِثُ الْمَقْطُوْعُ وَهُوَ مَا يَنْتَهِىْ اِلَى التَّابِعِيِّ وَمَنْ دُوْنَ التَّابِعِيِّ مِنْ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيْهِ اَىْ فِى التَّسْمِيَةِ مِثْلُهٗ اَىْ مِثْلَ مَا يَنْتَهِىْ اِلَى التَّابِعِيِّ فِىْ تَسْمِيَةِ جَمِيْعِ ذٰلِكَ مَقْطُوْعًا وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ مَوْقُوْفٌ عَلٰى فُلَانٍ فَحَصَلَتِ التَّفْرِقَةُ فِى الْاِصْطِلَاحِ بَيْنَ الْمَقْطُوْعِ وَالْمُنْقَطِعِ فَالْمُنْقَطِعُ مِنْ مَبَاحِثِ الْاِسْنَادِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَقْطُوْعُ مِنْ مَبَاحِثِ الْمَتْنِ كَمَا تَرٰى وَقَدْ اَطْلَقَ بَعْضُهُمْ هٰذَا فِىْ مَوْضِعِ هٰذَا وَبِالْعَكْسِ تَجَوُّزًا عَنِ الْاِصْطِلَاحِ وَيُقَالُ لِلْاَخِيْرَيْنِ اَىِ الْمَوْقُوْفِ وَالْمَقْطُوْعِ الْاَثَرُ ـ

অনুবাদ : উল্লিখিত তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের নাম মারফূ'। আর তা হলো, ঐ হাদীস, যার সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। চাই তা মুত্তাসিল সনদে হোক বা না হোক। দ্বিতীয় প্রকারের নাম মাওকূফ। আর তা হলো ঐ হাদীস যার সনদ সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। তৃতীয়টি হলো মাকতূ'। আর তা হলো, ঐ হাদীস যার সনদ তাবেয়ী বা তাবয়ে-তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এরপরের লোকদের পর্যন্ত যে হাদীসের সনদ গিয়ে শেষ হয় তাকেও মাকতূ' বলে। চাইলে তুমি একে (তাবেয়ী ও তাবয়ে-তাবেয়ী -এর হাদীসকে) অমুকের মাওকূফও বলতে পার। এখান থেকে পরিষ্কার হয় যে, মাকতূ' ও মুনকাতি' এক নয়। মুনকাতি' হলো সনদের বিষয় আর মাকতূ' হলো মতনের বিষয়। তবে কেউ কেউ পরিভাষা ডিঙ্গিয়ে একটির স্থানে অপরটি ব্যবহার করেছেন। মাওকূফ ও মাকতূ' হাদীসের অপর নাম আছার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرْفُوْع ও مُتَّصِل -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে عَام خَاص مِنْ وَجْهٍ -এর নিসবত। হাদীসে মারফূ' হলো, যার সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছে। চাই তা ধারাবাহিক সূত্রে হোক কিংবা সনদের মাঝ থেকে রাবীর পতনের মাধ্যমে হোক। আর হাদীসে মুত্তাসিল হলো, যার সনদ থেকে রাবীর পতন হয় না। চাই সে সনদ রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী যেখানেই গিয়ে শেষ হোক না কেন।

مَقْطُوْع এবং مَوْقُوْف -এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীসে মাকতূ'-এর উপর কখনো কখনো মাওকূফও ব্যবহার হয়। যদিও মূলত মাওকূফ হলো সাহাবীর খবর, আর মাকতূ' হলো তাবেয়ীর খবর।

مَقْطُوْع এবং مُنْقَطِعْ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের পূর্ববর্তী সংজ্ঞা হতে সহজেই জানা গেছে যে, এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, مَقْطُوْع প্রত্যেক ঐ হাদীসকে বলে যার সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। চাই সে সনদ হতে কোনো রাবীর পতন হোক বা না হোক। আর مُنْقَطِعْ ঐ হাদীসকে বলে, যার সনদ থেকে কোনো রাবী পড়ে যায়। চাই সে সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হোক বা না হোক।

এ সংজ্ঞা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, مَقْطُوْع -এর সম্পর্ক হাদীসের মতনের সাথে আর مُنْقَطِعْ -এর সম্পর্ক হাদীসের সনদের সাথে। আর উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হলো عَامْ خَاصْ مِنْ وَجْهٍ -এর। তবে مَقْطُوْع ও مُنْقَطِعْ উভয় যেহেতু قَطْعٌ (কর্তন করা) মাসদার হতে নির্গত, তাই কেউ কেউ পরিভাষা ডিঙ্গিয়ে আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে مَقْطُوْع -এর স্থলে مُنْقَطِعْ এবং مُنْقَطِعْ -এর স্থলে مَقْطُوْع ব্যবহার করেন।

اَثَرٌ -এর সংজ্ঞা : অভিধানে اَثَرٌ অর্থ بَقِيَّةُ الشَّيْءِ বা অবশিষ্টাংশ। তবে পরিভাষায় اثر -এর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা হলো–

ক. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে اَثَرٌ হলো–

اَلْاَثَرُ مَا رُوِىَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ اَقْوَالٍ وَاَفْعَالٍ.

অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কর্ম ও বাণীকে اَلْاَثَرُ বলে।

খ. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয়ের অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা বর্ণিত হয় অর্থাৎ হাদীসে মারফূ'কে খবর ও হাদীস বলে। আর اَثَر টা হলো عَامْ বা ব্যাপক অর্থাৎ اَثَر টা مَوْقُوْف, مَرْفُوْع, مَقْطُوْع সবগুলোর উপর ব্যবহার হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে اَثَر টা حَدِيْث -এর সমার্থক হয়।

وَالْمُسْنَدُ فِى قَوْلِ اَهْلِ الْحَدِيْثِ هٰذَا حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ هُوَ مَرْفُوْعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرِهِ الْاِتِّصَالِ فَقَوْلِى مَرْفُوْعٌ كَالْجِنْسِ وَقَوْلِى صَحَابِيٍّ كَالْفَصْلِ يَخْرُجُ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِىُّ فَاِنَّهُ مُرْسَلٌ اَوْ مَنْ دُوْنَهُ فَاِنَّهُ مُعْضَلٌ اَوْ مُعَلَّقٌ وَقَوْلِى ظَاهِرِهِ الْاِتِّصَالِ يَخْرُجُ مَا ظَاهِرُهُ الْاِنْقِطَاعُ وَيَدْخُلُ مَا فِيْهِ الْاِحْتِمَالُ وَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ حَقِيْقَةُ الْاِتِّصَالِ مِنْ بَابِ الْاَوْلٰى وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيْدِ بِالظُّهُوْرِ اَنَّ الْاِنْقِطَاعَ الْخَفِىَّ كَعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ وَالْمُعَاصِرِ الَّذِىْ لَمْ يَثْبُتْ لُقِيُّهُ لَا يُخْرِجُ الْحَدِيْثَ عَنْ كَوْنِهِ مُسْنَدًا لِاِطْبَاقِ الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ خَرَّجُوا الْمَسَانِيْدَ عَلٰى ذٰلِكَ وَهٰذَا التَّعْرِيْفُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْحَاكِمِ اَلْمُسْنَدُ مَا رَوَاهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ مُتَّصِلًا اِلٰى صَحَابِيٍّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَاَمَّا الْخَطِيْبُ فَقَالَ اَلْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ فَعَلٰى هٰذَا اَلْمَوْقُوْفُ اِذَا جَاءَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمّٰى عِنْدَهُ مُسْنَدًا لٰكِنْ قَالَ اِنَّ ذٰلِكَ قَدْ يَأْتِىْ بِقِلَّةٍ وَاَبْعَدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَيْثُ قَالَ اَلْمُسْنَدُ الْمَرْفُوْعُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْاِسْنَادِ فَاِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُعْضَلِ وَالْمُنْقَطِعِ اِذَا كَانَ الْمَتْنُ مَرْفُوْعًا وَلَا قَائِلَ بِهِ ـ

অনুবাদ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম যখন কোনো হাদীস সম্পর্কে বলেন, এটি একটি মুসনাদ হাদীস, তখন তার অর্থ দাঁড়ায়– কোনো সাহাবী বর্ণিত এমন মারফূ' হাদীস দৃশ্যত যার সনদ মুত্তাসিল।

কোনো তাবেয়ীর বর্ণিত মারফূ' হাদীসকে বলা হয় মুরসাল এবং তার চেয়ে নিম্নস্তরের কারো বর্ণিত মারফূ' হাদীস হবে মু'যাল বা মু'আল্লাক। (এগুলোকে মুসনাদ বলা যাবে না।)

আমার উক্তি 'দৃশ্যত যার সনদ মুত্তাসিল', সুতরা যার সনদ দৃশ্যত মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) সেটি এ সংজ্ঞা থেকে বাইরে থাকবে। তবে যদি মুত্তাসিল হবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও সেটি এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর বস্তুত মুত্তাসিল হলে তো ভালোভাবেই তাকে মুসনাদ বলা যাবে।

'দৃশ্যত' কথাটি যোগ করার ফলে অনুমিত হয় যে, যেখানে প্রচ্ছন্ন বিচ্ছিন্নতা থাকে, যেমন মুদাল্লিস ব্যক্তি ও যে সমসাময়িক ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়নি এমন ব্যক্তিদের 'আনআনা' হাদীস, তা মুসনাদ-এর আওতা বহির্ভূত হবে না। মুসনাদ হাদীসের সংকলনকারী ইমামগণ সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এখানে মুসনাদ-এর যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো, তা হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, "মুসনাদ হলো সেই হাদীস যা কোনো মুহাদ্দিস এমন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন দৃশ্যত যার নিকট থেকে তিনি শুনেছেন, তেমনি উক্ত শায়খ বর্ণনা করেন নিজ শায়খ থেকে– এভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় সাহাবী থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।" কিন্তু খতীবে বাগদাদী বলেন, "মুসনাদ হলো মুত্তাসিল" সে অনুযায়ী কোনো মাওকূফ হাদীসও যদি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়, তাহলে তা-ও তার মতে মুসনাদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য তিনি বলেছেন, মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত মাওকূফ হাদীসকে খুব কমই মুসনাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইবনে আব্দুল বার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অভিনব মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মুসনাদ হলো মারফূ''। তিনি সনদের দিক উপেক্ষা করেছেন। সে মতে যে হাদীসের মতনটি মারফূ' অথচ সনদের দিক দিয়ে মুরসাল, মু'যাল বা মুনকাতি'– তার ক্ষেত্রেও এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অথচ এমনটি আর কেউ বলেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُسْنَدٌ -এর সংজ্ঞা : اَلْمُسْنَدُ শব্দটি অভিধানে سَنَدٌ মাসদার হতে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। **অর্থ**– সনদিত, যার সনদ রয়েছে। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْمُسْنَدُ-এর সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। **যথা–**

১. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর অভিমত : তিনি মুসনাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন–

اَلْمُسْنَدُ هُوَ مَرْفُوْعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرِهِ الْاِتِّصَالُ.

অর্থাৎ কোনো সাহাবীর বর্ণিত এমন মারফূ' হাদীস দৃশ্যত যার সনদ মুত্তাসিল।

এ সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : এখানে مَرْفُوْعٌ শব্দটি جِنْس বা ব্যাপক। অন্যান্য শর্তগুলো فَصْل তথা বিভাজন। 'صَحَابِيٌّ' এটা প্রথম শর্ত। এ শর্তারোপের কারণে তাবেয়ীর মারফূ' যাকে মুরসাল বলে এবং তাবয়ে-তাবেয়ীর মারফূ' যাকে মু'যাল বা মু'আল্লাক বলে, সব বাদ পড়েছে।

"بِسَنَدٍ ظَاهِرِهِ الْاِتِّصَالِ" এটা দ্বিতীয় শর্ত। এ শর্তারোপের কারণে প্রত্যেক ঐ হাদীস বাদ পড়েছে দৃশ্যত যার সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। যেমন– মুরসালে জলী। অবশ্য যে হাদীসের সনদ দৃশ্যত মুত্তাসিল; কিন্তু মুনকাতি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যেমন মুরসালে খফী– সবই মুসনাদ হবে। সুতরাং যে হাদীস বাস্তবে মুত্তাসিল তা অবশ্যই মুসনাদ হবে।

اِتِّصَالٌ-কে ظَاهِرٌ বা দৃশ্যত -এর সাথে শর্তারোপ করার কারণে জানা যায় যে, যার بَاطِنٌ তথা যা প্রচ্ছন্নভাবে ইনকিতায়ে খফী হয় যেমন– মুদাল্লিসের হাদীসে মুআনআন এবং সমসাময়িকের হাদীসে মুআনআন, যার সাক্ষাৎ তার শায়খের সাথে হয় না, তাকেও মুসনাদ বলে। কারণ, যে ইমামরা মুসনাদ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তারা সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের হাদীসও রেওয়ায়েত করেছেন।

২. হাকিমে মুস্তাদরাক -এর অভিমত : তিনি মুসনাদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করেছেন–

اَلْمُسْنَدُ مَا رَوَاهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ مُتَّصِلًا اِلٰى صَحَابِيٍّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ মুসনাদ হলো সেই হাদীস যা কোনো মুহাদ্দিস এমন শায়খ থেকে বর্ণনা করেন দৃশ্যত যার নিকট থেকে তিনি শুনেছেন, তেমনি উক্ত শায়খ বর্ণনা করেন নিজ শায়খ থেকে– এভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় সাহাবী থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ -থেকে বর্ণনা করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞার ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, এ সংজ্ঞা ও পূর্ববর্তী সংজ্ঞার মাঝে মৌলিক কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং দৃশ্যত বিরোধ মাত্র। নতুবা উভয় সংজ্ঞার পরিণতি তথা সারকথা একই।

৩. খতীবে বাগদাদীর অভিমত : তিনি মুসনাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ- اَلْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ

অর্থাৎ 'মুসনাদ হলো মুত্তাসিল'। চাই তা মারফূ' হোক কিংবা মাওকূফ হোক কিংবা মাকতূ'। অবশ্য মারফূ'-এ তুলনায় মাওকূফ এবং মাকতূ' -এর উপর 'মুসনাদ' -এর প্রয়োগ খুব কম হয়।

৪. আল্লামা ইবনু আব্দিল বার-এর অভিমত : এ ব্যাপারে তিনি এক অভিনব মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন- اَلْمُسْنَدُ الْمَرْفُوْعُ অর্থাৎ মুসনাদ হলো মারফূ'।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, ইবনে আব্দুল বার সনদের দিক উপেক্ষা করে এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার সংজ্ঞা মতে যে হাদীসের মতনটি মারফূ' অথচ সনদের দিক দিয়ে সেটি মুরসাল, মু'যাল বা মুনকাতি'- তার ক্ষেত্রেও এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। যেহেতু তিনি ছাড়া এমনটি আর কেউ বলেন না, সেজন্য হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ সংজ্ঞাটিকে 'অভিনব' আখ্যা দিয়েছেন।

মোটকথা, اَلْمُسْنَدُ শব্দটির প্রয়োগ কখনো নির্দিষ্ট হাদীসের উপর হয়। যেমন, এভাবে বলা হয়- هٰذَا حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ অর্থাৎ 'এটি মুসনাদ হাদীস।' আবার কখনো শব্দটি বিশেষ কিতাব বুঝাতেও ব্যবহার হয়, যাতে এক সাহাবীর সকল রেওয়ায়েত জমা করা হয় অথবা কয়েকজন সাহাবীর সমস্ত হাদীস পৃথক পৃথকভাবে জমা করা হয়। যেমন- মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা ইত্যাদি।

তাদরীব গ্রন্থে আছে যে, মুসনাদ দ্বারা কখনো ইসনাদও উদ্দেশ্য হয়। যেমন- বলা হয় مُسْنَدُ الشِّهَابِ, مُسْنَدُ الْفِرْدَوْسِ ইত্যাদি।

فَاِنْ قَلَّ عَدَدُهٗ اَىْ عَدَدُ رِجَالِ السَّنَدِ فَاِمَّا اَنْ يَنْتَهِىَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ الْعَدَدِ الْقَلِيْلِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى سَنَدٍ اٰخَرَ يَرِدُ بِهٖ ذٰلِكَ الْحَدِيْثُ بِعَيْنِهٖ بِعَدَدٍ كَثِيْرٍ اَوْ يَنْتَهِىْ اِلٰى اِمَامٍ مِنْ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ ذِىْ صِفَةٍ عُلْيَةٍ كَالْحِفْظِ وَالْفِقْهِ وَالضَّبْطِ وَالتَّصْنِيْفِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْجِيْحِ كَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَالْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَنَحْوِهِمْ فَالْاَوَّلُ وَهُوَ مَا يَنْتَهِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَلْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ فَاِنِ اتَّفَقَ اَنْ يَكُوْنَ سَنَدُهٗ صَحِيْحًا كَانَ الْغَايَةَ الْقُصْوٰى وَاِلَّا فَصُوْرَةُ الْعُلُوِّ فِيْهِ مَوْجُوْدَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوْعًا فَهُوَ كَالْعَدَمِ ـ

অনুবাদ : যদি একই হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং কোনো একটি সনদে মাধ্যম সংখ্যা কম থাকে, তাহলে তাকে বলে সনদে আলী বা উচ্চ সনদ। আর যে সনদে তুলনামূলকভাবে অধিক মাধ্যম তার নাম সনদে সাফিল বা নিম্ন সনদ।

উচ্চ সনদ দু প্রকার। যদি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে সনদের মধ্যে ব্যক্তি সংখ্যা কম হয়, তাহলে তার নাম আলীয়ে মুতলাক বা সাধারণ উচ্চ। আর যদি হাদীসের ইমামগণের কোনো একজন যিনি মেধা, ফিক্হ, জ্ঞান, আয়ত্তশক্তি, লেখনি ইত্যাদি প্রাধান্য প্রদায়ক উচ্চগুণের অধিকারী যেমন– শুবা (র.), ইমাম মালিক (র.), সুফিয়ান ছাওরী (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.) প্রমুখ–সে পর্যন্ত পৌঁছতে এরূপ কম সংখ্যক ব্যক্তির মাধ্যম থাকে, তাহলে তার নাম আলীয়ে নিসবী বা আপেক্ষিক উচ্চ।

সাধারণ উচ্চ সনদের সাথে সাথে যদি সেটি সহীহও হয়, তাহলে তা হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উচ্চ। আর যদি তা না হয়, তাহলে যতক্ষণ তা মাওযূ' না হয়, ততক্ষণ এ উচ্চতা বিবেচ্য হবে। মাওযূ' হলে উচ্চতার কোনো মূল্য নেই। কেননা, সেটি তো হাদীসই নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'সনদ' উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য : নবী করীম ﷺ পর্যন্ত সনদে মুত্তাসিল বা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরা এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মহানবী ﷺ -এর সকল হাদীস সনদ পরম্পরায় আমাদের কাছে সংরক্ষিত। এটি দীন হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে দীনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে হাতিম বলেন, ইসনাদের মাধ্যমে উম্মতকে সম্মানিত করা হয়েছে। অন্য কোনো উম্মত এ সনদ লাভ করেনি; বরং তাদের কাছে সহীফা এসেছে মাত্র; যা তারা নিজেদের কথার সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। যার ফলে বর্তমানে এটা নির্ণয় অসম্ভব হয়ে গেছে যে, কোনটি আসমানী গ্রন্থ–তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল– আর কোনটি তাদের নিজেদের উক্তি।

সনদের গুরুত্ব ও মর্যাদা : সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরামের কণ্ঠেই তা স্বীকৃত হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.)-এর উক্তি : প্রখ্যাত এ মুহাদ্দিস বলেন–

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

অর্থাৎ সনদ দীনের অংশ। যদি সনদ না থাকত, তাহলে যার যা ইচ্ছা তা বলত।

২. হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) -এর উক্তি : তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন– اَلْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ সনদে মুত্তাসিল মু'মিনের হাতিয়ার।

হাতিয়ার না থাকলে যেমন যুদ্ধ করা যায় না, তেমনি সনদ না থাকলে দীনকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ইসনাদের হুকুম : عُلُوّ سَنَدْ তথা উচ্চ সনদের গুরুত্ব বর্ণনাতীত। এটি দীনের একটি প্রয়োজনীয় দিক। উচ্চ সনদ অর্জন করা দীনের ঈপ্সিত বিষয় এবং একান্ত কাম্য। সনদের হুকুম সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ।

১. হাকিমে মুস্তাদরাক বলেন : طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِيْ سُنَّةٌ صَحِيْحَةٌ

অর্থাৎ উচ্চ সনদ অর্জন করা দীনের প্রাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (র.) বলেন : উচ্চ সনদ অর্জন করা পূর্বসূরি অনুসরণীয় ওলামায়ে কেরামের নীতি ও আদর্শ।

এ উক্তিসমূহের আলোকে বলা যায়, ইসনাদ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদা; বরং ফরজে কেফায়া।

اَلْعُلُوُّ ও اَلنُّزُوْلُ **-এর সংজ্ঞা :** এ দুটি সনদের সিফাত। নিম্নে এদের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

اَلْعُلُوُّ শব্দের অর্থ হলো– উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, মহত্ত্ব। اَلْعُلُوُّ থেকে اِسْم فَاعِل হলো عَالِيٌ।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে اَلْعُلُوُّ -এর সংজ্ঞা হলো– اَلْعُلُوُّ عِبَارَةٌ عَنْ قِلَّةِ رِجَالِ السَّنَدِ

অর্থাৎ সনদের রিজাল অর্থাৎ সনদের মাঝে وَاسِطَه (মাধ্যম) কম হওয়া।

اَلنُّزُوْلُ শব্দের অর্থ– অবতরণ, আগমন, পতন,হ্রাস ইত্যাদি। اَلنُّزُوْلُ থেকে اِسْم فَاعِل হলো اَلنَّازِلُ।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে اَلنُّزُوْلُ -এর সংজ্ঞা হলো– اَلنُّزُوْلُ عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ رِجَالِ السَّنَدِ

অর্থাৎ সনদের মাঝে وَاسِطَة বেশি হওয়া অর্থাৎ সনদের রিজালের সংখ্যা বেশি হওয়া।

এ পরিভাষার প্রয়োগ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম একই হাদীসের দুটি সনদের وَاسِطَة কমবেশি হলে اَلْعُلُوُّ ও اَلنُّزُوْلُ পরিভাষা ব্যবহার করেন। ভিন্ন ভিন্ন দুই হাদীসের সনদের মাঝে وَاسِطَة কমবেশি হলে এ পরিভাষা ব্যবহার করেন না।

সনদের প্রকারভেদ : রাবীর সংখ্যার স্বল্পতা ও বৃদ্ধির দিক দিয়ে সনদ দু প্রকার। ১. সনদে আলী ও ২. সনদে নাযিল। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হলো–

১. اَلسَّنَدُ الْعَالِيْ -এর সংজ্ঞা : একই হাদীসের যে সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয়, তাকে اَلسَّنَدُ الْعَالِيْ বা উচ্চ সনদ বলে।

২. اَلسَّنَدُ النَّازِلُ -এর সংজ্ঞা : আর যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি থাকে, তাকে اَلسَّنَدُ النَّازِلُ বা নিম্ন সনদ বলে।

রাবীর সংখ্যার কমবেশির দিক দিয়ে হাদীসও তেমনিভাবে দু প্রকার। ১. আলী ও ২. নাযিল। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. حَدِيْث عَالِيْ -এর সংজ্ঞা : যে হাদীসের সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয়, তাকে حديث عالى বলে।

২. حَدِيْث نَازِلْ -এর সংজ্ঞা : আর যে হাদীসের সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি হয়, তাকে حديث نازل বলে।

اَلْعُلُوُّ এবং اَلنُّزُوْلُ -এর পুনঃ প্রকরণ : اَلْعُلُوُّ এবং اَلنُّزُوْلُ উভয়টি আবার দু প্রকার। مُطْلَقْ ও نِسْبِىْ। নিম্নে উভয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. مُطْلَقْ -এর সংজ্ঞা : রাবীর কমবেশি হওয়াটা যদি প্রথম রাবী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত হিসেবে হয়, তাহলে তাকে مُطْلَقْ বলে।

২. نِسْبِىْ -এর সংজ্ঞা : রাবীর কমবেশি হওয়াটা যদি প্রথম রাবী হতে কোনো নির্দৃষ্ট ইমামুল মুহাদ্দিস পর্যন্ত হিসেবে হয়, তাহলে তাকে نِسْبِىْ বলে। সুতরাং عُلُوّ এবং نُزُوْل মোট ৪ প্রকার হলো। যথা-

১. اَلْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয় এবং এই কম হওয়াটা প্রথম রাবী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ বলে।

২. اَلْعُلُوُّ النِّسْبِىُّ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা কম হয় এবং এই কম হওয়াটা প্রথম রাবী হতে নির্দৃষ্ট ইমামুল মুহাদ্দিস পর্যন্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلْعُلُوُّ النِّسْبِىُّ বলে।

৩. اَلنُّزُوْلُ الْمُطْلَقُ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি হয় এবং এই বেশি হওয়াটা প্রথম রাবী হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلنُّزُوْلُ الْمُطْلَقُ বলে।

৪. اَلنُّزُوْلُ النِّسْبِىُّ : যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি হয় এবং এই বেশি হওয়াটা প্রথম রাবী হতে নির্দৃষ্ট কোনো ইমামুল মুহাদ্দিস পর্যন্ত রাবীর বিচারে হয়, তাহলে তাকে اَلنُّزُوْلُ النِّسْبِىُّ বলে।

عُلُوّ مُطْلَقْ ও نُزُوْل مُطْلَقْ -এর উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস দুই সনদে বর্ণিত। উভয় সনদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছে। এক সনদে রাবীর সংখ্যা ছয়, আর অপর সনদে রাবীর সংখ্যা সাত। তাহলে ছয় রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে عُلُوّ مُطْلَقْ আর সাত রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে نُزُوْل مُطْلَقْ।

عُلُوّ نِسْبِىْ ও نُزُوْل نِسْبِىْ -এর উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস দুই সনদে বর্ণিত। উভয় সনদ ইমাম বুখারী (র.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে; কিন্তু একটি সনদে রাবীর সংখ্যা ছয় আর অপর সনদে রাবীর সংখ্যা সাত। তাহলে ছয় রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে عُلُوّ نِسْبِىْ আর সাত রাবীবিশিষ্ট সনদকে বলা হবে نُزُوْل نِسْبِىْ।

عُلُوّ سَنَدْ -এর হুকুম : عُلُوّ سَنَدْ -এর দ্বারা সনদের মান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোনো হাদীসের সনদ উচ্চ হওয়ার সাথে সাথে যদি সহীহও হয়, তাহলে হাদীসটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। আর যদি হাদীসটি সহীহ না হয়, তাহলে আলী সনদের কারণে সেটিও মর্যাদাবিশিষ্ট হয়। তবে শর্ত হলো, হাদীসটি মাওযূ' বা জাল, অপর মতে যা'ঈফ না হওয়া চাই।

وَالثَّانِى اَلْعُلُوُّ النِّسْبِيُّ وَهُوَ مَا يَقِلُّ الْعَدَدُ فِيْهِ اِلٰى ذٰلِكَ الْاِمَامِ وَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ مِنْ ذٰلِكَ الْاِمَامِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ كَثِيْرًا وَقَدْ عَظُمَتْ رُغْبَةُ الْمُتَاخِّرِيْنَ فِيْهِ حَتّٰى غَلَبَ ذٰلِكَ عَلٰى كَثِيْرٍ مِنْهُمْ بِحَيْثُ اَهْمَلُوا الْاِشْتِغَالَ بِمَا هُوَ اَهَمُّ مِنْهُ وَاِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ الْعُلُوُّ مَرْغُوْبًا فِيْهِ لِكَوْنِهٖ اَقْرَبَ اِلَى الصِّحَّةِ وَقِلَّةِ الْخَطَأِ لِاَنَّهٗ مَا مِنْ رَاوٍ مِنْ رِجَالِ الْاِسْنَادِ اِلَّا وَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِ فَكُلَّمَا كَثُرَتِ الْوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ كَثُرَتْ مَظَانُّ التَّجْوِيْزِ وَكُلَّمَا قَلَّتْ قَلَّتْ فَاِنْ كَانَ فِى النُّزُوْلِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ فِى الْعُلُوِّ كَاَنْ يَكُوْنَ رِجَالُهٗ اَوْثَقَ مِنْهُ اَوْ اَحْفَظَ اَوْ اَفْقَهَ اَوِ الْاِتِّصَالُ فِيْهِ اَظْهَرُ فَلَا تَرَدُّدَ فِىْ اَنَّ النُّزُوْلَ حِ اَوْلٰى وَاَمَّا مَنْ رَجَّحَ النُّزُوْلَ مُطْلَقًا وَاحْتَجَّ بِاَنَّ كَثْرَةَ الْبَحْثِ يَقْتَضِى الْمَشَقَّةَ فَيَعْظُمُ الْاَجْرُ فَذٰلِكَ تَرْجِيْحٌ بِاَمْرٍ اَجْنَبِيٍّ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيْحِ وَالتَّضْعِيْفِ ـ

অনুবাদ : আর দ্বিতীয়টি হলো عُلُوّ نِسْبِىْ। আর তা হলো, যে সনদে ইমাম পর্যন্ত রাবীর সংখ্যা কম হয়। যদিও ঐ ইমামের পর হতে শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ রাসূল পর্যন্ত) রাবীর সংখ্যা বেশি হয়। পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে উচ্চ সনদ সংগ্রহের দারুণ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অনেকেই এতে এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছেন যে, এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গৌণ হয়ে গেছে।

উচ্চ সনদ সংগ্রহের প্রতি উৎসাহিত হবার কারণ হলো, তাতে শুদ্ধতার সম্ভাবনা অধিক আর ভুলের সম্ভাবনা কম। কেননা, সনদভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে কোনো রাবীর ক্ষেত্রেই ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মাধ্যম যতই বেশি হবে এবং সনদ (যত) দীর্ঘ হবে, ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা ততই বাড়বে। পক্ষান্তরে মাধ্যম যতই কম হবে, ভুলের সম্ভাবনাও ততই কমে যাবে। অবশ্য নিম্ন সনদে যদি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে যা উচ্চ সনদে নেই, যেমন– নিম্ন সনদের ব্যক্তিরা তুলনামূলক অধিক নির্ভরযোগ্য, অধিক স্মৃতিধর, অধিক ফিক্‌হজ্ঞানসম্পন্ন হন কিংবা তাতে ইত্তিসালের (নিরবচ্ছিন্নতার) দিকটি অধিক স্পষ্ট হয়, তাহলে উক্ত নিম্ন সনদই যে প্রাধান্য পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই নিম্ন সনদকে নির্বিচারে প্রাধান্য দিয়েছেন এই যুক্তিতে যে, অধিক ব্যক্তির নাম চর্চায় পরিশ্রম বেশি হয়, সুতরাং তাতে ছওয়াবও বেশি হবে। প্রাধান্য প্রদানের এ যুক্তি হাদীসকে শুদ্ধ কিংবা দুর্বল সাব্যস্ত করার সাথে সম্পর্কিত বিষয় থেকে ভিন্ন বা অভিনব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোন সনদ উত্তম ? সাধারণভাবে اَلسَّنَدُ الْعَالِىْ-ই উত্তম। তবে তার মাঝে যদি এমন কোনো রাবী **থাকেন যিনি দুর্বল** কিংবা মিথ্যাবাদী কিংবা মিথ্যার সাথে সন্দেহপরায়ণ অথবা অন্য কোনো অভিযোগের

কারণ তার মাঝে পাওয়া যায় অথচ اَلسَّنَدُ النُّزُوْلُ -এর মাঝে এ ধরনের কোনো রাবী নেই এবং তা অন্য সকল দোষ থেকে মুক্ত, তার রাবীগণ অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভরযোগ্য, স্মৃতিধর এবং তার সনদের ধারাবাহিক হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট, সেক্ষেত্রে اَلسَّنَدُ النَّازِلُ -ই উত্তম হবে।

اَلسَّنَدُ الْعَالِىُ কেন উত্তম? আল্লামা ইবনুস সালাহ (র.) বলেন, اَلسَّنَدُ النَّازِلُ -এর মাঝে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ, সনদের প্রত্যেক রাবীর ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা আছে যে, তার কারণে হাদীসের মাঝে ভুল সৃষ্টি হবে। যদি রাবীর সংখ্যা কম হয়, তবে এই ত্রুটির সম্ভাবনাও কম হবে।

اَلسَّنَدُ الْعَالِىُ -এর প্রতি আগ্রহ : মুতাআখখিরীন হাদীস চর্চাকারীদের মাঝে اَلسَّنَدُ الْعَالِىُ -এর ব্যাপারে আগ্রহ বেশি। তাতে শুদ্ধতার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। সনদে আলীতে মুতাআখখিরীন হাদীস চর্চাকারীগণ গৌরববোধ করেন।

سَنَد نُزُوْل -কে প্রাধান্য দান : সাধারণত যদিও উচ্চ সনদই উত্তম এবং এটাই জমহুরের অভিমত, কিন্তু ইবনে খাল্লাদ কতিপয় আহলে নযর থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তারা سَنَد عُلُوّ -এর পরিবর্তে سَنَد نُزُوْل -কেই প্রাধান্য দান করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো, سَنَد نُزُوْل -এ রাবীর সংখ্যা বেশি হয়। যার ফলে তাদের রাবীদের অবস্থা যাচাই করতে কষ্ট ও মেহনত বেশি হয়। আর যাতে কষ্ট বেশি হয়, তাতে ছওয়াব বেশি হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَجْرُكُمْ عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكُمْ অর্থাৎ প্রতিদান দেওয়া হবে মেহনত অনুপাতে।

সুতরাং سَنَد عُلُوّ -এর তুলনায় سَنَد نُزُوْل - এ যেহেতু ছওয়াব বেশি হয়, তাই সেটিই প্রাধান্য পাবে।

দলিলের জবাব : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এ পক্ষের দলিলের জবাবে বলেন যে, হাদীসের আসল সম্পর্ক হচ্ছে বিশুদ্ধ ও দুর্বলতার সাথে; ছওয়াব ও প্রতিদানের সাথে নয়। এজন্য বেশি ছওয়াবের ভিত্তিতে سَنَد نُزُوْل -কে প্রাধান্য দেওয়াটা হবে হাদীসের বহির্গত বিষয় দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া; আর এর কোনো ধর্তব্য নেই। এ কারণে ইবনুস সালাহ (র.) এ মাযহাবের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- هُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيْفُ الْحُجَّةِ অর্থাৎ এটা এমন মাযহাব যার ভিত্তি নড়বড়ে।

وَفِيْهِ أَيْ فِي الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ اَلْمُوَافَقَةُ وَهِيَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِيْنَ مِنْ غَيْرِ طَرِيْقِهِ أَيِ الطَّرِيْقَةِ الَّتِي تَصِلُ إِلَى ذٰلِكَ الْمُصَنِّفِ الْمُعَيَّنِ مِثَالُهُ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ حَدِيْثًا فَلَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيْقِهِ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ ثَمَانِيَةٌ وَلَوْ رَوَيْنَا ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَيْبَةَ مَثَلًا لَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ فِيْهِ سَبْعَةٌ فَقَدْ حَصَلَتِ الْمُوَافَقَةُ مَعَ الْبُخَارِيِّ فِي شَيْخِهِ بِعَيْنِهِ مَعَ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ عَلَى الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ۔

অনুবাদ : عُلُوّ نِسْبِيْ সনদ কয়েক প্রকার। এক নম্বর মুওয়াফাকা। অর্থাৎ হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের কোনো একটির লেখকের শায়খ পর্যন্ত উক্ত লেখকের মাধ্যম ছাড়াই পৌঁছানো। যেমন– ইমাম বুখারী (র.) তাঁর কিতাবে কুতায়বার মাধ্যমে ইমাম মালিক (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনে হাজার) যদি ইমাম বুখারীর সূত্রে এটি বর্ণনা করি, তাহলে আমার ও কুতাইবার মাঝখানে মাধ্যম হবে আটজন। কিন্তু ঠিক এই হাদীসটি যদি আমি আবুল আব্বাস সাররাজের সূত্রে কুতাইবা থেকে বর্ণনা করি, তাহলে মাধ্যম হবে সাতজন। এখানে ইমাম বুখারীর সাথে তাঁর শায়খের বেলায় আমার মিল আছে। সাথে সাথে তাঁর পর্যন্ত আমার পৌঁছুনের সনদ উচ্চ। এরই নাম মুওয়াফাকা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عُلُوّ نِسْبِيْ-এর প্রকার : এটা মোট ৪ প্রকার। ১. اَلْمُوَافَقَةُ ২. اَلْبَدْلُ ৩. اَلْمُسَاوَاةُ ও ৪. اَلْمُصَافَحَةُ। নিম্নে ৪ প্রকারের আলোচনা করা হলো।

اَلْمُوَافَقَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُوَافَقَةُ শব্দটি **بَاب مُفَاعَلَة**-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থ– অনুরূপ হওয়া, একমত হওয়া।

اَلْمُوَافَقَةُ-এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় **اَلْمُوَافَقَةُ** হলো –

وَهُوَ أَنْ يَصِلَ الرَّاوِيْ إِلَى شَيْخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِيْنَ كَالْبُخَارِيِّ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ طَرِيْقِهِ مَعَ عُلُوِّ إِسْنَادِهِ عَلَى إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ۔

অর্থাৎ হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের কোনো একটির লেখকদের শায়খ পর্যন্ত উক্ত লেখকদের মাধ্যম ছাড়াই পৌঁছানো। তবে শর্ত হলো, লেখকের মাধ্যমে তার শায়খ পর্যন্ত পৌঁছতে যত মাধ্যম লাগত তা অপেক্ষা কম মাধ্যম হতে হবে। অর্থাৎ সনদ عَالِيْ হতে হবে।

اَلْمُوَافَقَةُ-এর উদাহরণ : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর শায়খ কুতাইবার সূত্রে ইমাম মালিক (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে হাজার (র.) বলেন, আমি যদি ঐ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) -এর সূত্রে বর্ণনা করি, তাহলে আমার ও কুতাইবার মাঝখানে মাধ্যম হবে আটজন। কিন্তু ঠিক এই হাদীসটি যদি আমি আবুল আব্বাস সাররাজের সূত্রে কুতাইবা হতে বর্ণনা করি, তাহলে মাধ্যম হবে সাতজন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর সাথে আমার مُوَافَقَة আছে। কেননা, তিনিও কুতাইবা থেকে রেওয়ায়েত করেন, আমিও কুতাইবা হতে রেওয়ায়েত করি। সাথে সাথে আমার সনদ عَلِيْ তথা উচ্চ। কারণ, এতে মাধ্যম কম।

وَفِيْهِ اَيِ الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ اَلْبَدْلُ وَهُوَ الْوُصُوْلُ اِلٰى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذٰلِكَ كَأَنْ يَقَعَ لَنَا ذٰلِكَ الْاِسْنَادُ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيْقٍ اُخْرٰى اِلَى الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَيَكُوْنُ الْقَعْنَبِيُّ بَدَلًا فِيْهِ مِنْ قُتَيْبَةَ وَاَكْثَرُ مَا يَعْتَبِرُوْنَ الْمُوَافَقَةَ وَالْبَدْلَ اِذَا قَارَنَا الْعُلُوَّ وَاِلَّا فَاسْمُ الْمُوَافَقَةِ وَالْبَدْلِ وَاقِعٌ بِدُوْنِهِ ـ

অনুবাদ : عُلُوّ نِسْبِىْ-এর আরেক প্রকারের নাম বদল। এর অর্থ সিহাহ সিত্তার **কোনো একটির** লেখকের শিক্ষকের শিক্ষক পর্যন্ত তার মাধ্যম ব্যতীত পৌছানো পূর্ববর্তীটির ন্যায়। **যেমন– আমি** (ইবনে হাজার) যদি কা'নাবীর মাধ্যমে ইমাম মালিক পর্যন্ত অন্য সনদ পরম্পরায় (**ইমাম বুখারীর** মাধ্যম ব্যতীত) পৌছতে পারি, তাহলে তাকে বলা হবে বদল। এখানে কুতাইবার **স্থানে এসেছে** কা'নাবী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরাম উচ্চতার দিক তুলনা করেই 'মুওয়াফাকা' ও **'বদল'** সাব্যস্ত করেন। যদিও নাম হিসেবে এ দুটি শব্দ উচ্চতা ছাড়াই প্রযোজ্য হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْبَدْلُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْبَدْلُ শব্দটি মাসদার। অর্থ– বদল করা, পরিবর্তন করা।

اَلْبَدْلُ-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় بَدْل বলা হয়–

وَهُوَ الْوُصُوْلُ اِلٰى شَيْخِ شَيْخِ اَحَدِ الْمُصَنِّفِيْنَ مِنْ غَيْرِ طَرِيْقِهِ مَعَ عُلُوِّ الْاِسْنَادِ عَلَى الْاِسْنَادِ اِلَيْهِ.

অর্থাৎ হাদীসের প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থের লেখকের শায়খের শায়খ পর্যন্ত উক্ত লেখকের মাধ্যম ছাড়া পৌছা। শর্ত হলো, উক্ত লেখকের মাধ্যমসহ পৌছলে যত মাধ্যম লাগত তার চেয়ে কম মাধ্যম হতে হবে। অর্থাৎ সনদ عَالِىْ হতে হবে।

اَلْبَدْلُ-এর উদাহরণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, পূর্বের (মুওয়াফাকা -এর) উদাহরণে উল্লিখিত হাদীসটি (উদাহরণস্বরূপ) যদি আমি ইমাম বুখারীর মাধ্যমসহ বর্ণনা করি, তাহলে মোট মাধ্যম হবে নয়জন। আর যদি ইমাম বুখারীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কারো সনদে কা'নাবীর সূত্রে ইমাম বুখারীর শায়খের শায়খ ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করি, তাহলে মাধ্যম হবে আটজন। এক্ষেত্রে কা'নাবী হবে কুতাইবার বদল। সাথে সাথে কা'নাবীর সনদটি عَالِىْ।

اَلْمُوَافَقَةُ ও اَلْبَدْلُ-এর মধ্যে পার্থক্য : اَلْمُوَافَقَةُ ও اَلْبَدْلُ-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই বললেই চলে। তবে একটি স্থানে একটু ব্যতিক্রম। আর তা হলো, اَلْمُوَافَقَةُ-এর মধ্যে দ্বিতীয় সনদটি লেখকের শায়খ পর্যন্ত গিয়ে মিলে, আর اَلْبَدْلُ-এর মধ্যে লেখকের শায়খের শায়খ পর্যন্ত গিয়ে মিলে।

وَفِيْهِ اَىْ فِى الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ الْمُسَاوَاةُ وَهِىَ اِسْتِوَاءُ عَدَدِ الْاِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِىْ اِلَى اٰخِرِهٖ اَىْ اِسْنَادِ الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ مَعَ اِسْنَادِ اَحَدِ الْمُصَنِّفِيْنَ كَاَنْ يَرْوِىَ النَّسَائِىُّ مَثَلًا حَدِيْثًا يَقَعُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ فِيْهِ اَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا فَيَقَعُ لَنَا ذٰلِكَ الْحَدِيْثُ بِعَيْنِهٖ بِاِسْنَادٍ اٰخَرَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ يَقَعُ بَيْنَنَا فِيْهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا فَتَسَاوَى النَّسَائِىُّ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُلَاحَظَةِ ذٰلِكَ الْاِسْنَادِ الْخَاصِّ .

অনুবাদ : عُلُوّ نِسْبِى-এর তৃতীয় প্রকারের নাম মুসাওয়াত বা সমতা। এর অর্থ, কোনো সনদের মাধ্যম সংখ্যা রাবী থেকে শেষ পর্যন্ত সিহাহ সিত্তার কোনো লেখকের সনদের সমান হওয়া। যেমন– ইমাম নাসায়ী (র.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তার থেকে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এগারজন ব্যক্তি রয়েছেন। আমি (ইবনে হাজার) ঠিক সেই হাদীসটি অপর এক সনদে বর্ণনা করি। তাতেও আমা হতে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত এগারজন ব্যক্তি রয়েছেন। সুতরাং সংখ্যার দিক দিয়ে আমার ও ইমাম নাসায়ী (র.)-এর মধ্যে সমতা রয়েছে। এরই নাম মুসাওয়াত। অবশ্য ইমাম নাসায়ী (র.)-এর সনদে যদি কোনো বিশেষত্ব থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। সেটি আমাদের লক্ষণীয় বিষয় নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُسَاوَاةُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُسَاوَاةُ শব্দটি بَاب مُفَاعَلَة-এর মাসদার। অর্থ– সমতা, সমান-সমান হওয়া ইত্যাদি।

اَلْمُسَاوَاةُ-এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْمُسَاوَاةُ হলো–

وَهِىَ اَنْ يَّسْتَوِىَ عَدَدُ رِجَالِ سَنَدِ الرَّاوِىْ مَعَ سَنَدِ اَحَدِ الْمُصَنِّفِيْنَ .

অর্থাৎ হাদীস সংকলনকারী কোনো মুহাদ্দিস (যেমন– ইমাম নাসায়ী) একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত মোট মাধ্যম যত জন, ঠিক ঐ হাদীসটি যদি অন্য কোনো রাবী তত মাধ্যমে রেওয়ায়েত করেন, তবে তাকে اَلْمُسَاوَاةُ বলে।

اَلْمُسَاوَاةُ-এর উদাহরণ : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, ইমাম নাসায়ী (র.) নিম্নোক্ত হাদীসটি كِتَابُ الصَّلٰوةِ-এ মোট দশ মাধ্যমে রেওয়ায়েত করেন।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, আমিও এ হাদীসটি মোট দশ মাধ্যমে রেওয়ায়েত করি। সুতরাং মোট মাধ্যমের ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী (র.)-এর সাথে আমার مُسَاوَاة তথা সমতা রয়েছে।

বি. দ্র. اَلْمُسَاوَاةُ টা عُلُوّ مُطْلَق এবং عُلُوّ نِسْبِى উভয়ের মাঝে পাওয়া যাওয়া সম্ভব। এ হিসেবে اَلْمُسَاوَاةُ টা যেমনিভাবে عُلُوّ نِسْبِى-এর প্রকার, তেমনিভাবে عُلُوّ مُطْلَق-এরও প্রকার। আর পূর্বে اَلْمُوَافَقَةُ ও اَلْبَدَلُ-এর যে উদাহরণ অতিবাহিত হয়েছে তা عُلُوّ مُطْلَق-এরই। তাই عُلُوّ نِسْبِى-এর প্রকার উল্লেখ করে তার উদাহরণ হিসেবে তা উল্লেখ করাটা লেখকের একপ্রকার ভুল। [রাওযাতুল আছর : ১৩২]

وَفِيْهِ اَيِ الْعُلُوِّ النِّسْبِيِّ اَيْضًا اَلْمُصَافَحَةُ وَهِيَ الْاِسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيْذِ ذٰلِكَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوْحِ اَوَّلًا وَسُمِّيَتِ الْمُصَافَحَةُ لِاَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ فِى الْغَالِبِ بِالْمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلَاقَيَا وَنَحْنُ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ كَاَنَّا لَقِيْنَا النَّسَائِيَّ فَكَاَنَّا صَافَحْنَاهُ وَيُقَابِلُ الْعُلُوُّ بِاَقْسَامِهِ اَلْمَذْكُوْرَةِ اَلنُّزُوْلُ فَيَكُوْنُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ اَقْسَامِ الْعُلُوِّ يُقَابِلُهُ قِسْمٌ مِنْ اَقْسَامِ النُّزُوْلِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْعُلُوَّ قَدْ يَقَعُ غَيْرَ تَابِعِ النُّزُوْلِ ـ

অনুবাদ : عُلُوّ نِسْبِىْ-এর চতুর্থ প্রকার মুসাফাহা। এর অর্থ, উক্ত লেখকের কোনো ছাত্রের সাথে সমতা থাকা। এরূপ নামকরণের কারণ হলো, সাক্ষাৎ হলে সাধারণত মুসাফাহা করা হয়ে থাকে। আমি (ইবনে হাজার) যেন ইমাম নাসায়ী (র.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছি এবং তাঁর সাথে মুসাফাহা করেছি। উচ্চতার যেসব প্রকারের কথা উল্লেখ করা হলো, তার বিপরীতে রয়েছে নিম্নতার প্রকারসমূহ। উচ্চতার প্রতিটি প্রকারের বিপরীতে নিম্নতার একটি করে প্রকার রয়েছে। অনেকেই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, উচ্চতা অনেক সময় নিম্নতার অনুসারী হওয়া ছাড়াও সংঘটিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُصَافَحَةُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُصَافَحَةُ শব্দটি بَاب مُفَاعَلَة-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। অর্থ– দুজনের সাক্ষাতে মুসাফাহা করা।

اَلْمُصَافَحَةُ-এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْمُصَافَحَةُ হলো–

وَهِيَ اَنْ يَسْتَوِيَ اِسْنَادُ الرَّاوِيْ عَدَدًا مَعَ اِسْنَادِ تِلْمِيْذِ اَحَدِ الْمُصَنِّفِيْنَ ـ

অর্থাৎ হাদীস সংকলনকারী কোনো মুহাদ্দিসের ছাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মোট যত মাধ্যমে হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন ঠিক তত মাধ্যমে ঐ হাদীসটি অন্যকোনো রাবীর রেওয়ায়েত করাকে اَلْمُصَافَحَةُ বলে। মোট মাধ্যম সমানহেতু যেন রাবী ঐ ছাত্রের শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন।

فَاِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِىْ وَمَنْ رُوِىَ عَنْهُ فِىْ اَمْرٍ مِنَ الْاُمُوْرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرُّوَاةِ مِثْلَ السِّنِّ وَاللُّقِىِّ وَهُوَ الْاَخْذُ عَنِ الْمَشَائِخِ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ لِاَنَّهُ حِ يَكُوْنُ رَاوِيًا عَنْ قَرِيْنِهِ وَاِنْ رَوٰى كُلٌّ مِنْهُمَا اَىِ الْقَرِيْنَيْنِ عَنِ الْاٰخَرِ فَهُوَ الْمُدَبَّجُ وَهُوَ اَخَصُّ مِنَ الْاَوَّلِ فَكُلُّ مُدَبَّجٍ اَقْرَانٌ وَلَيْسَ كُلُّ اَقْرَانٍ مُدَبَّجًا وَقَدْ صَنَّفَ الدَّارَ قُطْنِىُّ فِىْ ذٰلِكَ وَصَنَّفَ اَبُو الشَّيْخِ الْاِصْبَهَانِىُّ فِى الَّذِىْ قَبْلَهُ وَاِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تِلْمِيْذِهٖ صَدَقَ اَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا يَرْوِىْ عَنِ الْاٰخَرِ فَهَلْ يُسَمّٰى مُدَبَّجًا فِيْهِ بَحْثٌ وَالظَّاهِرُ لَا لِاَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ وَالتَّدْبِيْجُ مَاخُوْذٌ مِنْ دِيْبَاجَتَيِ الْوَجْهِ فَيَقْتَضِىْ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ مُسْتَوِيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يَجِيْءُ فِيْهِ هٰذَا ـ

অনুবাদ : রাবী এবং তিনি যার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ে যদি রেওয়ায়েত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে শরিক হন, যেমন– বয়স কিংবা কোনো শায়খ থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করায়, তাহলে এরূপ ব্যক্তির বর্ণনাকে বলা হয় রেওয়ায়েতুল আকরান বা সাথিদের বর্ণনা। কেননা, এক্ষেত্রে একজন রাবী তার সাথি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

দুজন সাথি যদি প্রত্যেকেই একে অপরের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে এর নাম হয় মুদাব্বাজ। রেওয়ায়েতুল আকরান হলো ব্যাপক আর এটা সীমিত। প্রতিটি মুদাব্বাজই আকরানের অন্তর্গত, কিন্তু সকল আকরান মুদাব্বাজ নয়। ইমাম দারাকুতনী (র.) এ সম্পর্কে একখানা কিতাব রচনা করেছেন। আর আবূ শায়খ ইস্পাহানী রচনা করেছেন রেওয়ায়েতুল আকরান সম্পর্কে।

শায়খ যদি নিজ শিষ্য থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে একে অপর থেকে বর্ণনা করার অর্থ পাওয়া যায়। এটিকে মুদাব্বাজ বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে দৃশ্যত এরূপ বলা না যাওয়াই সঙ্গত। কেননা, সেটি হলো রেওয়ায়েতুল আকাবির আনিল আসাগির বা ছোটদের নিকট থেকে বড়দের বর্ণনা শ্রেণির অন্তর্গত।

মুদাব্বাজ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে দিবাজা থেকে। যার অর্থ– মুখমণ্ডলের দুদিক। সুতরাং এখানে উভয় দিক সমান হওয়া প্রয়োজন। শিষ্য থেকে শায়খের বর্ণনা এ শ্রেণিতে পড়ে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رِوَايَةُ حَدِيْث কয়েক প্রকার। ১. رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ ২. مُدَبَّجٌ ৩. رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ ৪. الْاَصَاغِرِ عَنِ الْاَكَابِرِ। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ-এর আভিধানিক অর্থ : رِوَايَةٌ শব্দটি بَاب ضَرَبَ-এর মাসদার। আর اَقْرَانٌ শব্দটি قَرْنٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সাথি, বন্ধু, সহচর, সহপাঠী, জ্ঞান ও বিদ্যায় বা বয়সে সমতুল্য ইত্যাদি।

رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ-এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ হলো–

هِىَ اَنْ يَرْوِىَ قَرِيْنٌ عَنْ قَرِيْنِهٖ كَرِوَايَةِ الْاَعْمَشِ عَنِ التَّيْمِىِّ ـ

অর্থাৎ কোনো সহপাঠী (তথা স্বীয় শায়খের ছাত্র) থেকে, কিংবা জ্ঞান-বিদ্যায় সমতুল্য অথবা সমবয়স্ক কোনো ব্যক্তি থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করাকে رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ বলা হয়। যেমন- ইমাম আ'মাশ (র.) হযরত তায়মী (র.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

নামকরণ : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, اَقْرَانٌ শব্দটি قَرْنٌ -এর বহুবচন আর قَرْنٌ অর্থ- সাথি। যেহেতু এখানে বর্ণনাকারী আর مَرْوِى عَنْه করীন বা সাথি হন সেহেতু একে رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ তথা সাথি হতে সাথির রেওয়ায়েত বলে।

اَلْمُدَبَّجُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُدَبَّجُ শব্দটি اِسْم مَفْعُوْل-এর وَاحِد مُذَكَّرْ। تَدْبِيْجٌ মূলধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ- রঞ্জিতকরণ, সজ্জিতকরণ, অলঙ্করণ।

اَلْمُدَبَّجُ-এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় مُدَبَّجْ বলা হয়- اَنْ يَرْوِىَ الْقَرِيْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ অর্থাৎ দুই সহপাঠী বা সমবয়স্ক বা সমতুল্য ব্যক্তির প্রত্যেকেই অপর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

اَلْمُدَبَّجُ-এর উদাহরণ : যেমন- হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) উভয়ে একে অপর হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম মালিক ও ইমাম আওযায়ী (র.) উভয়ে একে অপর হতে, ইমাম আহমদ ও ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (র.) উভয়ে একে অপর হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

رِوَايَةُ اَقْرَانْ এবং مُدَبَّجْ-এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে عَام خَاص مُطْلَقْ-এর নিসবত রয়েছে। رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ টা عَامْ আর مُدَبَّجْ টা خَاصْ। কেননা, مُدَبَّجْ-এর মধ্যে উভয় পক্ষ হতে রেওয়ায়েত হওয়া জরুরি। কিন্তু رِوَايَةُ الْاَقْرَانِ-এর মধ্যে এটি শর্ত নয়; বরং যে কোনো একদিক হতে রেওয়ায়েত হলেই যথেষ্ট।

رِوَايَةُ الشَّيْخِ عَنِ التِّلْمِيْذِ এটা مُدَبَّجْ-এর অন্তর্গত কিনা? যদি শায়খ তার ছাত্র হতে রেওয়ায়েত করেন, যাকে পরিভাষায় رِوَايَةُ الشَّيْخِ عَنِ التِّلْمِيْذِ বলে, তা مُدَبَّجْ হবে না; বরং এটা رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, مُدَبَّجْ হওয়ার জন্য رَاوِىْ এবং مَرْوِىْ عَنْهُ সমসাময়িক হওয়া শর্ত। আর আলোচ্য সুরতে ছাত্র শায়খের সমসাময়িক নয়।

اَلْمُدَبَّجُ-এর নামকরণ : اَلْمُدَبَّجُ শব্দটি اَلتَّدْبِيْجُ মাসদার হতে গঠিত اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। اَلتَّدْبِيْجُ শব্দ উৎসারিত হয়েছে دِيْبَاجَتَىِ الْوَجْهِ হতে। এর অর্থ- মুখের দুই গাল। সুতরাং যেমনিভাবে দুই গাল একে অপরের বরাবর হয়, তেমনিভাবে مُدَبَّجْ-এর মধ্যে رَاوِىْ এবং مَرْوِىْ عَنْهُ একে অপর হতে রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে বরাবর হয়। এজন্য একে مُدَبَّجْ করে নাম রাখা হয়েছে।

مُدَبَّجْ জানার ফায়দা : مُدَبَّجْ জানার ফায়দা দুটি। যথা-

১. এতে করে সনদে বৃদ্ধির ধারণা দূরীভূত হয়।

২. حَدِيْث مُعَنْعَنْ-এর মধ্যে وَاوْ-কে عَنْ দ্বারা পরিবর্তন করা হতে নিরাপত্তা লাভ হয়।

وَإِنْ رَوَى الرَّاوِيْ عَمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ فِى السِّنِّ اَوْ فِى اللِّقَاءِ اَوْ فِى الْمِقْدَارِ فَهٰذَا النَّوْعُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ وَمِنْهُ اَىْ مِنْ جُمْلَةِ هٰذَا النَّوْعِ وَهُوَ اَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ رِوَايَةُ الْاٰبَاءِ عَنِ الْاَبْنَاءِ وَالصَّحَابَةُ عَنِ التَّابِعِيْنَ وَالشَّيْخُ عَنْ تِلْمِيْذِهِ وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَفِىْ عَكْسِهِ كَثْرَةٌ لِاَنَّهُ هُوَ الْجَادَّةُ الْمَسْلُوْكَةُ الْغَالِبَةُ وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ ذٰلِكَ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ مَرَاتِبِهِمْ وَتَنْزِيْلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ وَقَدْ صَنَّفَ الْخَطِيْبُ فِىْ رِوَايَةِ الْاٰبَاءِ عَنِ الْاَبْنَاءِ تَصْنِيْفًا وَاَفْرَدَ جُزْءً لَطِيْفًا فِىْ رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِيْنَ ـ

অনুবাদ : রাবী যদি এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি বয়স, শিক্ষাগ্রহণ কিংবা হাদীসের পরিমাণের দিক দিয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের, তাহলে তার নাম রেওয়ায়েতুল আকাবির আনিল আসাগির বা ছোটদের থেকে বড়দের বর্ণনা। এ শ্রেণির মধ্যে রয়েছে পুত্র থেকে পিতার, তাবেয়ী থেকে সাহাবীর, শিষ্য থেকে শায়খের বর্ণনা ইত্যাদি। তবে এর উল্টোটি অনেক ব্যাপক। কেননা, সেটিই অধিক প্রচলিত ও সঠিক পদ্ধতি।

এসব জানার উপকারিতা হলো, এর ফলে রাবীদের স্তরসমূহ পার্থক্য করা যাবে এবং লোকদেরকে যথাস্থানে রাখা যাবে। খতীবে বাগদাদী (র.) 'পুত্র হতে পিতার বর্ণনা' বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং 'তাবেয়ী থেকে সাহাবীর বর্ণনা' বিষয়ে চমৎকার একটি পুস্তিকা লেখেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْاَكَابِرُ শব্দটি اَكْبَرُ -এর বহুবচন। এর অর্থ– বড়, বৃহত্তম। আর اَلْاَصَاغِرُ শব্দটি اَصْغَرُ -এর বহুবচন। এর অর্থ– ছোট, ক্ষুদ্রতম। সুতরাং رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ -এর অর্থ হচ্ছে– বড় ব্যক্তির ছোট ব্যক্তি হতে রেওয়ায়েত করা।

رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ -এর পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

هِىَ رِوَايَةُ الشَّخْصِ عَمَّنْ دُوْنَهُ فِى السِّنِّ اَوْ فِى الْعِلْمِ اَوْ فِى الْحِفْظِ ـ

অর্থাৎ কোনো রাবীর তার চেয়ে বয়সে কিংবা ইলমে কিংবা হাদীস মুখস্থের দিক থেকে নিম্নের কারো সূত্রে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

رِوَايَةُ الْاَكَابِرِ عَنِ الْاَصَاغِرِ -এর প্রকারভেদ : এটা কয়েক প্রকার। যথা–

১. رَاوِىْ (রাবী) مَرْوِىْ عَنْهُ হতে বয়সে বড় হবে এবং মর্যাদায় উচ্চ হবে। যেমন – ইবনে শিহাব যুহরী এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-এর রেওয়ায়েত ইমাম মালিক (র.) থেকে।

২. শুধু মর্যাদাগত তথা মুখস্থ ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে বড় হবে। যেমন– ইমাম মালিক (র.) -এর রেওয়ায়েত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে এবং ইমাম আহমদ ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত ইবনে মূসা থেকে।

৩. উভয় দিক দিয়ে বড় হবে। যেমন– উবাদালাহ -এর রেওয়ায়েত হযরত কা'ব (রা.) হতে।

এ ছাড়া رِوَايَةُ الْاٰبَاءِ عَنِ الْاَبْنَاءِ তথা পিতা কর্তৃক পুত্র হতে রেওয়ায়েত, رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِيْنَ তথা সাহাবী কর্তৃক তাবেয়ী হতে রেওয়ায়েত, رِوَايَةُ التَّابِعِيْنَ عَنِ الْاَتْبَاعِ তথা তাবেয়ী কর্তৃক তাবয়ে-তাবেয়ীন হতে রিওয়ায়েত, رِوَايَةُ الشَّيْخِ عَنِ التِّلْمِيْذِ তথা ওস্তাদ কর্তৃক

وَمِنْهُ مَنْ رَوٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ وَجَمَعَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّيْنِ الْعَلَائِيُّ مِنَ الْمُتَاخِرِيْنَ مُجَلَّدًا كَبِيْرًا فِىْ مَعْرِفَةِ مَنْ رَوٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَقَسَّمَهُ اَقْسَامًا فَمِنْهُ مَا يَعُوْدُ الضَّمِيْرُ فِىْ قَوْلِهٖ عَنْ جَدِّهٖ عَلَى الرَّاوِىْ وَمِنْهُ مَا يَعُوْدُ الضَّمِيْرُ فِيْهِ عَلٰى اَبِيْهِ وَبَيَّنَ ذٰلِكَ وَحَقَّقَهُ وَخَرَّجَ فِىْ كُلِّ تَرْجَمَةٍ حَدِيْثًا مِنْ مَرْوِيْهِ وَقَدْ لَخَّصْتُ كِتَابَهُ الْمَذْكُوْرَ وَ زِدْتُ عَلَيْهِ تَرَاجِمَ كَثِيْرَةً جِدًّا وَاَكْثَرُ مَا وَقَعَ فِيْهِ مَا تَسَلْسَلَتْ فِيْهِ الرِّوَايَةُ عَنِ الْاٰبَاءِ بِاَرْبَعَةَ عَشَرَ اَبًا ـ

অনুবাদ : আরেকটি ধরন হলো– যিনি পিতা থেকে, পিতা দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালের মনীষীদের মধ্যে হাফিজ সালাহুদ্দীন আলায়ী বিরাট এক গ্রন্থ রচনা করেছেন যাতে তিনি যারা নিজ পিতা থেকে, পিতা দাদা থেকে এরূপে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের নাম সংকলন করেছেন। তিনি আবার তাদের শ্রেণিবিভাগও করেছেন। এক প্রকার হলো, যেখানে দাদা বলতে বুঝায় প্রথম রাবীর দাদা। আরেক প্রকার হলো, যেখানে দাদা বলতে পিতার দাদা উদ্দেশ্য। তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন, প্রমাণিত করেছেন এবং প্রত্যেক নামের সাথে তার বর্ণিত একটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন। আমি (ইবনে হাজার) উক্ত কিতাবটির সারসংক্ষেপ করেছি এবং তাতে আরো অনেক নাম সংযুক্ত করেছি। পিতৃপুরুষদের থেকে ধারাবাহিক বর্ণনার সর্বোচ্চ সংখ্যা যা পাওয়া গেছে তা হলো, চৌদ্দজন পিতার ক্রমধারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رِوَايَةُ الْاَصَاغِرِ عَنِ الْاَكَابِرِ-এর অর্থ : এর শাব্দিক অর্থ– বড়দের থেকে ছোটদের হাদীস রেওয়ায়েত করা। পরিভাষায় رِوَايَةُ الْاَصَاغِرِ عَنِ الْاَكَابِرِ হলো–

هِىَ رِوَايَةُ الشَّيْخِ عَمَّنْ فَوْقَهُ فِى السِّنِّ اَوْ فِى الْعِلْمِ اَوِ الْحِفْظِ

অর্থাৎ কোনো রাবীর তার চেয়ে ইলমে, বয়সে এবং হাদীস মুখস্থের দিক থেকে বড় কারো থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

হাদীস রেওয়ায়েতের এটাই সাধারণ নিয়ম। কেননা, সাধারণত ছোট বড় হতে রেওয়ায়েত করে থাকে।

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ – এটাও رِوَايَةُ الْاَصَاغِرِ عَنِ الْاَكَابِرِ-এর অন্তর্গত। এটা আবার দু প্রকার। যথা–

১. যার মধ্যে جَدِّهٖ -এর ضَمِيْر (সর্বনাম) রাবীর দিকে ফেরে। যেমন–

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

২. যার মধ্যে جَدِّهٖ -এর ضَمِيْر (সর্বনাম) রাবীর পিতার দিকে ফেরে। যেমন–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

ধারাবাহিকভাবে পিতৃপুরুষদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এমন সনদে পূর্বপুরুষদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৪ জন পাওয়া যায়।

وَإِنِ اشْتَرَكَ اِثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ اَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخَرِ فَهُوَ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ وَاَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ مَا بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ فِيْهِ فِي الْوَفَاةِ مِائَةٌ وَّخَمْسُوْنَ سَنَةً وَ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَافِظَ السِّلَفِيَّ سَمِعَ مِنْهُ اَبُوْ عَلِي الْبَرْدَانِيُّ اَحَدُ مَشَائِخِهِ حَدِيْثًا وَ رَوَاهُ عَنْهُ وَمَاتَ عَلَى رَاْسِ خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ كَانَ اٰخِرُ اَصْحَابِ السِّلَفِيِّ بِالسَّمَاعِ سِبْطُهُ اَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اِبْنُ مَكِّيٍّ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ وَمِنْ قَدِيْمِ ذٰلِكَ اَنَّ الْبُخَارِيَّ حَدَّثَ عَنْ تِلْمِيْذِهِ اَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ اَشْيَاءً فِي التَّارِيْخِ وَغَيْرِهِ وَمَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَّخَمْسِيْنَ وَمِأَتَيْنِ وَاٰخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ السَّرَّاجِ بِالسَّمَاعِ اَبُو الْحُسَيْنِ الْخَفَّافُ وَمَاتَ سَنَةَ ثَلٰثٍ وَّتِسْعِيْنَ وَثَلٰثِمِائَةٍ وَغَالِبُ مَا يَقَعُ مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْمَسْمُوْعَ مِنْهُ قَدْ يَتَاَخَّرُ بَعْدَ مَوْتِ اَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ عَنْهُ زَمَانًا حَتّٰى يَسْمَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْاَحْدَاثِ وَيَعِيْشُ بَعْدَ السَّمَاعِ مِنْهُ دَهْرًا طَوِيْلًا فَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوْعِ ذٰلِكَ نَحْوُ هٰذِهِ الْمُدَّةِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ ـ

অনুবাদ : দুজন রাবী যদি একজন শায়খ থেকে হাদীস সংগ্রহের দিক দিয়ে শরিক থাকেন এবং তাদের একজনের মৃত্যু অপরজনের চেয়ে পূর্বে হয়, তাহলে যিনি পূর্বে ইন্তেকাল করেন তাকে 'সাবিক' এবং পরে ইন্তেকালকারীকে 'লাহিক' বলা হয়। দুজন রাবীর মৃত্যুর মাঝখানে সর্বোচ্চ যে ব্যবধান জানা যায়, তা হলো দেড়শো বছর। হাফিজ সিলাফী (র.) থেকে তাঁরই অন্যতম শায়খ আবূ আলী বারদানী একটি হাদীস শুনেছিলেন এবং তার বরাত দিয়ে সেটি বর্ণনা করতেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ৫০০ হিজরিতে। অতঃপর হাফিজ সিলাফীর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন তার পৌত্র আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে মাক্কী। তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৫০ হিজরিতে।

এর পূর্বেরও একটি ঘটনা রয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর ছাত্র আবুল আব্বাস সারবাজ থেকে ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কিছুই বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র.) ইন্তেকাল করেছেন ২৫৬ হিজরিতে। এদিকে আবুল আব্বাস সাররাজ-এর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন আবুল হুসাইন খাফফাফ। তিনি ইন্তেকাল করেছেন ৩৯৩ হিজরিতে। সুতরাং দুজনের মধ্যে ব্যবধান হয়েছে ১৩৭ বছরের। এটি এ কারণে হয়ে থাকে যে, অনেক সময় শায়খ তার ছাত্রদের কারো ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। তখন শেষকালে হয়তো তার নিকট কোনো অল্পবয়সী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন এবং তার নিকট হাদীস শোনার পর দীর্ঘকাল জীবনযাপন করেন। ফলে সব মিলিয়ে এরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلسَّابِقُ ও اَللَّاحِقُ -এর আভিধানিক অর্থ : উভয় শব্দ اِسْم فَاعِل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ। اَلسَّابِقُ -এর অর্থ– সাবেক, পূর্ববর্তী, অগ্রবর্তী, বিজয়ী। আর اَللَّاحِقُ -এর অর্থ– যুক্ত, মিলিত, সম্পৃক্ত, পরবর্তী ইত্যাদি।

اَلسَّابِقُ ও اَللَّاحِقُ -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ اَنْ يُّشْرِكَ رَاوِيَانِ مُتَقَدِّمٌ وَّمُتَاَخِّرٌ مَوْتًا فِى الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّبَاعُدِ بَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا .

অর্থাৎ দুজন রাবী যদি একজন শায়খ থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং তাদের একজনের মৃত্যু অপরজনের পূর্বে হয়, তাহলে যিনি পূর্বে ইন্তেকাল করেন তাকে اَلسَّابِقُ এবং যিনি পরে ইন্তেকাল করেন তাকে اَللَّاحِقُ বলা হয়।

اَلسَّابِقُ ও اَللَّاحِقُ -এর উদাহরণ : এর তিনটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. হাফিজ সিলাফী (র.) থেকে তাঁর শায়খ আবূ আলী বারদানী (র.) একটি হাদীস শুনেন এবং তাঁর সূত্রে তা রেওয়ায়েত করেন। তিনি [হাফিজ সিলাফী] ইন্তেকাল করেন ৫০০ হিজরিতে। হাফিজ সিলাফীর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন তাঁর পৌত্র আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে মাক্কী। তিনি ইন্তেকাল করেন ৬৫০ হিজরিতে। এখানে দুজনের ইন্তেকালের মাঝে ব্যবধান হলো ১৫০ বছর। আর এটাই হলো সর্বোচ্চ মেয়াদ।

২. আবুল আব্বাস আস সারবাজ (র.) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর ওস্তাদ। ইমাম বুখারী (র.) ও আবূ হুসাইন খাফফাফ (র.) উভয়ে তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তাদের দুজনের মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান প্রায় ১৪০ বছর। কারণ, ইমাম বুখারী (র.) ইন্তেকাল করেছেন ২৫৬ হিজরিতে আর আবুল হুসাইন খাফফাফ (র.) ইন্তেকাল করেন ৩৯৩ হিজরিতে।

৩. ইমাম মালিক (র.) থেকে ইমাম যুহরী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম যুহরী ইন্তেকাল করেন ১২৪ হিজরিতে। ইমাম মালিকের আরেকজন ছাত্র ইসমাঈল আসসাহমী ইন্তেকাল করেন ২৫৯ হিজরিতে। উভয়ের মাঝে ব্যবধান ১৩৫ বছর।

দীর্ঘকাল ব্যবধানের কারণ : اَلسَّابِقُ ও اَللَّاحِقُ -এর ইন্তেকালের মাঝে এ দীর্ঘকাল ব্যবধানের কারণ হলো, অনেক সময় শায়খ তার ছাত্রদের ইন্তেকালের পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকেন। আর তাঁর শেষ জীবনে অল্পবয়স্ক ছাত্ররা তাঁর থেকে হাদীস আহরণ করেন এবং তাঁদের কারো কারো মৃত্যু হয় দীর্ঘ ব্যবধানে।

اَلسَّابِقُ ও اَللَّاحِقُ জানার উপকারিতা : এর উপকারিতা তিনটি। যথা–

১. এর মাধ্যমে لَاحِقٌ -এর সনদ হতে রাবীর পতনের ধারণা দূরীভূত হয়।

২. لَاحِقٌ থেকে উচ্চ সনদ লাভ করা যায়। কারণ, سَابِقٌ থেকে রেওয়ায়েতে যে মাধ্যম হয়, তা لَاحِقٌ থেকে রেওয়ায়েতে কম হয়ে যায়।

৩. এতে তাদলীসের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

কয়েকটি নামের বিশ্লেষণ : তিনটি নামের বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হলো–

১. **اَلسِّلَفِىُّ :** এ শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আস-সিলাফী। সীন বর্ণে যের, লাম বর্ণে যবর এবং ফা বর্ণে যের যোগে। এটি একটি اِسْم مَنْسُوْب। এটি এসেছে عِنَبٌ -এর ওযনে। سِلَفٌ হলো হাফিজ আবূ তাহির সিলাফীর দাদার নাম।

২. **اَلْبَرْدَانِىُّ :** এ শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ আল-বারদানী। 'বা' বর্ণে যবর, 'রা' বর্ণে সাকিন, দাল বর্ণে যবর এবং নূন বর্ণে যের যোগে। হাফিজ সিলাফী এবং আবূ আলী বারদানী একে অপরের ছাত্র এবং শিক্ষকও বটে।

৩. **اَلْخَفَّافُ :** শব্দটির সঠিক উচ্চারণ আল-খাফফাফ। 'হাম্মাদ' -এর ওযনে। 'খ' বর্ণে যবর যোগে। তিনি মোজা তৈরি করতেন অথবা মোজার ব্যবসা করতেন বলে তাঁকে خَفَّافٌ তথা মোজাওয়ালা বলা হয়।

وَاِنْ رَوَى الرَّاوِىْ عَنْ اِثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الْاِسْمِ اَوْ مَعَ اِسْمِ الْاَبِ اَوْ مَعَ اِسْمِ الْجَدِّ اَوْ مَعَ النِّسْبَةِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا فَاِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ لَمْ يُضِرَّ وَمِنْ ذٰلِكَ مَا وَقَعَ فِى الْبُخَارِيِّ فِىْ رِوَايَتِهِ عَنْ اَحْمَدَ غَيْرَ مَنْسُوْبٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ فَاِنَّهُ اِمَّا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَوْ اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى اَوْ عَنْ مُحَمَّدٍ غَيْرَ مَنْسُوْبٍ عَنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاِنَّهُ اِمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ اَوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىْ وَقَدْ اِسْتَوْعَبْتُ ذٰلِكَ فِىْ مُقَدَّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَمَنْ اَرَادَ لِذٰلِكَ ضَابِطًا كُلِّيًّا يَمْتَازُ بِهٖ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ فَبِاخْتِصَاصِهٖ اَيِ الرَّاوِىْ بِاَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ وَمَتٰى لَمْ يَتَبَيَّنْ ذٰلِكَ اَوْ كَانَ مُخْتَصًّا بِهِمَا مَعًا فَاِشْكَالُهٗ شَدِيْدٌ فَيُرْجَعُ فِيْهِ اِلَى الْقَرَائِنِ وَالظَّنِّ الْغَالِبِ.

অনুবাদ : কোনো রাবী যদি এমন দুজন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাদের উভয়ের নাম সমান, অথবা পিতার নামও সমান, অথবা দাদার নামও সমান, অথবা বংশ পরিচয়ও সমান এবং একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করার কোনো আলামত উল্লেখ না থাকে– যদি দুজনই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হন, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে রয়েছে– আহমাদ (বংশ পরিচয় উল্লেখ নেই) বর্ণনা করেন ইবনে ওয়াহাব থেকে। এখানে আহমাদ ইবনে সালিহ হবেন অথবা আহমাদ ইবনে ঈসা হবেন। আরেক স্থানে রয়েছে মুহাম্মদ (বংশ পরিচয় উল্লেখ নেই) বর্ণনা করেন ইরাকবাসীদের থেকে। এখানে হয়তো মুহাম্মদ ইবনে সালাম উদ্দেশ্য হবেন নইলে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহালী। আমি বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর ভূমিকায় এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। যদি কেউ এরূপ দুজনের মধ্যে পার্থক্য করতে চান, তাহলে এমন একটি বৈশিষ্ট্য বিচারে তা করতে হবে যা দুজনের মধ্যে যে কোনো একজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে কে উদ্দেশ্য আর কে নন তা সুস্পষ্ট হবে। যদি এরূপ না করা যায়; বরং উক্ত বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে জটিলতা খুব বেশি হবে। তখন অন্য কোনো আলামত কিংবা প্রবলতার ধারণার উপর নির্ভর করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُهْمَلُ-এর সংজ্ঞা : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْمُهْمَلُ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

اَنْ يَرْوِىَ الرَّاوِىْ عَنْ شَيْخَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِى الْاِسْمِ اَوْ فِى الْاِسْمِ وَاِسْمِ الْاَبِ اَوْ فِى الْاِسْمِ وَاِسْمِ الْاَبِ وَالْجَدِّ مَعَ النِّسْبَةِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا بِمَا يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

অর্থাৎ রাবী সনদ বর্ণনার সময় তার যে শায়খের নাম উল্লেখ করেন ঐ নামে তার আরেকজন শায়খ আছে, তবে উভয়ের পিতার নাম ভিন্ন অথবা উভয়ের পিতার নামও এক অথবা পিতার নামের সাথে সাথে দাদার নামও এক অথবা নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, বংশ পরিচয় ও নিসবত সব এক। আর

এখানে কোন জন রাবী, বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করেননি। ফলে প্রকৃত শায়খকে চিহ্নিত করতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যে শায়খের ব্যাপারে সন্দেহ লাগে, তাকে اَلْمُهْمَلُ বলে।

اَلْمُهْمَلُ জানার ফায়দা : এ প্রকার সম্পর্কে ধারণা থাকলে একই নামের দুজনের মধ্যে কে উদ্দেশ্য তা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়।

اَلْمُهْمَلُ -এর হুকুম : مُهْمَلْ রেওয়ায়েতের উভয় শায়খ যদি নির্ভরযোগ্য হন, তবে হাদীস গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন– সহীহ বুখারীতে এক স্থানে এভাবে ইমাম বুখারী (র.) সনদ বর্ণনা করেছেন যে : عَنْ اَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

আহমাদ নামে তাঁর দুজন শায়খ আছেন। **এক.** আহমাদ ইবনে সালিহ **দুই.** আহমাদ ইবনে ঈসা। আর দুজনই নির্ভরযোগ্য। এখানে এ উদাহরণে আহমাদ হলেন مُهْمَلْ ।

আর যদি একজন নির্ভরযোগ্য হন এবং অন্যজন দুর্বল হন, তাহলে রেওয়ায়েতে কে উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে হবে। দুর্বল প্রতিপন্ন হলে মাকবূল হবে না, আর নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হলো হাদীস মাকবূল হবে। যেমন–

১. সুলাইমান ইবনে দাউদ (খাওলানী)।

২. সুলাইমান ইবনে দাউদ (ইয়ামানী)।

এদের প্রথমজন নির্ভরযোগ্য আর দ্বিতীয়জন দুর্বল।

রাবী নির্ণয়ের পদ্ধতি : এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, মুহাদ্দিসের যে রাবীর সাথে দীর্ঘ সংশ্রব, একই দেশীয় ইত্যাদি সম্পর্ক থাকবে, তার রেওয়ায়েত মনে করতে হবে। আর যদি এমন বিশেষ সম্পর্ক না থাকে অথবা থাকলেও সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দুজনই সমান হয়, তখন বিভিন্ন আলামত এবং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

اَلْمُهْمَلُ এবং اَلْمُبْهَمُ -এর মধ্যে পার্থক্য : مُهْمَلْ -এর মধ্যে রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়; যদিও তা নির্ণয়ে সন্দেহ থাকে। পক্ষান্তরে مُبْهَمْ -এর মধ্যে রাবীর নামই উল্লেখ করা হয় না।

وَإِنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ حَدِيْثًا وَجَحَدَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ فَإِنْ كَانَ جَزْمًا كَانَ يَقُوْلَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ مَا رَوَيْتُ لَهُ هٰذَا وَنَحْوُ ذٰلِكَ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذٰلِكَ رُدَّ ذٰلِكَ الْخَبَرُ لِكِذْبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَادِحًا فِيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ أَوْ كَانَ جَحْدُهُ إِحْتِمَالًا كَانَ يَقُوْلَ مَا أَذْكُرُ هٰذَا أَوْ لَا أَعْرِفُهُ قُبِلَ ذٰلِكَ الْحَدِيْثُ فِى الْأَصَحِّ لِأَنَّ ذٰلِكَ يَحْتَمِلُ عَلٰى نِسْيَانِ الشَّيْخِ وَقِيْلَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ الْفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ فِيْ إِثْبَاتِ الْحَدِيْثِ بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الْأَصْلُ الْحَدِيْثَ تَثْبُتُ رِوَايَةُ الْفَرْعِ وَكَذٰلِكَ يَنْبَغِىْ أَنْ يَكُوْنَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبْعًا لَهُ فِى التَّحْقِيْقِ وَهٰذَا مُتَعَقَّبٌ بِأَنَّ عَدَالَةَ الْفَرْعِ يَقْتَضِىْ صِدْقَهُ وَعَدَمَ عِلْمِ الْأَصْلِ لَا يُنَافِيْهِ فَالْمُثْبَتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِىْ وَأَمَّا قِيَاسُ ذٰلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلٰى شَهَادَةِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فَافْتَرَقَا وَفِيْهِ أَيْ وَفِىْ هٰذَا النَّوْعِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِىْ كِتَابَ مَنْ حَدَّثَ وَنَسِىَ وَفِيْهِ مَا يَدُلُّ عَلٰى تَقْوِيَةِ الْمَذْهَبِ الصَّحِيْحِ لِكَوْنِ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ حَدَّثُوْا بِأَحَادِيْثَ فَلَمَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوْهَا لٰكِنَّهُمْ لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ صَارُوْا يَرْوُوْنَهَا عَنِ الَّذِيْنَ رَوَوْهَا عَنْهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ كَحَدِيْثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا فِىْ قِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَاوَرْدِىْ حَدَّثَنِىْ بِهٖ رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ فَلَقِيْتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ عَنْكَ بِكَذَا فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ رَبِيْعَةُ عَنِّىْ أَنِّىْ حَدَّثْتُهُ عَنْ أَبِىْ بِهٖ وَنَظَائِرُهُ كَثِيْرَةٌ.

অনুবাদ : একজন শায়খের বরাত দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করা হলো; কিন্তু শায়খ তার বর্ণনাকে অস্বীকার করলেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি খুব জোরালো ভাষায় অস্বীকার করেন, যেমন– তিনি বললেন, সে আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে, অথবা আমি তার কাছে এরূপ বর্ণনা করিনি, ইত্যাদি তাহলে উক্ত হাদীস পরিত্যাজ্য হবে। কেননা, শায়খ ও তার ছাত্রের মধ্য থেকে কেউ একজন অবশ্যই মিথ্যাচার করেছেন। অবশ্য কে করলেন তা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। তাই এ বৈপরীত্যের কারণে তাদের কারো নির্ভরযোগ্যতাই খর্ব হবে না। আর যদি তার অস্বীকার হয় সন্দেহমূলক, যেমন তিনি বললেন–

আমার স্মরণ নেই বা আমি জানি না, তাহলে অধিক বিশুদ্ধমত হলো, উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। মনে করতে হবে যে, শায়খ ভুলে গেছেন।

অনেকে বলেন, এ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, হাদীসটি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে শাখা অনুসরণ করে মূলের। মূল ব্যক্তি অর্থাৎ শায়খ যদি হাদীসটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহলেই তার শাখা বা ছাত্রের হাদীসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এ যুক্তির জবাবে বলা যায়, ছাত্র যেহেতু আদিল, সুতরাং এর দাবি হলো তিনি সত্য বলছেন। শায়খের না জানা এ বক্তব্যের বিপরীত নয়। কেননা, না-বাচকের চেয়ে হ্যাঁ-বাচকটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। যদি এটিকে সাক্ষ্য প্রদান/গ্রহণের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে তা সঠিক হবে না। কেননা, মূল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম থাকতে অধস্তন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে এরূপ নয়, তাই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম দারাকুতনী (র.) একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম 'মান হাদ্দাছা ওয়া নাসিয়া'। এতে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যা দ্বারা সঠিক মতটির পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। কেননা, তাদের মধ্যে অনেকেই বেশি কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তাদের নিকট সেগুলো পেশ করা হলে তারা তা স্মরণ করতে পারেননি। কিন্তু তাদের ছাত্রদের উপর আস্থাশীলতার কারণে ছাত্রদেরই বরাত দিয়ে নিজ থেকে সেগুলো বর্ণনা করেছেন। যেমন– সুহাইল ইবনে আবূ সালিহ (র.), পিতা আবূ সালিহ হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন সাক্ষী ও শপথ সংক্রান্ত।

আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দারাওয়ারদী (র.) বলেন, হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে আবূ আব্দুর রহমান (র.) সুহাইল (র.) থেকে। পরে আমি সুহাইলের সাক্ষাৎ পেলাম এবং হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জানেন না। আমি বললাম, রাবীয়া তো আপনার বরাত দিয়ে আমার নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে সুহাইল বলতেন, রাবীয়া আমার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাকি তার নিকট আমার পিতা থেকে এটি বর্ণনা করেছি। এরূপ অনেক উদাহরণ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভুলে যাওয়া মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। অনেক সময় মানুষ কারো কাছে কোনো কথা বলে। পরে কেউ তাকে স্মরণ করালে– তিনি এ ধরনের কোনো কথা বলেছিলেন কিনা মনে করতে পারেন না।

مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ -এর অর্থ : এর অর্থ হলো যিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন এবং (ঐ রেওয়ায়েতের কথা) ভুলে গেছেন।

উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ হলো– اَنْ يُنْكِرَ الشَّيْخُ رِوَايَةَ مَا حَدَّثَ بِهٖ تِلْمِيْذُهٗ عَنْهُ অর্থাৎ শায়খ তার বরাত দিয়ে বর্ণিত স্বীয় ছাত্রের হাদীসকে তিনি বর্ণনা করেছেন বলে স্বীকার না করা।

مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ -এর হুকুম : শায়খ যদি দৃঢ়তার সাথে এবং নিশ্চিতভাবে তার রেওয়ায়েত করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন, যেমন– তিনি বলেন, আমি এ হাদীস রেওয়ায়েত করিনি অথবা সে আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে ইত্যাদি, তাহলে উক্ত হাদীস মারদূদ হবে। কেননা, এখানে দুজনের একজন অনির্দিষ্টভাবে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীর হাদীস মারদূদ হয়, মাকবূল হয় না।

তবে এতে রাবী ও শায়খ কারো عَدَالَتْ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিংবা তাদের অন্য রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যাত হবে না। কেননা, দুজনের প্রত্যেকেই একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আর কোনো একজনকে প্রাধান্য দেবারও উপায় নেই, তাই فَاِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا এ নীতি অনুসারে উভয় মিথ্যারোপ পরিত্যক্ত হয়ে উভয়ে عَادِلْ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

আর যদি শায়খ প্রত্যাখ্যান করেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের সাথে। যেমন বলেন, আমার স্মরণ নেই বা **আমি** তা জানি না ইত্যাদি, তাহলে এমন হাদীসের হুকুম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আর তা হলো–

১. জুমহুরের অভিমত : জুমহুর মুহাদ্দিস, জুমহুর ফুকাহা, জুমহুর মুতাকাল্লিম– প্রমুখের অভিমত হলো, এমতাবস্থায় হাদীস মাকবূল হবে। কেননা, রাবী শায়খ হতে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করছে আর শায়খের অস্বীকার হলো সন্দেহপূর্ণ। তাই মনে করতে হবে যে, শায়খ ভুলে গেছেন। কারণ, নিয়ম আছে– اَلْمُثْبِتُ الْجَازِمُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِى الْمُتَرَدِّدِ

অর্থাৎ দৃঢ় ইতিবাচকটা দ্বিধান্বিত নেতিবাচকের উপর অগ্রগামী হয়।

২. কতিপয় আহনাফের অভিমত : তাদের মতে এমতাবস্থায়ও হাদীস মাকবূল হবে না। কারণ, হাদীস বর্ণনায় আসল হলো শায়খ আর রাবী হলো শাখা। শাখা সব সময় আসলের অনুগামী হয়। সুতরাং যখন আসল অর্থাৎ শায়খ হাদীস অস্বীকার করেছেন তখন শাখা তথা রাবী হতে কিভাবে হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে? সুতরাং এটা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্যের মতো হয়ে গেল। সুতরাং যেরূপভাবে আসল (প্রকৃত) সাক্ষী অস্বীকার করলে শাখা (সাক্ষীর সাক্ষী) -এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনিভাবে শায়খের অস্বীকারের দরুন ছাত্রের হাদীসও মাকবূল হবে না।

সঠিক অভিমত ও তার দলিল : উপরিউক্ত দু অভিমতের মধ্যে সর্বাধিক সঠিক হলো জুমহুরের অভিমত। কারণ, রাবী দৃঢ়তার উপর আছে আর শায়খ সন্দেহের উপর। আর নীতি হলো– وَالْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ অর্থাৎ 'নিশ্চিত বিষয়টা সন্দেহের দ্বারা বাতিল হয় না।' অনুরূপভাবে নীতি আছে– اَلْمُحَقَّقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَظْنُوْنِ.

অর্থাৎ সাব্যস্তকৃত বিষয়টি অগ্রগামী হয় ধারণাকৃত বিষয়ের উপর।

কতিপয় আহনাফের কিয়াসের জবাব : কতিপয় আহনাফ তাদের দাবির স্বপক্ষে شَهَادَت عَلَى الشَّهَادَت -এর উপর কিয়াস করেছিলেন। তাদের কিয়াসের জবাবে বলা হয় যে, তাদের এই কিয়াস করাটা অযৌক্তিক এবং ভুল। আর তার কারণ কয়েকটি। যথা–

১. মূল সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না; কিন্তু রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে শায়খ সমর্থ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রের রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হয়।

২. সাক্ষ্য স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া দিতে পারবে না; পক্ষান্তরে গোলামও হাদীস রেওয়ায়েত করতে পারে।

৩. সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান; পক্ষান্তরে হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা বরাবর।

৪. দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া সাক্ষ্য গৃহীত হয় না; কিন্তু এক ব্যক্তির রেওয়ায়েতও গৃহীত হয়।

যেহেতু কমপক্ষে উল্লিখিত চার দৃষ্টিকোণ থেকে রেওয়ায়েতে হাদীস শাহাদাতের চেয়ে ভিন্ন ও ব্যতিক্রম, তাই রেওয়ায়েতে হাদীসকে শাহাদাতের উপর কিয়াস করা অনুচিত এবং ভুল।

مَنْ حَدَّثَ وَنَسِىَ -এর উদাহরণ : আবূ দাঊদ এবং তিরমিযী শরীফে سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ সূত্রে সাক্ষ্য ও কসম সংক্রান্ত ঘটনায় একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম এবং এক সাক্ষীর মাধ্যমে ফয়সালা করেছেন।

এ হাদীসটি مَنْ حَدَّثَ وَنَسِىَ -এর উদাহরণ হওয়ার কারণ হলো, এ হাদীসটি রবীয়া ইবনে আব্দুর রহমান সুহাইল থেকে রেওয়ায়েত করেন। কিন্তু আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ সুহাইলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে 'তিনি জানেন না' বলে জবাব দেন।

وَاِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِى اِسْنَادٍ مِنَ الْاَسَانِيْدِ فِى صِيَغِ الْاَدَاءِ كَسَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا اَوْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الصِّيَغِ اَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحَالَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَسَمِعْتُ فُلَانًا يَقُوْلُ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ اِلٰى اٰخِرِهٖ اَوِ الْفِعْلِيَّةِ كَقَوْلِهٖ دَخَلْنَا عَلٰى فُلَانٍ فَاَطْعَمَنَا تَمْرًا اِلٰى اٰخِرِهٖ اَوِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ مَعًا كَقَوْلِهٖ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ وَهُوَ اٰخِذٌ بِلِحْيَتِهٖ قَالَ اٰمَنْتُ بِالْقَدْرِ اِلٰى اٰخِرِهٖ فَهُوَ الْمُسَلْسَلُ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْاِسْنَادِ وَقَدْ يَقَعُ التَّسَلْسُلُ فِىْ مُعْظَمِ الْاِسْنَادِ كَحَدِيْثِ الْمُسَلْسَلِ بِالْاَوَّلِيَّةِ فَاِنَّ السِّلْسِلَةَ يَنْتَهِىْ فِيْهِ اِلٰى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَطْ وَمَنْ رَوَاهُ مُسَلْسَلًا اِلٰى مُنْتَهَاهُ فَقَدْ وَهِمَ ـ

অনুবাদ : রাবীগণ যদি কোনো একটি সনদে হাদীস বর্ণনার সময়ে ভাষাগত দিক দিয়ে ঐক্য বজায় রাখেন, যেমন– প্রত্যেকেই বললেন, সামি'তু বা হাদ্দাছানা কিংবা অন্য কোনো শব্দ সকলেই ব্যবহার করলেন অথবা ঐক্য বজায় রাখেন অন্যদিক দিয়ে অর্থাৎ উক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে, যেমন– প্রত্যেকেই বললেন, আমি অমুককে বলতে শুনেছি– আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি– অমুকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন..... এভাবে শেষ পর্যন্ত; কিংবা কর্মগত দিক দিয়ে, যেমন– প্রত্যেকেই বললেন, আমরা অমুকের নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাদেরকে খেজুর খাওয়ালেন .... এভাবে শেষ পর্যন্ত, কিংবা উক্তি ও কর্ম উভয় অবস্থার দিক দিয়ে, যেমন– প্রত্যেকেই বললেন, অমুকে নিজ দাড়ি ধরে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম .... এভাবে শেষ পর্যন্ত– তাহলে তার নাম মুসালসাল (ধারাবাহিক)।

এটি মূলত সনদের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় এই ধারাবাহিকতা সংঘটিত হয় সনদের বৃহত্তর অংশে (পুরো অংশে নয়)। যেমন– হাদীসে মুসালসাল বিল আওওয়ালিয়্যা বা শায়খের সাথে ছাত্রের প্রথম সাক্ষাতের সময় যে হাদীসটি শিক্ষা দেওয়ার রীতি রয়েছে। ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পর্যন্তই এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। যারা এটিকে শেষ পর্যন্ত মুসালসাল বলে বর্ণনা করেন তারা ভুল করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُسَلْسَلُ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْمُسَلْسَلُ শব্দটি بَاب فَعْلَلَة হতে اِسْم مَفْعُوْل-এর وَاحِد مُذَكَّر। এর অর্থ– ক্রমিক, ধারাবাহিক, পরম্পরাযুক্ত ইত্যাদি।

اَلْمُسَلْسَلُ-এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْمُسَلْسَلُ হলো–

هُوَ مَا اتَّفَقَ رُوَاتُهُ اَوْ بَعْضُهُمْ عَلٰى وَصْفٍ لِلرُّوَاةِ اَوِ الرِّوَايَةِ وَصِفَاتُ الرُّوَاةِ اَقْوَالُهُمْ وَاَفْعَالُهُمْ وَصِفَاتُ الرِّوَايَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِيَغِ الْاَدَاءِ اَوْ بِزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا ـ

অর্থাৎ কোনো একটি সনদের সকল রাবী যদি হাদীস বর্ণনার সময় একই শব্দ, একই উক্তি, অথবা কর্ম অথবা একই উক্তি ও কর্ম একসঙ্গে অথবা একই অবস্থার অবতারণা করেন, তাহলে তাকে বলে اَلْمُسَلْسَلُ।

এ সংজ্ঞাটিই সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, কোনো একটি সনদের রাবীগণ যদি হাদীস বর্ণনার সময় একই ভাষা কিংবা অবস্থার অবতারণা করেন, তাহলে তাকে বলে মুসালসাল।

اَلْمُسَلْسَلُ-এর কয়েকটি সুরত : اَلْمُسَلْسَلُ-এর সংজ্ঞা হতে জানা যায় যে, তার কয়েকটি **সুরত** হতে পারে। যথা–

১. হাদীস বর্ণনার শব্দ সকলের এক হওয়া। যেমন– সকলের حَدَّثَنَا ,سَمِعْتُ ,قَالَ , أَخْبَرَنَا ইত্যাদি বলা। যেমন– سَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا الخ

২. কোনো উক্তি (قَوْل) -এর উপর রাবীদের এক হওয়া। যেমন–

ক. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.) -কে বলেন,

إِنِّىْ أُحِبُّكَ فَقُلْ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি প্রতি নামাজের পরে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

হে আল্লাহ ! তোমার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তমরূপে ইবাদত করতে আমাকে সহযোগিতা করো।

এ হাদীস রেওয়ায়েত করতে প্রত্যেক রাবী তার ছাত্রকে إِنِّىْ أُحِبُّكَ তথা 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলেন।

খ. উদাহরণস্বরূপ এভাবে হাদীস বর্ণনা করা যে–

اَشْهَدُ بِاللّٰهِ سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُوْلُ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ يَقُوْلُ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ ... الخ

৩. কোনো আমলের ব্যাপারে এক হওয়া। যেমন–

ক. এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন–

شَبَّكَ بِيَدِىْ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাতের আঙ্গুলকে তাঁর আঙ্গুলের মধ্যে করেন এবং বলেন, আল্লাহ শনিবার দিন ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করেছেন।

এ হাদীস রেওয়ায়েত করতে প্রত্যেক রাবী তার ছাত্রের হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল পুরে বর্ণনা করেছেন।

খ. যেমন– دَخَلْنَا عَلٰى فُلَانٍ فَاَطْعَمَنَا تَمْرًا وَحَدَّثَنِىْ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى فُلَانٍ فَاَطْعَمَنَا تَمْرًا

অর্থাৎ আমি অমুকের কাছে গেলে তিনি আমাকে খেজুর আহার করিয়েছেন।

৪. কোনো উক্তি ও কর্ম উভয়ের উপর এক হওয়া। যেমন–

قَالَ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ وَهُوَ اَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ قَالَ اٰمَنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَحُلْوِهٖ وَمُرِّهٖ قَالَ حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ وَهُوَ اَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ قَالَ اٰمَنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَحُلْوِهٖ وَمُرِّهٖ ـ

৫. সকলের একই অবস্থা হওয়া। যেমন– مُسَلْسَلٌ بِتَحْرِيْكِ الشَّفَتَيْنِ

সহীহ বুখারীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে, নবুয়তের প্রাথমিক কালে ওহী অবতীর্ণের সময় কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -যে কসরৎ করতেন আর তাতে দু ঠোঁটের যে অবস্থা হতো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নিজের ঠোঁটে তা ছাত্রদেরকে দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে সকল রাবীই হাদীসটি রেওয়ায়েতকালে ঠোঁট নেড়ে ছাত্রদেরকে তা দেখাতেন। এটাই مُسَلْسَلٌ بِتَحْرِيْكِ الشَّفَتَيْنِ নামে পরিচিত।

مُسَلْسَل কিসের সিফাত ? مُسَلْسَل মূলত শুধু اِسْنَاد -এর সিফাত, হাদীসের সিফাত নয়। পক্ষান্তরে مَرْفُوْع ,مَوْقُوْف এবং مَقْطُوْع এগুলো মতনের সিফাত। আর صَحِيْح ,حَسَن -এগুলো হলো সনদ এবং মতন উভয়ের সিফাত। مُسَلْسَل যেহেতু শুধু সনদের সিফাত এ জন্য তাকে হাদীসে মুসালসাল না বলে ইসনাদে মুসালসাল বলা উচিত।

تَسَلْسُل কোথায় সংঘটিত হয় ? মুসালসালভাবে হাদীস রেওয়ায়েত করার নাম تَسَلْسُل । এই تَسَلْسُل মূলত পুরো সনদের মাঝে সংঘটিত হয়; কিন্তু কখনো সনদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেও সংঘটিত হয়। যেমন– মুসালসাল বিল আওওয়ালিয়াতের হাদীস। অর্থাৎ যে হাদীসে এটা উল্লেখ থাকে যে, শায়খ ছাত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাতে যে হাদীস বর্ণনা করেন।

مُسَلْسَل জানার ফায়দা : এটা জানায় ফায়দা হলো, এটা রাবীদের অধিক সংরক্ষণের কথা জানায়।

وَصِيَغُ الْاَدَاءِ الْمُشَارُ اِلَيْهَا عَلٰى ثَمَانِ مَرَاتِبَ اُوْلٰى سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِىْ ثُمَّ اَخْبَرَنِىْ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَهِىَ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَهِىَ الثَّالِثَةُ ثُمَّ اَنْبَأَنِىْ وَهِىَ الرَّابِعَةُ ثُمَّ نَاوَلَنِىْ وَهِىَ الْخَامِسَةُ ثُمَّ شَافَهَنِىْ اَىْ بِالْاِجَازَةِ وَهِىَ السَّادِسَةُ ثُمَّ كَتَبَ اِلَىَّ اَىْ بِالْاِجَازَةِ وَهِىَ السَّابِعَةُ ثُمَّ عَنْ وَنَحْوُهَا مِنَ الصِّيَغِ الْمُحْتَمَلَةِ لِلسَّمَاعِ وَالْاِجَازَةِ وَلِعَدَمِ السَّمَاعِ اَيْضًا وَهٰذَا مِثْلُ قَالَ وَ ذَكَرَ وَ رَوٰى فَاللَّفْظَانِ الْاَوَّلَانِ مِنْ صِيَغِ الْاَدَاءِ وَ هُمَا سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِىْ صَالِحَانِ لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهٗ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَتَخْصِيْصُ التَّحْدِيْثِ بِمَا سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ اِصْطِلَاحًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّحْدِيْثِ وَالْاِخْبَارِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ وَفِىْ اِدِّعَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا تَكَلُّفٌ شَدِيْدٌ لٰكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ فِى الْاِصْطِلَاحِ صَارَ ذٰلِكَ حَقِيْقَةً عُرْفِيَّةً فَقُدِّمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ اللُّغَوِيَّةِ مَعَ اَنَّ هٰذَا الْاِصْطِلَاحَ اِنَّمَا شَاعَ عِنْدَ الْمُشَارِقَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَاَمَّا غَالِبُ الْمُغَارِبَةِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلُوْا هٰذَا الْاِصْطِلَاحَ بَلِ الْاِخْبَارُ وَالتَّحْدِيْثُ عِنْدَهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَاِنْ جَمَعَ الرَّاوِىْ اَىْ اَتٰى بِصِيْغَةِ الْاُوْلٰى جَمْعًا كَانَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا فُلَانٌ اَوْ سَمِعْنَا فُلَانًا يَقُوْلُ فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهٗ سَمِعَ مَعَ غَيْرِهٖ وَقَدْ يَكُوْنُ النُّوْنُ لِلْعَظْمَةِ لٰكِنْ بِقِلَّةٍ وَاَوَّلُهَا اَىْ صِيَغُ الْمَرَاتِبِ اَصْرَحُهَا اَىْ اَصْرَحُ صِيَغِ الْاَدَاءِ فِىْ سَمَاعِ قَائِلِهَا لِاَنَّهَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَاسِطَةَ وَلِاَنَّ حَدَّثَنِىْ قَدْ يُطْلَقُ فِى الْاِجَازَةِ تَدْلِيْسًا وَاَرْفَعُهَا مِقْدَارًا مَا يَقَعُ فِى الْاِمْلَاءِ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّثَبُّتِ وَالتَّحَفُّظِ ـ

অনুবাদ : হাদীস বর্ণনার শব্দ (যার দিকে পূর্বে) ইশারা করা হয়েছে তা আট শ্রেণিতে বিভক্ত।

প্রথম : سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِىْ (আমি শুনেছি ও তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।)

দ্বিতীয় : اَخْبَرَنِىْ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (তিনি আমাকে জানিয়েছেন ও তার নিকট আমি পাঠ করেছি।)

তৃতীয় : قُرِئَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ (তার নিকট পাঠ করা হয়েছিল আর আমি শুনছিলাম।)

চতুর্থ : اَنْبَأَنِىْ (তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।)

পঞ্চম : نَاوَلَنِىْ (তিনি আমাকে দান করেছেন।)

ষষ্ঠ : شَافَهَنِىْ (তিনি আমার সামনেই অনুমতির কথা বলেছেন।)

সপ্তম : كَتَبَ اِلَىَّ (তিনি আমার নিকট অনুমতি লেখে পাঠিয়েছেন।)

অষ্টম : عَنْ (থেকে) অথবা এ জাতীয় কোনো শব্দ যাতে শোনা ও অনুমতি লাভ এবং না-শোনা উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। যেমন, ক্বা-লা, যুকিরা, রুবিয়া ইত্যাদি।

প্রথম শব্দ দুটি (সামি'তু ও হাদ্দাছানী) শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যিনি একাকী শায়খের শব্দ শুনেছেন। শায়খের শব্দ শোনার সাথে হাদ্দাছানা বা হাদ্দাছানী -এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ হবার বিষয়টি মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে একটি পরিভাষা হিসেবে প্রসিদ্ধ। অবশ্য আভিধানিকভাবে হাদ্দাছা ও আখবারা শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য দাবি করা নেহায়েত অহেতুক। কিন্তু পরিভাষায় এ পার্থক্যটি যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সুতরাং এটি হবে হাকীকতে উরফিয়্যা বা গোষ্ঠীগত প্রকৃত অর্থ। সে কারণে তাকে হাকীকতে লুগাবিয়্যা বা আভিধানিক প্রকৃত অর্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। তা ছাড়া এ পরিভাষাটি (পার্থক্য) শুধুমাত্র পূর্ব এলাকার মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। পশ্চিম এলাকার অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ পরিভাষা ব্যবহার করেন না। তাদের মতে হাদ্দাছা ও আখবারা একই অর্থবোধক।

রাবী যদি প্রথম স্তরের শব্দ দুটিকে বহুবচনে ব্যবহার করেন যেমন– তিনি বললেন, হাদ্দাছানা ফুলানুন বা সামি'না ফুলানান ইয়াকূলু– তাহলে প্রমাণিত হবে যে, তিনি হাদীসটি একাকী নয়; বরং অন্যের সাথে শুনেছেন। কখনো কখনো বহুবচন ব্যবহার করা হয় মর্যাদার কারণে, তবে তা খুব কম।

হাদীস বর্ণনার শব্দাবলির মধ্যে প্রথম স্তরের হলো 'সামি'তু' যা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। অর্থাৎ রাবী কথাটি বক্তার নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন– এ মর্মে সা'মিতু শব্দটি সবচেয়ে বেশি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। কেননা, এতে আর কোনো মাধ্যম থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

আর মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ হলো 'ইমলা'। কেননা, এতে শায়খের উচ্চারণ এবং রাবীর শোনা ও লেখার কথা প্রকাশ হয়। যার ফলে তাতে অধিক সংরক্ষণ ও আয়ত্তের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَدَاء -এর অর্থ হলো, শায়খ থেকে প্রাপ্ত হাদীস ছাত্রের কাছে বর্ণনা করা। যে সমস্ত শব্দযোগে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে اَلْفَاظ اَدَاء حَدِيْث বলে। এর অপর নাম صِيَغ اَدَاء বা হাদীস বর্ণনার শব্দ। হাদীস বর্ণনা করার শব্দ অনেক। সম্মানিত লেখক হাদীস বর্ণনার শব্দগুলোকে আট প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এই আট প্রকারকে তিনি প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ, ذَكَرَ, رَوٰى -এর ব্যবহার : এ শব্দত্রয়ের ব্যবহার দুভাবে হয়–

১. হয়তো এগুলোর সাথে لِىْ অথবা لَنَا যুক্ত হবে, যেমন বলা হবে قَالَ لَنَا ইত্যাদি, তখন তা حَدَّثَنَا -এর মতো মুত্তাসিল হবে।

২. এ শব্দগুলোর সাথে لِىْ বা لَنَا যুক্ত হবে না, যেমন শুধু বলা হবে قَالَ فُلَانٌ তখন এটা عَنْ -এর মতো মুত্তাসিল ও গায়রে মুত্তাসিল উভয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

تَحْدِيْث ও سَمَاع -এর ব্যবহার : سَمَاع ও تَحْدِيْث কখনো একবচন হিসেবে (যেমন– سَمِعْتُ ও حَدَّثَنِىْ) ব্যবহার হয় আবার কখনো বহুবচন হিসেবেও (যেমন سَمِعْنَا ও حَدَّثَنَا) ব্যবহার হয়।

একবচন ব্যবহার থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা–

ক. قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ অর্থাৎ শায়খ হাদীস পড়েছেন আর রাবী তা শুনেছেন।

খ. রাবী একা শায়খ থেকে শুনেছেন। শুনার সময় তার অন্য কোনো সাথি ছিল না।

বহুবচন ব্যবহার থেকেও দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা–

ক. قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ অর্থাৎ শায়খ হাদীস পড়েছেন আর রাবী তা **শুনেছেন।**

খ. রাবী একা শুনেননি; সাথিদের সাথে মিলে শুনেছেন।

অবশ্য একা শুনার ক্ষেত্রেও অনেক সময় سَمِعْنَا ও حَدَّثَنَا -এর ব্যবহার পাওয়া যায়, **তবে খুব কম।**

تَحْدِيْث এবং إِخْبَار -এর মধ্যে পার্থক্য : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) **বলেন, আভিধানিক** অর্থের দিক দিয়ে اَلتَّحْدِيْثُ ও اَلْاِخْبَارُ -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের **অর্থ খবর তথা** সংবাদ দেওয়া। তবে পরিভাষাগত কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে **কেরামের মাঝে** মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **পূর্ব এলাকার মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মুসলিম সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত হলো, পরিভাষায় تَحْدِيْث ও إِخْبَار -এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, تَحْدِيْث বুঝায় قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ -কে আর إِخْبَار বুঝায় قِرَاءَةُ التِّلْمِيْذِ عَلَى الشَّيْخِ -কে।

২. **পশ্চিম এলাকার মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত :** ইমাম বুখারী, ইমাম মালিক, ইমাম যুহরী, আহলে হিজায এবং আহলে কূফার অভিমত হলো, আভিধানিকের মতো পরিভাষাগতভাবেও تَحْدِيْث ও إِخْبَار -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়।

তবে যেহেতু অঞ্চলবিশেষে تَحْدِيْث ও إِخْبَار -এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে, তাই এখন পার্থক্য করাই ভালো। অর্থাৎ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ বুঝাতে تَحْدِيْث শব্দের ব্যবহার, পক্ষান্তরে قِرَاءَةُ التِّلْمِيْذِ عَلَى الشَّيْخِ বুঝাতে اخبار শব্দের ব্যবহার করতে হবে।

تَحْدِيْث -এর তুলনায় سَمَاع -এর মর্যাদা বেশি : تَحْدِيْث ও سَمَاع উভয়টি যদিও قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَى التِّلْمِيْذِ বুঝায়; কিন্তু سَمَاع (سَمِعْتُ – سَمِعْنَا) টা تَحْدِيْث (حَدَّثَنَا – حَدَّثَنِيْ) -এর চেয়ে দু কারণে বেশি মর্যাদা রাখে। যথা–

১. سَمَاع -এর মাঝে শায়খ থেকে সরাসরি ও স্বয়ং শোনার বিষয়টি বেশি স্পষ্ট। এতে মাঝখানে মধ্যস্থতার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

২. حَدَّثَنِيْ -এর ব্যবহার অনেক সময় এমন إِجَازَة -এর উপর হয় যাতে তাদলীস আছে। পক্ষান্তরে سَمَاع -এর ব্যবহার এ ধরনের إِجَازَة-এর উপর কখনই হয় না।

سَمَاعٌ عَنِ الشَّيْخِ -এর প্রকারভেদ : سَمَاعٌ عَنِ الشَّيْخِ তথা শায়খ থেকে হাদীস শোনাটা দু প্রকার। যথা–

১. سَمَاع -এর সাথে সাথে শায়খের اَلْفَاظ ছাত্রের লেখে নেওয়া। একে إِمْلَاء (ইমলা) বলে।

২. ছাত্র শায়খের শব্দ শুধু শোনে, লেখে না। শায়খও ছাত্রের লেখানোর প্রতি তাকিদ করেন না। প্রথম প্রকারটি দ্বিতীয় প্রকার এমনকি হাদীস বর্ণনার সমস্ত শব্দ হতে উত্তম। কেননা, এখানে শোনার সাথে সাথে লেখেও নেওয়া হয়। যাতে করে ভুলের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই কেউ যদি حَدَّثَنِى الشَّيْخُ إِمْلَاءً অথবা سَمِعْتُ الشَّيْخَ إِمْلَاءً বলে, তাহলে তা سَمِعْتُ الشَّيْخَ বা حَدَّثَنِيْ -এর উপর প্রাধান্য পাবে।

وَالثَّالِثُ وَهُوَ اَخْبَرَنِىْ كَالرَّابِعِ وَهُوَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهٖ عَلَى الشَّيْخِ فَاِنْ جَمَعَ كَانَ يَقُوْلَ اَخْبَرَنَا وَقَرَأْنَا فَهُوَ كَالْخَامِسِ وَهُوَ قُرِئَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَعُرِفَ مِنْ هٰذَا اَنَّ التَّعْبِيْرَ بِقَرَأْتُ لِمَنْ قَرَأَ خَيْرٌ مِنَ التَّعْبِيْرِ بِالْاِخْبَارِ لِاَنَّهٗ اَفْصَحُ بِصُوْرَةِ الْحَالِ ـ

تَنْبِيْهٌ اَلْقِرَاءَةُ عَلَى شَيْخٍ اَحَدُ وُجُوْهِ التَّحَمُّلِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَاَبْعَدَ مَنْ اَبٰى ذٰلِكَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ وَقَدِ اشْتَدَّ اِنْكَارُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْمَدِيْنِيِّيْنَ عَلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى بَالَغَ بَعْضُهُمْ فَرَجَّحَهَا عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَ ذَهَبَ جَمْعٌ جَمٌّ مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَحَكَاهُ فِىْ اَوَائِلِ صَحِيْحِهٖ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ اِلٰى اَنَّ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَالْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ يَعْنِىْ فِى الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ سَوَاءٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ، وَالْاِنْبَاءُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ وَاِصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ بِمَعْنَى الْاِخْبَارِ اِلَّا فِىْ عُرْفِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ فَهُوَ لِلْاِجَازَةِ كَعَنْ لِاَنَّهَا فِىْ عُرْفِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ لِلْاِجَازَةِ ـ

অনুবাদ : তৃতীয় শব্দটি অর্থাৎ আখবারানী চতুর্থটি অর্থাৎ করা'তু আলাইহি -এর মতোই। করা'তু আলাইহি ব্যবহৃত হয় তার ক্ষেত্রে যিনি স্বয়ং শায়খকে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

যদি এ দুটি শব্দ বহুবচন ব্যবহৃত হয় যেমন– রাবী বলেন, 'আখবারানা' বা 'করা'না আলাইহিস', তাহলে তখন এ দুয়ের মর্যাদা হবে পঞ্চমটি অর্থাৎ 'কুরিয়া আলাইহি ওয়া আনা আসমাউ' -এর মতো। এ থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি পাঠ করেছেন তার পক্ষে 'আখবারানী' শব্দ ব্যবহার না করে 'করা'তু' ব্যবহার করা অধিক সমীচীন। কেননা, 'কারা'তু আলাইহি' শব্দ বাস্তব অবস্থাকে বেশি প্রকাশ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে শায়খের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণের অন্যতম পদ্ধতি হলো তাকে পাঠ করে শোনানো। যারা এটি অস্বীকার করেন তাদের অভিমত মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। ইরাকের কোনো কোনো মুহাদ্দিস এটি অস্বীকার করেন। ইমাম মালিকসহ মদীনার অনেক মুহাদ্দিস এ অভিমতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এমনকি অনেকে এ ব্যাপারে অতিরঞ্জিতও করেছেন এবং শায়খের শব্দ শোনার চেয়ে এটিকে (শায়খের সামনে পড়াকে) অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম বুখারীসহ মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি বিরাট দল এ অভিমত পোষণ করতেন যে, শায়খের শব্দ শোনা ও শায়খকে শোনানো সমান মর্যাদা রাখে। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ -এর শুরুতে হাসান বসরী (র.), সুফিয়ান ছাওরী (র.), মালিক (র.) প্রমুখ ইমামের অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, শায়খের শব্দ শোনা ও তাকে শোনানো শুদ্ধতা ও শক্তির দিক দিয়ে সমান।

আনবা'আ শব্দটি অভিধান ও মুতাকদ্দিমীনের পরিভাষায় আখবারা -এর অর্থই প্রদান করে। কিন্তু মুতাআখখিরীনের রীতিতে তা নয়। তাদের মতে এটি 'আন' -এর মতোই শুধুমাত্র অনুমতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। মুতাআখখিরীনের রীতিতে 'আন' ব্যবহৃত হয় অনুমতি বুঝাতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَخْبَرَنِىْ -এর দুটি সীগাহ। اَخْبَرَنَا ও اَخْبَرَنِىْ। আর قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর জন্য ব্যবহার হয় তিন সীগাহ। ১. قَرَأْتُ عَلَيْهِ ২. قَرَأْنَا عَلَيْهِ ৩. قُرِئَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ। আলোচ্য পাঁচ সীগাহ (শব্দ) -এর

মাঝে পার্থক্য হলো, أَخْبَرَنِيْ ও قَرَأْتُ عَلَيْهِ শুধু ঐ রাবীর জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি একা শায়খের সামনে হাদীস পড়েছেন আর শায়খ তা শোনেছেন, তাই حُكْمًا ও اِصْطِلَاحًا এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ সুরতে أَخْبَرَنِيْ বলার চেয়ে قَرَأْتُ عَلَيْهِ বলা বেশি ভালো। কারণ, قَرَأْتُ عَلَيْهِ -এর মাঝে قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর বিষয়টি বেশি প্রকাশমান।

আর قَرَأْنَا عَلَيْهِ, اخبرنا এবং قُرِئَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ ব্যবহার হয় ঐ রাবীদের ক্ষেত্রে, শায়খের সামনে একজন হাদীস পড়েছেন আর বাকিরা তা শুনেছেন।

قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ টা تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ -এর অন্তর্গত কিনা? تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ -এর অর্থ শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করা। এর অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন– ১. قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ ২. سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ ৩. اِجَازَتْ ৪. مُنَاوَلَةْ ৫. وِجَادَتْ ইত্যাদি। অবশ্য এর মধ্যে قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ তথা শায়খকে শোনানো -এটা تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ তথা হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** তাঁদের মতে এটিও تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ -এর একটি সুরত বা পদ্ধতি।

২. **ইরাকীদের অভিমত :** আবূ আসিম, ওকী প্রমুখ ইরাকীদের অভিমত হলো, قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ এটি تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ -এর অর্ন্তগত নয়। কারণ, এ পন্থায় ছাত্র ওস্তাদ হতে হাদীস গ্রহণ করে না; বরং শায়খকে পড়ে শোনায় মাত্র।

সঠিক মাযহাব ও তার দলিল : উক্ত দু মাযহাবের মধ্যে জুমহুরের মাযহাবই সর্বোচ্চ সঠিক ও বাস্তবসম্মত। আর ইরাকীদের মাযহাবটি সত্য ও বাস্তবতা হতে অনেক দূরে অবস্থিত। জুমহুরের মাযহাব সঠিক হবার কারণ হলো, ছাত্র শায়খকে হাদীস পড়িয়ে শোনান এমনিই নয়; বরং ছাত্র ওস্তাদকে এ উদ্দেশ্যে শোনায় যাতে শায়খ ছাত্রের ভুল সংশোধন করে দেন। বস্তুত এ কারণে ইমাম মালিক প্রমুখ আহলে ইরাকীদের মাযহাবের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ অতিরঞ্জিত করে قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -কে سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ থেকেও উত্তম বলেছেন।

قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর মর্যাদা : যাদের মতে قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ হাদীস গ্রহণের একটি পদ্ধতি, তাদের পরস্পরের মাঝে এ প্রশ্নে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর মর্যাদা কেমন ?

১. কারো কারো মত হলো, قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ টা سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ থেকে অগ্রগণ্য।

২. ইমাম বুখারী, ইমাম মালিক, ছাওরী, হাসান বসরী প্রমুখের মতে শক্তি এবং বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে উভয় বরাবর; একটি অপরটির উপর অগ্রগণ্য নয়।

৩. হাফিজ ইবনে হাজার (র.) -এর মতে উভয়টা বরাবর নয় এবং قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ টা سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ থেকে অগ্রগণ্যও নয়; বরং سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ টা হাদীস বর্ণনার সকল শব্দের মধ্যে সর্বোত্তম।

قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর অপর নাম কতিপয়ের মতে عَرْض। কেননা, হাদীসের পাঠকারী তার পাঠ শায়খের সামনে আরজ তথা পেশ করে।

اَنْبَأَنِي -এর অর্থ ও ব্যবহার : আভিধানিক অর্থ হিসেবে اِخْبَار ও اِنْبَاء -এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে পরিভাষাগতভাবে পার্থক্য আছে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. মুতাকদ্দিমীন মুহাদ্দিসগণের মতে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং أَخْبَرَنِيْ ও أَخْبَرَنَا -এর স্থলে اَنْبَأَنِيْ ও اَنْبَأَنَا -এর ব্যবহার শুদ্ধ।

২. মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে পার্থক্য রয়েছে। اِخْبَارٌ ব্যবহার হয় قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর ক্ষেত্রে, আর اِنْبَاء ব্যবহার হয় عَنْ -এর মতো অনুমতি বুঝাতে।

وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى السَّمَاعِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَاصِرِ فَإِنَّهَا تَكُوْنُ مُرْسَلَةً اَوْ مُنْقَطِعَةً فَشَرْطُ حَمْلِهَا عَلَى السَّمَاعِ ثُبُوْتُ الْمُعَاصَرَةِ اِلَّا مِنَ الْمُدَلِّسِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْمُوْلَةً عَلَى السَّمَاعِ وَقِيْلَ يَشْتَرِطُ فِىْ حَمْلِ الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصِرِ عَلَى السَّمَاعِ ثُبُوْتُ لِقَائِهِمَا اَىِ الشَّيْخِ وَالرَّاوِىْ عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً لِيَحْصُلَ الْاَمْنُ فِىْ بَاقِى الْعَنْعَنَةِ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ الْمُرْسَلِ الْخَفِىْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ تَبْعًا لِعَلِىِّ بْنِ الْمَدِيْنِىْ وَالْبُخَارِىِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ -

অনুবাদ : সমসাময়িক ব্যক্তির আনআনা -কে শোনার অর্থে গ্রহণ করতে হবে। সমসাময়িক না হলে শোনার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না; বরং তখন সেটি মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হবে। সুতরাং আনআনাকে শোনার অর্থে গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো সমসাময়িকতা সাব্যস্ত হওয়া। তবে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে তাদের ক্ষেত্রে যারা মুদাল্লিস নন। মুদাল্লিস হলে সমসাময়িক ব্যক্তির আনআনাকেও শোনার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না।

অনেকের মতে সমসাময়িক ব্যক্তির আনআনাকে শোনার অর্থে গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো, শায়খ ও রাবীর মধ্যে একবার হলেও সাক্ষাৎ সাব্যস্ত হওয়া। তাহলে অবশিষ্ট আনআনা হাদীসগুলো মুরসালে খফী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকবে। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী প্রমুখ হাদীস যাচাইকারী মনীষীর অনুসরণে এই অভিমতটিই অধিক পছন্দনীয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْث مُعَنْعَن -এর সংজ্ঞা : عَنْ শব্দ দ্বারা রেওয়ায়েত করাকে عَنْعَنَة বলে। যে হাদীস عَنْ শব্দ যোগে রেওয়ায়েত করা হয়, তাকে حَدِيْث مُعَنْعَن বলে। যেমন– فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ভাবে রেওয়ায়েত করা।

عَنْعَنَة -এর হুকুম ও শর্ত : জুমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে কিছু শর্তসাপেক্ষে عنعنة -কে سَمَاعْ ও اِتِّصَال হিসেবে ধর্তব্য করা হবে।

১. مُعَاصَرَة বা সমসাময়িকতা। رَاوِىْ এবং مَرْوِى عَنْه যদি مُعَاصِر বা একই যুগের হন অর্থাৎ রাবী مَرْوِى عَنْه থেকে শোনা সম্ভব হয়, তাহলে عَنْعَنَة -কে مُتَّصِلُ السَّنَدِ ধরা হবে। আর যদি مُعَاصِر (সমসাময়িক) না হন, তাহলে তাবেয়ীর عَنْعَنَة হলে তাকে মুরসাল অথবা পরবর্তী কালে عَنْعَنَة হলে তাকে মুনকাতি' ধরা হবে।

২. রাবীর মুদাল্লিস না হতে হবে। রাবী মুদাল্লিস হলে তার عَنْعَنَة -কে مُتَّصِل ধরা হবে না।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, مُتَّصِلُ السَّنَدِ হওয়ার জন্য রাবী ও مَرْوِى عَنْه -এর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ শর্ত। ইমাম বুখারী (র.), আলী ইবনুল মাদীনী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ মতের প্রবক্তা। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এটাকেই رَاجِعْ বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, مَرْوِى عَنْه -এর সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হলে তার হাদীসে মুআনআন মুরসালে খফী হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তা আর বাকি থাকে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) -এর মতে حَدِيْث مُعَنْعَنْ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য সমসাময়িক হওয়াটাই যথেষ্ট, সাক্ষাৎ হওয়াটা জরুরি নয়। এমনকি যারা এটাকে শর্ত করেছেন মুসলিম শরীফের ভূমিকায় তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

وَاَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِى الْاِجَازَةِ الْمَكْتُوْبِ الْمُتَلَفَّظِ بِهَا تَجَوُّزًا وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ فِى الْاِجَازَةِ بِهَا وَهُوَ مَوْجُوْدٌ فِىْ عِبَارَةِ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُتَاخِّرِيْنَ بِخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ فَاِنَّهُمْ اِنَّمَا يُطْلِقُوْنَهَا فِيْمَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ مِنَ الْحَدِيْثِ اِلَى الطَّالِبِ سَوَاءٌ اَذِنَ فِىْ رِوَايَتِهٖ اَمْ لَا لَا فِيْمَا اِذَا كَتَبَ اِلَيْهِ بِالْاِجَازَةِ فَقَطْ وَاشْتَرَطُوْا فِىْ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ اِقْتِرَانَهَا بِالْاِذْنِ بِالرِّوَايَةِ وَهِىَ اِذَا حَصَلَ هٰذَا الشَّرْطُ اَرْفَعُ اَنْوَاعِ الْاِجَازَةِ لِمَا فِيْهَا مِنَ التَّعْيِيْنِ وَالتَّشْخِيْصِ وَصُوْرَتُهَا اَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ اَصْلَهٗ اَوْ مَا قَامَ مَقَامَهٗ لِلطَّالِبِ اَوْ يُحْضِرَ الطَّالِبُ اَصْلَ الشَّيْخِ وَيَقُوْلُ لَهٗ فِى الصُّوْرَتَيْنِ هٰذِهٖ رِوَايَتِىْ عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهٖ عَنِّىْ وَشَرْطُهٗ اَنْ يُمَكِّنَهٗ اَيْضًا مِنْهُ اِمَّا بِالتَّمْلِيْكِ اَوْ بِالْعَارِيَةِ لِيَنْقُلَ مِنْهُ وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ وَاِلَّا اِنْ نَاوَلَهٗ وَاسْتَرَدَّ فِى الْحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ اَرْفَعِيَّتُهٗ لٰكِنَّ لَهَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ عَلَى الْاِجَازَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَهِىَ اَنْ يُجِيْزَهُ الشَّيْخُ بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ وَيُعَيِّنَ لَهٗ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهٖ لَهٗ وَاِذَا خَلَتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْاِذْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهَا عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَ جَنَحَ مَنْ اِعْتَبَرَهَا اِلٰى اَنَّ مُنَاوَلَتَهٗ اِيَّاهُ يَقُوْمُ مَقَامَ اِرْسَالِهٖ اِلَيْهِ بِالْكِتَابِ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ وَقَدْ ذَهَبَ اِلٰى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ الْمُجَرَّدَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْاَئِمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَقْتَرِنْ ذٰلِكَ بِالْاِذْنِ بِالرِّوَايَةِ كَاَنَّهُمْ اِكْتَفَوْا فِىْ ذٰلِكَ بِالْقَرِيْنَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِىْ فَرْقٌ قَوِىٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الْكِتَابَ لِلطَّالِبِ وَبَيْنَ اِرْسَالِهٖ اِلَيْهِ بِالْكِتَابِ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰى اٰخَرَ اِذَا خَلَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْاِذْنِ ـ

অনুবাদ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'মুশাফাহা' -কে রূপকভাবে ঐ অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা মৌখিকভাবে দেওয়া হয়। অনুরূপ 'মুকাতাবা' রূপকভাবে ঐ অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যা লিখিতভাবে দেওয়া হয়। (নতুবা প্রকৃত মুশাফাহা হলো, হাদীস শুনিয়ে বা পড়িয়ে অনুমতি দেওয়া। অনুরূপ প্রকৃত 'মুকাতাবা হলো হাদীস শুনিয়ে বা পড়িয়ে তা বর্ণনা করতে লিখিতভাবে অনুমতি দেওয়া।) এ ধরনের অনুমতি মুতাআখখিরীনের অনেক রচনায় পাওয়া যায়; কিন্তু মুতাকদ্দিমীনের রচনায় তা পাওয়া যায় না। মুকাতাবা বলতে তারা বুঝিয়ে থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট শায়খের কোনো হাদীস লেখে পাঠানো; তাতে তা বর্ণনার অনুমতি থাকুক বা না থাকুক। শুধুমাত্র অনুমতি লেখে পাঠালে সেক্ষেত্রে তারা মুকাতাবা শব্দটি ব্যবহার করেন না।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'মুনাওয়ালা' -এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা শুদ্ধ হবার জন্য মুনাওয়ালার 'রেওয়ায়েতের অনুমতি সম্বলিত' হওয়া শর্ত করেছেন। এ শর্তযুক্ত মুনাওয়ালা অনুমতির সর্বোচ্চ প্রকার। কেননা, এতে ব্যক্তির সুনির্দিষ্টতা রয়েছে। মুনাওয়ালা হলো, শায়খ তার নিজ (হাদীসের) কপি অথবা প্রতিলিপি

(ফটোস্ট্যাট বা কম্পোজ কপি) শিক্ষার্থীকে দেবেন অথবা শিক্ষার্থী (তার কাছে থাকা) শায়খের আসল কপি (শায়খের সামনে) উপস্থিত করবে আর উভয় অবস্থায় শায়খ শিক্ষার্থীকে বলবেন, এটা অমুক হতে আমার রেওয়ায়েত; তুমি তা আমার বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করতে পার।

(মুনাওয়ালার) অনুমতির সর্বোচ্চ প্রকার হওয়ার (আরেকটি) শর্ত হলো, শায়খ শিক্ষার্থীকে মূলকপি হতে (উপকৃত হওয়ার) সুযোগ দেবেন; চাই তা মালিক বানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা ধার (কর্জ) দেওয়ার মাধ্যমে হোক। যাতে শিক্ষার্থী মূলকপি হতে হাদীস তুলে (লেখে) নিতে পারে এবং মূল কপির সাথে তার প্রতিলিপির তুলনা করে নিতে পারে। নতুবা শায়খ যদি তাকে মূলকপি দিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ ফেরত নেন, তাহলে এই মুনাওয়ালার অনুমতির সর্বোচ্চ প্রকার হওয়া প্রকাশ পাবে না (অর্থাৎ এমতাবস্থায় তা সর্বোত্তম অনুমতি হবে না)। তথাপি তা ইজাযতে মু'আয়্যানার উপর অগ্রাধিকার পাবে।

ইজাযতে মু'আয়্যানা হলো, শায়খ শিক্ষার্থীকে কোনো (অনুপস্থিত) সুনির্দিষ্ট কিতাব রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেবেন সেই সাথে তিনি তা রেওয়ায়েতের পদ্ধতিতে নির্ধারণ করে দেবেন।

মুনাওয়ালার সাথে যদি অনুমতি যুক্ত না থাকে, তাহলে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যারা গ্রহণ করেন, তারা এটিকে এক শহর থেকে অন্য শহরে শায়খের কিতাব পাঠানোর অনুরূপ মনে করেন। বর্ণনার অনুমতি ছাড়া শুধুমাত্র লেখে পাঠানো হাদীস একদল মুহাদ্দিসের মতে বর্ণনা করা শুদ্ধ। তারা লেখে পাঠানোকেই অনুমতির নিদর্শন বলে বিবেচনা করেন। আমার নিকট অনুমতি ছাড়া ছাত্রকে শায়খের কিতাব দেওয়া ও এক শহর থেকে অন্য শহরে কিতাব পাঠানোর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُشَافَهَةُ -এর সংজ্ঞা : اَلْمُشَافَهَةُ শব্দটি بَاب مُفَاعَلَة -এর মাসদার। شَفَةٌ হতে এটা নির্গত। এর অর্থ– মুখোমুখি কথাবার্তা বলা। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اَلْمُشَافَهَةُ হলো, শায়খ যদি নির্দিষ্ট একটি হাদীস বর্ণনা করতে কাউকে মৌখিকভাবে অনুমতি দেন, তাহলে এটিকে রূপক অর্থে ইজাযত বিল মুশাফাহা বলে। প্রকৃত মুশাফাহা হলো, হাদীসটি শুনিয়ে বা পড়িয়ে অনুমতি দেওয়া।

شَافَهَنِىْ بِالْاِجَازَةِ -এর মর্মার্থ : اَلْاِجَازَةُ -এর অর্থ হলো, শায়খ কর্তৃক কাউকে তার সূত্রে হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করা। চাই সে সরাসরি শায়খ থেকে হাদীস শোনে থাকুক বা না শোনে থাকুক। অনুমতি কখনো শায়খ মৌখিকভাবে প্রদান করেন। যেমন– কাউকে লক্ষ্য করে বলেন, اَجَزْتُ لَكَ لِلرِّوَايَةِ অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার সূত্রে রেওয়ায়েতের অনুমতি দিচ্ছি।

কখনো অনুমতি লিখিত আকারে প্রদান করেন। যেমন, কাগজে লেখে দেন– اَجَزْتُ لَكَ لِلرِّوَايَةِ عَنِّىْ।

মৌখিক অনুমতি প্রদানকে مُشَافَهَة বলে। আর লিখিত অনুমতিকে মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসগণের মতে مُكَاتَبَةٌ بِالْاِجَازَةِ বলে।

مُكَاتَبَة -এর সংজ্ঞা : مُكَاتَبَة শব্দটি بَاب مُفَاعَلَة -এর মাসদার। এর অর্থ– পত্র লেখা। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُكَاتَبَة হলো, শায়খ যদি কাউকে হাদীস বর্ণনার লিখিত অনুমতি দেন, তাহলে তাকে রূপক অর্থে ইজাযত বিল মুকাতাবা বলে।

مُكَاتَبَة -এর অর্থ নিয়ে মতভেদ : مُكَاتَبَة -এর মর্মার্থ কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. মুতাকদ্দিমীন মুহাদ্দিসগণের মতে مُكَاتَبَة হলো, শায়খ কর্তৃক কাগজে হাদীস লেখে কারো কাছে পাঠানো। চাই তাকে তার সূত্রে রেওয়ায়েত করার অনুমতি প্রদান করুক বা না করুক।

২. মুতাআখখিরীনদের মতে হাদীস ছাড়া শুধু লিখিত অনুমতিকে مُكَاتَبَةٌ بِالْاِجَازَةِ বলে।

مُشَافَهَة -এর সূত্রে রাবী হাদীস বর্ণনার সময় বলবেন– حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ مُشَافَهَةً আর مُكَاتَبَة -এর সুরতে বলবেন– كَتَبَ اِلَىَّ فُلَانٌ অথবা حَدَّثَنِىْ فُلَانٌ مُكَاتَبَةً।

কিতাবে اَلْمُشَافَهَةُ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– وَاَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِى الْاِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ الْمُتَلَفَّظِ بِهَا تَجَوُّزًا কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে এর মধ্যে اَلْمَكْتُوبُ শব্দটির উল্লেখ ভুল বলে মনে হয়। কেননা, এর অর্থ লিখিত অনুমতি। অথচ مُشَافَهَة বলা হয় মৌখিক অনুমতিকে। এখানে আসল ইবারত সম্ভবত এমন হবে– وَاَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِى الْاِجَازَةِ الْمُتَلَفَّظِ بِهَا تَجَوُّزًا وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ فِى الْاِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا

مُنَاوَلَة -এর সংজ্ঞা : مُنَاوَلَة শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَة -এর মাসদার। এর অর্থ– দান করা, দেওয়া ইত্যাদি। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُنَاوَلَة হলো–

اَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ اَصْلَهُ اَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ اَوْ يُحْضِرَ الطَّالِبُ اَصْلَ الشَّيْخِ وَيَقُولُ لَهُ فِى الصُّورَتَيْنِ هٰذِهِ رِوَايَتِى عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهْ عَنِّى .

অর্থাৎ শায়খ স্বীয় কিতাবের মূলকপি অথবা প্রতিলিপি যদি শিক্ষার্থীকে প্রদান করেন অথবা শায়খের যে মূলকপি ছাত্রের কাছে আছে তা ছাত্র শায়খের সম্মুখে পেশ করেন এবং শায়খ তাকে তা প্রদান করে বলেন যে, এটা অমুক থেকে আমার রেওয়ায়েত, তুমি তা আমার থেকে রেওয়ায়েত করো।

مُنَاوَلَة -এর শর্ত : ইজাযতের সর্বোত্তম পদ্ধতি مُنَاوَلَة হওয়ার শর্ত দুটি।

১. মুনাওয়ালার সাথে রেওয়ায়েত করার অনুমতিও থাকবে।
২. শায়খ ছাত্রকে হাদীসের মুলকপি অথবা প্রতিলিপির হয়তো মালিক বানিয়ে দেবেন অথবা তা হতে হাদীস উঠিয়ে নিতে ধারস্বরূপ দেবেন।

مُنَاوَلَة -এর প্রকারভেদ : مُنَاوَلَة দু প্রকার। যথা–

১. اَلْمَقْرُونَةُ بِالْاِجَازَةِ অর্থাৎ শায়খ স্বীয় কিতাবের মূলকপি অথবা প্রতিলিপি প্রদানের সাথে সাথে এই বলে অনুমতি দেন যে, هٰذَا رِوَايَتِى عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهْ عَنِّى
অর্থাৎ এগুলো আমি অমুক ওস্তাদ থেকে নিচ্ছি। এখন থেকে তুমি আমার সূত্রে রেওয়ায়েত করো।
এ সুরতে ছাত্র রেওয়ায়েত করার সময় বলবে– حَدَّثَنِى فُلَانٌ مُنَاوَلَةً অথবা اَخْبَرَنِى فُلَانٌ مُنَاوَلَةً।
২. اَلْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْاِجَازَةِ অর্থাৎ শায়খ ছাত্রকে কিতাবের মূলকপি অথবা প্রতিলিপি দেবেন; কিন্তু অনুমতি উল্লেখ করবেন না। শুধু বলবেন– هٰذَا سَمَاعِى اَوْ رِوَايَتِى عَنْ فُلَانٍ।

مُنَاوَلَة -এর হুকুম : مُنَاوَلَة-এর প্রথম প্রকারের হুকুম হলো, এ সুরতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ঐ শায়খর সূত্রে ঐ কিতাব থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করা জায়েজ।

আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ مُنَاوَلَة টা যখন অনুমতিশূন্য হবে, তখন তা রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** তাঁদের মতে অনুমতিহীন مُنَاوَلَة হলে, তখন রেওয়ায়েত করা জায়েজ নেই।
২. **কতিপয়ের অভিমত :** কতিপয় আলিমের মতে অনুমতিহীন مُنَاوَلَة -ও রেওয়ায়েত করা জায়েজ।

দ্বিতীয় পক্ষের দলিল : যারা অনুমতিহীন مُنَاوَلَة রেওয়ায়েত জায়েজের পক্ষে তারা তাদের দাবির সমর্থনে দুটি দলিল পেশ করেন। যথা–

১. শায়খ ছাত্রকে কোনো কিতাব দিলে ঐ কিতাব থেকে তার রেওয়ায়েত করা জায়েজ হয়, যদিও সেখানে অনুমতির কথা না থাকে। সুতরাং এখানেও তদ্রূপ অনুমতিহীন مُنَاوَلَة হলেও তা রেওয়ায়েত করতে পারবে।
২. ছাত্রের কাছে কপি পাঠালেই তা রেওয়ায়েতের অনুমতির উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা, কপি পাঠানোর মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোনো ফায়দা নেই। সুতরাং অনুমতিহীন কপি পেলেও তা হতে রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে।

সঠিক অভিমত : হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হলো, যেহেতু অনুমতিহীন কিতাব পাঠানো এবং কপি পাঠানোর মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, তাই দ্বিতীয় পক্ষের অভিমত শক্তিশালী বলে প্রতিভাত হয়।

وَكَذَا اِشْتَرَطُوا الْاِذْنَ فِى الْوِجَادَةِ وَهِىَ اَنْ يَجِدَ بِخَطٍّ يَعْرِفُ كَاتِبَهٗ فَيَقُوْلُ وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ وَلَا يَسُوْغُ فِيْهِ اِطْلَاقُ اَخْبَرَنِىْ بِمُجَرَّدِ ذٰلِكَ اِلَّا اِنْ كَانَ لَهٗ مِنْهُ اِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ وَاَطْلَقَ قَوْمٌ ذٰلِكَ فَغَلِطُوْا ، اَوْ كَذَا الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابِ وَهِىَ اَنْ يُوْصِىَ عِنْدَ مَوْتِهٖ اَوْ سَفَرِهٖ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِاَصْلِهٖ اَوْ بِاُصُوْلِهٖ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ يَجُوْزُ لَهٗ اَنْ يَرْوِىَ تِلْكَ الْاُصُوْلَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هٰذِهِ الْوَصِيَّةِ وَاَبٰى ذٰلِكَ الْجُمْهُوْرُ اِلَّا اِنْ كَانَ لَهٗ مِنْهُ اِجَازَةٌ وَكَذَا اِشْتَرَطُوا الْاِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِى الْاِعْلَامِ وَهُوَ اَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ اَحَدَ الطَّلَبَةِ بِاَنَّنِىْ اَرْوِى الْكِتَابَ الْفُلَانِىْ عَنْ فُلَانٍ فَاِنْ كَانَ لَهٗ مِنْهُ اِجَازَةٌ اُعْتُبِرَ وَاِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِذٰلِكَ.

অনুবাদ : অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিজাদা -এর ক্ষেত্রে অনুমতির শর্ত করেছেন। বিজাদা হলো, শিক্ষার্থী কোথাও হতে একটি লিখিত কপি পান, যার লেখককে তিনি চেনেন। অতঃপর তিনি (তা রেওয়ায়েত করতে গিয়ে) বলেন, আমি অমুকের লেখায় (এ হাদীস) পেয়েছি। শুধু এতটুকুর কারণে তার ক্ষেত্রে আখবারানী বলা (অর্থাৎ তা বলে রেওয়ায়েত করা) জায়েজ হবে না। হ্যাঁ, তবে শায়খ থেকে তা রেওয়ায়েতের অনুমতি তার সাথে থাকলে জায়েজ হবে (আখবারানী বলে রেওয়ায়েত করা)। যারা অনুমতি না থাকলেও আখবারানী ফুলানুন বলে তা বর্ণনা করা শুদ্ধ মনে করেন, তারা ভুল করেন। অনুরূপভাবে কিতাবের অসিয়তের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম অনুমতি শর্ত করেছেন। অসিয়্যত বিল কিতাব হলো, কোনো মুহাদ্দিস তার ইন্তেকাল কিংবা সফরের সময় তার হাদীসের আসল কপি বা কপিসমূহ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদানের অসিয়ত করে যাওয়া। মুতাকদ্দিমীনের একদল শুধুমাত্র অসিয়তের কারণে অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে উক্ত কিতাবসমূহ হতে হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ বলে মনে করেন; কিন্তু জুমহুরে মুহাদ্দিসীন এই জায়েজ হওয়াকে অস্বীকার করেন। অবশ্য যদি অসিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য অসিয়তকারী হতে রেওয়ায়েতের অনুমতি থাকে, তাহলে জায়েজ আছে।

অনুরূপভাবে ই'লাম-এর মধ্যেও অনুমতির শর্ত করেছেন। ই'লাম হলো, কোনো ছাত্রকে শায়খের জানানো যে, অমুক ব্যক্তি থেকে যদি আমি অমুক কিতাব বর্ণনা করি। সুতরাং শায়খ থেকে ছাত্রের জন্য যদি অনুমতি থাকে, তাহলে এ ই'লাম ধর্তব্য হবে। নতুবা এমন (অর্থাৎ অনুমতিহীন) ই'লাম ধর্তব্য হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وِجَادَة -এর সংজ্ঞা : মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় وِجَادَة হলো–

اِسْمٌ لِمَا اُخِذَ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيْفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَلَا اِجَازَةٍ وَلَا مُنَاوَلَةٍ.

এটিকে সহজ ভাষায় এভাবে বলা যায়, ছাত্র কারো কাছ থেকে হাদীসের লিখিত একটি কপি পায়, যার **লেখককে সে চিনে যে,** তা অমুকে লেখেছে। এ রকম কপি পাওয়াকে وِجَادَة বলে।

وِجَادَةٌ -এর হুকুম : জুমহুরের মতে وِجَادَةٌ -এর মাধ্যমে হাদীস রেওয়ায়েত করা তখন জায়েজ যখন ঐ কিতাবের লেখক তাকে রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেবে। অনুমতি পেলে তখনই কেবল তা أَخْبَرَنِيْ দ্বারা রেওয়ায়েত করা জায়েজ। আর অনুমতি না হলে أَخْبَرَنِيْ বলে তা রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে না। তবে এভাবে বলতে পারে– وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের লেখায় পেয়েছি।

তবে কারো কারো মত হলো, কিতাবের লেখকের পক্ষ হতে অনুমতি থাকুক বা না থাকুক وِجَادَةٌ -কে أَخْبَرَنِيْ -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ; কিন্তু তাদের এই অভিমত সঠিক নয়।

وَصِيَّتْ بِالْكِتَابِ -এর সংজ্ঞা : যদি কোনো মুহাদ্দিস তাঁর ইন্তেকাল কিংবা সফরের সময় এ মর্মে অসিয়ত করে যান যে, আমার এ কিতাব বা কিতাবসমূহ অমুককে দেবে, তাহলে এর নাম وَصِيَّتْ بِالْكِتَابِ। অসিয়তকারীকে আরবিতে مُوْصِيْ বলে আর যার জন্য অসিয়ত করা হয় তাকে مُوْصٰى لَهٗ বলে।

وَصِيَّتْ بِالْكِتَابِ -এর হুকুম : অসিয়তের সাথে সাথে যদি مُوْصٰى لَهٗ -এর জন্য مُوْصِيْ -এর পক্ষ হতে রেওয়ায়েতের অনুমতি থাকে, তাহলে তা রেওয়ায়েত করা এবং তার জন্য اخبرني শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ।

আর যদি مُوْصِيْ হতে রেওয়ায়েতের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা রেওয়ায়েত করা এবং তার জন্য أَخْبَرَنِيْ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. জুমহুরের মতে নাজায়েজ।

২. কতিপয় মুতাকদ্দিমীনের মতে জায়েজ।

إِعْلَامٌ -এর সংজ্ঞা : إِعْلَامٌ শব্দটি بَابِ إِفْعَالٌ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– জানানো, অবগত করানো ইত্যাদি। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় إِعْلَامٌ হলো–

هُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِيْ أَرْوِى الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ.

অর্থাৎ কোনো ছাত্রকে শায়খের এ কথা জানানো যে, অমুক ব্যক্তি হতে আমি অমুক কিতাব রেওয়ায়েত করি।

إِعْلَامٌ -এর হুকুম : إِعْلَامٌ -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো, অনুমতি সম্বলিত হতে হবে। যদি إِعْلَامٌ -এর সাথে অনুমতি না থাকে, তাহলে তা রেওয়ায়েত করা জায়েজ কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. মুহাদ্দিসীন, ফোকাহা এবং অধিকাংশ উসূলীনদের মত হলো, إِعْلَامٌ -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ। যদিও তার সাথে অনুমতি না থাকুক।

২. তবে শাফেয়ী মতালম্বী ও অধিকাংশ মুহাক্কিকের অভিমত হলো, শুধু إِعْلَامٌ -এর দ্বারা হাদীস রেওয়ায়েত করা জায়েজ নেই। কারণ, কখনো এমনও হয় যে, শায়খ তার ছাত্রকে তার রেওয়ায়েত-সূত্র জানান, কিন্তু তাকে রেওয়ায়েতের অনুমতি দেন না।

كَالْاِجَازَةِ الْعَامَّةِ فِى الْمَجَازِ لَهُ لَا فِى الْمَجَازِ بِهِ كَاَنْ يَقُوْلَ اَجزْتُ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ لِمَنْ اَدْرَكَ حَيٰوتِى اَوْ لِاَهْلِ الْاَقْلِيْمِ الْفُلَانِى اَوْ لِاَهْلِ الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَهُوَ اَقْرَبُ اِلَى الصِّحَّةِ لِقُرْبِ الْاِنْحِصَارِ وَكَذَا الْاِجَازَةُ لِلْمَجْهُوْلِ كَاَنْ يَقُوْلَ مُبْهَمًا اَوْ مُهْمَلًا وَكَذَا الْاِجَازَةُ لِلْمَعْدُوْمِ كَاَنْ يَقُوْلَ اَجزْتُ لِمَنْ سَيُوْلَدُ لِفُلَانٍ وَقَدْ قِيْلَ اِنْ عَطَفَهُ عَلٰى مَوْجُوْدٍ صَحَّ كَاَنْ يَقُوْلَ اَجزْتُ لَكَ وَ لِمَنْ سَيُوْلَدُ لَكَ وَالْاَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ اَيْضًا وَكَذٰلِكَ الْاِجَازَةُ لِمَوْجُوْدٍ اَوْ لِمَعْدُوْمٍ عُلِّقَتْ بِمَشِيَّةِ الْغَيْرِ كَاَنْ يَقُوْلَ اَجزْتُ لَكَ اِنْ شَاءَ فُلَانٌ اَوْ اَجزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ لَا اَنْ يَقُوْلَ اَجزْتُ لَكَ اِنْ شِئْتَ ـ

অনুবাদ : যেমন– মুজায-লাহু তথা ছাত্রের জন্য ইজাযতে আম্মাহ তথা ব্যাপকতর সাধারণ অনুমতির কোনো ধর্তব্য নেই। তবে মুজায-বিহী তথা হাদীসের ক্ষেত্রে নয় (অর্থাৎ আম হাদীসের ব্যাপারে অনুমতি দিলে তার ধর্তব্য রয়েছে)। ইজাযাতে আম্মাহ হলো, যেমন– শায়খ বলবেন, আমি সকল মুসলমানকে অনুমতি দিলাম অথবা যারা আমার জীবদ্দশায় আমাকে পাবে তাদের অনুমতি দিলাম অথবা অমুক মহাদেশের লোকদের অনুমতি দিলাম অথবা অমুক শহরের লোকদের অনুমতি দিলাম। এটা অর্থাৎ কোনো শহরবাসীকে অনুমতি দেওয়াটা কিছুটা সীমাবদ্ধতার কারণে বিশুদ্ধতার নিকটবর্তী। (অর্থাৎ এসব অনুমতির মধ্যে কেবল এই শেষটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।)

অনুরূপভাবে অজ্ঞাত ব্যক্তির অনুমতিরও কোনো ধর্তব্য নেই। যেমন– শায়খ দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্টভাবে বলবেন (আমি এক ব্যক্তিকে বা আল্লাহর এক বান্দাকে অনুমতি দিলাম)।

অনুরূপভাবে অস্তিত্বহীন অনুমতির কোনো ধর্তব্য নেই। যেমন– শায়খ বলবেন, অমুকের যে ছেলেটি জন্ম নেবে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। অবশ্য কেউ কেউ (আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ) বলেছেন, যদি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বশীলের উপর সংযোগ (আতফ) করে বলে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। যেমন– শায়খ বলবেন, আমি তোমাকে এবং তোমার যে সন্তান জন্ম নেবে তাকে অনুমতি দিলাম। তবে সহীহ না হওয়াটাই সত্যের বেশি নিকটবর্তী।

অনুরূপভাবে উপস্থিত বা অস্তিত্বহীনের জন্য ঐ অনুমতিরও ধর্তব্য নেই যা অপরের ইচ্ছার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন– শায়খ বলবেন, যদি অমুক ব্যক্তি চায় তাহলে তোমাকে অনুমতি দিলাম। অথবা অমুক ব্যক্তি যাকে চায় আমি তাকে অনুমতি দিলাম। শায়খ এটা বলেন না যে, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যদি তুমি চাও (কেননা, এমন বলাটা শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইজাযত বা অনুমতির জন্য চারটি বিষয় প্রয়োজন হয়। ১. অনুমতির শব্দ উচ্চারণ করা। যেমন– এমন বলা, اَجَزْتُ لَكَ তথা আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। ২. مُجِيْز অর্থাৎ অনুমতিদাতা কোনো একজন হওয়া। ৩. مُجَاز অর্থাৎ কোনো এক ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া। এর অপর নাম مُجَاز لَهٗ অর্থাৎ যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৪. مُجَاز بِهٖ অর্থাৎ যার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আর তা হলো হাদীস।

اِجَازَة عَامَّة-এর সংজ্ঞা : এর অর্থ– সাধারণ অনুমতি। তবে উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় اِجَازَة عَامَّة বলা হয়, শায়খ যদি বলেন– সকল মুসলমানকে কিংবা যারা আমার জীবদ্দশায় বর্তমান রয়েছে তাদেরকে কিংবা অমুক মহাদেশের লোকদেরকে কিংবা অমুক শহরের লোকদেরকে আমি অনুমতি দিলাম, তাহলে এর নাম ইজাযতে আম্মাহ।

ইজাযতে আম্মাহ -এর আরেকটি অর্থ হলো, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শায়খ তার সকল হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেবেন। যেমন– বলবেন, أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَرْوِيَاتِي অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার সকল হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দিলাম।

এ সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে প্রথম সংজ্ঞায় مُجَازٌ لَهُ অর্থাৎ ছাত্র عَام বা অনির্দিষ্ট, আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় مُجَازٌ لَهُ খাস হলেও مُجَازٌ بِهِ টা عَام।

إِجَازَةٌ عَامَّةٌ -এর হুকুম : إِجَازَةٌ عَامَّةٌ -এর মধ্যে مُجَازٌ بِهِ অর্থাৎ হাদীস عَام হলে– এমন إِجَازَةٌ عَامَّةٌ জায়েজ। তবে যদি مُجَازٌ لَهُ আম বা সাধারণ হয়, তাহলে উপরোল্লিখিত সুরতের মধ্যে মাত্র একটি সুরত জায়েজ হতে পারে। আর তা হলো, শায়খ বলবেন– أَجَزْتُ لِأَهْلِ الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ অর্থাৎ আমি অমুক শহরের লোকদের অনুমতি দিলাম। এ ছাড়া বাকি কোনো إِجَازَةٌ عَامَّةٌ ধর্তব্য নয়।

إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُوْلِ -এর সংজ্ঞা : মুবহাম অথবা মুহমাল ব্যক্তিকে ইজাযত দেওয়াকে إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُوْلِ বলে। অন্য ভাষায় একে এভাবে বলা যায় যে, শায়খ কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে রেওয়ায়েতের অনুমতি দেন। যেমন– তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে অথবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে রেওয়ায়েতের অনুমতি দিলাম। অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকেই দেন কিন্তু সে নামটি অনেক ব্যক্তির হওয়ায় ব্যক্তি অজ্ঞাত থেকে যায়। যেমন– বলেন যে, আমি মুহাম্মদকে অনুমতি দিলাম। অথচ মুহাম্মদ কয়েক ব্যক্তির নাম।

إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُوْلِ -এর হুকুম : এমন অনুমতির দ্বারা হাদীস রেওয়ায়েত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।

إِجَازَةٌ بِالْمَجْهُوْلِ -এর সংজ্ঞা : শায়খ কোনো ব্যক্তিকে অজ্ঞাত হাদীস রেওয়ায়েত করার অনুমতি দেওয়া যেমন– এমন বলা, أَجَزْتُ لَكَ بَعْضَ مَسْمُوْعَاتِي অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার শ্রুত কিছু হাদীস রেওয়ায়েতের অনুমতি দিলাম।

إِجَازَةٌ بِالْمَجْهُوْلِ -এর হুকুম : إِجَازَةٌ لِلْمَجْهُوْلِ -এর ন্যায় এর দ্বারাও রেওয়ায়েত করা নাজায়েজ।

إِجَازَةٌ لِلْمَعْدُوْمِ -এর সংজ্ঞা : অনুপস্থিত ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদানের নাম إِجَازَةٌ لِلْمَعْدُوْمِ। যেমন– শায়খ বলবেন, أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُوْلَدُ لِفُلَانٍ অর্থাৎ অমুকের যে বাচ্চা জন্ম নেবে তাকে অনুমতি দিলাম।

إِجَازَةٌ لِلْمَعْدُوْمِ -এর হুকুম : এমন إِجَازَة জায়েজ আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. জুমহুরের মতে জায়েজ নেই।

২. মুতাকদ্দিমীনের মধ্য হতে আবূ বকর ইবনে আবূ দাঊদ সাযিসতানী এবং আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দা বলেছেন, যদি مَعْدُوْم -কে مَوْجُوْد -এর উপর عَطْف করে যেমন বলে– أَجَزْتُ لَكَ وَلِمَنْ سَيُوْلَدُ لَكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে ও তোমার যে পুত্র জন্ম নেবে তাকে অনুমতি দিলাম, তাহলে তা জায়েজ হবে।

তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, إِجَازَةٌ لِلْمَعْدُوْمِ -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ না হওয়াটাই সত্যের বেশি নিকটবর্তী।

إِجَازَةٌ مُعَلَّقَةٌ -এর সংজ্ঞা : অনুমতিকে কারো ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করাকে إِجَازَةٌ مُعَلَّقَةٌ বলে। যেমন– শায়খ বলেন, أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ অর্থাৎ আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যদি অমুকে চায়। অথবা বলেন– أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি যাকে চায় আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

إِجَازَةٌ مُعَلَّقَةٌ -এর হুকুম : এমন إِجَازَة -এর মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা জায়েজ হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. জুমহুরের মতে নাজায়েজ।

২. তবে আবূ বকর ইবনে আবূ খায়ছামাহ -এর মতে জায়েজ।

অবশ্য শায়খ যদি এমন বলেন যে, أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ অর্থাৎ 'আমি তোমাকে অনুমতি **দিলাম যদি** তুমি চাও।' তাহলে এমন অনুমতির মাধ্যমে রেওয়ায়েত করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ হবে।

وَهٰذَا عَلَى الْاَصَحِّ فِى جَمِيْعِ ذٰلِكَ وَقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ فِى جَمِيْعِ ذٰلِكَ سِوَى الْمَجْهُوْلِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ الْخَطِيْبُ وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَائِخِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْاِجَازَةَ لِلْمَعْدُوْمِ مِنَ الْقُدَمَاءِ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ دَاوٗدَ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْدَةَ وَاسْتَعْمَلَ الْمُعَلَّقَةَ مِنْهُمْ اَيْضًا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَ رَوٰى بِالْاِجَازَةِ الْعَامَّةِ جَمْعٌ كَثِيْرٌ جَمَعَهُمْ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِىْ كِتَابٍ وَ رَتَّبَهُمْ عَلٰى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ وَكُلُّ ذٰلِكَ كَمَا قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ تَوَسُّعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ لِاَنَّ الْاِجَازَةَ الْخَاصَّةَ الْمُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِىْ صِحَّتِهَا اِخْتِلَافًا قَوِيًّا عِنْدَ الْقُدَمَاءِ وَاِنْ كَانَ الْعَمَلُ اِسْتَقَرَّ عَلٰى اِعْتِبَارِهَا عِنْدَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ فَهِىَ دُوْنَ السَّمَاعِ بِالْاِتِّفَاقِ فَكَيْفَ اِذَا حَصَلَ فِيْهَا الْاِسْتِرْسَالُ الْمَذْكُوْرُ فَاِنَّهَا تَزْدَادُ ضُعْفًا لٰكِنَّهَا فِى الْجُمْلَةِ خَيْرٌ مِنْ اِيْرَادِ الْحَدِيْثِ مُعْضَلًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاِلٰى هُنَا اِنْتَهَى الْكَلَامُ فِىْ اَقْسَامِ صِيَغِ الْاَدَاءِ .

অনুবাদ : মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যতীত উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে খতীবে বাগদাদী (র.) হাদীস বর্ণনা জায়েজ মনে করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজের কতিপয় শায়খের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন। মুতাকদ্দিমীনের মধ্য থেকে আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দা (র.) মা'দূম ও অস্তিত্বহীনকে অনুমতি দিয়েছেন। আবূ বকর ইবনে আবূ খায়ছামা প্রমুখ মুতাকাদ্দিম শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। ইজাযতে আম -এর উপর ভিত্তি করে বিরাট একদল হাদীস বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো হাফিজুল হাদীস বর্ণক্রমানুসারে তাদের নাম স্বতন্ত্রগ্রন্থে সংকলন করেছেন। কিন্তু ইবনুস সালাহ -এর মতে অনুমতির ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপকতা সমীচীন নয়। কেননা, সুনির্দিষ্টরূপে পাঠ ছাড়া ইজাযতে মু'আয়্যানা (মুতাআখখিরীন যা আমল করেন) সম্পর্কেই মুতাকাদ্দিমীনের কড়া দ্বিমত ছিল। সে কারণে প্রত্যক্ষভাবে শোনার চেয়ে এর মর্যাদা সকলেরই মতে কমে গেছে। অতঃপর এ ধরনের ব্যাপকতার কারণে অনুমতির মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তথাপি কোনো একটি হাদীসকে মু'যাল বা মু'আল্লাকরূপে বর্ণনা করার চেয়ে এ ধরনের অনুমতির উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করাও অধিক উত্তম। আল্লাহ ভালো জানেন। হাদীস বর্ণনার শব্দের প্রকারসমূহের আলোচনা সমাপ্ত হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. اِجَازَة عَامَّة ২. اِجَازَةٌ لِلْمَعْدُوْم ৩. اِجَازَة مُعَلَّقَة ইত্যাদি নাজায়েজ হওয়াটা হলো জুমহুরের অভিমত। আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তবে এগুলো খতীবে বাগদাদীর মতে জায়েজ। অবশ্য اِجَازَة لِلْمَجْهُوْلِ -এর ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় না পাওয়া গেলে তখন আবার এটা নাজায়েজ। আর যদি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে তা জায়েজ।

اِجَازَة خَاصَّة -এর সংজ্ঞা : শায়খ ছাত্রকে অনুমতি দেবেন; কিন্তু ছাত্র শায়খের সামনে কিছু পড়বে না– **এর নাম** اِجَازَة خَاصَّة।

اِجَازَة خَاصَّة -এর হুকুম : মুতাকাদ্দিমীনের মাঝে এটা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কঠিন মতভেদ থাকলেও **মুতাআখখিরীনের** মতে তা জায়েজ। এমন ইজাযতের মর্তবা জুমহুরের মতে سَمَاعٌ مِنَ الشَّيْخِ থেকে নিম্নের। **কিন্তু তারপরেও তা অর্থাৎ** এমন ইজাযত مُعْضَل বা مُعَلَّق করে হাদীস বর্ণনার চেয়ে ভালো। অবশ্য তকী ইবন

ثُمَّ الرُّوَاةُ اِنِ اتَّفَقَتْ اَسْمَائُهُمْ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِهِمْ فَصَاعِدًا وَاخْتَلَفَتْ اَشْخَاصُهُمْ سَوَاءٌ اِتَّفَقَ فِىْ ذٰلِكَ اِثْنَانِ مِنْهُمْ اَمْ اَكْثَرُ وَكَذٰلِكَ اِذَا اتَّفَقَ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا فِى الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهٖ خَشْيَةُ اَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصًا وَاحِدًا وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ الْخَطِيْبُ كِتَابًا حَافِلًا وَقَدْ لَخَّصْتُهٗ وَ زِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيْرًا وَهٰذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّوْعِ الْمُسَمّٰى بِالْمُهْمَلِ لِاَنَّهٗ يَخْشٰى مِنْهُ اَنْ يُظَنَّ الْوَاحِدُ اِثْنَيْنِ وَهٰذَا يُخْشٰى اَنْ يُظَنَّ الْاِثْنَانِ وَاحِدًا ـ

অনুবাদ : যদি দুই বা ততোধিক রাবীর নাম, তাদের পিতার নাম এবং তারও উপরের (অর্থাৎ পিতামহের) নাম এক হয়, অনুরূপ উপনাম ও বংশ পরিচয় এক হয় কিন্তু ব্যক্তি পৃথক পৃথক হয়, তাহলে তাকে বলে মুত্তাফিক ও মুফতারিক (নামের দিক দিয়ে মুত্তাফিক তথা এক কিন্তু অপর দিক তথা ব্যক্তির দিক দিয়ে মুফতারিক তথা ভিন্ন ভিন্ন)। এটি জানার উপকারিতা হলো, দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা। খতীবে বাগদাদী (র.) এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি তার সারসংক্ষেপ করেছি এবং তাতে আরো অনেক বিষয় সংযোজন করে দিয়েছি। এ শ্রেণিরই বিপরীত হলো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত মুহমাল (বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়বিশিষ্ট একক রাবী)। সেখানে একই ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি বলে ধারণা করার আশঙ্কা থাকে। আর এখানে একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করার আশঙ্কা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের কয়েক প্রকারের আলোচনা ইতঃপূর্বে চলে গেছে। আর তা হলো, ১. সাবিক-লাহিক, ২. মুহমাল, ৩. মুবহাম, ৪. মান হাদ্দাছা ওয়া নাসিয়া এবং ৫. মুসালসাল। এখান থেকে রাবীদেরই আরো কয়েক প্রকারের আলোচনা করা হচ্ছে। তবে এটা হলো রাবী নির্ণয়ে সন্দেহের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাবীদের নাম, উপনাম, ইত্যাদি এক হওয়ার কারণে অনেক সময় সন্দেহ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এখানে ব্যক্তি একজনই নাকি একাধিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ রাবী নির্ণয়ে জটিলতার দিক দিয়ে রাবী তিন প্রকার। ১. মুত্তাফিক-মুফতারিক, ২. মু'তালিফ-মুখতালিফ ও ৩. মুতাশাবিহ।

مُتَّفِقْ – مُفْتَرِقْ সম্পর্কে আলোচনা : লেখক এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ১. সংজ্ঞা, ২. ফায়দা ও ৩. এদের ও মুহমালের মধ্যে পার্থক্য। নিম্নে এ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

مُتَّفِقْ – مُفْتَرِقْ-এর আভিধানিক অর্থ : উভয়টি بَاب اِفْتِعَالْ হতে اِسْم فَاعِلْ-এর وَاحِد مُذَكَّرْ। مُتَّفِقْ (মুত্তাফিক) অর্থ– এক, একমত ইত্যাদি। আর مُفْتَرِقْ (মুফাতারিক) অর্থ– ভিন্ন, পৃথক ইত্যাদি।

مُتَّفِقْ - مُفْتَرِقْ -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় مُتَّفِقْ ও مُفْتَرِقْ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هُوَ مَا اتَّفَقَتْ اَسْمَاءُ الرُّوَاةِ اَوْ مَعَ اَسْمَاءِ الْاٰبَاءِ فَصَاعِدًا فِىْ اِثْنَانِ مِنْهُمْ اَمْ اَكْثَرَ وَكَذٰلِكَ اِتَّفَقَ اِثْنَانَ فَصَاعِدًا فِى الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ وَاخْتَلَفَتْ اَشْخَاصُهُمْ.

অর্থাৎ দুই বা ততোধিক রাবীর নাম অথবা তাদের নামের সাথে সাথে তাদের পিতা, পিতামহের নাম, উর্ধ্বতন পুরুষের নাম অনুরূপ উপনাম ও বংশ পরিচয় এক হওয়া; কিন্তু তাদের ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া।

নামকরণ : এমন রাবীদের নাম যেহেতু উচ্চারণে ও লেখায় এক হয়, তাই একে মুত্তাফিক বলে। সাথে সাথে যেহেতু তারা ব্যক্তি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই একে মুফতারিক বলে।

مُتَّفِقْ - مُفْتَرِقْ -এর কয়েকটি সুরত : এদের কয়েকটি ধরন হতে পারে।

১. কয়েকজন রাবীর নিজের নাম ও পিতার নাম এক। যেমন– খলীল ইবনে আহমাদ নামে কয়েকজন রাবী রয়েছেন।

২. কয়েকজন রাবীর নিজের নাম, পিতার নাম এবং দাদার নাম এক। যেমন– আহমাদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামদান নামে একই স্তরের চার রাবী রয়েছেন।

৩. কয়েকজনের কুনিয়াত এবং নিসবত এক। যেমন– আবূ ইমরান জাওনী নামে দুজন রাবী রয়েছেন।

৪. কয়েকজন রাবীর নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের নিসবত এক। যেমন– মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী নামে দুজন রাবী আছেন।

৫. কয়েকজন রাবীর কুনিয়াত এবং পিতার নাম এক। যেমন– আবূ বকর ইবনে আব্বাস নামে তিনজন রাবী রয়েছেন।

مُتَّفِقْ - مُفْتَرِقْ জানার ফায়দা : এর ফায়দা ও লাভ দুটি। যথা–

১. দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে মনে করা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

২. একই নামের কয়েকজন রাবীর মধ্য হতে কেউ নির্ভরযোগ্য হন, কেউ হন দুর্বল। مُتَّفِقْ ও مُفْتَرِقْ -এর عِلْمْ না থাকলে কে নির্ভরযোগ্য আর কে দুর্বল তা জানা যায় না; বরং ثِقَةْ ও ضَعِيْف নির্ণয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

مُتَّفِقْ - مُفْتَرِقْ ও مُهْمَلْ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে تَبَايُنْ-এর নিসবত অর্থাৎ একটি অপরটি হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীত। আর তা হলো, مُهْمَلْ -এর মধ্যে এক রাবীকে কয়েকজন রাবী মনে করার সম্ভাবনা থাকে। আর مُتَّفِقْ - مُفْتَرِقْ-এর মধ্যে একাধিক রাবীকে একজন মনে করার আশঙ্কা থাকে।

وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا سَوَاءٌ كَانَ مَرْجِعُ الْاِخْتِلَافِ النَّقْطَ وَالشَّكْلَ فَهُوَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ وَمَعْرِفَتُهُ مِنْ مُهِمَّاتِ هٰذَا الْفَنِّ حَتّٰى قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ أَشَدُّ التَّصْحِيْفِ مَا يَقَعُ فِي الْأَسْمَاءِ وَ وَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ وَلَا قَبْلَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدَهُ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ أَبُوْ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ لٰكِنَّهُ أَضَافَهُ إِلٰى كِتَابِ التَّصْحِيْفِ لَهُ ثُمَّ أَفْرَدَهُ بِالتَّالِيْفِ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيْدٍ فَجَمَعَ فِيْهِ كِتَابَيْنِ كِتَابًا فِيْ مُشْتَبَهِ الْأَسْمَاءِ وَكِتَابًا فِيْ مُشْتَبَهِ النِّسْبَةِ وَجَمَعَ شَيْخُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ ذٰلِكَ كِتَابًا حَافِلًا ثُمَّ جَمَعَ الْخَطِيْبُ ذَيْلًا ثُمَّ جَمَعَ الْجَمِيْعَ أَبُوْ نَصْرِ بْنُ مَاكُوْلَا فِيْ كِتَابِهِ الْإِكْمَالِ وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِيْ كِتَابٍ اٰخَرَ فَجَمَعَ فِيْهِ أَوْهَامَهُمْ وَبَيَّنَهَا وَكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ مَا جُمِعَ فِيْ ذٰلِكَ وَهُوَ عُمْدَةُ كُلِّ مُحَدِّثٍ بَعْدَهُ وَقَدْ اِسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ نُقْطَةَ مَا فَاتَهُ أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَهُ فِيْ مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ ثُمَّ ذَيَّلَ عَلَيْهِ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلِيْمٍ بِفَتْحِ السِّيْنِ فِيْ مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ وَكَذٰلِكَ أَبُوْ حَامِدِ بْنُ الصَّابُوْنِيِّ وَجَمَعَ الذَّهَبِيُّ فِيْ ذٰلِكَ مُخْتَصَرًا جِدًّا اِعْتَمَدَ فِيْهِ عَلَى الضَّبْطِ بِالْقَلَمِ فَكَثُرَ فِيْهِ الْغَلَطُ وَالتَّصْحِيْفُ الْمُبَائِنُ لِمَوْضُوْعِ الْكِتَابِ وَقَدْ يَسَّرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِتَوْضِيْحِهِ فِيْ كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ بِتَبْصِيْرِ الْمُنْتَبِهِ بِتَحْرِيْرِ الْمُشْتَبِهِ وَهُوَ مُجَلَّدٌ وَاحِدٌ فَضَبَطْتُهُ بِالْحُرُوْفِ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْمَرْضِيَّةِ وَ زِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا كَثِيْرًا مِمَّا أَهْمَلَهُ أَوْ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰى ذٰلِكَ.

অনুবাদ : যদি একাধিক রাবীর নাম লেখার পদ্ধতিতে এক হয় কিন্তু উচ্চারণের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে এর নাম হয় মু'তালিফ ও মুখতালিফ। উচ্চারণের পার্থক্যের কারণ হয় নুকতা আবার কখনো হয় আকৃতি। এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা ইলমুল হাদীসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি আলী ইবনুল মাদীনী (র.) বলেন, নামের ক্ষেত্রে যে বিকৃতি হয় তা খুবই জটিল। কেননা, এটি যেমন যুক্তিতে ধরা পড়ে না, তেমনি আগ-পিছের বর্ণনা থেকেও বুঝা যায় না। এ বিষয়ে আবূ আহমদ আসকারী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এটিকে তার 'আত-তাসহীফ' কিতাবের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, তাই আব্দুল গনী ইবনে মাযীদ স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিনি দু পর্বে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বে বিভ্রাটপূর্ণ নামসমূহ এবং দ্বিতীয় পর্বে বিভ্রাটপূর্ণ পরিচয়সমূহ উল্লেখ করেছেন। আব্দুল গনীর শায়খ ইমাম দারাকুতনীও এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতঃপর খতীবে বাগদাদী এর পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। অতঃপর এসব কিতাবকে আবূ নসর মাকূলা তার 'ইকমাল' গ্রন্থে একত্রিত করে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে যেসব বিষয় বাদ পড়ে

গিয়েছিল আবূ নসর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সেগুলোকে উল্লেখ করে সকলের সন্দেহকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আবূ নসরের কিতাবে যেহেতু সকল কিতাবের বিষয়বস্তু সমাবিষ্ট হয়েছিল সেজন্য তার পরের মুহাদ্দিসগণের নির্ভরতা ছিল এ কিতাবের উপর। আবূ নসরের কিতাব থেকে যা কিছু বাদ পড়ে গিয়েছিল কিংবা পরবর্তীতে উদ্ভূত হয়েছিল, সেগুলোর অভাব পূরণ করেন আবূ বকর ইবনে নুকতা তার এক বৃহৎ গ্রন্থে। অতঃপর মানসূর ইবনে সালীম ও আবূ হামিদ সাবূনী এরও পরিশিষ্ট রচনা করেন। ইমাম যাহাবীও এ বিষয়ে একটি খুব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এতে তিনি হরকত ও নুকতা শুধুমাত্র চিহ্ন দ্বারা দিয়েছেন (শব্দে বর্ণনা করেননি), তাই তাতে প্রচুর বিকৃতি ও ভুল হয়েছে, যা কিতাবের বিষয়বস্তুর সাথে সাযুজ্যহীন। (কেননা, কিতাবটি লেখাই হয়েছে ভুল শোধরানোর জন্য।) আল্লাহ তা'আলা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। আমি এগুলোকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি এক গ্রন্থে যার নাম 'তাবসীরুল মুনতাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ'। এটি একটি বৃহৎ কিতাব। এতে আমি নামগুলোকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে বর্ণমালা দ্বারা আয়ত্ত করে দিয়েছি। তা ছাড়া ইমাম যাহাবী যে বিষয়গুলো বাদ দিয়েছিলেন এবং যা তিনি অবহিত ছিলেন না, সেগুলোকেও আমি এর সাথে সংযোজন করে দিয়েছি। এর সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُؤْتَلِف - مُخْتَلِف -এর আভিধানিক অর্থ : উভয়টি بَاب اِفْتِعَال হতে اِسْم فَاعِل -এর وَاحِد مُذَكَّر। مُؤْتَلِف অর্থ– একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া। আর مُخْتَلِف অর্থ– ভিন্ন হওয়া।

مُؤْتَلِف - مُخْتَلِف -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় مُؤْتَلِف - مُخْتَلِف -এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ – هُوَ اَنْ تَأْتَلِفَ الْاَسْمَاءُ اَوِ الْاَلْقَابُ اَوِ الْاَنْسَابُ خَطًّا وَتَخْتَلِفَ نُطْقًا

অর্থাৎ যদি দুই বা ততোধিক রাবীর নাম অথবা উপাধি কিংবা বংশের নাম লেখায় এক রকম হয় কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন হয়, তবে তাকে اَلْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ বলে।

উদাহরণ : যেমন– ১. مِسْوَرٌ (মীম যের, সীন সাকিন এবং ওয়াও যবর) এবং مُسَوَّرٌ (মীম পেশ, সীন যবর, ওয়াও মুশাদ্দাদ যবর)। ২. سَلَامٌ (সালাম) তাশদীদ ছাড়া এবং سَلَّامٌ (সাল্লাম) তাশদীদযুক্ত ইত্যাদি।

নামকরণের কারণ : যেহেতু এ সকল রাবীর নাম লেখায় এক রকম হয়, তাই তাকে مُؤْتَلِف বলে। পক্ষান্তরে উচ্চারণে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই তাকে مُخْتَلِف বলে।

مُؤْتَلِف - مُخْتَلِف জানার ফায়দা : এর বড় লাভ হলো, এর মাধ্যমে বিকৃতি এবং পরিবর্তন হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

تَصْحِيْف বা বিকৃতি দু প্রকার। ১. تَصْحِيْفٌ فِى الْمَتْنِ ২. تَصْحِيْفٌ فِى السَّنَدِ ; এর মধ্যে দ্বিতীয়টি বুঝা প্রথমটি হতে বেশি জটিল। কেননা, তার জন্য এমন কোনো নির্দেশনা থাকে না, যা দ্বারা তাসহীফ বা বিকৃত হওয়া না হওয়া জানা যায়। কিন্তু تَصْحِيْفٌ فِى الْمَتْنِ টা এর বিপরীত। কেননা, সেখানে আগে-পিছে দেখে তাসহীফ হওয়া না হওয়া সম্পর্কে জানা যায়।

اَلْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ এবং اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ -এর মধ্যে পার্থক্য : এদের মধ্যে পার্থক্য হলো, اَلْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ -এর মধ্যে রাবীর নাম উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়; পক্ষান্তরে اَلْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ -এর মধ্যে রাবীর নাম উচ্চারণে এক হয়।

وَاِنْ اِتَّفَقَتِ الْاَسْمَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا وَاخْتَلَفَتِ الْاٰبَاءُ نُطْقًا مَعَ اِيْتِلَافِهَا خَطًّا كَمُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ بِضَمِّهَا فَالْاَوَّلُ نِيْسَابُوْرِيٌّ وَالثَّانِىْ فِرْيَابِيٌّ وَهُمَا مَشْهُوْرَانِ وَطَبْقَتُهُمَا مُتَقَارِبَةٌ اَوْ بِالْعَكْسِ كَانْ يَخْتَلِفَ الْاَسْمَاءُ نُطْقًا وَيَأْتَلِفَ خَطًّا وَيَتَّفِقَ الْاٰبَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا كَشُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ وَسُرَيْجِ ابْنِ النُّعْمَانِ اَلْاَوَّلُ بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ يَرْوِىْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَالثَّانِىْ بِالسِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيْمِ وَهُوَ مِنْ شُيُوْخِ الْبُخَارِيِّ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ الْمُتَشَابِهُ وَكَذَا اِنْ وَقَعَ ذٰلِكَ الْاِتِّفَاقُ فِى الْاِسْمِ وَاِسْمِ الْاَبِ وَالْاِخْتِلَافُ فِى النِّسْبَةِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ الْخَطِيْبُ كِتَابًا جَلِيْلًا سَمَّاهُ تَلْخِيْصَ الْمُتَشَابِهِ ثُمَّ ذَيَّلَ عَلَيْهِ اَيْضًا بِمَا فَاتَهُ اَوَّلًا وَهُوَ كَثِيْرُ الْفَائِدَةِ ـ

অনুবাদ : যদি রাবীদের নামের আকৃতি ও উচ্চারণ সমান হয়, কিন্তু তাদের পিতার নামের আকৃতি সমান ও উচ্চারণ পৃথক হয়, যেমন– মুহাম্মদ ইবনে আকীল ও মুহাম্মদ ইবনে উকাইল; প্রথমজন নিশাপুরী, অপরজন ফিরয়াবী, দুজনেই প্রসিদ্ধ এবং দুজনের স্তর কাছাকাছি, অথবা এর বিপরীত রূপ অর্থাৎ রাবীদের নামের আকৃতি সমান কিন্তু উচ্চারণ পৃথক এবং তাদের পিতার নামের আকৃতি ও উচ্চারণ সমান। যেমন– শুরায়হ ইবনুন নু'মান ও সুরায়জ ইবনুন নুমান, প্রথমজন শীন ও হা সহকারে, তাবেয়ী, হযরত আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয়জন সীন ও জীম সহকারে, ইমাম বুখারীর অন্যতম শায়খ। এ ধরনের রাবীদেরকে বলা হয় মুতাশাবিহ। তেমনি যদি রাবীদের ও তাদের পিতার নামে উচ্চারণ ও আকৃতির দিক দিয়ে মিল থাকে, কিন্তু বংশ পরিচয় ভিন্ন হয়, তাহলে তাকেও মুতাশাবিহ বলা হয়।

মুতাশাবিহ সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার তিনি নাম দিয়েছেন তালখীসুল মুতাশাবিহ। অতঃপর তার একটি পরিশিষ্ট রচনা করে প্রথমে যেসব বিষয় বাদ পড়ে গিয়েছিল তা পূরণ করে দিয়েছেন। গ্রন্থটি খুবই উপকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَشَابِه : মূলত কোনো একক প্রকার না; বরং তা পূর্বোক্ত দু প্রকারের মাধ্যমে গঠিত হয়। নিম্নে مُتَشَابِه-এর সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

مُتَشَابِه-এর আভিধানিক অর্থ : مُتَشَابِه শব্দটি بَاب تَفَاعُلْ হতে اِسْم فَاعِلْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ এর অর্থ– সদৃশ, সাদৃশ্যপূর্ণ, সাযুজ্য ইত্যাদি।

مُتَشَابِه -এর পারিভাষিক অর্থ : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় **مُتَشَابِه** হলো–

هُوَ اِنْ تَتَّفِقَ اَسْمَاءُ الرُّوَاةِ لَفْظًا وَخَطًّا وَتَخْتَلِفُ اَسْمَاءُ الْاٰبَاءِ لَفْظًا لَا خَطًّا اَوِ الْعَكْسُ .

অর্থাৎ যদি দুই বা ততোধিক রাবীর নাম উচ্চারণ ও লেখায় এক রকম হয়, কিন্তু তাদের পিতাদের নাম উচ্চারণে ভিন্ন– তবে লেখায় এক রকম অথবা রাবীদের পিতার নাম উচ্চারণে ও লেখায় এক, কিন্তু রাবীদের নাম উচ্চারণে ভিন্ন অথচ লেখায় এক রকম, তাহলে একে বলে মুতাশাবিহ।

اَلْمُتَشَابِهُ -এর সুরত : এ সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে, **اَلْمُتَشَابِهُ** -এর সুরত তিনটি। যথা–

১. ঐ এক নামীয় রাবী যাদের পিতার নাম লেখতে এক, কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন। যেমন– **مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلٍ** এবং **مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلٍ** । এর মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ হলো মুহাম্মদ ইবনে আকীল আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ মুহাম্মদ ইবনে উকাইল। প্রথমজন নিশাপুরী আর দ্বিতীয়জন ফিরয়াবী।

২. রাবীদের পিতার নাম উচ্চারণ ও লেখায় এক কিন্তু রাবীদের নাম উচ্চারণে ভিন্ন, কিন্তু লেখায় এক। যেমন– **شُرَيْحُ بْنُ نُعْمَانَ** এবং **سُرَيْجُ بْنُ نُعْمَانَ**। এর মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ শুরায়হ ইবনে নু'মান আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ সুরায়য ইবনে নু'মান। প্রথমজন তাবেয়ী আর দ্বিতীয়জন ইমাম বুখারীর ওস্তাদ।

৩. রাবীদের এবং তাদের পিতার নাম লেখায় এবং উচ্চারণে এক কিন্তু নিসবত উচ্চারণে ভিন্ন হলেও লেখায় এক। যেমন– **مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَخْرِمِيْ** এবং **مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مُخَرِّمِيْ** । এর মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মাখিরমী আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মাখরিমী। প্রথমজন ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ীর শায়খ আর দ্বিতীয়জন ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র।

وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ اَنْوَاعٌ مِنْهَا اَنْ يَحْصُلَ الْاِتِّفَاقُ اَوِ الْاِشْتِبَاهُ فِى الْاِسْمِ
وَاِسْمِ الْاَبِ مَثَلًا اِلَّا فِى حَرْفٍ اَوْ حَرْفَيْنِ فَاَكْثَرَ مِنْ اَحَدِهِمَا اَوْ مِنْهُمَا وَهُوَ
عَلٰى قِسْمَيْنِ اِمَّا بِاَنْ يَكُوْنَ الْاِخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيْرِ مَعَ اَنَّ عَدَدَ الْحُرُوْفِ ثَابِتَةٌ
فِى الْجِهَتَيْنِ اَوْ يَكُوْنَ الْاِخْتِلَافُ بِالتَّغْيِيْرِ مَعَ نُقْصَانِ بَعْضِ الْاَسْمَاءِ عَنْ
بَعْضٍ فَمِنْ اَمْثِلَةِ الْاَوَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ بِكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَنُوْنَيْنِ
بَيْنَهُمَا اَلِفٌ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْعَوَقِىْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ ثُمَّ الْقَافُ شَيْخُ
الْبُخَارِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَيَّارٍ بِفَتْحِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيْدِ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ
وَبَعْدَ الْاَلِفِ رَاءٌ وَهُمْ اَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْيَمَامِيُّ شَيْخُ عُمَرَ بْنِ يُوْنُسَ
وَمِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَنُوْنَيْنِ الْاُوْلٰى مَفْتُوْحَةٌ
بَيْنَهُمَا يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ تَابِعِيٌّ يَرْوِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهٖ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ
بِالْجِيْمِ بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَاٰخِرُهٗ رَاءٌ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ تَابِعِيٌّ
مَشْهُوْرٌ اَيْضًا وَمِنْ ذٰلِكَ مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ كُوْفِيٌّ مَشْهُوْرٌ وَمُطَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ
بِالطَّاءِ بَدَلَ الْعَيْنِ شَيْخٌ اٰخَرُ يَرْوِىْ عَنْهُ اَبُوْ حُذَيْفَةَ النَّهْدِىُّ وَمِنْهُ اَيْضًا اَحْمَدُ
بْنُ الْحُسَيْنِ صَاحِبُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ وَاٰخَرُوْنَ وَ اَحْيَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ مِثْلُهٗ لٰكِنْ
بَدَلَ الْمِيْمِ يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ وَهُوَ شَيْخٌ بُخَارِيٌّ يَرْوِىْ عَنْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْبِيْكَنْدِىْ وَمِنْ ذٰلِكَ اَيْضًا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ شَيْخٌ بُخَارِىٌّ مَشْهُوْرٌ مِنْ طَبَقَةِ
مَالِكٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ شَيْخٌ مَشْهُوْرٌ شَيْخٌ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسَى الْكُوْفِيِّ
اَلْاَوَّلُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ وَالثَّانِىْ بِالْجِيْمِ وَالْعَيْنِ
الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ ثُمَّ رَاءٌ۔

অনুবাদ : মুত্তাফিক, মু'তালিফ ও মুতাশাবিহ -এর সংমিশ্রণে আরো কিছু শ্রেণি সৃষ্টি হয়। যেমন–

১. রাবীদের বা তাদের পিতার কিংবা উভয়ের নামে ঐক্য কিংবা সাদৃশ্য (ইত্তিফাক বা ইশতিবাহ) থাকলেও কোনো একটিতে এক হরফ, দুই হরফ কিংবা ততোধিক হরফে গড়মিল থাকে, কিংবা উভয়টিতে গড়মিল থাকে। এটি আবার দু প্রকার।

ক. ইত্তিফাক বা ইশতিবাহ সৃষ্টি হয়েছে বিকৃতির কারণে। বস্তুত হরফ-সংখ্যা দু জায়গাতেই (সমানভাবে) বহাল আছে।

খ. কোনো একটি নামে হরফ-সংখ্যা কমিয়ে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ : مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (মুহাম্মদ ইবনে সিনান)। নুকতাহীন 'সীন' -এ যের ও দুটি 'নূন' যাদের মাঝে একটি 'আলিফ' রয়েছে। এ নামে অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম বুখারীর শায়খ আওয়াকী (عَوَقِى)। 'আইন' ও 'ওয়াও' -তে যবর অতঃপর দুই নুকতাবিশিষ্ট 'ক্বাফ'।

مُحَمَّدُ بْنُ سَيَّارٍ (মুহাম্মদ ইবনে সায়য়ার)। নুকতাহীন সীনে যবর, নিচে নুকতাবিশিষ্ট ইয়া -এ তাশদীদ এবং আলিফ -এর পরে 'রা'। এ নামেও অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন ওমর ইবনে ইউনুস -এর শায়খ য়ামামী (র.)।

مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ (মুহাম্মদ ইবনে হুনাইন)। নুকতাহীন 'হা' পেশ অতঃপর দুটি 'নূন', যাদের মাঝখানে একটি নিচে নুকতাবিশিষ্ট 'ইয়া', প্রথম 'নূন' -এ যবর। ইনি একজন তাবেয়ী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ (মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর)। 'জীম' -এ পেশ অতঃপর এক নুকতাবিশিষ্ট 'বা', শেষে 'রা'। ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম, একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী।

مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ (মুআররফ ইবনে ওয়াসিল) কূফী। ইনি খুব প্রসিদ্ধ।

مُطَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ (মুতাররফ ইবনে ওয়াসিল)। 'আইন' -এর স্থলে ত্বা। ইনি অপর এক মনীষী। আবূ হুযায়ফা নাহদী তাঁর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

أَحْمَدُ بْنُ حُسَيْنٍ (আহমাদ ইবনে হুসাইন)। ইনি হলেন ইব্রাহীম ইবনে সা'দ-এর সাথি। এছাড়া এ নামে আরো অনেক ব্যক্তি রয়েছেন।

أَحْيَدُ بْنُ حُسَيْنٍ (আহয়াদ ইবনে হুসাইন)। এখানে 'মীম' -এর স্থলে নিচে নুকতাবিশিষ্ট 'ইয়া'। ইনি বুখারার জনৈক মুহাদ্দিস। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আলবিকান্দী তাঁর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ (হাফস ইবনে মায়সারা)। ইনি বুখারার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং ইমাম মালিকের সমসাময়িক।

جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ (জা'ফর ইবনে মায়সারা)। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা আল-কূফীর শায়খ।

প্রথম ব্যক্তির (শেষ দুজনের মধ্য হতে) নামে নুকতাহীন 'হা' ও এক নুকতাবিশিষ্ট 'ফা', শেষে 'সাদ'। দ্বিতীয়জনের নামে রয়েছে 'জীম' ও নুকতাহীন 'আইন', শেষে 'ফা' ও 'রা'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَشَابِه এবং مُخْتَلِف - مُؤْتَلِف এ দু প্রকারের সংমিশ্রণে অতিরিক্ত আরো কয়েক প্রকার গঠিত হয়। যথা–

১. রাবীর নাম এবং তাদের পিতার নাম সমস্ত হরফে এক হবে, কিন্তু দু-একটি অক্ষর এক হবে না। যে হরফসমূহে এ ঐক্য ও ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তা আবার দু প্রকার। যথা–

ক. ভিন্নতা কোনো অক্ষর পরিবর্তন হওয়ার কারণে হবে; কিন্তু হরফ-সংখ্যা একই থাকবে। যেমন– أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ এবং أَحْيَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ। এরা দুজন রাবী। এদের মধ্যে শুধু মীম ও ইয়া -এর ক্ষেত্রে ভিন্নতা, কিন্তু উভয়ের হরফ-সংখ্যা একই। সম্মানিত লেখক এর আরো কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন– مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ এবং مُحَمَّدُ بْنُ سَيَّارٍ। অনুরূপ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ এবং مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ। অনুরূপ مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ এবং مُطَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ ইত্যাদি।

খ. ভিন্নতাটা হবে দু-এক হরফে পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং হরফ-সংখ্যাও সমান হবে না; বরং কমবেশি হবে। যেমন– حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ এবং جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ। حَفْص এবং جَعْفَر -এর মধ্যে হরফের পরিবর্তনের সাথে সাথে হরফ-সংখ্যাও এক নেই। কারণ, حَفْص -এর মধ্যে جَعْفَر থেকে এক হরফ কম। এর আরো উদাহরণ লেখক পেশ করেছেন।

وَمِنْ ذٰلِكَ اَيْضًا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ : সম্মানিত লেখক حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ এবং جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ -কে প্রথম প্রকারের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে শুধু অক্ষরের পরিবর্তন ঘটে, অক্ষর-সংখ্যা সমান থাকে। কিন্তু এ প্রকারের উদাহরণ হিসেবে حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ও جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ উল্লেখ করাটা ভুল হয়েছে। কেননা, এখানে অক্ষরের পরিবর্তনের সাথে সাথে অক্ষর সংখ্যাও কমবেশি হয়েছে। কেননা, جَعْفَر -এর মধ্যে হরফ-সংখ্যা চারটি; পক্ষান্তরে حَفْص -এর মধ্যে হরফ-সংখ্যা

وَمِنْ اَمْثِلَةِ الثَّانِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِى الصَّحَابَةِ صَاحِبُ الْاَذَانِ وَاِسْمُ جَدِّهٖ عَبْدُ رَبِّهٖ وَ رَاوِىُ حَدِيْثِ الْوُضُوْءِ وَاِسْمُ جَدِّهٖ عَاصِمٌ وَهُمَا اَنْصَارِيَّانِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بِزِيَادَةِ يَاءٍ فِىْ اَوَّلِ اِسْمِ الْاَبِ وَالزَّايِ مَكْسُوْرَةٍ وَهُمْ اَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِى الصَّحَابَةِ الْخَطْمِىُّ يُكْنٰى اَبَا مُوْسٰى وَحَدِيْثُهٗ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَالْقَارِىُ لَهٗ ذِكْرٌ فِىْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ اَنَّهُ الْخَطْمِىُّ وَفِيْهِ نَظَرٌ وَمِنْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى وَهُمْ جَمَاعَةٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَىٍّ بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِ الْجِيْمِ وَتَشْدِيْدِ الْيَاءِ تَابِعِىٌّ مَعْرُوْفٌ يَرْوِىْ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ (আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ)। এ নামে অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন সাহাবী, যিনি আজানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর দাদার নাম আবদু রাব্বিহী। আরেকজন হলেন অজুর হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর দাদার নাম আসিম। দুজনই আনসারী সাহাবী।

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ)। পিতার নামের শুরুতে 'ইয়া' যবর অতঃপর যা (زاء) -এ যের। এ নামেও অনেক ব্যক্তি রয়েছেন। একজন হলেন সাহাবী, যিনি খাতমী, তাঁর উপনাম আবূ মূসা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আরেকজন হলেন প্রসিদ্ধ কারী। হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীসে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। অনেকে মনে করেন ইনি খাতমীই। বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ।

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া)। এ নামেও অনেক ব্যক্তি রয়েছেন।

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَىٍّ (আব্দুল্লাহ ইবনে নুজাই)। 'নূনে' পেশ, 'জীমে' যবর, 'ইয়া' -এ তাশদীদ। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি হযরত আলী (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ যার মধ্যে হরফে পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে হরফ-সংখ্যাতেও কমবেশি হবে– তার কয়েকটি উদাহরণ লেখক আলোচ্য অংশে উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ এবং عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ। এদের মধ্যে يَزِيْدَ -এর তুলনায় زَيْدٍ -এর মধ্যে একটি অক্ষর কম।

২. عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى এবং عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُجَىٍّ। এদের মধ্যে نُجَىٍّ ও يَحْيٰى দুটি ভিন্ন নাম হওয়ার সাথে সাথে نُجَىٍّ -এর মধ্যে يَحْيٰى -এর তুলনায় এক অক্ষর কম।

اَوْ يَحْصُلُ الْاِتِّفَاقُ فِى الْخَطِّ وَالنُّطْقِ لٰكِنْ يَحْصُلُ الْاِخْتِلَافُ اَوِ الْاِشْتِبَاهُ بِالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ اِمَّا فِى الْاِسْمَيْنِ جُمْلَةً اَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ كَاَنْ يَقَعَ التَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْرُ فِى الْاِسْمِ الْوَاحِدِ فِىْ بَعْضِ حُرُوْفِهِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَا يَشْتَبَهُ بِهِ مِثَالُ الْاَوَّلِ الْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدِ وَيَزِيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَمِنْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ وَيَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمِثَالُ الثَّانِى اَيُّوْبُ بْنُ سَيَّارٍ وَاَيُّوْبُ بْنُ يَسَارٍ اَلْاَوَّلُ مَدَنِىٌّ مَشْهُوْرٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالْاٰخِرُ مَجْهُوْلٌ .

অনুবাদ : ২. আকৃতি ও উচ্চারণে মিল রয়েছে; কিন্তু গড়মিল বা বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে আগ-পিছ হবার কারণে। এই আগ-পিছ হতে পারে একসাথে দুই নামের মধ্যে অথবা একই নামের অক্ষরসমূহের মধ্যে। প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো اَلْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ (আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ) এবং يَزِيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ (ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ)। এটা সুস্পষ্ট (অর্থাৎ তার প্রথম প্রকার হতে হওয়া সুস্পষ্ট)। আরেকটি হলো عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ) এবং يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ (ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ)।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : اَيُّوْبُ بْنُ سَيَّارٍ (আইয়ূব ইবনে সাইয়্যার) এবং اَيُّوْبُ بْنُ يَسَارٍ (আইয়ূব ইবনে ইয়াসার)। প্রথমজন মদীনার অধিবাসী ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নন। অপরজন মাজহুল বা অজ্ঞাত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রাবীদের নাম লেখা ও উচ্চারণে এক, কিন্তু ভিন্নতা হবে আগ-পিছ হওয়ার কারণে। এটাও আবার দু প্রকার।

ক. উভয় রাবীর নাম একসাথে আগ-পিছ হয়ে ভিন্নতা হবে। اَلْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ এবং يَزِيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ। এমনিভাবে عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ এবং يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ।

খ. একই নামের অক্ষরসমূহের মধ্যে আগ-পিছ হওয়ার কারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হবে। যেমন– اَيُّوْبُ بْنُ سَيَّارٍ এবং اَيُّوْبُ بْنُ يَسَارٍ।

এ দু প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের তুলনায় প্রথম প্রকারটি সুস্পষ্ট। এখানে মূল নামটাই আগ-পিছ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সুরতে নাম আগ-পিছ হয় না; বরং একই নামের অক্ষরসমূহের মাঝে আগ-পিছ হয়।

خَاتِمَةٌ وَمِنَ الْمُهِمِّ فِىْ ذٰلِكَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَفَائِدَتُهُ الْاَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْمُشْتَبِهِيْنَ وَاِمْكَانُ الْاِطِّلَاعِ عَلٰى تَبْيِيْنِ التَّدْلِيْسِ وَالْوُقُوْفُ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْمُرَادِ مِنَ الْعَنْعَنَةِ وَالطَّبْقَةُ فِىْ اِصْطِلَاحِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ اِشْتَرَكُوْا فِى السِّنِّ وَلِقَاءِ الْمَشَائِخِ وَقَدْ يَكُوْنُ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ مِنْ طَبْقَتَيْنِ بِاِعْتِبَارَيْنِ كَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ثُبُوْتِ صُحْبَتِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ يُعَدُّ فِىْ طَبْقَةِ الْعَشَرَةِ مَثَلًا وَمِنْ حَيْثُ صِغَرِ السِّنِّ يُعَدُّ فِىْ طَبْقَةِ مَنْ بَعْدَهُمْ فَمَنْ نَظَرَ اِلَى الصَّحَابَةِ بِاِعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ جَعَلَ الْجَمِيْعَ طَبْقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانٍ وَغَيْرُهُ وَمَنْ نَظَرَ اِلَيْهِمْ بِاِعْتِبَارِ قَدْرٍ زَائِدٍ كَالسَّبْقِ اِلَى الْاِسْلَامِ اَوْ شُهُوْدِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ اَوِ الْهِجْرَةِ جَعَلَهُمْ طَبَقَاتٍ وَاِلٰى ذٰلِكَ جَنَحَ صَاحِبُ الطَّبَقَاتِ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْبَغْدَادِىُّ وَكِتَابُهُ اَجْمَعُ جُمِعَ فِىْ ذٰلِكَ مِنَ الْكُتُبِ وَكَذٰلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَهُمُ التَّابِعُوْنَ مَنْ نَظَرَ اِلَيْهِمْ بِاِعْتِبَارِ الْاَخْذِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَقَطْ جَعَلَ الْجَمِيْعَ طَبْقَةً وَاحِدَةً كَمَا صَنَعَ ابْنُ حِبَّانٍ اَيْضًا وَمَنْ نَظَرَ اِلَيْهِمْ بِاِعْتِبَارِ اللِّقَاءِ قَسَّمَهُمْ كَمَا فَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا وَجْهٌ ـ

অনুবাদ : উপসংহার : হাদীস চর্চাকারীগণের জন্য রাবীদের স্তরসমূহ জানা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে। যথা– বিভ্রাটপূর্ণ রাবীগণকে পরস্পর গুলিয়ে ফেলা থেকে মুক্ত থাকা, তাদলীস উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হওয়া, আনআনা পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসের স্বরূপ জানা (মুত্তাসিল না মুনকাতি') ইত্যাদি।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তবকা বা স্তর বলতে বুঝায় এমন একটি দল যাদের মধ্যে বয়স ও শায়খদের সাথে সাক্ষাতের দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

একই ব্যক্তি দু দিক দিয়ে দুই স্তরের হতে পারেন। যেমন– হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য লাভের দিক দিয়ে তাঁকে আশারায়ে মুবাশশারা -এর স্তরে গণ্য করা যেতে পারে; কিন্তু কম বয়সী হবার দিক দিয়ে আবার তাঁকে পরবর্তী স্তরে গণ্য করা হয়। যারা সাহাবীগণকে

শুধুমাত্র নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য লাভের দিক দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা সকলকে একটি মাত্র স্তরে গণ্য করেছেন। ইবনে হিব্বান প্রমুখ যেমন করেছেন। আর যারা অতিরিক্ত বিষয় বিবেচনা করেছেন, যেমন– ইসলাম গ্রহণে প্রবীণতা, প্রসিদ্ধ জিহাদসমূহে শরিক থাকা, হিজরত ইত্যাদি– তারা সাহাবীদেরকে কতিপয় স্তরে বিভক্ত করেছেন। এদিকে ঝুঁকেছেন 'আত-তাবাকাতুল কুবরা' -এর গ্রন্থকার আবু আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বাগদাদী। তার কিতাবটি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ।

সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের ব্যক্তি অর্থাৎ তাবেয়ীদের ব্যাপারেও এরূপ হয়েছে। যারা তাদেরকে শুধুমাত্র যে কোনো একজন সাহাবী থেকে হাদীস গ্রহণের দিক দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা তাদেরকে একটি মাত্র স্তরে গণ্য করেছেন। ইবনে হিব্বান এ ক্ষেত্রেও যেমনটি করেছেন। আর যারা তাদেরকে সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাতের (অধিক ও স্বল্পসংখ্যক সাহাবী) দিক দিয়ে বিবেচনা করেছেন, তারা তাদেরকে শ্রেণিকরণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ যেমনটি করেছেন। অবশ্য প্রত্যেকেরই যুক্তি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিতাবের শেষ পর্যায়ে এসে সম্মানিত লেখক খাতেমা বা সমাপনীতে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো, ১. রাবীদের স্তর জানার গুরুত্ব, ২. রাবীদের জন্ম ও ইন্তেকালের সময় সম্পর্কে জানার গুরুত্ব, ৩. রাবীদের শহর এবং দেশ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব, ৪. জরাহ ও তা'দীল সম্পর্কে রাবীদের অবস্থা জানার গুরুত্ব, ৫. জরাহ -এর স্তর জানা ও ৬. তা'দীলের স্তর জানা।

এগুলো রাবীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়, যা জানা প্রত্যেক হাদীস পাঠক বিশেষ করে হাদীসের ছাত্রের জন্য জানা আবশ্যক। সম্মানিত লেখক এ সকল বিষয়ে গভীর আলোচনা না করে; বরং প্রতিটি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় দিক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

طَبَقَة বা রাবীদের স্তর জানার ফায়দা : রাবীদের স্তর জানার ফায়দা তিনটি। যথা–

১. একই নামীয় ব্যক্তিদ্বয়কে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করা হতে বাঁচা যায়।

২. তাদলীস সম্পর্কে জানা যায়।

৩. হাদীসে মুআনআন -এর সনদ মুত্তাসিল না মুনকাতি' তা জানা যায়।

طَبَقَة -এর সংজ্ঞা : طَبَقَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো طَبَقَاتٌ। এর আভিধানিক অর্থ– স্তর, শ্রেণি ইত্যাদি। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় طَبَقَة -এর সংজ্ঞা হলো–

هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ اِشْتَرَكُوْا فِى السِّنِّ وَلِقَاءِ الْمَشَايِخِ ـ

অর্থাৎ তারা এমন একটি দল যারা বয়সের দিক দিয়ে (প্রায়) সমান এবং (একই) শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের দিক দিয়ে সম-অংশীদার হয়।

একই ব্যক্তির বিভিন্ন দিক : কখনো কোনো রাবী দুই দিক বিবেচনায় দুই তবকার অন্তর্ভুক্ত হন। যেমন– হযরত আনাস (রা.) সাহাবী হওয়ার দিক দিয়ে আশারায়ে মুবাশশারা তবকার অন্তর্গত। আবার তিনিই বয়স কম হওয়ার দিক বিবেচনায় সিগারে সাহাবা -এর তবকার অন্তর্গত হন।

ইবনে হিব্বান (র.) সমস্ত সাহাবীকে একই তবকায় গণ্য করেছেন। কারণ, সকলেই সাহাবী। কিন্তু ইবনে সা'দ (র.) সাহাবীদের মাঝে বিভিন্ন স্তর কায়েম করেছেন। হিজরত, জিহাদ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিক বিবেচনায় তিনি এই বিভক্তি করেছেন। সাহাবীদের ন্যায় সমস্ত তাবেয়ীকেও ইবনে হিব্বান (র.) এক তবকায় গণ্য করেছেন; কিন্তু শ্রেণিকারগণ বিভিন্ন দিক বিচারে তাদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যেহেতু এই ভাগ করা না করাটা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য মাত্র, তাই এতদুভয়ের মাঝে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। অর্থাৎ কেউ বিশেষ দিক বিবেচনায় এনেছেন বিধায় বিভিন্ন স্তর কায়েম করেছেন

আর কেউ এমন বিবেচনা করেননি বিধায় তারা সবাইকে এক কাতারে গণ্য করেছেন। উভয়টা নিজ নিজ স্থানে সঠিক এবং নির্ভুল।

اَلْكَمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ নামে রিজালশাস্ত্রের সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম হাফিজ আব্দুল গনী মাকদেসী (র.) (মৃত্যু ৬০০ হি.)। হাফিজ আবুল হাজ্জাজ ইফসুফ মিযযী (র.) (মৃত্যু ৭৪২ হি.) এ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে এর পূর্ণতাদানের জন্য অষ্টম শতাব্দীর সর্বজনপ্রিয় ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহযীবুল কামাল' রচনা করেন। 'তাহযীবুল কামাল' -এর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য হাফিজ যাহাবী (র.) সহ অনেকে এটি অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে আল্লামা আলাউদ্দীন মুগলতায়ী (র.) (মৃত্যু ৭৬২ হি.) অন্যতম। তাঁর গ্রন্থের নাম 'ইকমালু তাহযীবিল কামাল'।

পরবর্তীতে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) (মৃত্যু ৮৫২ হি:) হাফিজ মিযযী ও আল্লামা মুগলতায়ীর কিতাবদ্বয়কে সংক্ষেপ করে এবং নিজের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াবলি সংযোজন করে রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহযীবুত তাহযীব'। এ গ্রন্থ রচনার পর থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ রিজালশাস্ত্রের ব্যাপারে এর উপরই নির্ভর করে আসছেন। তবে এ গ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রাবীদের تَعْدِيْل ও جَرْح -এর ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত ও রায় ব্যক্ত করেননি; বরং ঐ রাবী সম্পর্কে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ কে কি বলেছেন তা-ই উল্লেখ করেছেন।

'তাহযীবুত তাহযীব' বিশাল গ্রন্থ, তাই শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) এরপর 'তাকরীবুত তাহযীব' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি রাবীদের সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ করেননি; বরং জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতামতের ভিত্তিতে তিনি রাবীদের تَعْدِيْل ও جَرْح বিষয়ে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। এতে তিনি রাবীদের تَعْدِيْل ও جَرْح -এর বিষয়ে আইম্মায়ে জরাহ ও তাদীলগণ যেসব শব্দ বা বাক্য কিংবা বাক্যবলি ব্যবহার করেছেন তার বিচারে রাবীদেরকে বারো স্তরে বিভক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে রাবীদের জন্ম-মৃত্যু ও হাদীস আহরণের দিক বিচারে রাবীদেরকে বারো তবকায় ভাগ করেছেন।

রাবীদের তবকা : নিম্নে সে বারো তবকা ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হলো।

১ম তবকা : اَلصَّحَابَةُ 'সাহাবায়ে কেরাম'। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) সকল সাহাবীকে এক তবকাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুতাকাদ্দিমীন মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণে প্রবীণতা, প্রসিদ্ধ জিহাদসমূহে অংশগ্রহণ, হিজরত ইত্যাদির বিচারে সাহাবায়ে কেরামকে কয়েক তবকায় সন্নিবেশিত করেছেন।

২য় তবকা : كِبَارُ التَّابِعِيْنَ। এরা হলেন সাহাবায়ে কেরামের সমবয়স্ক। যেমন– সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, মুখাযরামগণ। মুখাযরাম হলেন যিনি জাহিলিয়া-যুগও পেয়েছেন, ইসলাম-যুগও পেয়েছেন; কিন্তু ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ পাননি। এদের সংখ্যা প্রায় বিশ।

৩য় তবকা : اَلطَّبَقَةُ الْوُسْطٰى مِنَ التَّابِعِيْنَ। এরা হলেন প্রথম স্তরের তাবেয়ী। যেমন– হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখ।

৪র্থ তবকা : طَبَقَةٌ تَلِى الْوُسْطٰى مِنَ التَّابِعِيْنَ। এ তবকায় তারা, যাদের সাহাবীদের থেকে রেওয়ায়েত কম; كِبَارُ التَّابِعِيْنَ থেকেই যাদের রেওয়ায়েত বেশি। যেমন– ইমাম যুহরী (র.), হযরত কাতাদা (র.) প্রমুখ।

৫ম তবকা : اَلطَّبَقَةُ الصُّغْرٰى مِنَ التَّابِعِيْنَ। এ তবকায় তারা, যারা মাত্র এক দুজন সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। কেউ কেউ শুধু সাহাবীদের দেখেছেন, কিন্তু তাদের থেকে কোনো হাদীস শুনেননি। যেমন– হযরত আ'মাশ (র.), ইমাম আবূ হানীফা (র.)।

৬ষ্ঠ তবকা : اَلْاَخِيْرَةُ مِنَ التَّابِعِيْنَ। এ তবকায় তারা, যারা পঞ্চম তবকার রাবীদের সমকালীন, কিন্তু তারা কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পাননি। যেমন– ইবনে জুরাইজ (র.)।

৭ম তবকা : كِبَارُ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ। যেমন– ইমাম মালিক (র.), হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)।

৮ম তবকা : اَلطَّبَقَةُ الْوُسْطٰى مِنْ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ। যেমন– সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.), সুফিয়ান ইবনে উলাইয়্যা (র.)।

৯ম তবকা : اَلطَّبَقَةُ الصُّغْرٰى مِنْ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ । যেমন– ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), আবূ দাউদ তয়ালুসী (র.), আব্দুর রায্যাক (র.) প্রমুখ।

১০ম তবকা : كِبَارُ الْاٰخِذِيْنَ مِنْ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ । এরা তাবেয়ীদের সাক্ষাৎ পাননি। যেমন– ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

১১শ তবকা : اَلطَّبَقَةُ الْوُسْطٰى مِنَ الْاٰخِذِيْنَ مِنْ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ । যেমন– ইমাম যুহুলী (র.), ইমাম বুখারী (র.)।

১২শ তবকা : صِغَارُ الْاٰخِذِيْنَ مِنْ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ। যেমন– ইমাম তিরমিযী (র.)।

বি. দ্র. প্রথম দুই তবকার রাবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন ১০০ হিজরির পূর্বেই। ৩য় তবকা হতে ৯ম তবকা পর্যন্ত রাবীগণ ইন্তেকাল করেছেন ২০০ হিজরির পূর্বে। আর ৯ম থেকে বাকি তবকার রাবীগণ ইন্তেকাল করেছেন ২০০ হিজরির পরে।

مَرَاتِبُ الرُّوَاةِ বা রাবীদের স্তর : جَرْح وَتَعْدِيْل হিসেবেও হাফিজ ইবনে হাজার (র.) রাবীদেরকে বারো ভাগ করেছেন। যথা–

১ম স্তর : সাহাবায়ে কেরাম। সকল সাহাবায়ে কেরাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শ অনুযায়ী আদিল। হাদীসে এসেছে– **اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ** তথা সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ।

২য় স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যাদেরকে **تَعْدِيْل** বা প্রত্যয়ন করা হয়েছে দৃঢ়তার সাথে। এর দুই সুরত।

এক. **اِسْم تَفْضِيْل** -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– **فُلَانٌ اَوْثَقُ النَّاسِ, فُلَانٌ اَثْبَتُ النَّاسِ** ইত্যাদি।

দুই. প্রশংসাজ্ঞাপক একই শব্দ একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– **فُلَانٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ, فُلَانٌ ثَبْتٌ ثَبْتٌ** ইত্যাদি। অথবা, প্রশংসাজ্ঞাপক অনুরূপ অর্থবোধক পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– **فُلَانٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ, فُلَانٌ حَافِظٌ حُجَّةٌ, ثِقَةٌ ثَبْتٌ** ইত্যাদি।

৩য় স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যাদের ক্ষেত্রে একটি **صِفَةٌ مَادِحَةٌ** ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– **فُلَانٌ ثَبْتٌ, فُلَانٌ مُتْقِنٌ, فُلَانٌ عَدْلٌ** ইত্যাদি।

৪র্থ স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যারা তৃতীয় স্তরের চেয়ে একটু নিম্নপর্যায়ের। এদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে– **صَدُوْقٌ لَا بَأْسَ بِهٖ, لَيْسَ بِهٖ بَأْسٌ** শব্দদ্বয়ের যে কোনো একটি।

৫ম স্তর : এ স্তরে ঐ সকল রাবী যাদের জন্য নিম্নের ছয় প্রকারের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(١) صَدُوْقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ (٢) صَدُوْقٌ يَهِمُ (٣) صَدُوْقٌ لَهٗ اَوْهَامٌ (٤) صَدُوْقٌ يُخْطِئُ (٥) صَدُوْقٌ تَغَيَّرَ بِاٰخِرَةٍ (٦) فُلَانٌ رُمِيَ بِالرَّفْضِ ، فُلَانٌ رُمِيَ بِالْقَدْرِ ـ

অর্থাৎ কোনো গোমরাহ ফেরকার দিকে সম্পর্ক করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ স্তর : যে সকল রাবী থেকে অল্প হাদীস রেওয়ায়েত আছে এবং তাদের ব্যাপারে এমন কোনো جَرْح সাবেত নেই যার কারণে তাদের হাদীস মারদূদ হয়ে যায়। যদি এরূপ রাবীর مُتَابِعْ পাওয়া যায়, তবে তার ক্ষেত্রে مَقْبُوْل শব্দ ব্যবহার করা হয়। مُتَابِعْ যেমনই হোক না কেন। যদি مُتَابِعْ না পাওয়া যায়, তাহলে فُلَانٌ لَيِّنُ الْحَدِيْثِ অথবা فِيْهِ لَيِّنٌ অথবা فُلَانٌ لَيِّنٌ ব্যবহার হয়।

৭ম স্তর : এমন রাবীগণ যাদের শাগরেদ কম, তবে একের অধিক। তাদের সম্পর্কে কোনো ইমামের تَوْثِيْق (প্রত্যয়ন) নেই। এদের জন্য ব্যবহৃত হয় দুই শব্দ। ১. فُلَانٌ مَسْتُوْرٌ ২. فُلَانٌ مَجْهُوْلُ الْحَالِ

৮ম স্তর : ঐ সকল রাবী যাদের থেকে রেওয়ায়েতকারী কম, তবে একাধিক এবং কোনো ইমাম তাদেরকে এমন جَرْح مُبْهَم করেন, যে جَرْح প্রতিক্রিয়াশীল। তার জন্য ব্যবহার হয় এক শব্দ– فُلَانٌ ضَعِيْفٌ।

৯ম স্তর : ঐ সকল রাবী যাদের শাগরেদ একজন এবং কোনো ইমাম তাদেরকে جَرْح -ও করেননি, توثيق -ও করেননি। এদের জন্য ব্যবহার হয় مَجْهُوْل শব্দ। যেমন– فُلَانٌ مَجْهُوْلٌ।

১০ম স্তর : ঐ সকল রাবী যাদেরকে মজবুত جَرْح করা হয়েছে। এদের জন্য ব্যবহার হয় চার শব্দ–
(١) وَاهِيُ الْحَدِيْثِ (٢) مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ (٣) مَتْرُوْكٌ (٤) سَاقِطُ الْحَدِيْثِ

১১শ স্তর : ঐ সকল রাবী যারা مُتَّهَمٌ بِالْكِذْبِ। এদের জন্য ব্যবহার হয় فُلَانٌ رُمِيَ بِالْكِذْبِ, فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالْكِذْبِ।

১২শ স্তর : ঐ সকল রাবী যাদের ব্যাপারে প্রমাণিত হয় যে, তারা কম করে হলেও একটি হাদীস وَضْع (তৈরি) করেছেন। এদের জন্য ব্যবহৃত হয়–
(١) فُلَانٌ كَذَّابٌ (٢) فُلَانٌ وَضَّاعٌ (٣) فُلَانٌ اَكْذَبُ النَّاسِ (٤) فُلَانٌ رُكْنُ الْكِذْبِ (٥) فُلَانٌ دَجَّالٌ
(٦) فُلَانٌ مَنْبَعُ الْكِذْبِ (٧) فُلَانٌ مَعْدَنُ الْكِذْبِ

এ স্তরকে নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) দু স্তরে বিভক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ ১২ স্তরের তারতীব 'তাকরীবুত তাহযীব' অনুযায়ী। অন্যান্য رجال -এর কিতাব এই তারতীবের মুয়াফিক নাও হতে পারে। তাহযীবুত তাহযীবে প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে ৮/৯ উক্তি নকল করা হয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ -এ সেই উক্তির সারকথাকে সংক্ষেপে বুঝানোর জন্য এ ১২ স্তর উদ্ভাবন করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত ১২ স্তরের মধ্যে প্রথম তিন স্তরের রাবীদের হাদীস সহীহ, পরের দুই স্তরের রাবীদের হাদীস হাসান। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের রাবীদের হাদীস حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ, ৭ম ৮ম ও ৯ম স্তরের রাবীদের হাদীস যা'ঈফ। ১০ম ও ১২শ স্তরের রাবীদের হাদীস মারদূদ।

وَمِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ مَوَالِيْدِهِمْ وَ وَفِيَّاتِهِمْ لِاَنَّ مَعْرِفَتَهَا يَحْصُلُ الْاَمْنُ مِنْ دَعْوَى الْمُدَّعِىْ لِلِقَاءِ بَعْضِهِمْ وَهُوَ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ لَيْسَ كَذٰلِكَ وَ مِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ بُلْدَانِهِمْ وَاَوْطَانِهِمْ وَفَائِدَةُ الْاَمْنُ مِنْ تَدَاخُلِ الْاِسْمَيْنِ اِذَا اتَّفَقَا لٰكِنْ اِفْتَرَقَا بِالنَّسَبِ ـ

وَمِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ اَحْوَالِهِمْ تَعْدِيْلًا وَتَجْرِيْحًا وَجَهَالَةً لِاَنَّ الرَّاوِىَ اِمَّا اَنْ يُعْرَفَ عَدَالَتُهُ اَوْ يُعْرَفَ فِسْقُهُ اَوْ لَا يُعْرَفُ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذٰلِكَ وَمِنْ اَهَمِّ ذٰلِكَ بَعْدَ الْاِطِّلَاعِ مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ لِاَنَّهُمْ قَدْ يَجْرَحُوْنَ الشَّخْصَ بِمَا لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حَدِيْثِهِ كُلِّهِ وَقَدْ بَيَّنَّا اَسْبَابَ ذٰلِكَ فِيْمَا مَضٰى وَحَصَرْنَاهَا فِىْ عَشَرَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا مُفَصَّلًا وَالْغَرْضُ هُنَا ذِكْرُ الْاَلْفَاظِ الدَّالَّةِ فِىْ اِصْطِلَاحِهِمْ عَلٰى تِلْكَ الْمَرَاتِبِ ـ

অনুবাদ : হাদীস চর্চাকারীদের জন্য রাবীগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানাও জরুরি। এটা জানার ফলে কোনো ব্যক্তি যদি নবী করীম ﷺ, কোনো সাহাবী কিংবা কোনো তাবেয়ীর সাথে সাক্ষাতের দাবি করেন অথচ বাস্তবে তা না হন, তাহলে তা সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

রাবীদের দেশ ও তাদের বাসস্থান সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা জরুরি। এর ফলে একই নামের দুজন রাবীকে তাদের স্থান পরিচয়ের ভিত্তিতে পৃথক করা সম্ভব হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তা'দীল, জরাহ ও জাহালাতের দিক দিয়ে রাবীগণের অবস্থা অবগত হওয়া অর্থাৎ কোনো রাবী সম্পর্কে জানতে হবে যে, তিনি আদিল, অভিযুক্ত না অপরিচিত। কেননা, যে কোনো রাবী সম্পর্কে হয়তো তার আদিল হবার কথা জানা যাবে, নইলে ফাসিক হবার কথা অথবা কোনোটাই জানা যাবে না। (এটি জানা না গেলে হাদীসটি সহীহ কিনা তা নির্ণয় করা যাবে না।)

রাবীদের অবস্থা জানার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা জানা জরুরি তা হলো, জরাহ ও তা'দীলের স্তরসমূহ জানা। কারণ, অনেক সময় কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন জরাহ বা অভিযোগ করা হয়, যার দরুন তার সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করা জরুরি হয় না। (বরং কোথাও আংশিক প্রত্যাখ্যান আবার কোথাও আদৌ প্রত্যাখ্যান না করা জরুরি হয়।) জরাহ বা অভিযোগের কারণসমূহ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দশটি বিষয় সনাক্ত করা হয়েছে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় যে শব্দগুলো উক্ত স্তরসমূহ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তা উল্লেখ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানা : কোন রাবী কোন সনে জন্মগ্রহণ করেছেন আর কোন সনে ইন্তেকাল করেছেন হাদীসের ছাত্রদের সেটাও জানা জরুরি। এতে অনেক ফায়দা নিহিত আছে। তন্মধ্যে দুটি ফায়দা নিম্নরূপ–

১. কোনো রাবী কোনো শায়খের সাথে সাক্ষাতের মিথ্যা দাবি করলে তা প্রমাণ ও প্রকাশিত হয়ে যাবে। আর বাস্তবে এমনটি হয়েছেও। অনেকেই এরূপ মিথ্যা দাবি করেছে। ইতিহাস ও সন-তারিখের সুবাদে তাদের দাবির মিথ্যা হওয়া প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে তারা প্রশংসিত হওয়ার পরিবর্তে লাঞ্ছিত হয়েছে।

২. জন্ম-মৃত্যু তারিখ জানার আরেকটি ফায়দা এই যে, এর দ্বারা মুরসাল, মু'আল্লাক, মুনকাতি', মু'যাল সম্পর্কে জানা যায়। অবশ্য এটা রাবীদের স্তর হতেও জানা যায়।

রাবীদের দেশ ও বাসস্থান জানা : কোন রাবীর জন্মস্থান কোথায়, দেশ কোনটি, কোথায় বসবাস করেন তাও জানা জরুরি। এতে করে লাভ হলো, দুই রাবী নাম ইত্যাদির দিক দিয়ে মিলে গেলে দেশ-বাসস্থানের পরিচয়ে তাদের পৃথক করা যায়।

রাবী সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত বিষয় জানা জরুরি তার মধ্য হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'রাবীদের অবস্থা'। কেননা, রাবীদের কে আদিল, কে আদিল নয়, কে নির্ভরযোগ্য, কে নির্ভরযোগ্য নয়, কে পরিচিত, কে অপরিচিত এসব কিছু রাবীদের অবস্থা থেকেই জানা যায়। এ সমস্ত দিক বিচারে রাবী যদি প্রসিদ্ধ আদিল হয়, তাহলে তার হাদীস মাকবূল হয়, অন্যথায় মাকবূল হয় না। মোটকথা, হাদীসের ব্যাপারে সব রকম ফয়সালা রাবীদের অবস্থা জানার উপরই নির্ভরশীল।

جَرْح -এর আভিধানিক অর্থ : اَلْجَرْحُ (জীম বর্ণে যবর ও রা বর্ণে সাকিন) -এর আভিধানিক অর্থ- লোহা ইত্যাদি দ্বারা শরীর কাটা, ক্ষত করা, আহত করা।

جَرْح -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় جَرْح বলা হয়, রাবীকে এমন দোষে দোষী ও অভিযুক্ত করা, যা তার ন্যায়পরায়ণতাকে ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত করে।

جَرْح টা عَدَالَتْ -এর বিপরীত এবং طَعْن -এর সমার্থক। جَرْح -এর আসবাব বা কারণ দশটি। এগুলো আবার বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট। এসব জানা প্রয়োজন। এতে লাভ হলো, অনেক সময় ইমামগণ কোনো রাবীকে এমন শব্দ দ্বারা জরাহ বা অভিযুক্ত করেন, যাতে ঐ রাবীর সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয় না; বরং কোথাও আংশিক প্রত্যাখ্যান আবার কোথাও আদৌ প্রত্যাখ্যান না করা জরুরি হয়।

جَرْح ও تَعْدِيْل -এর শরয়ী হুকুম : تَعْدِيْل অর্থ- কাউকে ভালো বলা, প্রশংসা করা। এটা যে জায়েজ তা বলাই বাহুল্য এবং এর জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তির কথা জানা যায় না। কিন্তু جَرْح এর ব্যতিক্রম। جَرْح অর্থ- দোষ দেওয়া, দোষী করা, মন্দ বলা ইত্যাদি। যেহেতু এর মাধ্যমে কারো দোষ বর্ণনা করা হয়, তাই অনেকের কাছে ব্যাপারটি দৃশ্যত গিবত বলে মনে হয়। আর গিবত যেহেতু নাজায়েজ, তাই جَرْح -কেও নাজায়েজ বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, جَرْح ও تَعْدِيْل করা- এটা গিবত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই جَرْح - تَعْدِيْل করেছেন। তিনি কাউকে বলেছেন- عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ আবার কাউকে বলেছেন- بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ ; এর মধ্যে প্রথমটি تَعْدِيْل আর দ্বিতীয়টি جَرْح। সুতরাং খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেহেতু جَرْح - تَعْدِيْل সাবেত, তাই তা নাজায়েজ হওয়ার প্রশ্ন আসে না এবং তা গিবতও নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, সাধারণ দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হাদীসের আলোকে গিবত হলেও রাবীর جَرْح করাটা গিবত হবে না কেন ? এর উত্তর হলো, শরয়ী কোনো প্রয়োজন ছাড়া নিছক কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যদি কারো দোষচর্চা করা হয়, তাহলে সেটা গিবত হয়। কিন্তু কারো দোষের উল্লেখটা যদি শরয়ী প্রয়োজন, দীনের হেফাজত এবং কারো হক সংরক্ষণার্থে হয়, তাহলে তখন তা গিবত হয় না। যেহেতু রাবীর উপর হাদীসের সহীহ হওয়া না হওয়াটা নির্ভর করে আর রাবীর মধ্যে দোষ থাকলে হাদীস সহীহ হয় না, তাই তার মধ্যে দোষ থাকলে তা প্রকাশের মধ্যে দীনের হেফাজত নির্ভরশীল। সুতরাং এই দোষ বর্ণনাটা যেহেতু তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য হয় না; বরং দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্য করা হয়, তাই তা শরিয়তের দৃষ্টিতে গিবত বলে কথিত হয় না।

وَلِلْجَرْحِ مَرَاتِبُ اَسْوَأُهَا الْوَصْفُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيْهِ وَاَصْرَحُ ذٰلِكَ التَّعْبِيْرُ بِاَفْعَلَ كَاَكْذَبِ النَّاسِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ اِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِى الْوَضْعِ اَوْ هُوَ رُكْنُ الْكِذْبِ وَنَحْوُ ذٰلِكَ ثُمَّ دَجَّالٌ اَوْ وَضَّاعٌ اَوْ كَذَّابٌ لِاَنَّهَا وَاِنْ كَانَ فِيْهَا نَوْعُ مُبَالَغَةٍ لٰكِنَّهَا دُوْنَ الَّتِىْ قَبْلَهَا وَاَسْهَلُهَا اَيِ الْاَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَرْحِ قَوْلُهُمْ فُلَانٌ لَيِّنٌ اَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ اَوْ فِيْهِ اَدْنٰى مَقَالٍ وَبَيْنَ اَسْوَءِ الْجَرْحِ وَاَسْهَلِهِ مَرَاتِبُ لَا يَخْفٰى، فَقَوْلُهُمْ مَتْرُوْكٌ اَوْ سَاقِطٌ اَوْ فَاحِشُ الْغَلَطِ اَوْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ اَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِمْ ضَعِيْفٌ اَوْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اَوْ فِيْهِ مَقَالٌ ـ

অনুবাদ : অভিযোগের কয়েকটি (প্রধানত তিনটি) স্তর রয়েছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, এমন বিশেষণ ব্যবহার করা যা মুবালাগা বা চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশ করে। সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয় যদি তা কোনো ইসমে তাফযীল (তুলনাবোধক বিশেষণ) দ্বারা বর্ণনা করা হয়। যেমন- اَكْذَبُ النَّاسِ (সবচেয়ে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি), অথবা বানোয়াটের চূড়ান্ত, অথবা رُكْنُ الْكِذْبِ (মিথ্যার খুঁটি) এবং এ জাতীয় শব্দ। পরবর্তী স্তরের শব্দসমূহ হলো- كَذَّابٌ، وَضَّاعٌ، دَجَّالٌ ইত্যাদি। এগুলোতে যদিও কিছুটা মুবালাগা রয়েছে, কিন্তু তা প্রথম স্তরের চেয়ে একটু কম।

অভিযোগের সবচেয়ে নরম শব্দসমূহ হলো- لَيِّنٌ (নমনীয়), سَيِّئُ الْحِفْظِ (স্মৃতি দুর্বল), فِيْهِ اَدْنٰى مَقَالٌ (তার সম্পর্কে নিম্নতম কথা রয়েছে) ইত্যাদি। বলাবাহুল্য নিকৃষ্ট ও নরম অভিযোগের মাঝখানে অনেক স্তর রয়েছে। যেমন- مَتْرُوْكٌ، سَاقِطٌ، فَاحِشُ الْغَلَطِ، مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ইত্যাদি শব্দসমূহ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، ضَعِيْفٌ ، فِيْهِ مَقَالٌ ইত্যাদির তুলনায় গুরুতর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَرْح-এর স্তরসমূহ : মূলত جَرْح-এর তিন স্তর। ১. اَسْوَءُ الْجَرْحِ (সবচেয়ে নিকৃষ্ট অভিযোগ), ২. اَوْسَطُ الْجَرْحِ (মধ্যম মানের অভিযোগ) ও ৩. اَسْهَلُ الْجَرْحِ (সবচেয়ে নরম অভিযোগ)। অতঃপর প্রত্যেকতটার অধীনে আরও অনেক স্তর রয়েছে।

১. সবচেয়ে নিকৃষ্ট جَرْح হলো, যা এমন শব্দে হয়, যা চূড়ান্ত অভিযোগ বুঝায়। আর তা হলো, اِسْم تَفْضِيْل-এর সীগাহ দ্বারা جَرْح করা। যেমন, এভাবে বলা- هُوَ اَكْذَبُ النَّاسِ (সে সবচেয়ে মিথ্যুক)। এ শ্রেণিরই আরও শব্দ হলো- اِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِى الْوَضْعِ (তার মাধ্যমে বানোয়াট চূড়ান্ত হয়েছে), هُوَ رُكْنُ الْكِذْبِ (সে মিথ্যার খুঁটি), هُوَ مَنْبَعُ الْوَضْعِ اَوِ الْكِذْبِ (সে বানোয়াট কিংবা মিথ্যার উৎস) ইত্যাদি। এর থেকে নিম্নমানের হলো- هُوَ كَذَّابٌ, هُوَ وَضَّاعٌ, هُوَ دَجَّالٌ ইত্যাদি মুবালাগার শব্দ।

২. মধ্যম স্তরের جَرْح হলো, মুহাদ্দিসগণের উক্তি- هُوَ فَاحِشٌ, هُوَ سَاقِطٌ, هُوَ مَتْرُوْكٌ ইত্যাদি। এর চেয়ে একটু নিম্নমানের হলো- فِيْهِ مَقَالٌ, هُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ, هُوَ ضَعِيْفٌ ইত্যাদি।

৩. সবচেয়ে নরম শব্দ হলো, মুহাদ্দিসীনে কেরামের এই ভাষায় جَرْح করা যে, فُلَانٌ لَيِّنٌ, سَيِّئُ الْحِفْظِ, فِيْهِ مَقَالٌ ইত্যাদি।

মোটকথা, اَسْوَءُ الْجَرْحِ এবং اَسْهَلُ الْجَرْحِ-এর শব্দ ব্যতীত বাকি সমস্ত শব্দ হলো اَوْسَطُ الْجَرْحِ-এর। এ তিন স্তরের হুকুম হলো, যে রাবীর ব্যাপারে উল্লিখিত তিন ধরনের শব্দের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হলে তার কোনো হাদীস মাকবূল হবে না।

وَمِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ التَّعْدِيْلِ وَاَرْفَعُهَا الْوَصْفُ اَيْضًا بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيْهِ وَاَصْرَحُ ذٰلِكَ التَّعْبِيْرُ بِاَفْعَلَ كَاَوْثَقِ النَّاسِ اَوْ اَثْبَتِ النَّاسِ وَاِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِى التَّثَبُّتِ ثُمَّ مَا تَاَكَّدَ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْدِيْلِ اَوْ صِفَتَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ اَوْ ثَبْتٌ ثَبْتٌ اَوْ ثِقَةٌ حَافِظٌ اَوْ عَدْلٌ ضَابِطٌ اَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ وَاَدْنَاهَا مَا اَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ اَسْهَلِ التَّجْرِيْحِ كَشَيْخٍ يُرْوٰى حَدِيْثُهٗ وَيُعْتَبَرُ بِهٖ وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَبَيْنَ ذٰلِكَ مَرَاتِبُ لَا يَخْفٰى ۔

অনুবাদ : তা'দীল বা প্রত্যয়নের স্তর জানাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বোচ্চ স্তর হলো এমন **বিশেষণ** ব্যবহার করা যা মুবালাগা বা চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশ করে। এখানেও সবচেয়ে সুস্পষ্ট হয় যদি তা **ইসমে** তাফযীল দ্বারা বর্ণনা করা হয়। যেমন– اَثْبَتُ النَّاسِ ,اَوْثَقُ النَّاسِ (সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি), اِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِى التَّثَبُّتِ (নির্ভরতার চূড়ান্ত) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তর হলো, প্রত্যয়নবোধক একটি বা দুটি বিশেষণ দ্বারা জোরদার করা। যেমন– ثِقَةٌ ثِقَةٌ বা ثَبْتٌ ثَبْتٌ (নির্ভরযোগ্য নির্ভরযোগ্য), ثِقَةٌ حَافِظٌ (নির্ভরযোগ্য হাফিজ), عَدْلٌ ضَابِطٌ (নির্ভরযোগ্য আয়ত্তকারী) ইত্যাদি।

সর্বনিম্ন হলো, এমন শব্দসমূহ যা নিম্নতম অভিযোগের কাছাকাছি হবার কথা বুঝায়। যেমন– شَيْخٌ (একজন মনীষী), يُرْوٰى حَدِيْثُهٗ (তার হাদীস বর্ণনা করা হয়), يُعْتَبَرُ بِهٖ (তাকে বিবেচনা করা হয়) এবং এ জাতীয় শব্দ। এ দু স্তরের মাঝে যে আরো অনেক স্তর আছে সে বিষয়টি গোপন নয়, অর্থাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْدِيْل -এর আভিধানিক অর্থ : تَعْدِيْل শব্দটি بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো– ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত করা, প্রত্যয়ন করা।

تَعْدِيْل -এর পারিভাষিক অর্থ : উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় তা'দীল হলো, কোনো রাবীকে ভালো ও সৎ বলে সাব্যস্ত ও প্রত্যয়ন করা।

تَعْدِيْل -এর স্তর : جَرْح -এর মতো تَعْدِيْل -এরও তিনটি স্তর রয়েছে।

১. সর্বোচ্চ স্তর, ২. মধ্যস্তর ও ৩. নিম্নস্তর। নিম্নে প্রত্যেক স্তরের বিবরণ দেওয়া হলো।

১. **সর্বোচ্চ স্তর :** সর্বোচ্চ স্তরের তা'দীল হলো, যার মধ্যে মুবালাগা বিদ্যমান থাকে। যেমন– هُوَ اَوْثَقُ النَّاسِ ,فُلَانٌ اَثْبَتُ النَّاسِ ,فُلَانٌ اَحْفَظُ النَّاسِ ,اَعْدَلُ النَّاسِ ,اِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِى التَّثَبُّتِ ইত্যাদি।

২. **মধ্যস্তর :** আর তা হলো ঐ তা'দীল যা তা'দীলবাচক একটি শব্দের দ্বারা জোরালো করা হয়। যেমন– فُلَانٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ ,فُلَانٌ ثَبْتٌ ثَبْتٌ, অথবা দুটি শব্দ দ্বারা জোরালো করা হয়। যেমন– فُلَانٌ عَدْلٌ ضَابِطٌ ,ثِقَةٌ حَافِظٌ ইত্যাদি।

৩. **নিম্নস্তর :** নিম্নস্তরের তা'দীল হলো, এমন শব্দ দ্বারা তা'দীল করা, যা নরম অভিযোগের কাছাকাছি হয়। যেমন– يُرْوٰى حَدِيْثُهٗ তার হাদীস রেওয়ায়েত করা যায়, يُعْتَبَرُ بِهٖ তার হাদীস মুতা'আবাত এবং শাহিদ হিসেবে নেওয়া যায়, ইত্যাদি।

وَهٰذِهٖ اَحْكَامٌ يَتَعَلَّقُ بِذٰلِكَ وَ ذَكَرْتُهَا هُنَا تَكْمِلَةً لِلْفَائِدَةِ فَاَقُوْلُ تُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِاَسْبَابِهَا لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ لِئَلَّا يُزَكِّىَ بِمُجَرَّدِ مَا يَظْهَرُ لَهٗ اِبْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ وَاخْتِبَارٍ وَلَوْ كَانَتِ التَّزْكِيَةُ صَادِرَةً مِنْ مُزَكٍّ وَاحِدٍ عَلَى الْاَصَحِّ خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ اَنَّهَا لَا تُقْبَلُ اِلَّا مِنْ اِثْنَيْنِ اِلْحَاقًا لَهَا بِالشَّهَادَةِ فِى الْاَصَحِّ اَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اَنَّ التَّزْكِيَةَ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ وَالشَّهَادَةُ تَقَعُ مِنَ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَافْتَرَقَا وَلَوْ قِيْلَ يَفْصُلُ بَيْنَ مَا اِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ فِى الرَّاوِىْ مُسْتَنِدَةً مِنَ الْمُزَكِّىْ اِلَى اجْتِهَادِهٖ اَوْ اِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهٖ لَكَانَ مُتَّجِهًا لِاَنَّهٗ اِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ اَصْلًا لِاَنَّهٗ ح يَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ وَاِنْ كَانَ الثَّانِىْ فَيَجْرِىْ فِيْهِ الْخِلَافُ وَيَتَبَيَّنُ اَنَّهٗ اَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ لِاَنَّ اَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ فَكَذَا مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : সামনে কিছু আহকাম বর্ণনা করছি, যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি এখানে তা উল্লেখ করছি ফায়দার পূর্ণতার জন্য। সুতরাং আমি বলছি : বিশুদ্ধতর অভিমত অনুযায়ী এক ব্যক্তির প্রত্যয়নও গ্রহণযোগ্য। তবে প্রত্যয়নকারীকে প্রত্যয়নের কারণ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। সে ব্যক্তির প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে না, যিনি প্রত্যয়নের কারণ সম্পর্কে জানেন না। কেননা, কারণ না জেনে প্রত্যায়ন করলে তিনি কোনো অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই প্রাথমিক দৃষ্টিতে যা বুঝবেন তাই বলে দেবেন। অনেকেই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা সাক্ষ্য প্রদানের প্রত্যয়নের উপর কিয়াস করে অর্থাৎ সাক্ষীকে প্রত্যয়নের ব্যাপারটির যুক্তিকে এ ক্ষেত্রে পেশ করে বলতে চান যে, কমপক্ষে দুজন ব্যক্তি কোনো রাবীকে আদিল বলে প্রত্যয়ন না করলে সে প্রত্যয়ন বিবেচনা করা যাবে না। কেননা, সাক্ষীর প্রত্যয়নেও বিশুদ্ধতর অভিমত অনুযায়ী কমপক্ষে দুজন হওয়া জরুরি। কিন্তু এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা, সাক্ষীর প্রত্যয়ন ও আদিলের প্রত্যয়নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আদিলের প্রত্যয়ন হলো এক ধরনের রায়, যেখানে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। পক্ষান্তরে সাক্ষীর প্রত্যয়ন হলো বিচারকের সামনে সাক্ষ্য প্রদানের ন্যায়। তাই সেখানে সংখ্যার শর্ত রয়েছে।

এ মতপার্থক্য সেক্ষেত্রে হতে পারে না যা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হয়; বরং অন্যের কথা উদ্ধৃত করে প্রত্যয়ন করা হলে সেক্ষেত্রে হতে পারে। তবে উদ্ধৃতিমূলক প্রত্যয়নেও সংখ্যার শর্ত নেই। সুতরাং শাখায় তা কিরূপে শর্ত হতে পারে?

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَزْكِيَة -এর অর্থ : تَزْكِيَة শব্দটি بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ– প্রশংসা করা, সত্যতা প্রতিপাদন করা, বৃদ্ধি করা। পরিভাষায় تَزْكِيَة শব্দটি تَعْدِيْل -এর সমার্থবোধক। উদ্দেশ্য, কোনো রাবীর প্রশংসা বর্ণনা করা তথা তার প্রত্যয়ন করা।

تَزْكِيَة গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত : প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত কয়েকটি। যথা–

১. প্রত্যয়নকারী প্রত্যয়নের কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া।

২. প্রত্যয়নকারী নিজে আদিল হওয়া।

৩. অলসতা-উদাসীনতামুক্ত হওয়া।

প্রত্যয়নকারীর সংখ্যা : প্রত্যয়নকারী কমপক্ষে দুজন হতে হবে নাকি একজন হলেই চলবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. **জুমহুরের অভিমত :** তাঁদের মতে রাবীর প্রত্যয়নে কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত নয়; বরং সর্বনিম্ন একজনই যথেষ্ট। কারণ, রাবীর প্রত্যয়নকারী যদি নিজের পক্ষ হতে ইজতিহাদ করে প্রত্যয়ন করে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যয়নকারী হাকিম -এর মতো। আর যদি তিনি অন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এক্ষেত্রে তিনি মুখবির বা সংবাদদাতা। আর হাকিম ও সংবাদদাতার ক্ষেত্রে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। অতএব, একজনের প্রত্যয়নই যথেষ্ট ও ধর্তব্য হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত।

২. **কতিপয়ের অভিমত :** কেউ কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা রাবীর প্রত্যয়নকে সাক্ষ্যের প্রত্যয়নের উপর কিয়াস করে বলেন, যেভাবে কোনো সাক্ষ্যের প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হতে প্রত্যয়নকারী দুজন হওয়া শর্ত এবং একজনের প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হয় না, ঠিক তেমনিভাবে রেওয়ায়েতের প্রত্যয়নের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়নকারী দুজন হতে হবে– একজনের প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাদের কিয়াসের বিশ্লেষণ : রেওয়ায়েত প্রত্যয়নকে সাক্ষ্যের প্রত্যয়নের উপর কিয়াস করা যুক্তিহীন। কেননা, রাবীর প্রত্যয়নে প্রত্যয়নকারী হাকিমের (বিচারকের) মতো হন আর বিচারকের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যার শর্ত নেই। পক্ষান্তরে সাক্ষ্যের প্রত্যয়নে প্রত্যয়নকারী হন একজন সাক্ষীর মতো। আর সাক্ষী কমপক্ষে দুজন হতে হয়। এ বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় রাবী প্রত্যয়নের প্রশ্নে জুমহুরের অবস্থান ও অভিমত সর্বোচ্চ সঠিক।

تَزْكِيَة -এর প্রকারভেদ বনাম মতভেদ : تَزْكِيَة দু প্রকার। ১. প্রত্যয়নকারী নিজে ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো রাবীকে প্রত্যয়ন করবেন, অথবা ২. প্রত্যয়নকারী অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কাউকে প্রত্যয়ন করবেন। এর মধ্যে প্রথম প্রকারটি আসল প্রত্যয়ন, আর দ্বিতীয় প্রকারটি প্রথম প্রকারের শাখা। প্রত্যয়নকারীর সংখ্যা নিয়ে যে মতভেদ আছে তা প্রথম প্রকারের মধ্যে নয়; বরং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই যে, প্রত্যয়নকারী যদি নিজের ইজতিহাদীভাবে কাউকে প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এক্ষেত্রে তার একার প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য। এখানে দুজন হওয়ার শর্ত কেউ করেন না এবং তা হওয়ারই কোনো অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে প্রত্যয়নকারী যদি অপরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কোনো রাবীকে প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এক্ষেত্রে কতিপয় বলেন, এমন প্রত্যয়নের জন্য প্রত্যয়নকারী কমপক্ষে দুজন হতে হবে। কিন্তু তাদের এ দাবি সঠিক নয়। কেননা, দু প্রকারের প্রত্যয়নের মধ্যে যেটা আসল তার জন্য যখন সর্বসম্মতিক্রমে সংখ্যার শর্ত নেই, তখন যে প্রত্যয়নটা প্রথমটার শাখা তার জন্য সংখ্যার শর্ত কিভাবে হতে পারে? সংখ্যার শর্ত না হওয়ার পূর্বে আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কারো প্রত্যয়ন করলে এক্ষেত্রে প্রত্যয়নকারী মূলত একজন সংবাদদাতা হন, আর এটা সবার জানা ও মানা কথা যে, সংবাদদাতার ক্ষেত্রে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। অর্থাৎ এমন শর্ত নেই যে, কোনো একটি সংবাদ গ্রহণযোগ্য হতে হলে সংবাদাতার কমপক্ষে এতজন হতে হবে।

وَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يُقْبَلَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ اِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُ مَنْ اَفْرَطَ فَجَرَحَ بِمَا لَا يَقْتَضِىْ رَدًّا لِحَدِيْثِ الْمُحَدِّثِ كَمَا لَا يُقْبَلُ تَزْكِيَةُ مَنْ اَخَذَ بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ فَاَطْلَقَ التَّزْكِيَةَ وَقَالَ الذَّهَبِىُّ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِىْ نَقْدِ الرِّجَالِ لَمْ يَجْتَمِعْ اِثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هٰذَا الشَّانِ قَطُّ عَلٰى تَوْثِيْقِ ضَعِيْفٍ وَلَا عَلٰى تَضْعِيْفِ ثِقَةٍ اِنْتَهٰى وَلِهٰذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ اَنْ لَا يُتْرَكَ حَدِيْثُ الرَّجُلِ حَتّٰى يَجْتَمِعَ الْجَمِيْعُ عَلٰى تَرْكِهٖ وَلْيَحْذَرِ الْمُتَكَلِّمُ فِىْ هٰذَا الْفَنِّ مِنَ التَّسَاهُلِ فِى الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ فَاِنَّهٗ اِنْ عَدَّلَ بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ كَانَ كَالْمُثْبِتِ حُكْمًا لَيْسَ بِثَابِتٍ فَيَخْشٰى عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ فِىْ زُمْرَةِ مَنْ رَوٰى حَدِيْثًا وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهٗ كَذِبٌ وَاِنْ جَرَحَ بِغَيْرِ تَحَرُّزٍ اَقْدَمَ عَلَى الطَّعْنِ فِىْ مُسْلِمٍ بَرِيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَ وَسْمُهٗ بِمَيْسَمِ سُوْءٍ يَبْقٰى عَلَيْهِ عَارُهٗ اَبَدًا وَالْاٰفَةُ تَدْخُلُ فِىْ هٰذَا تَارَةً مِنَ الْهَوٰى وَالْغَرْضِ الْفَاسِدِ وَكَلَامُ الْمُتَقَدِّمِيْنَ سَالِمٌ مِنْ هٰذَا غَالِبًا وَتَارَةً مِنَ الْمُخَالَفَةِ فِى الْعَقَائِدِ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ كَثِيْرًا قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا وَلَا يَنْبَغِىْ اِطْلَاقُ الْجَرْحِ بِذٰلِكَ فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيْقَ الْحَالِ فِى الْعَمَلِ بِرِوَايَةِ الْمُبْتَدِعَةِ ـ

অনুবাদ : এমন ব্যক্তির প্রত্যয়ন ও অভিযোগ গ্রহণযোগ্য যিনি আদিল ও সচেতন। সুতরাং এমন ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়, যিনি অভিযোগের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারী। তিনি হয়তো এমন বিষয়ের ভিত্তিতে অভিযোগ করবেন, যে কারণে উক্ত রাবীর হাদীস প্রত্যাখ্যান করা জরুরি হয় না। তেমনি এমন ব্যক্তির অভিযোগও গ্রহণযোগ্য নয় যিনি স্থূলদৃষ্টিতে যা বুঝা যায় তার উপর ভিত্তি করে অভিযোগ করেন। ইমাম যাহাবী (র.) ব্যক্তি যাচাইয়ে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ের (ব্যক্তি যাচাইয়ের) দুজন আলিম কখনও একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দুর্বল সাব্যস্ত করতে কিংবা একজন দুর্বল ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করতে একমত হননি। এ কারণে ইমাম নাসায়ী (র.) -এর নীতি হলো, কোনো ব্যক্তির হাদীস প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে সকলে একমত না হলে তিনি তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করতেন না।

যারা জরাহ ও তা'দীল করবেন তাদের উচিত কোনো প্রকার শৈথিল্য অবলম্বন না করা। কেননা, **কোনো যুক্তি** ছাড়া কাউকে আদিল সাব্যস্ত করার অর্থ হলো, একটি ভিত্তিহীন হাদীসকে প্রামাণ্য হাদীস **সাব্যস্ত করা**। এতে করে সেই হাদীসের হুঁশিয়ারবাণী প্রযোজ্য হবার আশঙ্কা থাকবে, যাতে বলা

হয়েছে– "যে ব্যক্তি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবে যে ব্যাপারে তার ধারণা হলো যে সেটি অসত্য, সে হবে অন্যতম মিথ্যাবাদী।"

আর যদি তিনি অসর্তকভাবে জরাহ বা অভিযোগ করেন, তাহলে তিনি **একজন নিরপরাধ মুসলমানের** উপর এমন অভিযোগ আরোপ করলেন যার চিহ্ন তার কপালে চিরকাল থেকে যাবে।

অভিযোগে বাড়াবাড়ি অনেক সময় প্রবৃত্তির তাড়নায় আবার কখনো **বৈরিতা ও হিংসার কারণে হয়ে** থাকে। পূর্ববর্তী ইমামগণের বক্তব্য সাধারণভাবে এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে **পবিত্র (মুক্ত)। আবার** কখনো আকিদাগত বিরোধের কারণেও হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের **মধ্যে এ ধরনের অতিরঞ্জন** প্রচুর রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে আকিদাগত বিরোধের কারণে **অভিযোগ করা বৈধ নয়।** বিদআতপন্থিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি এটি বিশ্লেষণ করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কার অভিযোগ-প্রত্যয়ন ধর্তব্য? যে কেউ অভিযোগ কিংবা প্রত্যয়ন করলে তা গৃহীত ও **ধর্তব্য হয় না;** বরং এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা–

১. কেবলমাত্র তারই অভিযোগ ও প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে, যে তার কারণ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তবে তাদের জন্য ধরাবাঁধা কোনো সংখ্যার শর্ত নেই। এ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোকপাত হয়েছে।

২. প্রত্যয়নকারীকে আদেল, চৌকস ও হুঁশিয়ার হতে হবে। কেননা, অভিযোগে বাড়াবাড়ি করলে তা ধর্তব্য হয় না, যেরূপভাবে ঐ প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হয় না, যা কেবল বাহ্যিক অবস্থা দেখে করা হয়। যেমন– সূফিয়ায়ে কিরাম করে থাকেন।

৩. শৈথিল্য ও উদাসীনতা হতে মুক্ত থাকতে হবে। কারণ, কাউকে বিনা যুক্তিতে প্রত্যয়ন করার অর্থ একটি অসাব্যস্ত হাদীসকে সাব্যস্ত করে দেওয়া। যার দরুন সে **مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ঠিক এমনিভাবে অসতর্কবশত কোনো এমন **মুসলমানকে** অভিযুক্ত করা, যিনি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতে করে একজন নিরপরাধকে এমনভাবে **কালিমাযুক্ত** করে দেওয়া হয়, যা চিরদিন তাকে লজ্জিত করে। মোটকথা, উল্লিখিত তিন শত **যদি কারো মধ্যে** পাওয়া যায়, তবেই তার অভিযোগ ও প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় নয়।

অভিযোগ আরোপে বাড়াবাড়ির কারণ : আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন, এর কারণ সাধারণত পাঁচটি। যথা–

১. প্রবৃত্তির তাড়না তথা হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি।

২. আকিদাগত বিরোধ।

৩. সাধারণ আলিম ও সূফী-দরবেশদের মধ্যে উষ্ণবিরোধ।

৪. ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা।

৫. একচেটিয়া নিন্দার দিকটা বিবেচনা করা।

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ وَاَطْلَقَ ذٰلِكَ جَمَاعَةٌ وَلٰكِنَّ مَحَلَّهُ اِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِاَسْبَابِهِ لِاَنَّهُ اِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ لَمْ يَقْدَحْ فِيْمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَاِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالْاَسْبَابِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهِ اَيْضًا فَاِنْ خَلَا الْمَجْرُوْحُ عَنِ التَّعْدِيْلِ قُبِلَ الْجَرْحُ فِيْهِ مُجْمَلًا غَيْرَ مُبَيَّنِ السَّبَبِ اِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ عَلَى الْمُخْتَارِ لِاَنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ تَعْدِيْلٌ فَهُوَ فِىْ حَيِّزِ الْمَجْهُوْلِ وَاِعْمَالُ قَوْلِ الْمَجَارِحِ اَوْلٰى مِنْ اِهْمَالِهِ وَمَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِىْ مِثْلِ هٰذَا اِلَى التَّوَقُّفِ ـ

অনুবাদ : একদল মুহাদ্দিস সাধরাণভাবে জরাহকে তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জরাহটা অগ্রগামী হওয়ার স্থান হলো, যদি জরাহ -এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ হতে জরাহটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়, তাহলে তখন জরাহটা তা'দীলের উপর অগ্রগামী হবে। কেননা, জরাহটা যদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হয়, তাহলে এমন জরাহ-এ ঐ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হবে না যার আদালত সাব্যস্ত। অনুরূপভাবে জরাহটার যদি প্রকাশ পায় এমন ব্যক্তির থেকে যে জরাহের কারণ জানে না, তাহলে তার জরাহটাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর জরাহকৃত ব্যক্তি যদি তা'দীলশূন্য হয়, তাহলে সহীহ মত অনুযায়ী তার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত তথা বিস্তারিত নয়– এমন জরাহও গ্রহণযোগ্য হবে। যদি জরাহ প্রকাশিত হয় ঐ ব্যক্তির থেকে যে জরাহের কারণ সম্পর্কে জানে। কেননা, রাবীর ব্যাপারে যখন তা'দীল সাব্যস্ত হয় না তখন সে মাজহুলের মতো হয়ে যায়। আর জরাহকারীর বক্তব্যকে অকার্যকর না করে কার্যকর করাই উত্তম। অবশ্য ইবনুস সালাহ (র.) এরূপ ক্ষেত্রে তাকে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকার পক্ষপাতী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জরাহ অগ্রগামী না তা'দীল? যদি কোনো রাবী সম্পর্কে ইমামগণের পক্ষ হতে দু ধরনের বক্তব্য এভাবে পাওয়া যায় যে, কেউ তাকে তা'দীল করেন আবার কেউ তাকে জরাহ করেন, তখন জরাহ প্রধান্য পাবে নাকি তা'দীল অগ্রগামী হবে– এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. উসূলীনদের এক জামাআতের মত হলো, কোনো রাবী সম্পর্কে জরাহ ও তা'দীল নিয়ে تَعَارُضْ (দ্বন্দ্ব) দেখা দিলে তখন চূড়ান্তভাবে জরাহটা প্রাধান্য পাবে।

২. তবে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এ ব্যাপারে প্রকৃত কথা হলো দুটি শর্তের সাথে জরাহটা অগ্রগামী হবে। যথা–

ক. জরাহটা সবিস্তারে হতে হবে; অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত হলে হবে না।

খ. জরাহটা এমন ব্যক্তির থেকে প্রকাশ পেতে হবে যিনি জরাহ -এর কারণ সম্পর্কে অবগত।

যদি এই দুই শর্তের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তখন জরাহ -এর উপর তা'দীল প্রাধান্য পাবে।

তা'দীলবিহীন জরাহ -এর হুকুম : যদি কোনো রাবীর ব্যাপারে ব্যাখ্যাহীন জরাহ পাওয়া যায়– তা'দীল না পাওয়া যায়, তাহলে তার হুকুম নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তখন জরাহটা মাকবূল হবে। চাই জরাহটা সবিস্তারে হোক কিংবা অস্পষ্ট হোক। তবে এর জন্য শর্ত একটি। আর তা হলো, জরাহটা এমন ব্যক্তি থেকে হতে হবে, যে তার কারণ সম্বন্ধে অবগত। কেননা, জরাহকারীর বক্তব্যকে বাতিল করা থেকে আমল করা উত্তম।

২. আল্লামা ইবনুস সালাহ (র.) -এর মতে, এ সময়েও (ব্যাখ্যাহীন জরাহ -এর ক্ষেত্রে) জরাহ মাকবূল হবে না; বরং জরাহটা স্থগিত থাকবে।

মোটকথা যে, রাবীর জরাহ করা হয় তা দু প্রকার। ১.জরাহ -এর সাথে সাথে তার ব্যাপারে তা'দীলও পাওয়া যাবে। এমন অবস্থায় 'বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী' দু শর্তে জরাহটা তা'দীলের উপর অগ্রগামী হবে। ২. শুধু জরাহ পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী একটি শর্তে জরাহটা প্রাধান্য পাবে। আর তা হলো জরাহটা হতে হবে এমন ব্যক্তি হতে যে তার কারণ জানে।

جَرْح -এর প্রকারভেদ : জরাহ দু প্রকার। ১. جَرْح مُبَيَّنْ ও ২. جَرْح مُبْهَمْ। নিম্নে প্রত্যেকটার সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. جَرْح مُبَيَّنْ : জরাহ -এর সাথে সাথে যদি জরাহ-এর কারণ, সুরত, দলিল ইত্যাদি উল্লেখ থাকে, তাহলে তাকে جَرْح مُبَيَّنْ বা সুস্পষ্ট জরাহ বলে। যেমন, এভাবে বলা– فُلَانٌ مُتَّهَمٌ الْكِذْبِ ইত্যাদি। এর অপর নাম جَرْح مُفَسَّرْ বা সবিস্তারে জরাহ।

২. যদি জরাহ -এর সাথে তার কারণ, দলিল উল্লেখ না থাকে, তাহলে তাকে বলে جَرْح مُبْهَمْ । এর অপর নাম جَرْح مُجْمَلْ (অস্পষ্ট জরাহ) এবং جَرْح غَيْر مُبَيَّنْ (ব্যাখ্যাহীন জরাহ)। যেমন, এভাবে বলা– فُلَانٌ مَجْرُوْحٌ অমুক অভিযুক্ত। কিন্তু কেন অভিযুক্ত, তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি তা উল্লেখ থাকে না।

فَصْلٌ وَمِنَ الْمُهِمِّ فِى هٰذَا الْفَنِّ مَعْرِفَةُ كُنَى الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّنِ اشْتَهَرَ بِاسْمِهِ وَلَهُ كُنْيَةٌ لَا يُؤْمَنُ اَنْ يَأْتِىَ فِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُكَنِّيًا لِئَلَّا يُظَنَّ اَنَّهُ اٰخَرُ وَمَعْرِفَةُ اَسْمَاءِ الْمُكَنِّيْنَ وَهُوَ عَكْسُ الَّذِىْ قَبْلَهُ وَمَعْرِفَةُ مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ وَهُمْ قَلِيْلٌ وَمَعْرِفَةُ مَنْ اِخْتَلَفَ فِىْ كُنْيَتِهِ وَهُوَ كَثِيْرٌ وَمَعْرِفَةُ مَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ كَابْنِ جُرَيْجٍ لَهُ كُنْيَتَانِ اَبُو الْوَلِيْدِ وَاَبُوْ خَالِدٍ اَوْ كَثُرَتْ نُعُوْتُهُ وَاَلْقَابُهُ وَمَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اِسْمَ اَبِيْهِ كَاَبِىْ اِسْحَاقَ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْحَاقَ الْمَدَنِىْ اَحَدُ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ نَفْىُ الْغَلَطِ عَمَّنْ نَسَبَهُ اِلٰى اَبِيْهِ فَقَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ فَنُسِبَ اِلَى التَّصْحِيْفِ وَاِنَّ الصَّوَابَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ اَوْ بِالْعَكْسِ كَاِسْحَاقَ ابْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِىْ اَوْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ كَاَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ وَاُمِّ اَيُّوْبَ صَحَابِيَّانِ مَشْهُوْرَانِ اَوْ وَافَقَ اِسْمُ شَيْخِهِ اِسْمَ اَبِيْهِ كَالرَّبِيْعِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ هٰكَذَا يَاْتِىْ فِى الرِّوَايَاتِ فَيُظَنُّ اَنَّهُ يَرْوِىْ عَنْ اَبِيْهِ كَمَا وَقَعَ فِى الصَّحِيْحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ وَهُوَ اَبُوْهُ وَلَيْسَ اَنَسٌ شَيْخُ الرَّبِيْعِ وَالِدَهُ بَلْ اَبُوْهُ بَكْرِىٌّ وَشَيْخُهُ اَنْصَارِىٌّ وَهُوَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الصَّحَابِىُّ الْمَشْهُوْرُ وَلَيْسَ الرَّبِيْعُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَوْلَادِهِ -

অনুবাদ : হাদীসশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–

১. যে রাবী নামে প্রসিদ্ধ তার কোনো কুনিয়াত থাকলে তা জানা। নইলে কোথাও তাকে উপনামে উল্লেখ করা হলে তাকে অন্য ব্যক্তি বলে ধারণা করা হতে পারে।

২. যে রাবী কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ তার নাম জানা। নইলে কোথাও তাকে তার নামে উল্লেখ করা হলে ভিন্ন ব্যক্তি বলে ধারণা হতে পারে।

৩. কোনো রাবীর নাম ও কুনিয়াত একই হলে তা জানা। অবশ্য এরূপ খুব কম হয়।

৪. কোনো রাবীর কুনিয়াত সম্পর্কে মতভেদ থাকলে তা জানা। এরূপ প্রচুর রয়েছে।

৫. কারো কুনিয়াত অনেক থাকলে তা জানা। যেমন– ইবনে জুরাইজের দুটি কুনিয়াত। আবুল ওলীদ ও আবূ খালিদ।

৬. কোনো রাবীর কুনিয়াত তার পিতার নামের অনুরূপ হলে তা জানা। যেমন– আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক মাদানী। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। যেহেতু আবূ ইসহাকের পিতার নামও ইসহাক, সুতরাং তাকে ইবনে ইসহাক কুনিয়াতেও উল্লেখ করা ভুল হবে না।

তেমনি সে রাবীকেও চেনা দরকার যার নাম তার পিতার কুনিয়াতের অনুরূপ। যেমন– ইসহাক ইবনে আবূ ইসহাক সাবীয়ী।

সে রাবীকেও চেনা দরকার যার কুনিয়াত তার স্ত্রীর কুনিয়াতের অনুরূপ। যেমন– আবূ আইয়ুব আনসারী ও উম্মে আইয়ুব আনসারী। উভয়েই প্রসিদ্ধ সাহাবী।

যে রাবীর শায়খের নাম তার পিতার নামের অনুরূপ তাকেও চিনতে হবে। যেমন– রবী ইবনে আনাস বর্ণনা করেন আনাস থেকে। বিভিন্ন বর্ণনায় এরূপ আসে। ফলে তখন ধারণা হতে পারে রবী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। বুখারী শরীফে আছে, আমির ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন সা'দ থেকে। এখানে সা'দ হলেন আমির-এরই পিতা। কিন্তু রবী যে আনাস থেকে বর্ণনা করেন তিনি তার পিতা বনূ বকরের আনাস নন; বরং প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। রবী তার পুত্র নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্মানিত লেখক সমাপনী -এর আলোচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করার পর তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি আহকাম উল্লেখ করেছেন। তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে ফিরে আবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অবতারণা করছেন।

যারা নামে প্রসিদ্ধ : সাহাবীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁদের স্বতন্ত্র কুনিয়াত থাকলেও তারা তাতে পরিচিত ছিলেন না। এমন কয়েকজন হলেন–
হযরত ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)। এদের সকলের কুনিয়াত ছিল আবূ মুহাম্মদ। অনুরূপ হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত সালমান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.)। এদের সকলের কুনিয়াত হলো আবূ আব্দুল্লাহ। তাঁদের কুনিয়াত থাকলেও তাঁরা নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যারা কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ : এর বিপরীত কিছু সাহাবীর স্বতন্ত্র নাম থাকলেও তারা কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.)। তাদের সকলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। কিন্তু তাঁরা নামে নয়; বরং কুনিয়াতে বেশি পরিচিত ছিলেন। ঠিক তদ্রূপ হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। এটা তাঁর কুনিয়াত। তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান।

নামই কুনিয়াত : যেমন– আবূ বিলাল আশয়ারী। তিনি শরীকের ছাত্র ছিলেন। অনুরূপ আবূ হুসাইন। তিনি হাতিম রাযীর ছাত্র ছিলেন।

কুনিয়াতের মধ্যে মতভেদ : যেমন– উসাম ইবনে যায়েদ (রা.)। তাঁর কুনিয়াত নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে আবূ যায়েদ, কারো মতে আবূ মুহাম্মদ, আবার কারো মতে আবূ খারিযা।

বিভিন্ন কুনিয়াত : যাদের কুনিয়াত একাধিক তাদেরও জানা দরকার, যাতে কুনিয়াতের পরিবর্তনে তাকে চিনতে ভুল না হয়। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.)। তাঁর দুটি লকব সিদ্দীক এবং আতীক।

مَدَنِيٌّ এবং مَدِيْنِيٌّ -এর মধ্যে পার্থক্য : উভয় শব্দই শহরের দিকে নিসবত। তবে প্রভেদ হলো,, مَدَنِيٌّ শব্দটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শহর মদীনা মুনাওয়ারার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর مَدِيْنِيٌّ যে কোনো শহরের দিকে নিসবত। অবশ্য এ নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম হলেন হযরত আলী ইবনুল মাদীনী (র.)। তিনি ইমাম বুখারী (র.)-এর শায়খ। আলীর পিতা مَدِيْنِيٌّ হলেও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শহর মদীনার অধিবাসী ছিলেন।

রাবীর শায়খের নাম এবং পিতার নাম এক : কখনো রাবীর পিতার নাম এবং ওস্তাদের নাম এক হয়। তখন ধারণা হয় যে, রাবী হয়তো নিজ পিতা হতে রেওয়ায়েত করছেন। অথচ বাস্তবে তা নয়। যেমন– رَبِيْعُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ -এর মধ্যে রবীর পিতা এবং ওস্তাদ উভয়ের নাম এক অর্থাৎ আনাস। কিন্তু পিতা আনাস যিনি, তিনি হলেন বকারী আর ওস্তাদ আনাস যিনি, তিনি হলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদেম ছিলেন।

অবশ্য কখনো এমন হয় যে, রাবী তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেন। তখন গিয়ে পিতা এবং শায়খ একই ব্যক্তি হন। যেমন– বুখারীর সনদ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ -এ সংঘটিত হয়েছে।

وَمَعْرِفَةُ مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ كَالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ نُسِبَ إِلَى الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ لِأَنَّهُ تَبَنَّاهُ وَإِنَّمَا هُوَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو أَوْ نُسِبَ إِلَى أُمِّهِ كَابْنِ عُلَيَّةَ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِقْسَمٍ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَعُلَيَّةُ اسْمُ أُمِّهِ اشْتَهَرَ بِهَا وَكَانَ لَا يُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَلِهٰذَا كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَنَا إِسْمَاعِيلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ كَالْحَذَّاءِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى صِنَاعَتِهَا أَوْ بَيْعِهَا وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ يُجَالِسُهُمْ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ وَكَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي التَّيْمِ وَلٰكِنْ نَزَلَ فِيهِمْ وَكَذَا مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ فَلَا يُؤْمَنُ الْتِبَاسُهُ بِمَنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَهُ وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ الْجَدِّ الْمَذْكُورِ ـ

অনুবাদ : ৭. যে রাবীর পরিচয় তার পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে তাকে জানা। যেমন– মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ যুহরী। মেকদাদের পিতার নাম আমর। কিন্তু আসওয়াদ তাকে পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। সেজন্য তার নামের সাথেই মেকদাদের পরিচয় ঘটেছে।

সে রাবীকেও চিনতে হবে যিনি তার মাতার নামের সাথে পরিচিত। যেমন– ইবনে উলাইয়া। তিনি হলেন ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মিকসাম। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তার মায়ের নাম ছিল উলাইয়া। মায়ের নামের সাথেই তার পরিচয় প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইসমাঈল নিজে মায়ের নামের সাথে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন না। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলতেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল, যাকে ইবনে উলাইয়া বলা হয়।

সে রাবীকেও চেনা প্রয়োজন যাকে এমন একটি বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করা হয় যা সহজে বুঝা যায় না। যেমন– হায্যা। দৃশ্যত মনে হয় তিনি জুতা তৈরি কিংবা তার ব্যবসা করতেন। তাই তাকে হায্যা বলা হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। বস্তুত তিনি জুতা ব্যবসায়ীদের সাথে উঠাবসা করতেন, তাই তাকে তাদের সাথে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে।

তেমনি সুলাইমান তাইমী মূলত তাইম গোত্রের লোক ছিলেন না; কিন্তু তাদের মাঝে অবস্থান করতেন বলে তাকে তাইমী বলা হয়।

আবার অনেককে তার দাদার নামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এরূপ রাবীকেও চিনতে হবে। অন্যথায় এরূপ রাবীর সাথে বিভ্রাট ঘটবে যার নাম অনুরূপ এবং তার পিতার নাম উক্ত রাবীর দাদার নামের অনুরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পিতা নয় এমন ব্যক্তির দিকে নিসবত : যে সমস্ত রাবীদের পিতার দিকে ব্যতীত অন্যের দিকে নিসবত করা হয় তাও জানা দরকার। যাতে করে কোনো সনদে পিতার দিকে নিসবত হলে ধোঁকায় না পড়তে হয়। যেমন– হযরত মেকদাদ (রা.) -এর পিতার নাম আমর; কিন্তু তাকে আসওয়াদ যুহরীর দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয় মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। কেননা, আসওয়াদ তাকে পালকপুত্র বানিয়ে ছিলেন।

মায়ের দিকে নিসবত : কোন রাবীকে মায়ের প্রতি নিসবত দেওয়া হয় তাও জানা দরকার। যেমন– ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম তার মায়ের দিকে নিসবত হয়ে ইবনে উলাইয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তিনি এ নামে পরিচিত হওয়া পছন্দ করতেন না।

বুঝা যায় না এমন বস্তুর দিকে নিসবত : কখনো রাবীকে নিসবত দেওয়া হয় এমন বস্তুর দিকে, সে বস্তুর থেকে যেটা বুঝে আসে তা উদ্দেশ্য হয় না। যেমন– খালিদ হায্যা। হায্যা -এর অর্থ– মুচি। সুতরাং এ শব্দ থেকে সাধারণত বুঝে আসে যে তিনি মুচি ছিলেন। আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়; বরং তাকে হায্যা বলার কারণ হলো তিনি তাদের সাথে বেশি উঠাবসা করতেন।

তেমনিভাবে সুলাইমান তাইমী। এর থেকে বুঝে আসে যে, তিনি তাইমী গোত্রের ছিলেন; কিন্তু আসলে ব্যাপারটি তা নয়। তিনি তাইমী গোত্রে অবস্থান করতেন বলে এ বংশীয় নামে তিনি পরিচিত হন।

মোটকথা, পিতা ব্যতীত অন্যের দিক নিসবতের কয়েকটি সুরত। যথা–

১. পালক পিতার দিকে। যেমন– মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। ২. মায়ের দিকে। যেমন– ইবনে উলাইয়্যা। ৩. যে অর্থ বুঝা যায় না তার দিকে। যেমন– খালিদ হায্যা। ৪. দাদা বা পরদাদার দিকে।

وَمَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اِسْمُهُ وَاسْمُ اَبِيْهِ وَجَدِّهِ كَالْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَقَدْ يَقَعُ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ مِنْ فُرُوْعِ الْمُسَلْسَلِ وَقَدْ يَتَّفِقُ الْاِسْمُ وَاسْمُ الْاَبِ مَعَ اِسْمِ الْجَدِّ وَاسْمِ اَبِيْهِ فَصَاعِدًا كَاَبِى الْيَمَنِ الْكِنْدِىْ هُوَ زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ اَوْ اتَّفَقَ اِسْمُ الرَّاوِىْ وَاسْمُ شَيْخِهٖ وَشَيْخِ شَيْخِهٖ فَصَاعِدًا كَعِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْاَوَّلُ يُعْرَفُ بِالْقَصِيْرِ وَالثَّانِىْ اَبُوْ رَجَاءِ الْعَطَارِدِىْ وَالثَّالِثُ اِبْنُ حُصَيْنِ الصَّحَابِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَكَسُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْاَوَّلُ اِبْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَيُّوْبَ الطَّبْرَانِىُّ وَالثَّانِىْ اِبْنُ اَحْمَدَ الْوَاسِطِىُّ وَالثَّالِثُ اِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ الْمَعْرُوْفُ بِاِبْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيْلِ وَقَدْ يَقَعُ ذٰلِكَ لِلرَّاوِىْ وَشَيْخِهٖ مَعًا كَاَبِى الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِىِّ الْعَطَّارِ مَشْهُوْرٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ اَبِىْ عَلِيِّ الْاَصْبَهَانِىِّ الْحَدَّادِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا اِسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ اَحْمَدَ فَاتَّفَقَا فِىْ ذٰلِكَ وَافْتَرَقَا فِى الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ اِلَى الْبَلَدِ وَالصِّنَاعَةِ وَصَنَّفَ فِيْهِ اَبُوْ مُوْسَى الْمَدِيْنِىُّ جُزْءً حَافِلًا ـ

অনুবাদ : ৮. অনেক রাবীর নাম, তার পিতার নাম ও দাদার নাম একই। এটিও জানা দরকার। যেমন– হাসান ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবূ তালিব। কখনো কখনো সমনামের ধারাবাহিকতা এর চেয়েও বেশি হয়। এটিও মুসালসাল সনদের একটি প্রকার।

কখনো কখনো এরূপ হয় যে, রাবীর ও তার দাদার নাম এবং রাবীর পিতা ও তার দাদার নাম একই। যেমন– আবুল ইয়ামান কিন্দী যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে হাসান।

অনেক সময় রাবীর নাম, তার শায়খের নাম ও শায়খের শায়খের নাম একই হয়ে থাকে। যেমন– ইমরান ইমারান হতে, ইমরান (দ্বিতীয়জন) ইমরান হতে। প্রথম ইমরান পরিচিত কাসীর নামে, দ্বিতীয়জন আবূ রজা আতারিদী এবং তৃতীয়জন হলেন ইবনে হুসাইন (রা.) সাহাবী।

তেমনি সুলাইমান সুলাইমান থেকে, সুলাইমান (দ্বিতীয়জন) সুলাইমান হতে। প্রথম ব্যক্তি হলেন ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ূব তাবারানী, দ্বিতীয়জন ইবনে আহমাদ ওয়াসিতী এবং তৃতীয়জন ইবনে আব্দুর রহমান দিমাশকী, যিনি ইবনে বিনতে শুরাহবীল হিসেবে প্রসিদ্ধ।

কখনো কখনো এই নামের এক হওয়াটা রাবীর ও তার শায়খের সাথে একই সাথে ঘটে। অর্থাৎ রাবীর নাম ও তার পিতা-পিতামহের নাম এবং রাবীর শায়খের নাম ও শায়খের পিতা-পিতামহের নাম একই হয়ে থাকে। যেমন– আবূ আ'লা হামদানী আল-আত্তার। তিনি আবূ আলী ইস্পাহানী হাদ্দাদ থেকে রেওয়ায়েতে মাশহূর। উভয়ের (শায়খ ও ছাত্রের) নাম হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ। দুজনই নামের দিক দিয়ে একই কিন্তু কুনিয়াত, শহরীয় নাম এবং পেশার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন। আবূ মূসা মাদীনী এ বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কয়েক পুরুষের একই নাম : কখনো রাবীর কয়েক পুরুষের নাম একই হয়। যেমন– ইবনে মাজাহ শরীফে একজন রাবী আছেন, যার নাম হাসান ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা.)। এমনিভাবে ইমাম গাযালী (র.) -এর নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী। তাযকিরাতুল হুফফাজ গ্রন্থে আছে, এমনও উদাহরণ আছে, যেখানে চৌদ্দপুরুষ ধরে ধারাবাহিকভাবে 'মুহাম্মদ' নাম চলেছে।

রাবী ও তার দাদার নাম এবং রাবীর পিতা ও তার দাদার নাম এক : কখনো কোনো রাবীর নাম ও রাবীর দাদার নাম একই হয়। অনুরূপ রাবীর পিতা ও পিতার দাদার নাম একই হয়। যেমন– আবুল ইয়ামান কিন্দী নামে একজন রাবী আছেন। তার নাম যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে হাসান। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাবীর নাম ও তার দাদার নাম একই। আর তা হলো 'যায়েদ'। অনুরূপ রাবীর পিতা ও পিতার দাদার নাম এক। আর তা হলো 'হাসান'।

রাবীর নাম, শায়খের নাম এবং শায়খের শায়খের নাম এক : কখনো কোনো রাবীর নাম এবং তার শায়খের নাম ও শায়খের শায়খের নাম এক হয়। যেমন– عِمْرَانُ عَنْ عِمْرَانَ عِمْرَانَ সূত্রের রেওয়ায়েতে। প্রথম ইমরান জাসীর নামে দ্বিতীয় ইমরান আবূ রজা আতারিদী এবং তৃতীয় ইমরান সাহাবী হিসেবে পরিচিত। তারা বিভিন্ন উপনামে পরিচিতি হলেও সকলের নাম একই। আর তা হলো ইমরান।

রাবীর নাম পিতার নাম এবং দাদার নাম এক : কখনো কখনো রাবীর নিজের নাম, তার পিতার নাম এবং দাদার নাম যা হয়, তাই রাবীর শায়খের, তার পিতার ও দাদার নাম হয়। যেমন– আবূ আ'লা হামদানী আল-আত্তারের শায়খ হলেন আবূ আলী ইস্পাহানী হাদ্দাদ। আর উভয়ের নাম হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ। সুতরাং নামের দিক দিয়ে উভয়ই এক। অবশ্য রাবীর কুনিয়াত আবূ আ'লা আর শায়খের কুনিয়াত আবূ আলী। অনুরূপ রাবীর নিসবত হামদানী আর শায়খের নিসবত ইস্পাহানী। রাবীর পেশা আত্তার (আতর বিক্রেতা) আর শায়খের পেশা হাদ্দাদ (কর্মকার)।

وَمَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اِسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِىْ عَنْهُ وَهُوَ نَوْعٌ لَطِيْفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ اِبْنُ الصَّلَاحِ وَفَائِدَتُهُ رَفْعُ اللَّبْسِ عَنْ مَنْ يَظُنُّ اَنَّ فِيْهِ تَكْرَارًا اَوْ اِنْقِلَابًا فَمِنْ اَمْثِلَتِهِ الْبُخَارِيُّ رَوٰى عَنْ مُسْلِمٍ وَ رَوٰى عَنْهُ مُسْلِمٌ فَشَيْخُهُ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْفَرَادِيْسِيُّ الْبَصْرِيُّ وَالرَّاوِىْ عَنْهُ مُسْلِمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ صَاحِبُ الصَّحِيْحِ وَكَذَا وَقَعَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ اَيْضًا رَوٰى عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَ رَوٰى عَنْهُ مُسْلِمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ فِىْ صَحِيْحِهِ حَدِيْثًا بِهٰذِهِ التَّرْجَمَةِ بِعَيْنِهَا وَمِنْهَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ رَوٰى عَنْ هِشَامٍ وَ رَوٰى عَنْهُ هِشَامٌ فَشَيْخُهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَهُوَ مِنْ اَقْرَانِهِ وَالرَّاوِىْ عَنْهُ هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّسْتَوَائِيُّ وَمِنْهَا اِبْنُ جُرَيْجٍ رَوٰى عَنْ هِشَامٍ وَ رَوٰى عَنْهُ هِشَامٌ فَالْاَعْلٰى اِبْنُ عُرْوَةَ وَالْاَدْنٰى اِبْنُ يُوْسُفَ الصَّنْعَانِيُّ وَمِنْهَا الْحَكَمُ ابْنُ عُتَيْبَةَ رَوٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَعَنْهُ اِبْنُ اَبِىْ لَيْلٰى فَالْاَعْلٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَالْاَدْنٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَذْكُوْرِ وَاَمْثِلَتُهُ كَثِيْرَةٌ ـ

অনুবাদ : ৯. অনেক সময় কোনো রাবীর শায়খ ও শিষ্য একই নামের হয়। যদিও এটি একটি মজার বিষয়, কিন্তু ইবনুস সালাহ এ বিষয়ের প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টিপাত করেননি। এটি জানার উপকারিতা হলো, এর ফলে পুনরাবৃত্তি বা স্থান পরিবর্তনের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যেমন– ইমাম বুখারীর শায়খের নাম মুসলিম, শিষ্যের নামও মুসলিম। শায়খ হলেন মুসলিম ইবনে ইবরাহীম ফারাদিসী বসরী এবং ছাত্র হলেন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী– মুসলিম শরীফের গ্রন্থকার।

তেমনি আবদ ইবনে হুমাইদ -এর শায়খ হলেন মুসলিম ইবনে ইবরাহীম এবং ছাত্র হলেন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ। মুসলিম শরীফে তার এই সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাছীর-এর শায়খ হলেন হিশাম আবার ছাত্রের নামও হিশাম। শায়খ হলেন হিশাম ইবনে উরওয়া। তিনি তার সমসাময়িক। আর ছাত্র হলেন হিশাম ইবনে আবূ আব্দুল্লাহ দাস্তাওয়ায়ী।

ইবনে জুরায়জ -এর শায়খ হিশাম, আবার ছাত্রও হিশাম। প্রথমজন হলেন ইবনে উরওয়া এবং শেষের জন্য ইবনে ইউসুফ সানআনী।

হাকাম ইবনে উতায়বার শায়খ ইবনে আবূ লায়লা, ছাত্রও ইবনে আবূ লায়লা। প্রথম ব্যক্তি হলেন আব্দুর রহমান এবং পরের ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে উক্ত আব্দুর রহমান। এরূপ অনেক নজির রয়েছে।

وَمِنَ الْمُهِمِّ فِى هٰذَا الْفَنِّ مَعْرِفَةُ الْاَسْمَاءِ الْمُجَرَّدَةِ وَقَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْاَئِمَّةِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَهَا بِغَيْرِ قَيْدٍ كَابْنِ سَعْدٍ فِى الطَّبَقَاتِ وَابْنِ اَبِىْ خَيْثَمَةَ وَالْبُخَارِيِّ فِىْ تَارِيْخِهِمَا وَابْنِ اَبِىْ حَاتِمٍ فِى الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ اَفْرَدَ الثِّقَاتِ كَالْعِجْلِىْ وَابْنِ حِبَّانٍ وَابْنِ شَاهِيْنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَفْرَدَ الْمَجْرُوْحِيْنَ كَابْنِ عَدِيٍّ وَابْنِ حِبَّانٍ اَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ تَقَيَّدَ بِكِتَابٍ مَخْصُوْصٍ كَرِجَالِ الْبُخَارِيِّ لِاَبِىْ نَصْرٍ الْكَلَابَازِىْ وَ رِجَالِ مُسْلِمٍ لِاَبِىْ بَكْرِ بْنِ مَنْجُوْيَةَ وَ رِجَالِهِمَا مَعًا لِاَبِى الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ وَ رِجَالِ اَبِىْ دَاوُدَ لِاَبِىْ عَلِى الْجِيَانِىْ وَكَذَا رِجَالُ التِّرْمِذِيِّ وَ رِجَالُ النَّسَائِيِّ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَرِجَالُ السِّتَّةِ الصَّحِيْحَيْنِ وَاَبِىْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ لِعَبْدِ الْغَنِىِّ الْمُقَدِّسِىْ فِىْ كِتَابِ الْكَمَالِ ثُمَّ هَذَّبَهُ الْمِزِّىُّ فِىْ تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ وَقَدْ لَخَّصْتُهُ وَ زِدْتُ عَلَيْهِ اَشْيَاءَ كَثِيْرَةً وَسَمَّيْتُهُ تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ وَجَاءَ مَعَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّيَادَةِ قَدْرُ ثُلُثِ الْاَصْلِ ـ

অনুবাদ : ১০. হাদীসশাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যাদের নামের সাথে কোনো কুনিয়াত ইত্যাদি উল্লেখ করা হয় না তাদের জানা। একদল ইমাম তাদের নামের সংকলন তৈরি করেছেন। কেউ কেউ কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই তাদের নাম সংকলন করেছেন। যেমন– সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে, ইবনে আবূ খায়ছামাহ ও ইমাম বুখারী তাদের ইতিহাস গ্রন্থে এবং ইবনে আবূ হাতিম আল-জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে।

কেউ কেউ শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীদেরই নাম একত্রিত করেছেন। যেমন– ইজলী, ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন প্রমুখ। আবার কেউবা শুধুমাত্র অভিযুক্তদের নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যেমন– ইবনে আদী, ইবনে হিব্বান।

কেউ কেউ কোনো একটি নির্দিষ্ট কিতাবের রাবীদের নামে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন– আবূ নসর কালাবাযী তার 'রিজালুল বুখারী' ও আবূ বকর ইবনে মানজুয়া তার 'রিজালু মুসলিম' গ্রন্থে। উভয়ের ব্যক্তিবর্গের সংকলন করেছেন আবুল ফযল ইবনে তাহির। আবূ দাউদ শরীফের রাবীদের নাম সংকলন করেছেন আবূ আলী জিয়ানী। তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের রাবীদের নামের সংকলন করেছেন পশ্চিম এলাকার কতিপয় আলিম। সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে

মাজাহ শরীফের সকল রাবীর নাম একত্রে সংকলন করেছেন আব্দুল গনী মুকাদ্দিসী তার 'আল-কামাল' গ্রন্থে। অতঃপর তার পরিমার্জন করেছেন আল-মিযযী তার 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থে। আমি তার সারসংক্ষেপ করেছি এবং তাতে অনেক বিষয় সংযোজন করেছি। এর নাম দিয়েছি 'তাহযীবুত তাহযীব'। এটি (তাহযীবুত তাহযীব) মূল কিতাবের (তাহযীবুল কামালের) এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তাতে বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও মূল কিতাবের তিনভাগের একভাগের পরিমাণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَسْمَاء مُجَرَّدَة -এর সংজ্ঞা : কতক রাবী এমন আছেন যাদের শুধু নাম আছে; কুনিয়াত, লকব নেই তাদেরকে أَسْمَاء مُجَرَّدَة বা শুধু নাম বলে। এমন রাবী সম্পর্কেও জানা দরকার।

أَسْمَاء مُجَرَّدَة -এর নামের সংকলন তৈরি : ওলামায়ে কেরাম أَسْمَاء مُجَرَّدَة -এর নামের তালিকা কয়েক পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন। যথা–

১. কেউ কেউ তাদেরকে নির্বিচারে উল্লেখ করেছেন, ثِقَة - ضَعِيف বাছাই করেননি; অনুরূপ কোন কিতাবের হাদীস তাও দেখেননি। যেমন– ইবনে সা'দ তাবাকাত গ্রন্থ এবং ইবনে হাতীম আল-জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২. কেউ কেউ শুধু ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন। যেমন– ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন এবং ইজলী।

৩. কেউ কেউ কেবল অভিযুক্ত ও সমালোচিতদের সংকলন তৈরি করেছেন। যেমন– ইবনে আদী এবং ইবনে হিব্বান।

৪. কেউ কেউ সুনির্দিষ্ট কিতাবের রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বুখারী বা মুসলিম কিতাবের রাবীদের। যেমন– বুখারীর রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন আবূ নসর কালাবাযী আর মুসলিমের রাবীদের সংকলন তৈরি করেছেন আবূ বকর ইবনে মানজুয়া।

মোটকথা, মুহাদ্দিসীনে কেরামের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র রুচি অনুযায়ী তারা একেক দিক বিবেচনায় একেক ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

وَمِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ الْاَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهَا الْحَافِظُ اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بْنُ هَارُوْنَ الْبَرْدِيْجِىْ فَذَكَرَ اَشْيَاءَ كَثِيْرَةً تَعَقَّبُوْا عَلَيْهِ بَعْضَهَا وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ صُغْدِى بْنُ سِنَانٍ اَحَدُ الضُّعَفَاءِ وَهُوَ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ تُبَدَّلُ سِيْنًا مُهْمَلَةً وَسُكُوْنِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ يَاءٌ كَيَاءِ النِّسَبِ وَهُوَ اِسْمٌ عَلَمٌ بِلَفْظِ النِّسَبِ وَلَيْسَ هُوَ فَرْدًا فَفِى الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ لِاِبْنِ اَبِىْ حَاتِمٍ صُغْدِى الْكُوْفِى وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِيْنٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِىْ قَبْلَهُ فَضَعَّفَهُ وَفِىْ تَارِيْخِ الْعُقَيْلِيِّ صُغْدِى اِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَرْوِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ حَدِيْثُهُ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ اِنْتَهٰى وَاَظُنُّهُ هُوَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اِبْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ وَاَمَّا كَوْنُ الْعُقَيْلِيِّ ذَكَرَهُ فِى الضُّعَفَاءِ فَاِنَّمَا هُوَ لِلْحَدِيْثِ الَّذِىْ ذَكَرَهُ عَنْهُ وَلَيْسَتِ الْاٰفَةُ مِنْهُ بَلْ هِىَ مِنَ الرَّاوِىْ عَنْهُ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

وَمِنْ ذٰلِكَ سَنْدَرُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّوْنِ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ مَوْلٰى زِنْبَاعِ الْجُذَامِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَ رِوَايَةٌ وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّهُ يُكَنّٰى اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ اِسْمٌ فَرْدٌ لَمْ يُتَسَمَّ بِهِ غَيْرُهُ فِيْمَا نَعْلَمُ لٰكِنْ ذَكَرَ اَبُوْ مُوْسٰى فِى الذَّيْلِ عَلٰى مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِاِبْنِ مَنْدَةَ سَنْدَرُ اَبُو الْاَسْوَدِ وَ رَوٰى لَهُ حَدِيْثًا وَتُعُقِّبَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ هُوَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اِبْنُ مَنْدَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَذْكُوْرَ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْجِيْزِىْ فِىْ تَارِيْخِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا مِصْرَ فِىْ تَرْجَمَةِ سَنْدَرٍ مَوْلٰى زِنْبَاعٍ وَقَدْ حَرَّرْتُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِىْ فِى الصَّحَابَةِ ـ

অনুবাদ : ১১. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একক নামীয় রাবীদের জানা। হাফিজ আবূ বকর আহমাদ ইবনে হারূন বারদীজী এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে তিনি এরূপ অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে কোনো কোনো নামের ব্যাপারে তার সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন– صُغْدِى بْنُ سِنَانٍ, অন্যতম দুর্বল রাবী। পেশবিশিষ্ট সাদ। সাদ কখনো সীন দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। গাইন সাকিন অতঃপর দাল, শেষে ইয়া, নিসবতের ইয়া -এর মতো। নিসবতী শব্দ হলেও এটি নামবাচক বিশেষ্য। হাফিজ আবূ বকর লেখেছেন যে, এ নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই; কিন্তু তা ঠিক নয়।

কেননা, ইবনে আবূ হাতিম তার **'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল'** গ্রন্থে বলেছেন, সুগদী কূফীকে ইমাম ইবনে মাঈন নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। আর ইতঃপূর্বে উল্লিখিত সুগদী ইবনে সিনানকে তিনিও দুর্বল বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুগদী এক ব্যক্তি নয়; বরং দু ব্যক্তির নাম।

ইমাম উকাইলী তার ইতিহাস গ্রন্থে লেখেছেন, সুগদী ইবনে আব্দুল্লাহ যিনি কাতাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণিত হাদীস গায়রে মাহফূয অর্থাৎ শায।

আমার মনে হয় এই সুগদী হলেন তিনিই– ইবনে আবূ হাতিম যার উল্লেখ করেছেন। তবে উকাইলী তাকে দুর্বলদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসের কারণে যা ইমাম উকাইলী তার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে হাদীসের দুর্বলতা সুগদীর কারণে আসেনি; বরং তার শিষ্য আনবাসা ইবনে আব্দুর রহমানের কারণে। আল্লাহই ভালো জানেন।

এরূপ আরেকটি নাম হলো سَنْدَرُ (সানদার)। নুকতাহীন সীন ও নূন সহকারে, জা'ফর (جَعْفَرٍ)-এর ওযনে। তিনি যিনবা আল-জুযামী -এর মাওলা এবং হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তার প্রসিদ্ধ কুনিয়াত হলো আবূ আব্দুল্লাহ। আমার জানা মতে এই নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। কিন্তু ইবনে মানদার 'মা'রিফাতুস সাহাবা' -এর পাদটীকায় আবূ মূসা লেখেছেন, সানদার-এর কুনিয়াত আবুল আসওয়াদ। তিনি তার একটি হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, সানদার নামে আরো এক ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু তার বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আবূ মূসা যে সানদার-এর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি সে-ই ব্যক্তিই, ইবনে মানদা তার মা'রিফাতুস সাহাবা গ্রন্থে যার উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে মানদা যার উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন যিনবা আল-জুযামী -এর মাওলা। মোটকথা, দু স্থানে একই ব্যক্তি উদ্দেশ্য। মুহাম্মদ ইবনে রবী মিসরে বসতি স্থাপনকারী সাহাবীদের ইতিহাসে উল্লিখিত হাদীসটি যিনবা-এর মাওলা সানদার-এর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। আমি আমার সাহাবী সংক্রান্ত গ্রন্থেও এরূপই উল্লেখ করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَسْمَاءُ مُفْرَدَةٌ -এর সংজ্ঞা : কিছু রাবী এমন আছেন যাদের নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই তাদের নামকে أَسْمَاءُ مُفْرَدَةٌ বলে। যেমন– لُبَيُّ بْنُ لَبَا (লুবাই ইবনে লাবা), أَحْمَدُ بْنُ عُجَيَانَ (আহমাদ ইবনে আজয়ান), سَنْدَرُ (সানদার) ইত্যাদি।

سَنْدَرُ নামীয় একক ব্যক্তি : সানদার একজন সাহাবীর নাম। তিনি যিনবা জুযামীর মাওলা ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ। যেহেতু سَنْدَرُ নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই, তাই এ নামটি أَسْمَاءُ مُفْرَدَةٌ -এর অন্তর্গত।

অবশ্য আবূ মূসা مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ -এর পরিশিষ্টে এক سَنْدَرُ -এর উল্লেখ করেছেন, যার কুনিয়াত হলো আবুল আসওয়াদ। এ থেকে বুঝা যায় যে, সানদার নামে এক ব্যক্তি ছিলেন না; বরং দুই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়; বরং প্রকৃত তথ্য হলো আবূ মূসা সানদার বলে যার উল্লেখ করেছেন তিনিই পূর্ববর্তী সানদার। অতএব, সানদার দুজন হলেন না; বরং একজনই হলেন।

وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْكُنَى الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُفْرَدَةِ وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْاَلْقَابِ وَهِىَ تَارَةً يَكُوْنُ بِلَفْظِ الْاِسْمِ وَتَارَةً بِلَفْظِ الْكُنْيَةِ وَتَقَعُ بِسَبَبِ عَاهَةٍ كَالْاَعْمَشِ اَوْ حِرْفَةٍ وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْاَنْسَابِ وَهِىَ تَارَةً يَقَعُ اِلَى الْقَبَائِلِ وَهُوَ فِى الْمُتَقَدِّمِيْنَ اَكْثَرُ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمُتَاخِّرِيْنَ وَتَارَةً اِلَى الْاَوْطَانِ وَهٰذَا فِى الْمُتَاخِّرِيْنَ اَكْثَرُ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالنِّسْبَةُ اِلَى الْوَطَنِ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ بِلَادًا اَوْ ضِيَاعًا اَوْ سِكَكًا اَوْ مُجَاوَرَةً وَتَقَعُ اِلَى الصَّنَائِعِ كَالْخَيَّاطِ وَالْحِرَفِ كَالْبَزَّازِ وَيَقَعُ فِيْهَا الْاِتِّفَاقُ وَالْاِشْتِبَاهُ كَالْاَسْمَاءِ وَقَدْ تَقَعُ الْاَنْسَابُ اَلْقَابًا كَخَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ الْقَطْوَانِىْ كَانَ كُوْفِيًّا وَيُلَقَّبُ بِالْقَطْوَانِىْ وَكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا ـ

অনুবাদ : ১২. যে সকল রাবীর শুধুমাত্র কুনিয়াত রয়েছে বা সে কুনিয়াত আর কারো নেই তা জানা। তেমনি রাবীর উপাধিও জানা। এটি কখনো নামে, কখনো কুনিয়াতে আবার কখনো হয় কোনো বিপর্যয়ের কারণে। যেমন– আ'মাশ (দিনকানা)। কিংবা পেশার কারণে। (যেমন– বাযযায তথা কাপড় ব্যবসায়ী)।

১৩. রাবীদের সম্পর্কীয় পরিচয় জানাও জরুরি। এটি কখনো হয় গোত্রের সাথে, পরবর্তীদের তুলনায় পূর্ববর্তীদের মধ্যে যা বেশি দেখা যায়। আবার কখনো হয় বাসস্থানের সাথে, পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীদের মধ্যে যা বেশি দেখা যায়। বাসস্থানের সম্পর্ক হয় শহর, কিংবা চাষাবাদের স্থান, কিংবা গলি কিংবা পাশ্ববর্তী স্থানের সাথে। আবার কখনো দক্ষতা যেমন– দর্জি ও পেশা যেমন– কাপড় ব্যবসায়ী -এর সাথেও হয়। নামের মতোই এক্ষেত্রেও মিল ও বিভ্রাট সৃষ্টি হতে পারে। কখনো কখনো নিসবতই উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– খালেদ ইবনে মাখলাদ কাতওয়ানী। তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী, কিন্তু কাতওয়ানী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এ উপাধি উল্লেখে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُنْيَتِ مُجَرَّدَةْ -এর সংজ্ঞা : কিছু রাবীর শুধু কুনিয়াতই থাকে– নাম, লকব কিছুই থাকে না। এমন কুনিয়াতকে বলে كُنْيَتِ مُفْرَدَةْ। যেমন– اَبُو الْعُشَا এটা উসামার কুনিয়াত ছিল। অনুরূপ اَبُوْ عُبَيْدَيْنِ (আবূ উবাইদাইন) এটা মুয়াবিয়া ইবনে সাবুরার কুনিয়াত। এ দু কুনিয়াত কেবল তাঁদেরই ছিল, অন্য কারো ছিল না।

لَقَب -এর কয়েকটি সুরত : লকব বা উপাধির ধরন কয়েকটি হয়।

১. লকব কখনো নাম হয়। যেমন– হযরত সাফীনা (রা.)।

২.লকব কখনো কুনিয়াতে পরিণত হয়। যেমন– আবূ তুরাব হযরত আলী (রা.)-এর কুনিয়াত ও লকব।

৩. কখনো কোনো দোষ-ত্রুটি লকবে পরিণত হয়। যেমন- سُلَيْمَانُ اَعْمَشْ (اعمش অর্থ- দিনকানা অর্থাৎ দিনের আলোতে দেখতে পায় না), عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ (اَعْرَجُ অর্থ- ল্যাংড়া), مُسْلِمُ بْنُ عِمْرَانَ الْبَطِيْنُ (اَلْبَطِيْنُ অর্থ- পেটুক) ইত্যাদি।

৪. কখনো পেশা লকবে পরিণত হয়। যেমন- عَطَّارْ (আতর ব্যবসায়ী)।

নিসবতের কয়েকটি সুরত : নিসবতের সুরত কয়েকটি। যথা-

১. নিসবত কখনো গোত্রের দিকে হয়। যেমন- হাশেমী, কুরাইশী ইত্যাদি।

২. কখনো দেশের দিকে হয়। যেমন- বুখারী, মিসরী, বাংলাদেশী ইত্যাদি।

৩. কখনো صَنَاعَتْ তথা কারিগরি বা দক্ষতার দিকে। যেমন- خَيَّاطْ (দর্জি)।

৪. কখনো হয় حِرْفَةْ তথা পেশার দিকে। যেমন- عَطَّارْ (আতর ব্যবসায়ী)।

وَطَنْ -এর দিকে নিসবত : وَطَنْ -এর দিকে নিসবতটা عَامْ বা ব্যাপক। নিসবতে ওতনীর দ্বারা কখনো উদ্দেশ্য হয় শহর। যেমন- مَدَنِيْ، مَكِّيْ অথবা চাষাবাদের স্থান অথবা কোনো গলি, অথবা শুধু পড়শি হওয়ার কারণেও নিসবত হয়।

وَطَنِيْ নিসবতটা এ দৃষ্টিতেও عَامْ যে, যাকে কোনো وَطَنْ -এর দিকে নিসবত দেওয়া হয় সেখানে সে পূর্ব হতেই থাকতে পারে, অথবা পরবর্তীতে এসে বসবাস করতে পারে অথবা কিছুদিন ছিল এমনও হতে পারে। অর্থাৎ এ সমস্ত অবস্থায়ও কোনো ব্যক্তিকে وَطَنْ -এর দিকে নিসবত দেওয়া হয়।

নিসবতের মধ্যে মিল-অমিল : যেরূপভাবে রাবীদের পরস্পরের নামের মধ্যে অনেক সময় একজনের নাম অপরজনের সাথে উচ্চারণ ও লেখায় মিলে যায় আবার কখনো শুধু উচ্চারণে মেলে লেখায় মেলে না, ঠিক তেমনি নিসবতের মধ্যেও মিল-অমিলের ঘটনা ঘটে। যেমন- হানাফী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারীদেরকে হানাফী বলা হয়। অনুরূপ আরবের একটি গোত্র আছে বনূ হানীফ। তাদের লোকদেরকেও বলে হানাফী। আর উভয়টাই বলতে ও লেখতে একই।

وَمِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ اَسْبَابِ ذٰلِكَ اَيِ الْاَلْقَابُ وَالنِّسَبُ الَّتِى بَاطِنُهَا عَلٰى خِلَافِ ظَاهِرِهَا وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْمَوَالِى مِنَ الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلِ بِالرِّقِّ اَوْ بِالْحَلْفِ اَوْ بِالْاِسْلَامِ لِاَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ الْمَوْلٰى وَلَا يُعْرَفُ تَمْيِيْزُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالتَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ وَمَعْرِفَةُ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ الْقُدَمَاءُ كَعَلِىِّ بْنِ الْمَدِيْنِىِّ ـ

অনুবাদ : ১৪. যে উপাধি বা নিসবত বাহ্যিক অবস্থার পরিপন্থি তার কারণ জানাও হাদীস চর্চাকারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৫. কোনো রাবী মাওলা হলে তার সম্পর্কে যাচাই করা দরকার যে, তিনি আজাদকারী না আজাদকৃত। তা ছাড়া তাকে মাওলা বলার কারণ কি গোলামি না সহায়তা-চুক্তি, না কারো নিকট ইসলাম গ্রহণ। কেননা, এই তিন কারণের যে কোনো একটি থাকলে মাওলা বলা হয়। স্পষ্ট বর্ণনা ছাড়া তা সনাক্ত করা যায় না।

১৬. আরেকটি জানার বিষয় হলো, কোনো রাবী কার ভাই বা কার বোন। মুতাকদ্দিমীনের মধ্যে ইমাম আলী ইবনে মাদীনী এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

লকব ও নিসবতের কারণ জানা : যে সমস্ত রাবীর লকব বা নিসবত রয়েছে, তাদের ঐ লকবের কারণ, নিসবতের কারণও জানা দরকার। বিশেষত যখন তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত হয়। যেমন– হযরত আবূ মাসউদ উকবা ইবনে আমির (রা.) -কে বদরী বলা হয়। কিন্তু তা এ কারণে না যে, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; বরং এ কারণে যে, তিনি বদর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতেন।

مَوْلٰى -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : مَوْلٰى শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো مَوَالِىُ। مَوْلٰى শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. আজাদকারী, ২. আজাদকৃত গোলাম। প্রথম ব্যক্তিকে مَوْلٰى اَعْلٰى আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে مَوْلٰى اَسْفَلْ বলে।

৩. যার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা-চুক্তির অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৪. যার হাতে ইসলাম কবুল করা হয়েছে।

যেহেতু এ সকল অর্থে مَوْلٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাই জানা দরকার যে, আলোচ্য স্থলে مَوْلٰى -এর কোন অর্থ উদ্দেশ্য।

মাওলা এবং ভাই-বোন জানার উপকারিতা : এতে কয়েকটি উপকারিতা নিহিত। যথা–

১. একই জাতীয় দুই নামের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

২. একাধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলে ধারণা করা হতে বাঁচা যায়।

৩. কখনো এমন হয় যে, দুই রাবীর পিতার নাম একই হওয়ার কারণে তাদেরকে ভাই-ভাই বলে মনে করা হয়, অথচ বাস্তবে তারা সহোদরা নয়। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার এবং আমর ইবনে দীনার। বাহ্যিকভাবে পিতার নাম এক হওয়ায় আব্দুল্লাহ ও আমরকে ভাই-ভাই বলে মনে হয়; কিন্তু বাস্তবে তাঁরা সহোদরা নন।

وَمِنَ الْمُهِمِّ اَيْضًا مَعْرِفَةُ اٰدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ وَيَشْتَرِكَانِ فِىْ تَصْحِيْحِ النِّيَّةِ وَالتَّطْهِيْرِ عَنْ اَعْرَاضِ الدُّنْيَا وَتَحْسِيْنِ الْخُلُقِ وَيَنْفَرِدُ الشَّيْخُ بِاَنْ يُسْمِعَ اِذَا احْتِيْجَ اِلَيْهِ وَاَنْ لَا يُحَدِّثَ بِبَلَدٍ فِيْهِ مَنْ هُوَ اَوْلٰى مِنْهُ بَلْ يُرْشِدُ اِلَيْهِ وَلَا يَتْرُكُ اِسْمَاعَ اَحَدٍ لِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ وَاَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَجْلِسَ بِوَقَارٍ وَلَا يُحَدِّثُ قَائِمًا وَلَا عَجِلًا وَلَا فِى الطَّرِيْقِ اِلَّا اَنْ يُضْطَرَّ اِلٰى ذٰلِكَ وَاَنْ يُمْسِكَ عَنِ التَّحْدِيْثِ اِذَا خَشِىَ التَّغَيُّرَ اَوِ النِّسْيَانَ لِمَرَضٍ اَوْ هَرَمٍ وَاِذَا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الْاِمْلَاءِ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ مُسْتَمْلٍ يَقِظٌ وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِاَنْ يُوَقِّرَ الشَّيْخَ وَلَا يُضْجِرَهُ وَيُرْشِدَ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ وَلَا يَدَعَ الْاِسْتِفَادَةَ لِحَيَاءٍ اَوْ تَكَبُّرٍ وَيَكْتُبَ مَا سَمِعَهُ تَامًّا وَيَعْتَنِىَ بِالتَّقْيِيْدِ وَالضَّبْطِ وَيُذَاكِرَ بِمَحْفُوْظِهِ لِيَرْسَخَ فِىْ ذِهْنِهِ -

---

অনুবাদ : ১৭. হাদীস শিক্ষাদানকারী ও শিক্ষাগ্রহণকারীর আদবসমূহ জানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কয়েকটি বিষয় শায়খ ও শিষ্যকে সমানভাবে পালন করতে হয়। যথা– নিয়ত শুদ্ধ হওয়া, মনকে পার্থিব স্বার্থচিন্তা থেকে পবিত্র রাখা, চরিত্র সুন্দর করা।

শায়খের জন্য আদব হলো, প্রয়োজনের সময় তিনি হাদীস বর্ণনা করবেন। যে শহরে তার চেয়ে বড় মুহাদ্দিস রয়েছেন সেখানে তিনি হাদীস বর্ণনা করবেন না; বরং তার দিকে ইঙ্গিত করে দেবেন। অসৎ নিয়তের কারণে কাউকে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত রাখা যাবে না। পবিত্রতা ও গাম্ভীর্যের সাথে হাদীস বর্ণনা করতে হবে। দাঁড়িয়ে, তাড়াহুড়ো করে কিংবা রাস্তায় চলতে চলতে কখনো হাদীস বর্ণনা করবেন না। অবশ্য নিরুপায় হলে ভিন্নকথা। রোগ-ব্যাধি কিংবা বার্ধক্যের কারণে যদি বিস্মৃত বা এলোমেলো হবার আশঙ্কা হয়ে যায়, তখন হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকবেন। যখন তিনি একদল ছাত্রকে হাদীস লেখাবেন তখন তার পক্ষ থেকে একজন সচেতন ঘোষক (শায়খের আওয়াজের মুবাল্লিগ) থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীর জন্য আদব হলো, শায়খকে সম্মান করা। তাকে বিরক্ত না করা। নিজে যা শুনবে তা অন্যকে শোনানো। লজ্জা বা গর্ববোধের কারণে শিক্ষাগ্রহণ ও প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে না। যা শুনবে পুরোপুরি লেখবে। লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের হরকত ও সাকিন কথায় আয়ত্ত করবে। মুখস্থ হাদীসসমূহ সর্বদা চর্চা করতে থাকবে যাতে তা স্মৃতিতে মজবুত হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ক্ষেত্রে শায়খ ও ছাত্র উভয়ের আদব : হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কিছু আদব এমন রয়েছে, যা শায়খ-ছাত্র উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং তা উভয়ের জন্য রক্ষা বা পালন করা জরুরি। এমন তিনটি আদব সম্মানিত লেখক নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. নিয়ত বিশুদ্ধ করা অর্থাৎ খালেস নিয়তে হাদীসের পঠন-পাঠন করা।
২. পার্থিব স্বার্থচিন্তা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা।
৩. আখলাক-চরিত্র (হাদীসের আলোকে) সুমার্জিত করা। এ তিনটি ছাড়াও আরো কিছু জরুরি আদব রয়েছে। যথা–
৪. ইলমে হাদীসের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা প্রদান করা।
৫. হাদীসের পঠন-পাঠনের সময় কথাবার্তা না বলা।
৬. সর্বোচ্চ বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা।

৭. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আবশ্যিকভাবে পালন করা।
৮. অন্যায়-গুনাহ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলা।
৯. সর্বদা এর উপর শুকরিয়া আদায় করা যে, আল্লাহ তা'আলা হাদীস পড়ানো বা পড়ার তৌফিক দান করেছেন।
১০. হামদ, সালাত ও সালামের মাধ্যমে হাদীসের দরস প্রদান কিংবা গ্রহণ শুরু করা।
১১. হাদীসের পঠন-পাঠনের সময় সুন্নত তরীকায় অজু করা এবং সম্ভব হলে আতর ব্যবহার করা।
১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম এলে দরুদ পড়া, সাহাবায়ে কেরামের নাম এলে রাযিয়াল্লাহু আনহু পড়া এবং সালাফে সালেহীনের নাম এলে রহমাতুল্লাহি আলাইহি পড়া।

শায়খের একক আদব : হাদীসের মুবারক দরস দানে শায়খের জন্য একান্ত কিছু আদব রয়েছে, যা কেবল তাঁকেই পালন করতে হয়। আর তা সম্মানিত লেখকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ–

১. প্রয়োজনের সময় হাদীস বর্ণনা করা।
২. যে এলাকায় তার চেয়ে বড় মুহাদ্দিস আছেন সেখানে হাদীস বর্ণনা না করা; বরং হাদীস শিক্ষার্থীকে ঐ বড় মুহাদ্দিসের কাছে পাঠানো।
৩. অসৎ নিয়তের কারণে কাউকে হাদীস বর্ণনা করা বাদ না দেওয়া।
৪. পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যতার সাথে বসে হাদীস রেওয়ায়েত করা। দাঁড়িয়ে অথবা তাড়াহুড়ো করে হাদীস বর্ণনা না করা। অনুরূপ রাস্তা-ঘাটে হাদীস বর্ণনা না করা। তবে একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন সে অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করা দূষণীয় নয়।
৫. হাদীসে পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে হাদীস বর্ণনায় ভুলের আশঙ্কা হলে হাদীস বর্ণনা না করা।
৬. একদল ছাত্রদেরকে হাদীস লেখানোর সময় কোনো চৌকস মুবাল্লিগ (প্রয়োজনে একাধিক) নিযুক্ত করা, যারা শায়খের আওয়াজকে দূরে পৌঁছে দেবে।

এ ছাড়া শায়খের জন্য আরও কয়েকটি আদব আছে। যথা–

৭. সহীহ হাদীস রেওয়ায়েত করা মুনকার ও জাল হাদীস রেওয়ায়েত না করা। আর করলেও সাথে সাথে তার মুনকার বা জাল হওয়ার কথা বর্ণনা করে দেওয়া।
৮. ছাত্রদের সাথে কোমল ও হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ আচরণ করা।

ছাত্রের একক আদব : হাদীসের মুবারক দরস গ্রহণকালে হাদীসের ছাত্রের জন্য একান্ত কিছু আদব রয়েছে, যা কেবল তাকেই পালন করতে হয়। আর তা সম্মানিত লেখকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ–

১. ছাত্র শায়খকে সম্মান করবে।
২. শায়খ বিরক্ত হন– এমন আচরণ করবে না
৩. হাদীসের দরস থেকে যা শুনবে অপরকে তা জানাবে।
৪. লজ্জা ও অহঙ্কারবশত হাদীস শ্রবণ ত্যাগ করবে না।
৫. শ্রুত হাদীস পূর্ণরূপে লেখে রাখবে।
৬. লিখিত হাদীসে হরকত সাকিন কথায় লেখে রাখবে।
৭. মুখস্থ হাদীস যাতে ঠোঁটস্থ হয়ে যায় তার জন্য হাদীসের চর্চা অব্যাহত রাখবে। মুখস্থ হাদীস বারবার আওড়াবে বা রিভাইজ দেবে।

এ ছাড়াও ছাত্রের জন্য আরো কতিপয় আদব রয়েছে। যথা–

৮. সবকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দরসে উপস্থিত থাকবে। সম্ভব হলে সর্বদা শায়খের সাথে থাকলে আরও ভালো হয়।
৯. কিতাব এবং দরসগাহ তথা শ্রেণিকক্ষের যথাযথ সম্মান করবে।
১০. ইবাদাত ও ফাযায়েল-বিষয়ক যে হাদীসটি পড়বে তৎক্ষণাৎ তার উপর আমল করবে। কারণ, এ আমল করাই হলো হাদীসের যাকাত ও প্রাণ।
১১. হাদীসের দরস গ্রহণে প্রথমে সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমকে রাখবে। এরপরে সুনানে আরবাআ তথা আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, অতঃপর মুসনাদসমূহ এরপরে গিয়ে علل -এর কিতাব পড়বে। অর্থাৎ হাদীস গ্রহণে কিতাবের স্তরের প্রতি খেয়াল রাখবে।
১২. হাদীস পড়ার সময় অন্যকিছু লেখা, কথাবার্তা বলা অথবা তন্দ্রা জাতীয় এমন কিছু করবে না, যা হাদীস শ্রবণকে ব্যাহত করে।

وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَصَحُّ إِعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ بِالتَّمْيِيْزِ هٰذَا فِى السَّمَاعِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِيْنَ بِإِحْضَارِهِمُ الْأَطْفَالَ مَجَالِسَ الْحَدِيْثِ وَيَكْتُبُوْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ حَضَرُوْا وَلَابُدَّ لَهُمْ فِىْ مِثْلِ ذٰلِكَ مِنْ إِجَازَةِ الْمُسْمِعِ وَالْأَصَحُّ فِىْ سِنِّ الطَّلَبِ بِنَفْسِهٖ أَنْ يَتَأَهَّلَ لِذٰلِكَ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الْكَافِرِ أَيْضًا إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهٖ وَكَذَا الْفَاسِقُ مِنْ بَابِ الْأَوْلٰى إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهٖ وَثُبُوْتِ عَدَالَتِهٖ .

وَأَمَّا الْأَدَاءُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا إِخْتِصَاصَ لَهُ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ بَلْ يُقَيَّدُ بِالْإِحْتِيَاجِ وَالتَّأَهُّلِ لِذٰلِكَ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِإِخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ إِذَا بَلَغَ الْخَمْسِيْنَ وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَرْبَعِيْنَ وَتُعُقِّبَ بِمَنْ حَدَّثَ قَبْلَهَا كَمَالِكٍ .

অনুবাদ : ১৮. হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ ও তা বর্ণনা করার বয়স জানাও জরুরি। বিশুদ্ধতর অভিমত অনুযায়ী বুঝজ্ঞানের **বয়সই** হাদীস শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিবেচ্য। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভ্যাস ছিল তারা ছোট **ছেলেদেরকে** হাদীসের মজলিসে উপস্থিত করতেন এবং লেখে দিতেন যে, সে বা তারা **হাদীসের মজলিসে হাজির হয়েছিল**। তবে এরূপ ক্ষেত্রে হাদীস শিক্ষকের অনুমতি একান্ত আবশ্যক।

বিশুদ্ধ মত অনুযায় হাদীস শিক্ষার জন্য বয়সের কোনো শর্ত নেই; বরং যোগ্যতা ও উপযুক্ততা জরুরি। কাফিরের হাদীসগ্রহণ শুদ্ধ যদি সে তা ইসলাম গ্রহণের পরে বর্ণনা করে। তেমনি ফাসিকের হাদীস গ্রহণ তো আরো যুক্তিযুক্ত, যদি সে তা বর্ণনা করে তওবা ও তার আদিল হবার বিষয় সাব্যস্ত হবার পরে।

হাদীস বর্ণনার জন্য আগেই বলা হয়েছে, কোনো সময়ের সাথে তা সীমাবদ্ধ নয়; বরং যখন প্রয়োজন পড়বে ও তিনি তা বর্ণনার যোগ্যতা অর্জন করবেন তখনই বর্ণনা করবেন। আর এটি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ইবনে খাল্লাদ বলেছেন, কোনো রাবী পঞ্চাশ বছর বয়সে উপনীত হলে হাদীস বর্ণনার যোগ্য হন। তবে চল্লিশ বছর বয়সের সময় কেউ যদি বর্ণনা করেন, তাহলে তার প্রতি বিরূপ হওয়া যাবে না।

ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ যারা চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বেই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে নজির হিসেবে উল্লেখ করে ইবনে খাল্লাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সময়কাল : শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের জন্য বিশেষ কোনো বয়সের প্রয়োজন আছে কিনা, নাকি এর পূর্বেও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করা যায়–এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. হাদীসগ্রহণের সর্বনিম্ন বয়স পাঁচ বছর। এর পূর্বে হাদীস শুনে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কারো কারো মতে বিশ বছর।

৭. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আবশ্যিকভাবে পালন করা।
৮. অন্যায়-গুনাহ্ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলা।
৯. সর্বদা এর উপর শুকরিয়া আদায় করা যে, আল্লাহ তা'আলা হাদীস পড়ানো বা পড়ার তৌফিক দান করেছেন।
১০. হামদ, সালাত ও সালামের মাধ্যমে হাদীসের দরস প্রদান কিংবা গ্রহণ শুরু করা।
১১. হাদীসের পঠন-পাঠনের সময় সুন্নত তরীকায় অজু করা এবং সম্ভব হলে আতর ব্যবহার করা।
১২. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম এলে দরুদ পড়া, সাহাবায়ে কেরামের নাম এলে রাযিয়াল্লাহু আনহু পড়া এবং সালাফে সালেহীনের নাম এলে রহমাতুল্লাহি আলাইহি পড়া।

শায়খের একক আদব : হাদীসের মুবারক দরস দানে শায়খের জন্য একান্ত কিছু আদব রয়েছে, যা কেবল তাঁকেই পালন করতে হয়। আর তা সম্মানিত লেখকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ–
১. প্রয়োজনের সময় হাদীস বর্ণনা করা।
২. যে এলাকায় তার চেয়ে বড় মুহাদ্দিস আছেন সেখানে হাদীস বর্ণনা না করা; বরং হাদীস শিক্ষার্থীকে ঐ বড় মুহাদ্দিসের কাছে পাঠানো।
৩. অসৎ নিয়তের কারণে কাউকে হাদীস বর্ণনা করা বাদ না দেওয়া।
৪. পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যতার সাথে বসে হাদীস রেওয়ায়েত করা। দাঁড়িয়ে অথবা তাড়াহুড়ো করে হাদীস বর্ণনা না করা। অনুরূপ রাস্তা-ঘাটে হাদীস বর্ণনা না করা। তবে একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন সে অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করা দূষণীয় নয়।
৫. হাদীসে পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে হাদীস বর্ণনায় ভুলের আশঙ্কা হলে হাদীস বর্ণনা না করা।
৬. একদল ছাত্রদেরকে হাদীস লেখানোর সময় কোনো চৌকস মুবাল্লিগ (প্রয়োজনে একাধিক) নিযুক্ত করা, যারা শায়খের আওয়াজকে দূরে পৌঁছে দেবে।

এ ছাড়া শায়খের জন্য আরও কয়েকটি আদব আছে। যথা–
৭. সহীহ হাদীস রেওয়ায়েত করা মুনকার ও জাল হাদীস রেওয়ায়েত না করা। আর করলেও সাথে সাথে তার মুনকার বা জাল হওয়ার কথা বর্ণনা করে দেওয়া।
৮. ছাত্রদের সাথে কোমল ও হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ আচরণ করা।

ছাত্রের একক আদব : হাদীসের মুবারক দরস গ্রহণকালে হাদীসের ছাত্রের জন্য একান্ত কিছু আদব রয়েছে, যা কেবল তাকেই পালন করতে হয়। আর তা সম্মানিত লেখকের দৃষ্টিতে নিম্নরূপ–
১. ছাত্র শায়খকে সম্মান করবে।
২. শায়খ বিরক্ত হন– এমন আচরণ করবে না
৩. হাদীসের দরস থেকে যা শুনবে অপরকে তা জানাবে।
৪. লজ্জা ও অহঙ্কারবশত হাদীস শ্রবণ ত্যাগ করবে না।
৫. শ্রুত হাদীস পূর্ণরূপে লেখে রাখবে।
৬. লিখিত হাদীসে হরকত সাকিন কথায় লেখে রাখবে।
৭. মুখস্থ হাদীস যাতে ঠোঁটস্থ হয়ে যায় তার জন্য হাদীসের চর্চা অব্যাহত রাখবে। মুখস্থ হাদীস বারবার আওড়াবে বা রিভাইজ দেবে।

এ ছাড়াও ছাত্রের জন্য আরো কতিপয় আদব রয়েছে। যথা–
৮. সবকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দরসে উপস্থিত থাকবে। সম্ভব হলে সর্বদা শায়খের সাথে থাকলে আরও ভালো হয়।
৯. কিতাব এবং দরসগাহ তথা শ্রেণিকক্ষের যথাযথ সম্মান করবে।
১০. ইবাদাত ও ফাযায়েল-বিষয়ক যে হাদীসটি পড়বে তৎক্ষণাৎ তার উপর আমল করবে। কারণ, এ আমল করাই হলো হাদীসের যাকাত ও প্রাণ।
১১. হাদীসের দরস গ্রহণে প্রথমে সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমকে রাখবে। এরপরে সুনানে আরবাআ তথা আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ, অতঃপর মুসনাদসমূহ এরপরে গিয়ে علل -এর কিতাব পড়বে। অর্থাৎ হাদীস গ্রহণে কিতাবের স্তরের প্রতি খেয়াল রাখবে।
১২. হাদীস পড়ার সময় অন্যকিছু লেখা, কথাবার্তা বলা অথবা তন্দ্রা জাতীয় এমন কিছু করবে না, যা

وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَصَحُّ اِعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ بِالتَّمْيِيْزِ هٰذَا فِى السَّمَاعِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِيْنَ بِاِحْضَارِهِمُ الْاَطْفَالَ مَجَالِسَ الْحَدِيْثِ وَيَكْتُبُوْنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ حَضَرُوْا وَلَابُدَّ لَهُمْ فِىْ مِثْلِ ذٰلِكَ مِنْ اِجَازَةِ الْمُسْمِعِ وَالْاَصَحُّ فِىْ سِنِّ الطَّلَبِ بِنَفْسِهٖ اَنْ يَتَأَهَّلَ لِذٰلِكَ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الْكَافِرِ اَيْضًا اِذَا اَدَّاهُ بَعْدَ اِسْلَامِهٖ وَكَذَا الْفَاسِقُ مِنْ بَابِ الْاَوْلٰى اِذَا اَدَّاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهٖ وَثُبُوْتِ عَدَالَتِهٖ ـ

وَاَمَّا الْاَدَاءُ فَقَدْ تَقَدَّمَ اَنَّهٗ لَا اِخْتِصَاصَ لَهٗ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ بَلْ يُقَيَّدُ بِالْاِحْتِيَاجِ وَالتَّاَهُّلِ لِذٰلِكَ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاِخْتِلَافِ الْاَشْخَاصِ وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ اِذَا بَلَغَ الْخَمْسِيْنَ وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْاَرْبَعِيْنَ وَتُعُقِّبَ بِمَنْ حَدَّثَ قَبْلَهَا كَمَالِكٍ ـ

অনুবাদ : ১৮. হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ ও তা বর্ণনা করার বয়স জানাও জরুরি। বিশুদ্ধতর অভিমত অনুযায়ী বুঝজ্ঞানের বয়সই হাদীস শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিবেচ্য। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভ্যাস ছিল তারা ছোট ছেলেদেরকে হাদীসের মজলিসে উপস্থিত করতেন এবং লেখে দিতেন যে, সে বা তারা হাদীসের মজলিসে হাজির হয়েছিল। তবে এরূপ ক্ষেত্রে হাদীস শিক্ষকের অনুমতি একান্ত আবশ্যক। বিশুদ্ধ মত অনুযায় হাদীস শিক্ষার জন্য বয়সের কোনো শর্ত নেই; বরং যোগ্যতা ও উপযুক্ততা জরুরি। কাফিরের হাদীসগ্রহণ শুদ্ধ যদি সে তা ইসলাম গ্রহণের পরে বর্ণনা করে। তেমনি ফাসিকের হাদীস গ্রহণ তো আরো যুক্তিযুক্ত, যদি সে তা বর্ণনা করে তওবা ও তার আদিল হবার বিষয় সাব্যস্ত হবার পরে। হাদীস বর্ণনার জন্য আগেই বলা হয়েছে, কোনো সময়ের সাথে তা সীমাবদ্ধ নয়; বরং যখন প্রয়োজন পড়বে ও তিনি তা বর্ণনার যোগ্যতা অর্জন করবেন তখনই বর্ণনা করবেন। আর এটি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ইবনে খাল্লাদ বলেছেন, কোনো রাবী পঞ্চাশ বছর বয়সে উপনীত হলে হাদীস বর্ণনার যোগ্য হন। তবে চল্লিশ বছর বয়সের সময় কেউ যদি বর্ণনা করেন, তাহলে তার প্রতি বিরূপ হওয়া যাবে না।

ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ যারা চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বেই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে নজির হিসেবে উল্লেখ করে ইবনে খাল্লাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস শিক্ষাগ্রহণের সময়কাল : শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের জন্য বিশেষ কোনো বয়সের প্রয়োজন আছে কিনা, নাকি এর পূর্বেও হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করা যায়–এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. হাদীসগ্রহণের সর্বনিম্ন বয়স পাঁচ বছর। এর পূর্বে হাদীস শুনে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কারো কারো মতে বিশ বছর।

৩. কারো কারো মতে, কমপক্ষে ত্রিশ বছর।

৪. কিন্তু সম্মানিত লেখকের অভিমত অনুযায়ী এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ উক্তি হলো, হাদীসগ্রহণে বয়সের ধর্তব্য হচ্ছে বুঝ-জ্ঞানের সাথে। অর্থাৎ এমন বয়স হওয়া যে, সে সম্বোধন বুঝে এবং সঠিকভাবে কথার জবাব দিতে পারে– এই বয়সে উপনীত হলে তার জন্য হাদীসগ্রহণ করা বৈধ। চাই এতে তার যে বয়সই হোক না কেন।

এ মতভেদ হলো হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে। নতুবা বরকত বা রহমত-লাভের উদ্দেশ্যে যদি এসে থাকে, তাহলে এর জন্য বিশেষ কোনো বয়স ধরাবাঁধা নেই। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভ্যাস ছিল, তারা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও হাদীসের দরসগাহে হাজির করতেন এবং বাচ্চাদেরকে এটা লেখে দিতেন যে, সে হাদীসের মজলিসে উপস্থিত হয়েছিল। তবে এ উপস্থিতি ও শ্রবণের মাধ্যমে হাদীস রেওয়ায়েত করা জায়েজ নেই; যতক্ষণ মুহাদ্দিস সাহেবের থেকে হাদীস বর্ণনার ইজাযত (অনুমতি) না মিলবে। মোটকথা, হাদীস অর্জনের জন্য বয়স শর্ত নয়; যোগ্যতা মূল শর্ত।

কাফির ও ফাসিকের জন্য হাদীসগ্রহণ ও বর্ণনা : কাফিরের জন্য হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ করা জায়েজ। তবে হাদীস বর্ণনার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। অর্থাৎ ইসলাম আনয়নের পূর্বে যদি কাফির রেওয়ায়েত করে, তবে তা ধর্তব্য হবে না।

অনুরূপভাবে ফাসিকের জন্য হাদীসের শিক্ষাগ্রহণ করা জায়েজ। হাদীস বর্ণনা করার জন্য ফিসক হতে তওবা করা এবং পুনরায় আদিল সাব্যস্ত হওয়া শর্ত।

হাদীস বর্ণনার সময়কাল : হাদীস বর্ণনা তথা অন্যের কাছে হাদীস পৌঁছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট বয়সের শর্ত নেই; বরং দুটো বিষয় জরুরি ও শর্ত।

১. হাদীস বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দেওয়া।

২. হাদীস বর্ণনা করার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা।

এ যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এক রকম হয় না; বরং ব্যক্তির বিভিন্নতায় বিভিন্ন রকম হয়। ইবনে খাল্লাদ বলেছেন, বয়স ৫০ কমপক্ষে ৪০ হলে এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার যোগ্য হয়। কিন্তু তার এ অভিমত সঠিক নয়। কেননা, ইমাম মালিক (র.) প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস ৪০ বছর বয়স হবার পূর্বেই হাদীস রেওয়ায়েত করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ صِفَةِ الضَّبْطِ فِى الْكِتَابِ وَصِفَةُ كِتَابَةِ الْحَدِيْثِ وَهُوَ اَنْ يَكْتُبَهُ مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا فَيُشَكِّلَ الْمُشْكِلَ مِنْهُ وَيُنَقِّطَهُ وَيَكْتُبَ السَّاقِطَ فِى الْحَاشِيَةِ الْيُمْنٰى مَادَامَ فِى السَّطْرِ بَقِيَّةٌ وَاِلَّا فَفِى الْيُسْرٰى وَصِفَةُ عَرْضِهٖ وَهُوَ مُقَابَلَتُهٗ مَعَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ اَوْ مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهٖ اَوْ مَعَ نَفْسِهٖ شَيْئًا فَشَيْئًا وَصِفَةُ سَمَاعِهٖ بِاَنْ لَا يَتَشَاغَلَ بِمَا يُخِلُّ بِهٖ مِنْ نَسْخٍ اَوْ حَدِيْثٍ اَوْ نُعَاسٍ وَصِفَةُ اِسْمَاعِهٖ كَذٰلِكَ وَاَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ اَصْلِهِ الَّذِىْ سَمِعَ فِيْهِ اَوْ مِنْ فَرْعٍ قُوْبِلَ عَلٰى اَصْلِهٖ فَاِنْ تَعَذَّرَ فَلْيَجْبُرْهُ بِالْاِجَازَةِ لِمَا خَالَفَ اِنْ خَالَفَ وَصِفَةُ الرِّحْلَةِ فِيْهِ حَيْثُ يَبْتَدِئُ بِحَدِيْثِ اَهْلِ بَلَدِهٖ فَيَسْتَوْعِبُهُ ثُمَّ يَرْحَلُ فَيُحَصِّلُ فِى الرِّحْلَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَهٗ وَيَكُوْنُ اِعْتِنَاؤُهٗ بِتَكْثِيْرِ الْمَسْمُوْعِ اَكْثَرَ مِنْ اِعْتِنَائِهٖ بِتَكْثِيْرِ الشُّيُوْخِ ، وَصِفَةُ تَصْنِيْفِهٖ وَ ذٰلِكَ اِمَّا عَلَى الْمَسَانِيْدِ بِاَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلٰى حِدَةٍ فَاِنْ شَاءَ رَتَّبَهٗ عَلٰى سَوَابِقِهِمْ وَاِنْ شَاءَ رَتَّبَهٗ عَلٰى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ وَهُوَ اَسْهَلُ تَنَاوُلًا اَوْ تَصْنِيْفِهٖ عَلَى الْاَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ اَوْ غَيْرِهَا بِاَنْ يَجْمَعَ فِىْ كُلِّ بَابٍ مَا وَرَدَ فِيْهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلٰى حُكْمِهٖ اِثْبَاتًا اَوْ نَفْيًا وَالْاَوْلٰى اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى مَا صَحَّ اَوْ حَسَنَ فَاِنْ جُمِعَ الْجَمِيْعُ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعِيْفِ اَوْ تَصْنِيْفِهٖ عَلَى الْعِلَلِ فَيُذْكَرُ الْمَتْنُ وَطُرُقُهٗ وَبَيَانُ اِخْتِلَافِ نَقَلَتِهٖ وَالْاَحْسَنُ اَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى الْاَبْوَابِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُهَا اَوْ يُجْمَعَهٗ عَلَى الْاَطْرَافِ فَيُذْكَرُ طَرَفُ الْحَدِيْثِ الدَّالِّ عَلٰى بَقِيَّتِهٖ وَيُجْمَعُ اَسَانِيْدُهٗ اِمَّا مُسْتَوْعِبًا اَوْ مُتَقَيِّدًا بِكُتُبٍ مَخْصُوْصَةٍ ـ

অনুবাদ : ১৯. কিতাবের হরকত ও সাকিন আয়ত্ত করার এবং হাদীস লেখার পদ্ধতিও জানা দরকার। লেখার নিয়ম হলো, লেখা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হতে হবে। জটিল শব্দগুলোতে হরকত ও নুকতা দিতে হবে। ভুলক্রমে কোনো শব্দ বা অংশ বাদ পড়ে গেলে খাতার ডান কিনারায় লেখবে, যদি বাদ পড়ে যাওয়া অংশের পরে কোনো শব্দ বাকি থাকে আর পরে শব্দ না থাকলে বাম কিনারায় লেখবে। (মোটকথা, লাইনের মধ্য হতে বাদ পড়লে ডান পাশে আর লাইনের শেষে গিয়ে বাদ পড়লে বাম পাশে লেখবে।)

লিখিত হাদীসকে মিলিয়ে দেখার নিয়মও জানা দরকার। মিলিয়ে নিতে হবে শায়খের সাথে যিনি হাদীসটি শুনিয়েছেন। কিংবা অন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাথে কিংবা নিজে অল্প অল্প করে মিলিয়ে দেখবে।

হাদীস শোনার নিয়মও জানা দরকার। হাদীস শোনার সময় লেখা, কথাবার্তা বলা, ঘুম ইত্যাদি ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

হাদীস শোনানোর সময়ও এগুলো প্রযোজ্য। তা ছাড়া তিনি ঠিক সে-ই মূলখাতা থেকে হাদীস শোনাবেন যা দেখে তিনি নিজ শায়খ থেকে শুনেছেন অথবা এমন অনুলিপি থেকে যা মূলখাতার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। যদি মিলিয়ে দেখা খাতা না হয়, তাহলে না মেলানো খাতা থেকেই শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু তা থেকে হাদীস বর্ণনার সময়ে ভিন্নভাবে অনুমতির প্রয়োজন হবে যাতে না মেলানোর ক্ষতিটুকু পূরণ হয়ে যায়।

হাদীস শিক্ষার জন্য সফর করার নিয়ম হলো, প্রথমত নিজ শহরের হাদীসসমূহ পুরোপুরি শিখে নেবে, অতঃপর সফর করবে। তখন তার নিজের যা জানা নেই তা হাসিল করে নেবে। তা ছাড়া শায়খের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়ে হাদীসের সংখ্যা বাড়ানোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

২০. হাদীসের গ্রন্থ রচনার নিয়ম : (এর অনেক পদ্ধতি রয়েছে–)

ক. মুসনাদ হিসেবে রচনা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক সাহাবীর সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা। সাহাবীদের নামের ক্রমবিন্যাস ইসলাম গ্রহণের সময় হিসেবে করা যায়; আবার বর্ণমালার ক্রমানুসারেও করা যায়। এটিই আয়ত্ত করার পক্ষে সহজ।

খ. ফিক্হ বা অন্য কোনো বিষয়ের পরিচ্ছেদ অনুসারে বিন্যস্ত করা। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এমন হাদীস উল্লেখ করতে হবে যাতে উক্ত পরিচ্ছেদের হুকুম সাব্যস্ত কিংবা নাকচ হয়। উত্তম হলো, শুধুমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস উল্লেখ করে ক্ষান্ত হওয়া।

যদি সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়, তাহলে দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার কারণও বলে দিতে হবে।

গ. ইলাল বর্ণনার পদ্ধিতিতে– প্রত্যেক মতনের সাথে তার সকল সনদ বর্ণনা করে অতঃপর বর্ণনাকারীদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা উল্লেখ করা। (যেমন– কেউ মারফূ', কেউ মুরসাল, কেউ মাওকূফ সনদে বর্ণনা করে থাকলে তা উল্লেখ করে দিতে হবে।) এক্ষেত্রেও অধ্যায় অনুসারে সাজানো উত্তম, তাহলে আয়ত্ত করা সহজ হয়।

ঘ. প্রান্ত বর্ণনার পদ্ধতিতে– প্রতিটি হাদীসের একটি অংশবিশেষ উল্লেখ করবে, যাতে অবশিষ্ট অংশ বুঝা যায়। অতঃপর তার সনদসমূহ, সকল কিংবা নির্দিষ্ট কিতাবসমূহে যেসব সনদে সেটি বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্মানিত লেখক হাদীস লেখার যে নিয়ম-কানুন এখানে উল্লেখ করেছেন, তা ঐ সময়কার যখন হাদীসের কিতাবাদি ছাপানো ছিল না। এখনও যদি কেউ হাতে হাদীস লেখে, তাহলে তাকেও এ নিয়ম ফলো করতে হবে যে, লিখিত হাদীসকে অন্য কোনো কপির সাথে মিলিয়ে নেবে।

পতিত অংশ সংযোজন : সম্মানিত লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাদীস লেখতে গিয়ে যদি কোনো অংশ ভুলক্রমে বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা সংযোজনের দু পদ্ধতি। যথা–

১. দেখতে হবে বাদ পড়া অংশের পরে লাইন শেষ নাকি লাইনের মধ্যখান থেকে বাদ পড়েছে, যার পরে আরও কিছু শব্দ লেখা হয়েছে। যদি প্রথম সুরত হয় অর্থাৎ লাইনের শেষ হতে বাদ পড়ে, তাহলে বাদ পড়া অংশ কিতাবের বাম পাশের হাশিয়ায় বা সাদা অংশে সংযোজন করতে হবে।

২. আর যদি বাদ পড়াটা লাইনের মধ্যখান থেকে হয়, যার দু পাশে অন্য লেখা আছে, তাহলে এমতাবস্থায় পড়ে যাওয়া অংশ কিতাবের ডান হাশিয়ার তথা সাদা অংশে সংযোজন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, সংযোজনের এ নিয়ম লেখকের সময়কার। কেননা, তখন কিতাবের দু পাশে ফাঁকা রেখে মাঝখানে লেখা হতো। এখন যেহেতু নিয়ম পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন কিতাবের প্রথম (ডান পাশের) পাতার ডান পাশে একটু বেশি খালি জায়গা রাখা হয়। আর ডান পাশের তুলনায় বাম পাশে একেবারে কম জায়গা রাখা হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় (বাম পাশের) পাতার বাম পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়; কিন্তু ডান পাশে সে তুলনায় কম ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। তাই লেখকের বর্ণিত নিয়মটা এ যুগে কার্যকর নয়। এখন পড়ে যাওয়া অংশ যে পাশে খালি জায়গা থাকে সে পাশে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সংযোজন করে দিতে হবে।

হাদীসের গ্রন্থ রচনার নিয়ম : হাদীসের গ্রন্থ রচনার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এর সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি। অবশ্য প্রত্যেক পদ্ধতির জন্য সুনির্দিষ্ট শব্দও রয়েছে। যখন ঐ শব্দ বলা হয় তখন তার দ্বারা বুঝা যায় যে, কিতাবটি একটি বিশেষ পন্থায় লেখা হয়েছে। তাই এখন ঐ শব্দগুলো বললে তার দ্বারা পরিভাষায় প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য হয়।

মুসনাদ -এর পন্থা : مُسْنَدٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন مَسَانِيْدُ । মুসনাদ ঐ কিতাবকে বলে যাতে সাহাবায়ে কেরামের নামানুসারে হাদীস সংকলন করা হয়। অর্থাৎ এক সাহাবীর সকল বর্ণনা এক স্থানে এরপর আরেক সাহাবীর সকল বর্ণনা এক স্থানে– এভাবে হাদীস জমা করা হয়। যেমন– মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে হুমায়দী ইত্যাদি।

সাহাবায়ে কেরামের বিন্যাসটা কয়েকভাবে হতে পারে। যথা–

১. ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতার দিক বিবেচনায় অর্থাৎ যিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রথমে– এভাবে বিন্যাসটা হতে পারে।
২. আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে। অর্থাৎ যে সমস্ত সাহাবীর নাম আলিফ (হামযা) দ্বারা শুধু তাদের বর্ণিত হাদীস প্রথমে উল্লেখ করা। এরপর যাদের নামের শুরুতে 'বা' রয়েছে তাদের হাদীস উল্লেখ– এভাবে আরবি বর্ণমালা হিসেবে হাদীস জমা করা।

অধ্যায়গতভাবে পন্থা : ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় কায়েম করে হাদীস সংকলন করা যেতে পারে। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে হুকুম সাব্যস্তকারী কিংবা নাকচকারী হাদীস জমা করা হয়। অধ্যায়গতভাবে রচিত হাদীসের সংকলনকে جَامِعٌ (জামি') বলে। যেমন– বুখারী, তিরমিযী। কেউ কেউ অধ্যায়গতভাবেই কিন্তু শুধু সহীহ হাদীস জমা করেন। যেমন– বুখারী, মুসলিম। আবার কেউ হাসান হাদীসও জমা করেন। যেমন– তিরমিযী। এ ছাড়া অন্যভাবেও হাদীস জমা করা হয়।

ইলাল -এর পন্থা : ইলাল হাদীসের ঐ কিতাবকে বলে, যাতে প্রত্যেক মতনের সাথে তার সমস্ত সনদ উল্লেখ করা হয়। সাথে সাথে রাবীদের মধ্যে মারফূ', মুরসাল, মাওকূফ হিসেবে যে মতভেদ ঘটে তা উল্লেখ করে দেওয়া হয়। যেমন– ইমাম তিরমিযী (র.) -এর اَلْعِلَلُ الْكَبِيْرُ এবং اَلْعِلَلُ الصَّغِيْرُ। অনুরূপ ইবনে আবী হাতিমের كِتَابُ الْعِلَلِ ইত্যাদি।

আতরাফ (প্রান্ত) -এর পন্থা : اَطْرَافٌ হাদীসের ঐ কিতাবকে বলে, যাতে হাদীসের প্রথম অংশ উল্লেখ করে তার সমস্ত সনদ জমা করা হয়। অথবা, সুনির্দিষ্ট কিতাবে যে সনদ আসে তাকে জমা করা হয়। যেমন– ইমাম মিযযী (র.) -এর تُحْفَةُ الْاَشْرَافِ بِمَعْرِفَةِ الْاَطْرَافِ ইত্যাদি।

وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيْثِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيْهِ بَعْضُ الشُّيُوْخِ لِلْقَاضِى اَبِىْ يَعْلَى اِبْنِ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيِّ وَهُوَ اَبُوْ حَفْصٍ الْعُكْبُرِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ بْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ اَنَّ بَعْضَ اَهْلِ عَصْرِهٖ شَرَعَ فِىْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ وَكَاَنَّهٗ مَا رَاٰى تَصْنِيْفَ الْعُكْبُرِيِّ الْمَذْكُوْرِ وَصَنَّفُوْا فِىْ غَالِبِ هٰذِهِ الْاَنْوَاعِ عَلٰى مَا اَشَرْنَا اِلَيْهِ غَالِبًا وَهِىَ اَىْ هٰذِهِ الْاَنْوَاعُ الْمَذْكُوْرَةُ فِىْ هٰذِهِ الْخَاتِمَةِ نَقْلٌ مَحْضٌ ظَاهِرَةُ التَّعْرِيْفِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيْلِ وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ فَلْيُرَاجِعْ لَهَا مَبْسُوْطَاتُهَا لِيَحْصُلَ الْوَقْفُ عَلٰى حَقَائِقِهَا وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِىْ لِلْحَقِّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَعِتْرَتِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ

অনুবাদ : ২১. হাদীসের কারণ জানাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসের কারণ বিষয়ে কাজি আবূ ই'য়ালা ইবনে ফাররা হাম্বলীর ওস্তাদ আবূ হাফস উকবুরী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শায়খ তকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ (র.) লেখেছেন যে, তার সময়ের জনৈক মনীষী এ বিষয়গুলো সংকলন করতে শুরু করেছেন। হয়তো তিনি উকবুরীর রচনা দেখেননি।

হাদীসের অধিকাংশ বিষয়ে ইমামগণের রচনা রয়েছে। অধিকাংশ কিতাবের প্রতি আমি ইঙ্গিতও করে এসেছি। তবে পরিশিষ্টে যেসব শ্রেণির কথা বর্ণিত হয়েছে, আমি শুধু সেগুলোর নামই উল্লেখ করেছি। এগুলোর সংজ্ঞা সুস্পষ্ট– সকলের জানা। তার উদাহরণের অপেক্ষা রাখে না (অর্থাৎ উদাহরণের প্রয়োজন নেই)। এগুলো আয়ত্ত করাও দুষ্কর। এসবের জন্য (অর্থাৎ সমস্ত প্রকার ও উদাহরণ জানার জন্য) বড় বড় গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে। যাতে করে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবগতি লাভ হয়। আল্লাহ তৌফিকদাতা এবং সঠিক পথের দিশারী। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি দরুদ ও রহমত বর্ষণ করুন। রহমত বর্ষণ করুন কিয়ামত দিন পর্যন্ত; আরো তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথি, স্ত্রীগণ এবং সন্তানসন্ততির উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের প্রেক্ষাপট জানা : অনেক হাদীস এমন রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন। উসূলুল হাদীসের পরিভাষায় এই নেপথ্য ও প্রেক্ষাপটকে বলা হয় শানে উরূদ বা হাদীসের কারণ। হাদীসের প্রেক্ষাপট সুনির্দিষ্ট হলেও হুকুম হয় ব্যাপকভিত্তিক। যদিও হুকুমের বিবেচনায় হাদীসের প্রেক্ষাপট ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তথাপি এই প্রেক্ষাপট জানার মধ্যে অনেক ফায়দা নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ :

১. হাদীসের প্রেক্ষাপট জানা থাকলে হাদীসের পরস্পর বিরোধের সময় হাদীসকে তার স্ব-স্ব স্থানে প্রযোজ্য করা সম্ভব হয়।

২. হাদীসের মতলব ও উদ্দেশ্য বুঝতে প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সহায়ক হয়, ইত্যাদি।

॥ শেষ ॥

শরহু
নুখবাতিল ফিকার
আরবি বাংলা
شرح نخبة الفكر
ইসলামিয়া কুতুবখানা ■ ঢাকা